নবজাগরণের ছয় মহানায়ক

দীনেশ চন্দ্র সাহা

নবজাগরণের ছয় মহানায়ক

দীনেশ চন্দ্র সাহা
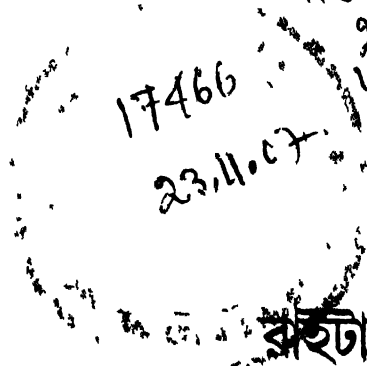
রাইটার্স পাবলিকেশন
প্যালেস কম্পাউন্ড ইস্ট
আগরতলা, ত্রিপুরা

নব জাগরণের ছয় মহানায়ক
NABA JAGARANER CHHAY MAHANAYAK
by Dinesh Chandra Saha
Published by . Writers Publication
Palace Compound East
Agartala, Tripura
Phone (0381) 222 8590

Price Rs 150/- Only

দ্বিতীয় সংস্করণ - আগরতলা বইমেলা ২০০[illegible]

প্রকাশক : দীনেশ চন্দ্র সাহা

অক্ষর বিন্যাস : প্লাজা গ্রাফিক্স, ওরিয়েন্ট চৌমুহনী,
আগরতলা, ত্রিপুরা। ২২০ ৫৬২৫

মুদ্রন : অনিল লিথোগ্রাফিং কোং,
১৩, [illegible] দে স্ট্রীট,
কোলকাতা [illegible] ১২

মূল্য : ১৫০ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

রাইটার্স পাবলিকেশন,
প্যালেস কম্পাউন্ড ইস্ট,
আগরতলা, ত্রিপুরা।

[illegible] প্রাপ্তিস্থান

মণীষা গ্রন্থালয়
৪/৩ বি বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলকাতা-৭৩

ISBN-81-902476-6-2

বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণের দুইশ বছর এবং স্বদেশী আন্দোলনের একশ বছর অতিক্রম করে জাতির কল্যাণে এবং জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ও স্বদেশের মুক্তি সাধণায় যাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁদের সকলের স্মৃতির উদ্দেশ্যে।

দীনেশ চন্দ্র সাহা
গ্রন্থাকার

সুদূর অতীত কাল থেকে ভারতীয় সমাজ নানা রীতি-নীতি-সংস্কারের বন্ধনে আবদ্ধ। তার ফলে মানুষের মানসিক স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। আমাদের দেশের নারীরা ছিলেন পুরুষদের অস্তঃপ্রাধীন। তাদের আশা আকাংক্ষা ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন মূল্যই ছিলনা। বিশেষ করে তথা কথিত উচ্চ বর্ণ ও উচ্চবর্গীয় সমাজে শাস্ত্রের মিথ্যা দোহাই দিয়ে নারীদের প্রতি চরম নির্যাতন ও শাস্ত্রের লাঞ্ছনা করা হত নানা পদ্ধতিতে। নারীদের না ছিল ব্যক্তি স্বাধিনতা, না ছিল সম্পত্তির অধিকার। বলা যায় নারীরা ছিলেন পুরুষের ভোগ্যপণ্য।

সুদূর অতীতকাল থেকেই বৈদিক যুগ থেকে ঊনিশ শতক পর্যন্ত নারীরা পুরুষদের সম্পত্তি ছাড়া আর কিছু ছিলেননা। শিক্ষার অভাব ও অর্থনৈতিক পরাধীনতা পুরুষদের প্রতি নারীদের অনুগত ও নির্ভরতার মূল কারণ। তাই স্বেচ্ছাচারী পুরুষরা শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে, ধর্মের দোহাই দিয়ে নারীনির্যাতন চালিয়ে গেছেন যুগের পর যুগ।

পুরুষরা সৃষ্টি করেছেন বহু বিবাহ, সতীদাহ প্রথা, বাল্য বিবাহ। নারীদের এই সব দুঃসহ জীবন-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়ে সমাজে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্যে যারা সংগ্রাম করে ছিলেন তাঁরা হলেন রাজা রামমোহনরায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূধন দত্ত বঙ্কিমচন্দ্র চটপাধ্যায় শ্রী রামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি মহামানবেরা।

এইসব মহামানবেরা কুসংস্কারের কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ সমাজকে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে এসেছেন। আর তাই তারা আমাদের প্রণম্য এবং প্রাতঃস্মরণীয়।

প্রবীন শিক্ষাবিদ এবং বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক শ্রী দীনেশ চন্দ্র সাহা মহাশয় বর্তমান গ্রন্থটিতে আমাদের দেশের মহান সন্তানদের জীবন ও কর্ম নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন। একদিকে তিনি যেমন ঐতিহাসিক তথ্যের ওপর ভিত্তি করে রামমোহন বিদ্যাসাগর মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রভৃতির তথ্যনিষ্ট জীবনী রচনা করেছেন, অন্যদিকে তেমনি ঐসব মহামানবদের বিচিত্র কর্মধারা সম্বন্ধেও বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

প্রথমে তিনি যথার্থভাবেই প্রাচ্যের প্রথম যুক্তিবাদী মানুষ রামমোহন রায়ের জীবন ও কর্ম নিয়ে তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন। রামমোহনরায় কী ভাবেএক গোঁড়া হিন্দু পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেও হিন্দু সমাজের সমস্ত কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে মানব জীবনের সত্য পথের সন্ধান করেছিলেন তার বিস্তৃত আলোচনা করেছেন লেখক।

রামমোহন ছিলেন বহুভাষাবিদ এবং বহু শাস্ত্রবিদ। সংস্কৃত, বাংলা, আরবি ফার্সি, ইংরেজী প্রভৃতি ভাষা আয়ত্ত করে বিভিন্ন ধর্মের গ্রন্থ পাঠ করে মানুষের সত্য ধর্মটিকে তিনি অনুভব করেছিলেন। তিনিই প্রথম মানুষ যিনি সতীদাহের মতো জঘন্য ও অমানবিক প্রথার বিরোধিতা

করবেন এবং তাঁরই আন্তরিক চেষ্টা ও উদ্যোগে ১৮২৯সালে সতীদাহকে নিষিদ্ধ করে আইন প্রণীত হয়। তিনি ভারতবাসীকে ন্যায্য অধিকারের দাবীতে প্রতিষ্ঠার জন্য দিল্লীর বাদশার দূত হয়ে ইংলেন্ডে যান এবং ফ্রান্সেও তিনি যান।

কর্মবীর এই মহান মানুষটি সুদূর বিদেশে ব্রিষ্টল শহরে মৃত্যু বরণ করেন। বহু ভাষাবিদ রামমোহন সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে যেমন কলম ধরেছেন পত্রিকা প্রকাশ করেছেন, তেমনি মাতৃভাষার উন্নতির জন্য গৌড়ীয় ব্যাকরণ নাম দিয়ে প্রথম যথার্থ বাংলা ব্যাকরণ রচণাও করেছেন। তাছাড়া সংস্কৃত ঘেষা পান্ডিত বংলাকে সহজ সরল বাংলা ভাষায় রূপান্তরের কৃতিত্বও তারই। বলা বহুল্য তিনিই প্রথম মানুষ যিনি আমাদের দেশে নব জাগ্রত চেতনার আলোক বার্তিকা জ্বেলেছিলেন।

রামমোহনের যথার্থ উত্তরসূরী পান্ডত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বহুভাষাবিদ সুপন্ডিত বিদ্যাসাগর আমাদের দেশে শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। রামমোহনের মতো তিনিও ছিলেন সম্পূর্ণ মুক্তমনের মানুষ। তাই মিথ্যা শাস্ত্রাচারের গন্ডি অতিক্রম করে মানবজীবনের সত্যপথের সন্ধানী ছিলেন তিনি।

একদিকে যেমন তিনি শিক্ষা বিস্তারে উদার দৃষ্টি ভঙ্গীর পরিচয় দান করেছেন, অন্যদিকে তেমনি সামাজ সংস্কারের ক্ষেত্রেও তিনি উদার মানসিকতার পরিচয় দান করেছেন।

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য পাঠের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি ভাষা শিক্ষাও যে প্রয়োজন সেকথা অনুভব করে সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী শিক্ষারও সূত্রপাত করেন তিনি।

তারই অন্তরিক প্রচেষ্টায় ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইন প্রণীত হয়। বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

মানবদরদী ও সমাজ সংস্কারক বিদ্যাসাগর বাংলা এবং সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির ক্ষেত্রেও অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছেন। সংস্কৃত ভাষার সাহিত্যের ইতিহাস ছাড়াও সংস্কৃত ভাষার সহজ বোধ্য ব্যাকরণও রচনা করেছেন তিনি। তাছাড়া বাংলা গদ্যভাষায় যথার্থ সাধু রূপটি নির্মাণ করে বাংলা ভাষাকে সাবলীল ও লালিত্যপূর্ণ করে তোলেন তিনি। যেমন মৌলিক গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে, তেমনি হিন্দী, সংস্কৃত ও ইংরাজি গ্রন্থের অনুবাদের ক্ষেত্রে তিনি প্রশংসনীয় কৃতিত্বের পরিচয় দান করেছেন। সমস্ত দিক দিয়েই বিদ্যাসাগর সমগ্র ভারতবাসীর কাছে তাই এক চিরস্মরণীয় মহামানব।

বাংলা মায়ের আর একজন বিদ্রোহী সন্তান হলেন মাইকেল মধূসুদন দত্ত। তিনি তাঁর জীবনাচরণে যেমন বিদ্রোহের পরিচয় দিয়েছেন তেমনি বিদ্রোহের পরিচয় দিয়েছেন তাঁর কাব্য-কবিতা, নাটক, প্রহসন রচনার ক্ষেত্রেও।

একদিকে তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দ সৃষ্টি করে পয়ারের সুকঠিন বন্ধনকে ভেঙে ফেলে, যেমন বাংলা কবিতাকে মুক্তি দিয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি মেঘনাদবধ কাব্য ও বীরাঙ্গনা কাব্য

রচনা করে নারী স্বাধীনতা তথা নারী মুক্তির কথা শুনিয়েছেন ।আবার প্রহসনের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর ধনী ও উচ্চবিত্ত মানুষদের ভণ্ডামির মুখোশটা খুলে দিয়েছেন । সংস্কার বদ্ধ বাঙালি সমাজের অন্তঃসারশূন্য স্বরপটি তিনি পকাশ করে মানব সতাকে প্রকাশ করেছেন। বাংলা

সাহিত্য ও বাঙালি সমাজে উনিশ শতকের নবজাগ্রত চেতনার সার্থক প্রতিনিধি মধুসূদন ।

মধুসূদনের মতো বাংলা সাহিত্য ধারায় নবযুগের সূচনা করেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। মধুসূদন কবিতায়. বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস ও প্রবন্ধে । তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক উপন্যাসের রচয়িতা শুধু নন, বিচিত্র ধারার উপন্যাস রচনার তিনি পথ প্রদর্শক ।সামাজিক জীবনে নরনারীর বিচিত্র সমস্যার বাস্তব ছবি অঙ্কন করে তিনি মানব জীবনের সূক্ষ্ম অনুভূতির দিকগুলো যথাযথভাবে তুলে ধরেচেন । তাঁর প্রবন্ধ গুলোতে আমরা আর এক বঙ্কিমকে পাই যিনি দেশি বিদেশি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের রস পরিবেষন করে আমাদের দৃষ্টিকে, আমাদের রসবোধের গন্ডিকে প্রসারিত করে দিয়েছেন ।শুধু তাই নয় তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধে দেশের দরিদ্র কৃষকদের অসহায় অবস্থার কথা সুস্পষ্ট ভাবে তুলে ধরে তাঁর উদার ও সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দান করেছেন । বঙ্কিমচন্দ্রের অসামান্য দানের কথা তাই চিরস্মরণীয় ।

সবশেষে বলতে হয় যুগস্রষ্টা পরম পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর শিষ্য বিবেকানন্দের কথা। ধর্ম সম্বন্ধে ভারতবাসীর বদ্ধমূল ধারনার পরিবর্তন ঘটিয়ে ধর্মের সত্যরূপটি তাঁরা প্রকাশ করেছেন ।যতমত ততপথ' কিন্তু সব পথের শেষ সেই একই ঈশ্বরে এই সত্য ধর্মবাণী শুনিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ ।আর স্বামীজী জীবসেবার কথা বলেছেন ।জীবের মধ্যেই ঈশ্বরের বাস ।কর্মযোগী স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের মানবতার তথা ধর্মের সত্য আদর্শকে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কাছে তুলে ধরে এক মহান কর্তব্য পালন করেছেন ।আমরা তাই শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামীজীকে প্রণাম জানাই।

শ্রী দীনেশ চন্দ্র সাহা মহাশয় উপরি উক্ত ছ'জন শ্রেষ্ঠ ভারতীয় মনীষার জীবন-কথা ও জীবনচর্যার যে তথ্যনিষ্ঠ পরিচয় দান করেছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয় ।তাঁর গবেষণাধর্মী মানসিকতা এবং মনীষীদের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধাবোধের ফসল এই গ্রন্থটি ।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই গ্রন্থটি সুস্থচিন্তা ও চেতনার বিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হবে।

আমি লেখককে আন্তরিক শুভকামনা জানাই ।

ডঃ শিশির কুমার সিংহ
অধ্যাপক
তথা ভূতপূর্ব বিভাগীয় প্রধান
বাংলা বিভাগ এবং ডিন, কলা ও বাণিজ্য শাখা
ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় ।

আগরতলা
২রা জানুয়ারী ২০০৬

(রাজা রামমোহন বায়)

(ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর)

(মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র)

সূচীপত্র
(শ্রী রাম কৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ)

রাজা রামমোহন রায়

(১৭৭২-১৮৩৩)

ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর

(১৮২০-১৮৯১)

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

(১৮২৪-১৮৭৩)

বঙ্কিম চন্দ্র

(১৮৩৮-১৮৯৪)
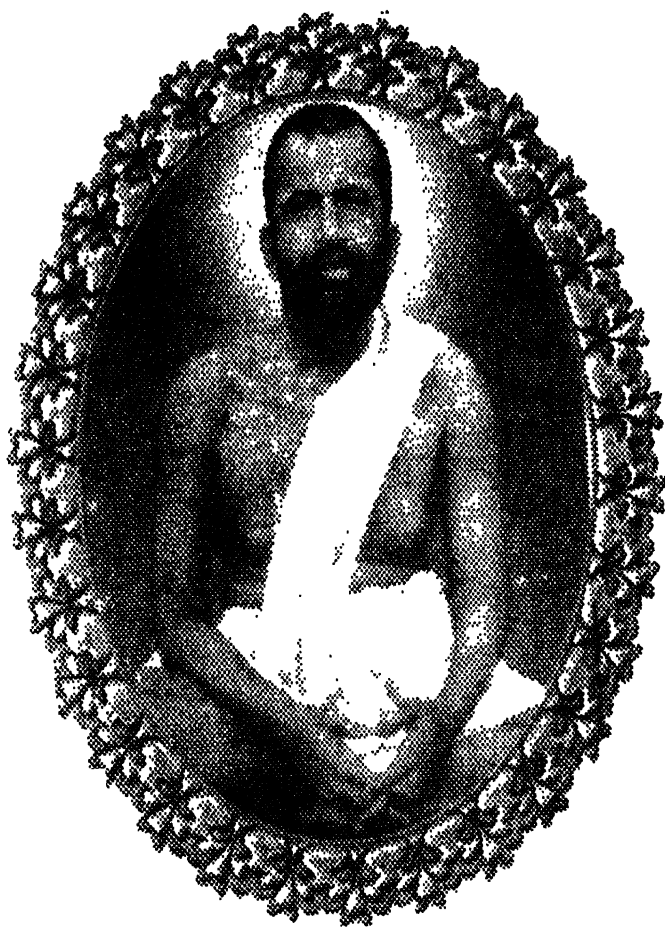
শ্রী রামকৃষ্ণ

(১৮৩৬-১৮৮৬)

স্বামী বিবেকানন্দ

(১৮৬৩-১৯০২)

নবজাগরণের অগ্রদূত
রাজা রামমোহন রায়

উৎসর্গ

নতুন প্রজন্মের যুবক - যুবতী, ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণ পাঠক পাঠিকাদের উদ্দেশ্যে, যারা জাতীয়তাবোধ, স্বদেশপ্রেম, আত্মমর্যাদাবোধ ও সামাজিক জাগরণের উদগাতাদের জীবনকাহিনী জানতে আগ্রহ্ বোধ করেন ।

দীনেশ চন্দ্র সাহা
গ্রন্থকার

এই লেখকের অন্যান্য বই

১। **বিংশ শতাব্দীর ত্রিপুরা - ১ম খন্ড - রাজন্য যুগ।**

এতে আছে রাজন্য যুগের তথ্য সমৃদ্ধ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ।

২। **বিংশ শতাব্দীর ত্রিপুরা - ২য় খন্ড - প্রজাতান্ত্রিক যুগ।**

এতে আছে প্রজাতান্ত্রিক ত্রিপুরার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ।

৩। **ত্রিপুরায় গণ আন্দোলনের বিচিত্র ধারা।**

এতে আছে ত্রিপুরায় রাজন্যযুগের শেষ লগ্নে শুরু হয়ে বর্তমান কাল পর্যন্ত বিভিন্ন ধারার গণআন্দোলনের তথ্য সমৃদ্ধ ইতিহাস।

৪। **কিশোর গল্প গুচ্ছ।**

(ছোটদের জন্য শিক্ষামূলক গল্প)

৫। **নব জাগরণের অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায়**

(এতে আছে মধ্যযুগের অন্ধকার থেকে আলোর পথে যাত্রার কাহিনী)

৬। **নব যুগের সমাজ বিপ্লবী ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর**

(শিক্ষা সংস্কাব ও সমাজ সংস্কারের মহানায়ক বিদ্যাসাগরের সংগ্রামী জীবনের পরিচয়)

৭। **নবযুগের দুই সাধক শ্রী রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ**

(এতে আছে ভারতীয় ধর্ম চিন্তায় মানবধর্মের নতুন ধারা)

৮। **নবজাগরণের ছয় মহানায়ক**

(এতে আছে উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরনের প্রেক্ষাপট ও ছয় মহানায়কের সংক্ষিপ্ত পরিচয়)

উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ ভারতের ইতিহাসে অতিগুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। এই নবজাগরণের জনক হিসাবে চিহ্নিত হয়েছেন— রাজা রামমোহন রায়। রবীন্দ্রনাথ রামমোহনকে বলেছেন — ভারত পথিক।

ইংরেজ শাসিত ভারতের রাজধানী কলকাতায় ইউরোপীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি, সাহিত্য-দর্শন- বিজ্ঞান ও আধুনিক জীবন ধারার প্রভাবে ভারতে মধ্যযুগের অবসান এবং আধুনিকযুগের আবির্ভাব সম্পর্কে সর্বপ্রথম সচেতন হয়ে উঠেছিলেন রাজা রামমোহন রায়।

একটা যুগসন্ধিক্ষণে রক্ষণশীল ধর্মান্ধ সমাজকে আধুনিকতার পথে পরিচালিত করা কি কঠিন কাজ তা আমরা একশ বছর ব্যাপী নব জাগরণের ইতিহাস [illegible] জানতে পারি।

এই নবজাগরণের ইতিহাস জানা না থাকলে জাতীয়তাবোধ, স্বদেশপ্রেম এবং জাতির প্রতি কর্তব্য বোধ জেগে উঠেনা। তাই নতুন প্রজন্মের বন্ধুদের জন্য এই ইতিহাস সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরেছি।

এই ইতিহাস ও মহানায়কেদের জীবনী অনেকে লিখেছেন। কিন্তু যুগের প্রয়োজনে পাঠকের সময় ও আগ্রহ অনুযায়ী পুরাতনকেই নতুন রূপ দিতে হয়। তাছাড়া প্রত্যেক লেখকের দৃষ্টি ভঙ্গী এবং অভিজ্ঞতা আলাদা। এই কারণেই প্রত্যেকের লেখায় উঠে আসে নতুন তথ্য, নতুন বিশ্লেষণ, নতুন অভিজ্ঞতার প্রতিফলন। বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে নবজাগরণের ইতিহাস নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে বহু আলোচনা সমালোচনা হয়েছে। সরকারী মহাফেজখানায় সংরক্ষিত বহু দলিল পত্র বিশ্লেষণ করে যে সব নতুন তথ্য পাওয়া গেছে তার ভিত্তিতেই গ্রন্থখানি রচিত হয়েছে।

আশাকরি সংক্ষিপ্ত হলেও তথ্য ও বিশ্লেষণের দিক থেকে পাঠক পাঠিকারা নতুন কিছু কথা এ গ্রন্থ পাঠ করে জানতে পারবেন। পাঠক পাঠিকারা উপকৃত হলেই আমার শ্রম সার্থক হবে।

আগরতলা — দীনেশ চন্দ্র সাহা

২৬ শে জানুয়ারী ২০০৬ — গ্রন্থকার

হে রাম মোহন, আজি শতেক বৎসর করি পার
মিলিল তোমার নামে দেশের সকল নমস্কার ।
মৃত্যু অন্তরাল ভেদি, দাও তব অন্তহীন দান
যাহা কিছু জরাজীর্ণ তাহাতে জাগাও নবপ্রাণ
যাহা কিছু মূঢ় তাহে চিত্তের পরশমণি তব
এনে দিক উদ্বোধন, এনে দিক শক্তি অভিনব ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(রামমোহনের প্রথম মৃত্যুশতবার্ষিকীতে কবির রচনা)

রাজা রাম মোহন রায়

রাজা রামমোহনের বাল্য জীবন ও শিক্ষা

রাজা রামমোহন রায় কোন রাজ্যের রাজা ছিলেন না । বৃটিশ সরকারও রাজা উপাধি দেয়নি । এমন কি মোগল বাদশাহের দেওয়া রাজা উপাধি ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সরকার স্বীকারও করেনি । তবু সারা বিশ্বে এবং ভারতে রাজা রামমোহন রূপেই রামমোহনের স্থায়ী পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ।

রায় উপাধিও রামমোহনের বংশগত উপাধি নয় । পূর্ব পুরুষের বংশগত উপাধি ছিল বন্দ্যোপাধ্যায় । এই বংশের কৃতি পুরুষেরা তিন পুরুষ যাবত নবাবের দববারে উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ।

এই বংশেরই কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে বাংলার নবাবের অধীনে উচ্চপদে চাকুরী করে কৃতিত্বের পরিচয় দেন । পুরস্কার স্বরূপ নবাব কৃষ্ণচন্দ্রকে বায় উপাধি প্রদান করেন । এই সময় থেকেই পববর্তী বংশধরগণ রায় উপাধি ধারণ কবেন ।

কৃষ্ণচন্দ্র দীর্ঘদিন কৃষ্ণনগরে রাজস্ব বিভাগে কাজ করেন । এই সময় পূর্বপুরুষের স্থায়ী বাসস্থান মুর্শিদাবাদের সাঁকাসা গ্রাম ত্যাগ করে হুগলি জেলার রাধানগর গ্রামে সপরিবারে বসবাস শুরু করেন ।

কৃষ্ণচন্দ্রের তিন পুত্রের মধ্যে ব্রজবিনোদ নবাব আলীবর্দীর অধীনে উচ্চপদে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেন । পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের পর মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহআলম পূর্বাঞ্চল পরিদর্শনে আসেন । এখানে ব্রজবিনোদকে বিভিন্ন কাজে সহযোগী হিসাবে পেয়ে খুব খুশী হন । বাদশাহের সঙ্গে হৃদ্যতার ফলে ব্রজবিনোদের সামাজিক মর্যাদা এবং প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়।

ব্রজবিনোদের সাত ছেলেব মধ্যে পঞ্চমপুত্র রামকান্ত রায় হলেন রামমোহনের পিতা। রামকান্ত রায় অত্যন্ত সৎ, ধর্মপ্রাণ, এবং তেজস্বী পুরুষ ছিলেন । তিনিও নবাব সরকারে গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত ছিলেন । কিন্তু পলাশী যুদ্ধের পর রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি হওয়ায় বর্ধমানের রাজার কাছ থেকে জমি ইজারা নিয়ে রাধানগরে স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করেন ।

তখনকার দিনে কুলীন ব্রাহ্মণেরা বহু বিবাহ করতেন । রামকান্তের পিতা ব্রজবিনোদ মৃত্যু শয্যায় থাকা কালে তাঁরই পরিচিত এক কুলীন ব্রাহ্মণ কন্যাদায় থেকে মুক্ত করার জন্য প্রার্থনা জানান । ধর্ম মতের দিক দিয়ে পৃথক হওয়ায় ব্রজবিনোদ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন ।

ব্রজবিনোদ বংশগত ভাবে বৈষ্ণব কিন্তু কুলীণ ব্রাহ্মণ শ্যামা ভট্টাচার্য ছিলেন শাক্ত মতাবলম্বী । সেকালে হিন্দু ধর্মের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে কড়া নিয়মের গন্ডি বাধাঁ ছিল । তবু মৃত্যু লগ্নে একজন সৎ ও কুলীণ ব্রাহ্মণকে কন্যাদায় থেকে মুক্ত করার জন্য পুত্রদের প্রতি আহ্বান রাখলেন ব্রজবিনোদ ।

পঞ্চম পুত্র রামকান্ত পিতার মানসিক অবস্থা উপলব্ধি করে শাক্ত ব্রাহ্মণ কন্যা তারিনীদেবীকে বিয়ে করতে রাজী হয়ে যান । পিতা ব্রজবিনোদ মানসিক শান্তি নিয়ে প্রাণত্যাগ করেন ।

রামকান্তের প্রথমা স্ত্রী সুভদ্রাদেবী ছিলেন নিঃসন্তান । দ্বিতীয়া স্ত্রী তারিনীদেবী ছিলেন অপরূপা সুন্দরী, এবং গুণবতী । তাঁরই গর্ভে জগমোহন এবং রামমোহন জন্মগ্রহণ করেন । তৃতীয়া স্ত্রী রাসমণির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন রামলোচন। তারিনীদেবীর প্রথম সন্তান ছিলেন একটি কন্যা ।

আজ থেকে ২৩৪ বছর আগে ১৭৭২ সালে রাধানগর গ্রামে রামমোহনের জন্ম হয় ।জন্মতারিখ নিয়ে কিছু মতভেদ থাকলেও ১৭৭২ সালটিকেই অধিকাংশ পন্ডিত স্বীকার করে নিয়েছেন। ভিন্ন মতে ১৭৭৪ সালে রামমোহনের জন্ম হয়েছে বলে দাবী করা হয় । কিন্তু ১৭৭২ সালকে জন্মবর্ষ ধরেই রামমোহনের জন্মশতবার্ষিকী পালন করা হয় ।

রামমোহন ছিলেন অত্যন্ত সুন্দর, স্বাস্থ্যবান এবং শ্রুতিধর । একবার কোন কিছু শুনলে তিনি কখনোই তা ভুলতেন না ।

রামমোহনের পরিবার ছিল অত্যন্ত ধর্মনিষ্ঠ । কিন্তু বাল্যকালেই রামমোহন লক্ষ্য করেন যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বৈষ্ণব মতাবলম্বী পিতার সঙ্গে শাক্ত উপাসক দাদু ও মামার সঙ্গে মতবিরোধ সৃষ্টি হতো । মাতা তারিনীদেবী শাক্ত পরিবারের মেয়ে হলেও বিবাহের পর স্বামীর ধর্মমত এবং কুলদেবতাকে মেনে নিয়েছিলেন । তিনি অত্যন্ত যুক্তিবাদী, বুদ্ধিমতী এবং তেজস্বিনী ছিলেন । পরিবারে কোন মতবিরোধ দেখা দিলে তিনিই তা মীমাংসা করে দিতেন ।

বৈষ্ণব পরিবারে গৃহদেবতা গোপীনাথের নিত্য পূজা হতো। বিভিন্ন উপলক্ষে কৃষ্ণলীলা এবং মানভঞ্জন সংক্রান্ত নৃত্যগীত ও যাত্রা অনুষ্ঠিত হতো। রামমোহন এইসময় সাধুসঙ্গ ভালবাসতেন এবং বড় হলে তিনি সন্ন্যাসী হবেন বলে কল্পনা করতেন।

সেকালের রীতি অনুযায়ী কুলীন ব্রাহ্মণ রামমোহনের বাল্যকালেই তিনবার তিনটি বিবাহ হয়েছিল। শিশু অবস্থায় প্রথম বিবাহ হয়েছিল। শিশু অবস্থায়ই প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু হয়। তারপর ৯ বছর বয়সে রামমোহনের দ্বিতীয় বিবাহ হয়। অল্পদিন পরেই তৃতীয় বিবাহ হয়। এই প্রথা রামমোহনকে ভীষণভাবে বিচলিত করেছিল। পরবর্তীকালে বামমোহন বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম করেছিলেন।

রামমোহনের বাবা রামকান্ত গ্রামের পাঠশালায রামমোহনকে ভর্তি করে দেন। কিন্তু সে কালে সরকারী ভাষা ছিল ফার্সী। আরবী ছিল মুসলমানদের ধর্মের ভাষা। কাজেই আরবী ও ফার্সী ভাষায় পারদর্শী না হলে নবাব সরকারে ভাল চাকরী পাওয়া যেতনা।

রায় পরিবারে ফার্সী ভাষার খুব কদর ছিল। কারণ এই পরিবারের সব পুরুষেরাই নবাবের দরবারে ভাল চাকরীতে নিযুক্ত হতেন। কাজেই পাঠশালার শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীতে একজন মৌলবী নিযুক্ত করে রামমোহনের ফার্সী শিক্ষারও ব্যবস্থা হয়েছিল।

ফার্সীভাষা কিছুটা আয়ত্ত করার পর পিতা রামকান্ত রামমোহনকে আরবী ও ফার্সী শিক্ষার জন্য পাটনায় পাঠিয়ে দেন। সেকালেব ভারতে পাটনা ছিল আরবী ও ফার্সী শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র।

রামমোহন ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। কয়েক বছরেব মধ্যেই তিনি আরবী ও ফার্সী ভাষায় পান্ডিত্য অর্জন করেন।

পাটনায় রামমোহন আরবী ভাষায় প্রাচীন গ্রীক পন্ডিত ইউক্লিড এবং এরিস্টটলের প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলি পড়ে ফেলেন। ইসলাম ধর্মের গভীরে পৌছার জন্য কোরান ও অন্যান্য গ্রন্থও পাঠ করেন।

এই সময় রামমোহনের চিন্তাভাবনায় যুক্তিবাদ স্থায়ী রূপ ধারণ করে।

মুসলমান সুফী সাধকদের মানবতাবাদী চিন্তা ও ভাবধারা রামমোহনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে ।

ইসলাম ধর্মের একেশ্বরবাদ এবং বহুদেবদেবীর মূর্তিপূজার বিরোধিতা রামমোহন গভীর মনোযোগ দিয়ে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা প্রণালীও রামমোহনকে আকৃষ্ট করে । এই সময় থেকেই তিনি অভিজাত মুসলিম পোষাক ব্যবহার শুরু করেন ।

রামমোহনের জন্ম এমন একটি সময়ে হয়েছিল,যখন ভাবতে মুসলিম শাসনের অবসান হচ্ছে এবং ইংরেজ শাসনের যাত্রা শুরু হয়েছে । এটা ছিল ভারতের ইতিহাসে একটি যুগসন্ধিক্ষণ।

তবু অভিজাত মুসলমানী খাদ্য,পোষাক,চালচলন ও জীবনযাত্রা রামমোহনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল । এসব পোষাকে রামমোহনেব মধ্যে ফুটে উঠত এক ভারতীয় আভিজাত্যের মূল্যবোধ, যা তিনি জীবনেব শেষদিন পর্যন্ত বক্ষা করেছিলেন।

কলকাতায় অবস্থান কালে রামমোহনেব সঙ্গে বহু ইংবেজ সাহেবের গভীব বন্ধুত্ব হয়েছে। কিন্তু রামমোহন কখনো ভাবতীয পোষাক ত্যাগ কবে সাহেবী পোষাক পরেন নি । ইউরোপে অবস্থান কালেও ভারতীয পোষাকেই রামমোহনেব মর্যাদাবোধ এবং ভারতীয় মূল্যবোধ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল । রামমোহন বাড়িতে ইংরাজী কায়দায় খাওয়া দাওয়া করতেন । কিন্তু খাদ্য তালিকায় থাকত মুসলমানী খাদ্য - পোলাও, কোপ্তা, কোর্মা ইত্যাদি ।

কিশোর বয়সেই খাদ্য, পোষাক ও চিন্তায় পরিবর্তন লক্ষ্য করে রামমোহনেব বাবা রামকান্ত ও মাতা তারিনীদেবী খুবই চিন্তিত হযে পড়েন । হিন্দু সংস্কৃতি ও সভ্যতার সঙ্গে রামমোহনকে পরিচিত করাবার জন্য কাশীতে সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা করেন । তখনকার সময় কাশী এবং নবদ্বীপ ছিল সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র । কিন্তু শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ সন্তানদের জন্যই বেদ উপনিষদ পাঠেব সুযোগ ছিল ।

কাশীতে এসে রামমোহন গভীর মনোযোগ দিযে সংস্কৃত ভাষা শিখলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই বেদ - উপনিযদ ও অন্যান্য শাস্ত্রীয় গ্রন্থ পাঠ কবে গভীর জ্ঞান এবং বিশ্লেষণ ক্ষমতা অর্জন কবলেন ।

পিতা রামকান্ত হিন্দুধর্মের প্রতি পুত্রকে আকৃষ্ট করার জন্য কাশীতে সংস্কৃতভাষা, সাহিত্য ও ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ফল হল বিপরীত।

রামমোহন দেখলেন বেদ উপনিষদে একমাত্র ব্রহ্মাকেই সৃষ্টির দেবতা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ বৈদিকযুগে হিন্দুরাও ছিল একেশ্বরবাদী।

সৃষ্টিকর্তার জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই। তাহলে মূর্তিপূজা কেন? এইসময় থেকেই রামমোহনের অনুসন্ধানী মন সবধর্মের মূলকথা জানার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল।

বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম ও শিখধর্মের সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ শুরু করলেন। খ্রীষ্টান এবং ইহুদী ধর্ম সম্পর্কেও অনুসন্ধান শুরু করলেন।

প্রতিটি ধর্মের গভীর তাৎপর্য উপলব্ধি করার পর রামমোহনের মন হয়ে গেল বিশ্বপ্রেমিক ঃ— রামমোহন ষোল বছর বয়সে মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থ প্রকাশের পর মাতা- পিতা ও পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে রামমোহনের তীব্র বিতর্ক ও মতান্তর সৃষ্টি হয়। ফলে তিনি গৃহত্যাগ করে অজানাকে জানার সংকল্প নিয়ে দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন।

ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চল ভ্রমণ করে প্রকৃত ভারতকে জানার চেষ্টা করেন। সারাদেশে তখন বৃটিশ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। অথচ প্রতিকারের কোন উপায় নেই। ভারতের সর্বত্র জন সাধারণের দুঃখ-দুর্দশা, ধর্মীয় নানা বিভেদ হিন্দু-মুসলমান শাসকশ্রেণীর মধ্যে দেশাত্মবোধের অভাব, সমাজের প্রতিস্তরে তখন ধর্মান্ধতা এবং নানা ধরনের কুসংস্কার ব্যাপক অন্ধকার যুগের স্পষ্ট ছবি তুলে ধরেছিল।

ক্ষুব্ধ রামমোহন সেকালের বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য তিব্বত ভ্রমনে গেলেন। সেখানে দেখা গেল বৌদ্ধরা লামাকে ঈশ্বর রূপে পূজা করছে। জ্যান্ত মানুষের পূজা মূর্তি পূজা থেকেও খারাপ লাগল। রামমোহন এসবের প্রতিবাদ করায় তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র হল। কিছু সংখ্যক বৌদ্ধ মহিলার সাহায্যে রামমোহনের জীবন রক্ষা পায়।

দেশে ফিরে এসে নারী জাতির কল্যাণের জন্য চিন্তা ভাবনা শুরু করেন। তখন রামমোহনের বয়স মাত্র কুড়ি বছর। পিতার আহবানে আবার গৃহে ফিরে এলেন। কিন্তু নতুন নতুন জ্ঞান লাভের আকাংক্ষা আরো তীব্র হয়ে উঠল।

এই সময় রামমোহন বাংলা, হিন্দি, সংস্কৃত, আরবী ও ফারসী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করে অনর্গল বক্তৃতা দেওয়া এবং লিখিত ভাষায় মনের কথা প্রকাশের ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন ।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন তখন স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে । প্রশাসনিক কাজ কর্মের জন্য বহু উচ্চ শিক্ষিত ইংরেজ রাজকর্মচারী কলকাতায় আসতে শুরু করেছিল ।

উচ্চ শিক্ষিত ইংরেজ রাজকর্মচারীদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন অত্যন্ত উদার প্রকৃতির মানুষ । ভারতের সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্পর্কে জানার অগ্রহে ভারতপ্রেমিক ইংরেজ পন্ডিতরা নানা ভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং ভারতীয় পন্ডিতদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন ।

রামমোহনের পান্ডিত্যের খ্যাতি তখন ছড়িয়ে পড়েছিল । কারণ অধিকাংশ হিন্দু পন্ডিত এবং মুসলিম মৌলবীরা রামমোহনের বিরুদ্ধে ব্যাপক নিন্দা ও সমালোচনা শুরু করেছিল । রামমোহন সকলের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেই শস্ত্রীয় ব্যাখা-বিশ্লেষণের দ্বারা নিজের যুক্তি প্রতিষ্ঠা করাব চেষ্টা করেছেন ।

এসব বিতর্কের ফলে রামমোহনের শত্রু সংখ্যা যেমন বেড়েছে অন্যদিকে তেমনি সহানুভূতিশীল অনুগামীর সংখ্যাও বেড়েছে । ইংরেজ সাহেবদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে উঠার সুযোগও বেড়েছে ।

ভারতপ্রেমিক ইংরেজদেব সাথে রামমোহনের বন্ধুত্ব গড়ে উঠার ফলে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে রামমোহনের দ্রুত পরিচয় ঘটে । ইউরোপের ইতিহাস-দর্শণ-অর্থনীতি এবং বিজ্ঞান চিন্তা সম্পর্কে জ্ঞান লাভের সুযোগ সৃষ্টি হয় ।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী শাসন ক্ষমতা হাতে পাওয়াব পরও দীর্ঘদিন ইংবেজী ভাষাকে সরকারী ভাষা করতে সাহস পায়নি। এর দুটি কারণ ছিল প্রথমত - ইংরেজী ভাষায় শিক্ষিত লোক ছিলনা। প্রশাসনেব সব কর্মচারীই ফার্সী ভাষায় শিক্ষিত ছিল। ফার্সী ভাষাতেই কাজকর্ম চালাতে অভ্যস্ত ছিল। এরকম অবস্থায় হঠাৎ করে ইংরেজী ভাষা চালু করলে অধিকাংশ কর্মচারীকে ছাঁটাই করতে হতো । ফলে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি হতো ।

দ্বিতীয়ত: ভারতীয় জনগণ ইংরেজ শাসনকে কিভাবে গ্রহণ করছে তা তখনো স্পষ্ট ছিলনা। জনগণ বিদ্রোহ করলে কোম্পানীর শাসন শুরুতেই ভেঙ্গে পড়তো।

রামমোহন ইংরেজ বন্ধুদের কাছ থেকে ইংরাজীভাষা শিখে অচিরেই নিজের দক্ষতার পরিচয় দিলেন। ইংবাজী ভাষায় বামমোহনের বক্তৃতা শোনে এবং প্রবন্ধ পাঠ করে ইংরেজ পন্ডিতরাই রামমোহনের ভাষাজ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

ইংরেজ বন্ধুদেব কাছে লিখিত চিঠি এবং শিক্ষাসংস্কার ও সমাজসংস্কাবেব দাবীতে সবকারের কাছে দেওয়া আবেদন পত্র ও প্রস্তাব বামমোহনের বাস্তবজ্ঞান ও ভাষাদক্ষতার উজ্জ্বল দলিল রূপে সংরক্ষিত হয়ে আছে।

রামমোহন প্রচীন ইহুদীধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানলাভের জন্য প্রাচীনগ্রন্থ পাঠ করার উদ্দেশ্যে হিব্রু ভাষা এবং বাইবেলের প্রাচীন পুঁথি পাঠ করার জন্য কঠোব পরিশ্রম করে প্রাচীন ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষা শিখেছিলেন।

সংস্কৃতভাষা আযত্ত কবাব পর ভারতীয় প্রাচীন বেদ - বেদান্ত - রামায়ণ - মহাভারত - পুরানতন্ত্র ও অন্যান্য শাস্ত্রীয় গ্রন্থসমূহ গভীর মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করেছিলেন। বিভিন্ন ভাষায় এবং বিভিন্ন ধর্মে প্রচলিত রীতি - নীতি এবং আচার - অনুষ্ঠানের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ কবে রামমোহন যে সব বক্তব্য রাখতেন, তা খন্ডন করার মত কোন পন্ডিত তখনকার ভারতবর্ষে ছিলনা।

ভারত ভ্রমণ করে রামমোহন ভারতীয় ঐক্যের স্বপ্ন দেখেছেন। আবার ইউরোপ ভ্রমণ করে তিনি সমগ্র মানবজাতির ঐক্যের কথা বলেছেন।

প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির গভীর জ্ঞান নিয়ে রামমোহন বিশ্বপ্রেমিক হয়ে উঠেছিলেন। সে যুগের ইউরোপেও এরূপ জ্ঞানী পুরুষ ছিলেন কিনা সে বিষয়ে ইউরোপীয় পন্ডিতদের মধ্যেই বিরাট প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল।

রামমোহনের কর্মজীবন ও হৃদয়ের আলোড়ন

রামমোহনের কর্মজীবন শুরু হয়েছে ছাত্র জীবন থেকেই । নানা জিজ্ঞাসাব উত্তর খুঁজতে তিনি অবিরাম পরিশ্রম করেছেন । যেখানেই নতুন কিছু জানার সম্ভাবনা আছে বলে শুনেছেন সেখানেই তিনি ছুটে গেছেন । কঠোর পবিশ্রমে তিনি ক্লান্তি বোধ করতেন না ।

পিতা রামকান্ত নানাভাবে চেষ্টা করেও যখন পুত্র বামমোহনকে নিজের পথে ফিরিয়ে আনতে পারলেন না, ঠিক তখনই হঠাৎ করে ১৭৯১ সালে রামমোহনেব বয়স যখন মাত্র কুড়ি বছবে পা দিয়েছে তখন একটি উইল কবে সমস্ত বিষয় সম্পত্তি ছেলেদের মধ্যে ভাগ কবে দেন ।

রামমোহনের ভাগে পড়েছিল আশি বিঘা জমি এবং কলকাতায় জোড়াসাঁকোব বাড়ী । এবপবই পিতা বামকান্ত বর্ধমান বাজাব অধীনে চাকবী নিয়ে বর্ধমানে চলে যান ।

রামমোহনের বড় ভাই জগমোহনও উচ্চপদে চাকবী করতেন । সম্পত্তি ভাগ হবার পর বামমোহন কিছুকাল বাডীতে থেকে বিষয় সম্পত্তির দেখাশোনা কবেন । কিন্তু মন পড়েছিল কলকাতায়।

স্থায়ীভাবে কলকাতায় বসবাস করতে হলে একটা স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা কবা দরকার । এই প্রস্তুতির জন্য অর্থ রোজগারে সচেষ্ট হন । রামমোহনের পিতা রামকান্ত পুত্রদের মধ্যে জমি ও বসতবাড়ী ভাগ কবে দিয়েছিলেন । কিন্তু কাউকে নগদ টাকা দেননি ।

এই সময় লর্ড কর্নওয়ালিস বাংলায় চিরস্থায়ী বান্দোবস্ত আইন পাশ করেন । ফলে জগমোহন- রামমোহন ও রামলোচন তিন ভাই জমিদার শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হন ।

এর কিছুকাল পরেই রামমোহনদের পরিবারে দুর্যোগ নেমে আসে । পিতা রামকান্ত বর্ধমানের রাজার কাছ থেকে ঋণ নিয়ে যথা সময়ে পরিশোধ করতে না পারায় জেল হয়ে যায় । জগমোহন পিতাকে ঋণের দায় থেকে মুক্ত করে আনেন ।

আবার কিছুকাল পরেই সময়মত রাজস্ব জমা দিতে না পারায় জগমোহনের জেল হয়। প্রথম দিকে জমিদারী ব্যবস্থায় অনেকটা অরাজক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা করার জন্যই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করেছিল। তাদের লক্ষ্য ছিল রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। কৃষকদের ক্ষোভের মুখে যাতে পরতে না হয় সে জন্যই জমিদার শ্রেনী সৃষ্টি করে তাদের উপরই রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিল। জমিদাররা সময়মত রাজস্ব জমা না দিলে উচ্ছেদ করা হতো। এমনকি জেল জরিমানারও ব্যবস্থা ছিল।

রামকান্ত রায়ের যৌথ পরিবার ভেঙ্গে যাবার পর তিন ভাই তিন জায়গায় সরে গেলেন। রামমোহন আয় বৃদ্ধির জন্য কলকাতায় মহাজনী ব্যবসা শুরু করেন। সেকালে উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীরা বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে ভারতীয় মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ নিত। সরকারী দলিলপত্রে দেখা যায় ১৮০২ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর টমাস উডফোর্ডকে পাঁচ হাজার টাকা ঋণ দিয়েছিলেন রামমোহন।

বহু ইংরেজ ব্যবসায়ী জাহাজে করে মালপত্র নিয়ে আসতো। এসব মাল বিক্রি করার জন্য দেশীয় দালাল বা এজেন্ট নিয়োগ করতো। ফিরে যাবার সময় ভারতীয় মালে জাহাজ ভর্তি করে নিত। এসব লেনদেন বাণিজ্যে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা অল্পসময়ের মধ্যেই ধনী হয়েছিল।

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের জন্ম। সে বছরই ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করে শাসন ক্ষমতা দখল করে। পরের বছরই কলকাতা শহরকে কোম্পানীর রাজধানী বলে ঘোষণা করে।

পরবর্তী কুড়ি বছরের মধ্যে কলকাতা একটি আধুনিক শহর রূপে গড়ে উঠতে থাকে এবং ভারতের প্রধান বানিজ্যকেন্দ্র হয়ে উঠে। ভারতীয়দের কাছে কলকাতার আকর্ষণ দ্রুত বাড়তে থাকে।

রামমোহন বিভিন্ন কাজে কলকাতায় আসতেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ কর্মচারীদের শিক্ষার জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার পর রামমোহন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে যাতায়াত শুরু করেন। সেখানে অধিকাংশ অধ্যাপক ছিলেন রামমোহনের বন্ধু। সেখানেই বহু ইংরেজ সাহেবের সঙ্গে রামমোহনের বন্ধুত্ব গড়ে উঠে। ইংরেজ বন্ধুদের কাছে ইউরোপীয় সাহিত্য, দর্শন, অর্থনীতি ও ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন।

অর্থ উপার্জন এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার পরিচয় লাভ করার তীব্র ইচ্ছা পূরনের জন্য রামমোহন ১৮০৩ সালে ইংরেজ কালেকটার উডফোর্ড এর অধীনে দেওয়ানের চাকরী গ্রহণ করেন। চাকুরী জীবনে দেওয়ানের কাজে সততার ও দক্ষতার পরিচয় দিয়ে অল্পদিনের মধ্যেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেন।

মুর্শিদাবাদে দেওয়ানের কাজ করার সময় তিনি তুহফত- উল- মুওয়াহহিদিন- অর্থাৎ একেশ্বরবাদীদের প্রতি উপহার - নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

এই গ্রন্থে রামমোহন বিভিন্ন ধর্মের যুক্তিপূর্ণ ব্যাখা করে দেখান যে - সব ধর্মের মূল কথা এক।

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় ধর্মের বিভিন্ন কাঠামো সৃষ্টি হয়েছে। কাঠামো তৈরীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মে পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। এটাই ছিল প্রথম যুক্তিবাদী গ্রন্থ। এখান থেকেই নবজাগরণের সূত্রপাত হয়।

এই সময় রামমোহনের পিতার মৃত্যু হয় এবং ধর্মীয় মতামত নিয়ে পরিবার পরিজন ও আত্মীয় স্বজনের মধ্যে তীব্র মতভেদ দেখা দেয়। রামমোহনের মাতা, পুত্রের ধর্মমতের সঙ্গে একমত হতে না পারায় রামকান্তের তৃতীয় পুত্র রামলোচনকে শ্রাদ্ধের অধিকার দেন। জেষ্ঠপুত্র জগমোহন তখন জেলে ছিলেন। রামমোহন পৃথক ভাবে কলকাতায় পিতৃ শ্রাদ্ধের আয়োজন করেন।

রামমোহনের সঙ্গে আত্মীয় পরিজনদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। একমাত্র ভাগ্নে গুরু প্রসাদ ছিলেন রামমোহনের অনুগামী। তিনি শেষ দিন পর্যন্ত রামমোহনের সঙ্গী ছিলেন।

ইংরেজ কালেকটর উডফোর্ড অসুস্থ হয়ে চাকরী ছেড়ে দিয়ে ইংলণ্ডে ফিরে যাবার পর ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে জন ডিগবীর রামগড়ের ম্যাজিস্ট্রেট অফিসে রামমোহনকে রেজিস্টার পদে নিয়োগ করা হয়। ১৮১৪ সালে জন ডিগবী চাকরী ছেড়ে দেবার পর রামমোহনও সরকারী চাকুরী ছেড়ে দেন। প্রথম দিকে কিছুকাল তিনি উডফোর্ড ও ডিগবীর ব্যাক্তিগত দেওয়ান ও মুনশীর পদে কাজ করেন। পরে কোম্পানীর সরকারী চাকরী লাভ করেন। হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পন্ডিত ও মৌলবীরা রামমোহনের তীব্র বিরোধী হওয়ায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ রামমোহনকে সরকারী চাকুরী দিতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। কিন্তু রামমোহনের সততা, দক্ষতা এবং দায়িত্ববোধকে প্রশংসা না করে কোন উপায় ছিল না।

জন ডিগবীর সঙ্গে রামমোহনের বন্ধুত্ব এত গভীর ছিল যে প্রতিদিন দুজনের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার নানা দিক নিয়ে আলোচনা হতো। ডিগবী গভীর মনোযোগ দিয়ে রামমোহনকে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের নানা দিক বুঝিয়ে দিতেন। পরবর্তী সময়ে ইংলেণ্ডে গিয়ে রামমোহন জন ডিগবীর বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা লাভ করেছিলেন। জন ডিগবী ছিলেন উচ্চ শিক্ষিত পন্ডিত এবং ভারতপ্রেমিক।

১৮১৪ সালে রামমোহন চাকরী ছেড়ে দিয়ে নিজের জমিদারী গুছিয়ে ১৮১৫ সাল থেকে স্থায়ী ভাবে কলকাতায় বসবাস শুরু করেন।

এই সময় রামমোহনেব হৃদয় আলোড়িত হয়েছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা ও জ্ঞানের আলোকে ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করার তীব্র বাসনায়। সামাজিক কুসংস্কার এবং ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে প্রতিকারের ব্যবস্থা করার জন্যও তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। এই সময় থেকেই শুরু হল নবযুগের সাধনা।

সব ইংরেজ সাহেব একরকম ছিলনা। একদল ইংরেজ সাহেব ছিলেন উদার মানবিক দৃষ্টি সম্পন্ন। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ এদের নামকরণ করেছিলেন বড় ইংরেজ বলে। আরেক দল ইংরেজ সাহেব ছিলেন অর্দ্ধ শিক্ষিত, স্বার্থপর, ঈর্ষাপরায়ণ, ক্ষমতালোভী এবং অত্যাচারী। রবীন্দ্রনাথ এদের নাম দিয়েছিলেন ছোট্ট ইংরেজ। এই ধারণাটা রামমোহনের সময় থেকে উপলব্ধি করা গিয়েছিল।

১৮০৯ সালের একটি ঘটনা রামমোহনের মনে খুব দাগ কেটেছিল। সরকারী কাজে তিনি ভাগলপুরে গিয়েছিলেন। সেখানে পাল্কীতে করে গন্তব্যস্থলে যাবার সময় রাস্তায় কালেকটর হ্যামিলটন দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর সামনে দিয়ে পাল্কী যাবার সময় পাল্কী থামিয়ে কালেকটর সাহেবকে অভিবাদন না জানিয়ে এগিয়ে চলায় হ্যামিলটন সাহেব ভীষণ রাগে উত্তেজিত হয়ে পড়েন। এবং পাল্কী থামাতে হুকুম করলেন। রামমোহন পাল্কী থামিয়ে ভদ্র ভাবে তাকে সরকারী কাজে যাত্রার কথা বোঝাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু হ্যামিলটন সাহেব মুখে যা এল সেই ভাষাতেই গালাগালি করলেন। রামমোহন পাল্কীতে উঠে চলে গেলেন। বড় লাট মিন্টোর কাছে সাহেবের এরূপ আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন এবং এর প্রতিকার দাবী করলেন।

রামমোহনের এই আবেদন পত্রটি একটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক দলিল রূপে সংরক্ষিত আছে। সে দিনের পরিস্থিতিতে এমন বলিষ্ঠ ভাষায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো এবং প্রতিকার দাবী করা দুঃসাহসের কাজ ছিল।

বড়লাট মিন্টো রামমোহনের আবেদন পত্র পাঠ করে অভিভূত হন । এক আদেশ জারী করে ঘোষণা করেন যাতে ভবিষ্যতে কোন ইংরেজ কর্মচারী এরূপ আচরণ না করেন ।

ভারতে মধ্যযুগে মুসলমান শাসনকালে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের সামনে দিয়ে কোন সাধারণ ব্যক্তি ছাতা মাথায় দিয়ে, পাল্কী বা ঘোড়ায় চড়ে যেতে পারতোনা। ইংরেজ কর্মচারীরা এই রীতিকে আভিজাত্যের প্রতীক রূপে গ্রহণ করে চালু করতে চেয়েছিল । রামমোহনের প্রতিবাদে তা বন্ধ হয়ে যায় ।

রামমোহনের কর্মজীবন ১৭৯১ সালে যৌথ পরিবার ভেঙ্গে যাবার পর থেকে ১৮১৪ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল । চব্বিশ বছরের কর্মজীবনে রামমোহন বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতা, বিচক্ষণতা এবং বৈষয়িক বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন ।

অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যথেষ্ট শক্ত ভিত্তি তৈরী হবার পর রামমোহন চাকরী ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় স্থায়ী ভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ।

রামমোহনকে একজন জমিদার, মহাজন এবং ইংরেজ ভক্ত রূপে যারা সমালোচনা করেছেন তারা দুইশ চৌত্রিশ বছর আগেকার সমাজকে বিচার বিশ্লেষণ না করেই একতরফাভাবে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীতে সমালোচনা করেছেন ।

ইতিহাস প্রমাণ করেছে রামমোহন ছিলেন সে যুগের একজন বাস্তবজ্ঞান সম্পন্ন সমাজ বিপ্লবী। তিনিই আধুনিক যুগের প্রথম আলো জ্বালিয়েছিলেন । প্রথমে বাংলায় পরে সারা ভারতে তা ছড়িয়ে পড়েছিল ।

১৮১১ সালে রামমোহনের বড় ভাই জগমোহনের মৃত্যু হয় । রামমোহন তখন কলকাতায়। বিধবা বৌদিকে সতীদাহ থেকে বাঁচাবার জন্য ছুটে গেছেন গ্রামে । সেকালে ডাক ব্যবস্থা সবে মাত্র শুরু হয়েছে । যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল খুবই দুর্বল । সময়মত বৌদির ডাক রামমোহনের কাছে পৌছেনি । গ্রামবাসীরা বৌদির ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে স্বামীর চিতায় তাকে পুড়িয়ে মেরেছিল।

এই ঘটনা রামমোহনের মনে এমন দাগ কেটেছিল যে তিনি এই বর্বর সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার জন্য জীবনপণ করে শপথ গ্রহণ করেছিলেন ।

সারা দেশের ধর্মান্ধ পন্ডিতদের বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় যুদ্ধ চালিয়ে শেষ পর্যন্ত এই প্রথা বন্ধ করেছিলেন।

এই কাজের জন্যই তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন ।

যুক্তিবাদী রামমোহন

ভারতে বহু প্রাচীনকাল থেকেই পন্ডিত সমাজে তর্কযুদ্ধের প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু এসব তর্কের বিষয়বস্তু ধর্ম-দর্শন এবং বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণ মানুষের জীবন এবং সমাজ বিকাশের ধারায় এসবের প্রভাব ছিল নগণ্য।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে চৈতন্য দেবের যুক্তিবাদী চিন্তাধারা হিন্দু সমাজের জাতিভেদ প্রথাকে প্রচন্ড ভাবে আঘাত দিয়েছিল। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মিলনের সেতুও তৈরী হয়েছিল। বহু মুসলমান, চৈতন্য দেবের প্রেম ধর্মের আকর্ষণে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেছিল। হরিদাস ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। এই ধারা অব্যাহত থাকলে হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয় এবং ঐক্য অনেক বেশী জোরদার হতো।

চৈতন্য দেবের আবির্ভাব ছিল বাংলার সমাজ জীবনে প্রথম যুক্তিবাদী শিহরণ। ব্রাহ্মণ পন্ডিতদের সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে তিনি ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থানে ঘুরেঘুরে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তর্কযুদ্ধে জয়ী চৈতন্যদেবের শিষ্যসংখ্যা প্রতিদিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি ঘোষণা করলেন ঈশ্বরের কাছে সব মানুষই সমান। চন্ডালও হরিভক্তি পরায়ণ হলে ব্রাহ্মণের সমান মর্যাদা লাভ করতে পারে। প্রেমের পথেই ভগবানকে লাভ করা যায়। যার হৃদয়ে প্রেম আছে সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। এই ভাবধারা ভারতের জাতিভেদ প্রথার মূল শিকর ধরেই টান মেরেছিল।

রামমোহনের চেয়ে ২৮৬ বছর আগে চৈতন্যদেব পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সেই সময়ে বাংলার সমাজে চরম বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল। ব্রাহ্মণ্য শাসনের নির্মম সংকীণতার ফলে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। উচ্চবর্ণের হিন্দুরাও মুসলমান শাসকদের কাছ থেকে নানারকম সুযোগ সুবিধা পাবার প্রলোভনে প্রলুব্ধ হয়ে ইসলামধর্ম গ্রহণ করতে অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে উঠেছিল।

এই সময় চৈতন্যদেবের আবির্ভাব না ঘটলে বাংলায় সমস্ত নিম্নবর্ণের মানুষরাই ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হতো। এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে সামাজিক

জীবনে এক বিপ্লব ঘটাল চৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম ।

চৈতন্য দেবের প্রেমধর্মকে গোঁড়া ব্রাহ্মণ পন্ডিতরা সহ্য করতে পারেননি। নানাভাবে অপদস্ত করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত পুরীর মন্দিরে আরতিরত অবস্থায় চৈতন্যদেবকে হত্যা করে সমুদ্রের জলে ফেলে দিয়েছিল। মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে এই মহান পুরুষকে হত্যা করে সামাজিক জীবনকে আবার অন্ধ ধর্মবিশ্বাস ও কুসংস্কারের সংকীর্ণ অন্ধকারে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। অবশ্য হত্যাকারীরা প্রচার করেছিল যে চৈতন্যদেব ভগবৎ-ভাবে বিভোর হয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছিলেন । কিন্তু পরবর্তী কালে গবেষকরা আবিষ্কার করেন যে তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল। ভারতীয় সমাজে প্রগতিবাদীদের এভাবে হত্যা করার বহু ঘটনা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়েছে । মধ্যযুগে পৃথিবীর সব দেশেই এমন ঘটনা ঘটেছে ।

চৈতন্যদেবের তিরোধানের ২৮৬ বছর পর আবার এক নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব পরিবারে রামমোহনের জন্ম হয়েছিল ।তখনকার বৈষ্ণব সমাজ চৈতন্যদেবের যুক্তিবাদী চিন্তাধারা থেকে সরে গিয়েছিল । তাই রামমোহনের নিজের পরিবারেই রামমোহনের যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থক প্রায় কেউ ছিলনা ।

রামমোহনের যুক্তিবাদ শুধু ধর্মের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রইল না ।সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রেই রামমোহন যুক্তিবাদ প্রয়োগ করে সামাজিক জীবনে বিপ্লব ঘটাতে উদ্যোগী হয়েছিলেন । চৈতন্যদেবের সময়ও এদেশে হিন্দু সমাজে সতীদাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ, গঙ্গায় প্রথম সন্তান বিসর্জন দেওয়া এবং শিশু বলি দেবার মত বর্বর প্রথাগুলো ধর্মের নামেই সমগ্র সমাজে প্রচলিত ছিল । সমাজের সর্বস্তরে শতকরা একশভাগ মানুষই এসব কুপ্রথা গুলোর অন্ধ সমর্থক হয়ে উঠেছিল । চৈতন্যদেব এসব ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে সাহস করেননি । কারণ সে সময়ে মুসলমান শাসক শ্রেণীও ছিল ধর্মান্ধ । যে কোন উপায়ে ধর্মান্তরিত করে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি করাই ছিল শাসকশ্রেণীর মূল লক্ষ্য ।তাই চৈতন্যদেবের প্রধান লক্ষ্য ছিল হিন্দু সমাজের ভাঙ্গন রোধ করা ।প্রেমধর্মের মাধ্যমে সমাজের বিপুল সংখ্যক মানুষকে তিনি ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন । সে যুগে এটাই ছিল একটা ঐতিহাসিক ঘটনা এবং একটা বড় বিপ্লবী কাজ ।

রামমোহনের সময় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে । মুসলমান শাসকদের তুলনায় ইংরেজদের শিক্ষা সভ্যতা ও দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অনেক বেশী উন্নত ।

ভারতে মুসলমান শাসনের আটশ বছরের মধ্যে প্রথম তিনশ বছর ছিল

চরম হিংসা ও বৈরীতার কাল । জোর করে ধর্মান্তর করা, হিন্দুদের ব্যক্তিগত এবং যৌথ সম্পদ লুণ্ঠন করা. নির্বিচারে হিন্দু মন্দির ধ্বংস করা, বাধা পেলে নির্বিচারে হত্যা করা, এটাই ছিল সেকালের রীতি । আকবর এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটালেন । কিন্তু আকবরের পর আবার শুরু হল অরাজকতা এবং অস্থিরতার কাল ।

আকবরের নীতি অনুসরণ করলে মোগল সাম্রাজ্যের পতন ঘটানো ইংরেজদের পক্ষে মোটেই সহজ হতো না । আকবরের উদার দৃষ্টিভঙ্গি এবং ধর্মমত অনুসরণ করলে হয়তো ভারতীয় সমাজ জীবনে অধ:পতন রোধ করা যেত । কিন্তু পরবর্তী শাসকদের হিন্দু বিদ্বেষী নীতি মোগল সাম্রাজ্যের পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল।

রামমোহন ইংরেজ শাসকদের মধ্যে পেয়েছেন একদল উদারপন্থী, মানবতাবাদী, প্রাচ্য সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল, অন্যায়-অবিচারের প্রতিকারে আন্তরিক ভাবে আগ্রহী, উচ্চ শিক্ষিত পন্ডিতদের ।

পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে আলোকিত হয়ে রামমোহন উপলব্ধি করেছিলেন যে, পাশ্চাত্য শিক্ষার সাহায্যে এবং ইংরেজ শাসকদের সহযোগীতায় ভারতীয় সমাজকে ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে এক নতুন জাতি গঠন প্রক্রিয়া শুরু করা যাবে।

হিন্দু - মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কার দূর করার জন্য ইংরেজী শিক্ষা প্রসার একান্ত প্রয়োজন। এটাই ছিল রামমোহনের বাস্তব বুদ্ধি ও ভবিষ্যত দৃষ্টির সঠিক উপলব্ধি এবং আধুনিক ভারত গড়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অবদান।

তখনকার সমাজে হিন্দুরা সংস্কৃত ভাষা এবং মুসলমানরা আরবী ও ফারসী ভাষার প্রতি অত্যাধিক আসক্ত ছিল। ইংরেজী ভাষাই সেখানে ঐক্যের পথ সৃষ্টি করতে পারে। রামমোহনের এই অনুভূতি ছিল সঠিক এবং বাস্তব সম্মত।

চৈতন্য দেবের প্রভাবে বাঙ্গালীর চিন্তা ও ভাবজগতে যে অলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল তাকে বলা হয় চৈতন্য জাগরণ। বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির সমস্ত বিভাগে গভীর ভাবাবেগ সৃষ্টি করেছিল চৈতন্য দেবের প্রভাব। সৃষ্টি হয়েছিল চরিত-সাহিত্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চৈতন্য দেবকে অবতার রূপে তুলে ধরার প্রচেষ্টা শুরু হওয়ায় আধুনিক যুগের যুক্তিবাদী ধারা সৃষ্টি হতে পারলোনা। ভক্তিবাদের আন্দোলন নতুন প্রবাহের সৃষ্টি করল।

ভারতীয় সনাতন ধর্ম ও সংস্কৃতি চেতনার একটা ঐতিহাসিক তাৎপর্য

আছে। দার্শনিক তত্ত্ব থেকে এই চেতনার ধারা স্বতন্ত্র একটি ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন যুগ-ধর্মের যে তরঙ্গ সৃষ্টি হয়েছে তার সঙ্গে সংঘাত-সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা নতুন যাত্রাপথ রচনা করে অগ্রসর হয়েছে। পৃথিবীর আর কোন সভ্যতায় এমনটি দেখা যায়না। এর ফলে ভারতীয় সংস্কৃতির একটা ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়।

রামমোহন এই ধারাটি আবিষ্কার করেছিলেন, এবং ভারতীয় সনাতন সংস্কৃতির মূল ধরার সঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতার সমন্বয় ঘটিয়ে নতুন যাত্রাপথ রচনার জন্য সাধনা এবং সংগ্রাম করেছিলেন।

ভারতবর্ষে যুগ যুগ ধরে অসংখ্য জ্যতির মানুষ এসেছে। সাময়িক সংঘাতের পর সনাতন সমাজে মিশে গেছে। রামমোহন সেই ধারায় ভারতে নতুন জাতি গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাই প্রথমেই হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ইত্যাদি ধর্মের মূল লক্ষ্য যে এক সেটা শাস্ত্রীয় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।

এজন্যই রামমোহন প্রতিটি ধর্মের মূল গ্রন্থ পাঠ করে তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিজের যুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

মানব ধর্মকে জ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তির দ্বারা মহিমান্বিত করে তোলার সাধনাই রামমোহনের জীবনে প্রধান ব্রত হয়ে উঠেছিল। এই মানবধর্মই ভারতে নবযুগের উদ্বোধন ঘটিয়েছিল।

রামমোহনের যুক্তিবাদ সমাজের সর্বস্তরে একটা ভাবের প্লাবন সৃষ্টি করেছিল এবং চিন্তাশীল জিজ্ঞাসার-জন্ম দিয়েছিল।

মানুষের জীবন ও সমাজ সম্পর্কে একটা জিজ্ঞাসা জাগিয়ে তোলাই নবযুগ সৃষ্টির প্রধান বৈশিষ্ট্য। জীবনের সর্বক্ষেত্রে সত্য এবং ন্যায় অনুসন্ধান করা এবং বিবেক-বুদ্ধিকে সচেতন ও সক্রিয় করে তোলাই নবযুগের প্রধান লক্ষ্য।

রামমোহন যুক্তিবাদী চিন্তাধারার প্রসারের জন্য বিভিন্ন ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। সেকালে ছাপাখানার যুগ শুরু হয়েছিল মাত্র। পত্রিকা প্রকাশ করা ছিল বেশ কঠিন কাজ।

রামমোহন ইংরেজী - বাংলা ও ফারসী ভাষায় তিনটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। সংবাদপত্র পড়ে হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান তিন সম্প্রদায়ের স্বার্থান্বেষীরা ভীষণ চটে

গেলেন। ইংরেজ কর্তৃপক্ষও বিচলিত হয়ে পত্রিকা বন্ধ করার জন্য আইন তৈরী করলেন।

রামমোহন কয়েকজন বন্ধুসহ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কাছে প্রতিবাদ জানালেন। আইনের কর্তা ম্যাকেনটনকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে পত্রিকা প্রকাশ অব্যাহত রাখলেন। এর ফলে রামমোহনের প্রভাব এবং জনপ্রিয়তা বেড়ে গেল।

খ্রীষ্টান পাদ্রীরা ভারতীয়দের খুব অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখতেন। খ্রীষ্ট-ধর্মে দীক্ষা দিয়ে পতিত ভারতবাসীদের উদ্ধার করার কথা প্রচার করা হতো। রামমোহন এরূপ দৃষ্টিভঙ্গীর বিরোধিতা করেন। এজন্য খ্রীষ্টান পাদ্রীদের সঙ্গে বার বার বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন।

মিশনারীদের শিক্ষা প্রসারের প্রচেষ্টাকে রামমোহন সমর্থণ করতেন। তাই পাদ্রীদের ধারণা হয়েছিল যে রামমোহনকে খ্রীষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করা যাবে। রামমোহন ধর্মান্তরকরণকে সমর্থণ করতে পারেন নি। ফলে খ্রীষ্টান পাদ্রীদের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়।

বামমোহন সব ধর্মের মানব কল্যাণকর উপদেশাবলীকে ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে উদার মানবিক চেতনার বিকাশ ঘটাতে বিশেষভাবে উদ্যোগী ছিলেন। কোন ধর্মমতকে বড় করে দেখা বা ছোট করে দেখার তীব্র বিরোধিতা করেছেন।

যুক্তিবাদী চিন্তাধারার প্রসারের জন্য রামমোহন কলকাতার বাড়ীতে সমস্ত বন্ধুদের নিয়ে আলোচনা করার জন্য ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে 'আত্মীয়সভা' নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। এখানে সর্ব ধর্মের অনুগামীরা আলোচনায় অংশ গ্রহণের সুযোগ পেতো। এখানে বিভিন্ন ধর্মের ভালমন্দ সব বিষয়ের আলোচনা করা হতো। সামাজিক কুপ্রথা এবং কুসংস্কারগুলো দূর করার জন্য বিভিন্ন প্রস্তাব গ্রহণ করা হতো।

নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, সম্পত্তির উপর নারীর অধিকার আইন চালু করা, সতীদাহ প্রথা বন্ধ করা, নারী শিক্ষার আয়োজন করা ইত্যাদি বিষয় গুরুত্ব দিয়ে

আলোচনা করা হতো ।

এভাবে কলকাতায় রামমোহনকে কেন্দ্র করে একদল উদার দৃষ্টিসম্পন্ন যুক্তিবাদী আধুনিক গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছিল।

বাংলা ভাষায়- **'সংবাদ কৌমুদী'** এবং ফার্সী ভাষায়- **'মিরাৎ-উল-আখবর'** প্রকাশ করে রামমোহন হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যুক্তিবাদী চিন্তাধারার প্রচার ও প্রসার ঘটালেন।

এভাবে তৈরী হল বাংলার সমাজ জীবনে সাংবাদিকতার এক নতুন ধারা, যার প্রভাব আজও সমাজের শিক্ষিত মানুষের মধ্যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে চলেছে।

সংবাদপত্র শুধু জনমত গঠন করে না, সামাজিক ধ্যান-ধারণা এবং মতাদর্শেরও পরিবর্তন ঘটায় । যুক্তি-তথ্য ও তত্ত্বের বিশ্লেষণ করে সংবাদপত্রের মাধ্যমে অসংখ্য পাঠকের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া যায় । রামমোহনই প্রথম ভারতে এই ধারার সৃষ্টি করেছিলেন ।

রামমোহনের সময় সংবাদপত্র প্রধানতঃ শহরের শিক্ষিত ও অভিজাত সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল । গ্রামের মানুষ ছিল অত্যন্ত দরিদ্র, নিরক্ষর এবং ধর্মান্ধ । তাদের মধ্যে সংবাদপত্রের প্রভাব প্রসারিত হতে প্রায় পঞ্চাশ বছর সময় লেগেছিল । রামমোহনের ঐতিহাসিক ভূমিকা বুঝতেও শিক্ষিত সমাজকে দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে হয়েছিল । যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার বিশ্লেষণের ক্ষমতা অর্জন করতে পারলে ভারতে নবযুগ সৃষ্টি হবে একথা রামমোহনই প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন।

স্বদেশ প্রেমিক রামমোহন

রামমোহনের স্বদেশপ্রেমকে বুঝতে হলে রামমোহনের জীবন ও সমাজকে প্রথমে স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে । রামমোহনের জীবন শুরু হয়েছিল ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির চরম অন্ধকার যুগে। অসংখ্য কুসংস্কার, কুপ্রথা ও সংকীর্ণতা হিন্দু সমাজকে আষ্টে-পৃষ্ঠে অক্টোপাসের মতো জড়িয়ে ধরেছিল ।

সতীদাহ প্রথায় হাজার হাজার বিধবা নারীকে ধর্মের নামে মৃত স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মারা হতো সারাদেশ জুড়ে । শতকরা একশ ভাগ হিন্দু এই অন্ধ বর্বর ব্যবস্থাকে পুণ্য কর্ম রূপে মেনে নিয়েছিল । অনুসন্ধানে দেখা গেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য সদ্য বিধবাদের জোর করে হাত পা বেঁধে স্বামীর চিতায় তুলে দিয়ে ভারী বাঁশ দিয়ে চার পাঁচজন মিলে চেপে ধরেছে । চিৎকার যাতে কেউ শুনতে না পায় তার জন্য গ্রামবাসীরা খোল করতাল বাজিয়ে চড়া সুরে কীর্ত্তন করে জ্বলন্ত আগুনে বিধবার চিৎকার ডুবিয়ে দিয়েছে । এই বর্বর ব্যবস্থা চলেছে শত শত বছর ধরে ।

রামমোহন ছোট বেলায় এই দৃশ্য দেখে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা পোষণ করতে থাকেন। হিন্দুধর্মের প্রাচীন গ্রন্থ ঘেঁটে কোথাও তিনি সতীদাহ প্রথার পক্ষে কোন সমর্থন খুঁজে পাননি ।

ধর্মান্ধতা এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করার অর্থ হল সমগ্র হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে লড়াই করা। এই লড়াইয়ে দুটি পথ তিনি আবিষ্কার করেন। একটি হল-ইংরেজ শাসকদের সহযোগিতা এবং অপরটি হল ধর্ম শাস্ত্রের বিচার বিশ্লেষণ করে সঠিক তথ্য ও তত্ত্ব প্রচার করে জনমত গঠন করা ।

এ দুটি কাজেই তিনি সাফল্য অর্জন করেছিলেন। ইংরেজ শাসকরা প্রথম দিকে অন্যায় জেনেও ধর্মীয় গোড়ামীতে হস্তক্ষেপ করতে আগ্রহী ছিলনা, কারণ তাতে প্রজাদের মধ্যে বিদ্রোহের সম্ভাবনা ছিল। পরবর্তী সময়ে লর্ডবেন্টিংক রামমোহনের পাশে এসে দাঁড়ালেন এবং আইন পাশ করে সতীদাহ প্রথা বন্ধ করলেন ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে।

শুরু হলো ধর্মান্ধদের সংগে সংঘাত। রামমোহন উদারপন্থী বন্ধুদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে সতীদাহ বিরোধী আইনের পক্ষে আবেদন জমা দিলেন। অন্যদিকে গোঁড়াপন্থী হিন্দু ব্রাহ্মণ পন্ডিতরা রামমোহনের চেয়ে দশ গুণ বেশী স্বাক্ষর সংগ্রহ করে আইনটি বাতিল করার দাবীতে তীব্র প্রতিবাদ পত্র পেশ করলেন ।

শেষ পর্যন্ত লন্ডনের প্রিভি কাউন্সিলে বিচারের জন্য আইনটির বিরুদ্ধে আপীল করা হয়। রামমোহনের চেষ্টায় আপীল অগ্রাহ্য হয় এবং আইনটি কার্যকর হয়। এই একটি ঘটনার মধ্যেই রামমোহনের দেশপ্রেম উজ্জ্বল হয়ে আছে ।

ভারতের আধুনিক যুগের প্রবর্তক রূপে রামমোহনের ভূমিকা পরবর্তী কালের মনীষীরা অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সংগে স্মরণ করেছেন ।

হিন্দু সমাজের মত মুসলিম সমাজেও ছিল গভীর ধর্মান্ধতা ও নানা কুসংস্কার । প্রাচীন হিব্রু ও গ্রীক ভাষা শিখে, প্রাচীন কোরান পাঠ করে মুসলিম সমাজের ধর্মান্ধতার অসারতা তিনি প্রমাণ করেছেন, মুসলিম মৌলবাদীদের স্বার্থান্বেষী ব্যাখ্যা সম্পর্কে শাস্ত্রীয় বিচার বিশ্লেষণ সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রচার করেছেন । এর ফলে মুসলিম মৌলবাদীদেরও আক্রমনের লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল রামমোহন ।

রামমোহন খাঁটি বৈষ্ণব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । তাই চৈতন্য যুগের প্রেমধর্ম উপলব্ধি করার জন্য গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন ।

চৈতন্য পরবর্তী বৈষ্ণবসমাজে যে সব বিকৃতি ঘটেছিল, সেগুলি আবিষ্কার করতে গিয়ে রামমোহনের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক চিন্তা চেতনা স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ।

তাই রামমোহন বুঝেছিলেন যে ভারতের সামগ্রিক অগ্রগতির জন্য হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কেই জাগিয়ে তুলতে হবে এবং ভারতীয় সমাজে সমন্বয় প্রচেষ্টাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে ।

রামমোহন আশা করেছিলেন যে, বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে নতুন কোন উদারনীতির সন্ধান পাওয়া যাবে । সে জন্য সে যুগের বৌদ্ধ- কেন্দ্র তিব্বতে গিয়েছিলেন কঠোর পরিশ্রম করে পাহাড়, পর্বতের দুর্গমতাকে উপেক্ষা করে ।

কিন্তু তিব্বতে গিয়ে দেখলেন সেখানকার বৌদ্ধরা লামাকে ঈশ্বর রূপে পূজা করে । তিব্বতে মানুষ পূজার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে রামমোহনের জীবন বিপন্ন হল । কয়েকজন উদারপন্থী মহিলার চেষ্টায় রামমোহন জীবন নিয়ে ফিরে এলেন। এই ঘটনায় নারীর প্রতি শ্রদ্ধা আরো বেড়ে গেল ।

দেশে ফিরে জৈন এবং শিখ ধর্ম সম্পর্কে অনুসন্ধান করলেন । কিন্তু সর্বত্রই দেখতে পেলেন সব ধর্মেরই প্রাচীন মাঙ্গলিক রূপ হারিয়ে গেছে । সব ধর্মেই অলৌকিকতা, যুক্তিহীনতা, আচার সর্বস্ব, কূপমন্ডকতা ধর্মের স্থান দখল করে আছে।

যে যুগে ধর্মের নামে আত্মসমর্পণ করা, বিধবাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা, নির্বোধ বালিকাকে বৃদ্ধের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া, নিজের প্রথম সন্তানকে নদীতে বা সমুদ্রে বিসর্জন দেওয়া- সর্বজন স্বীকৃত প্রচলিত প্রথা হয়ে উঠেছিল , সে যুগে এসব মিথ্যা আচারের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে সচেতন করে তোলা এবং প্রতিবাদের ভাষা ও যুক্তি সামনে তুলে ধরা এক বৈপ্লবিক ঘটনাই বটে ।

কেউ যদি বলেন, এটা ছিল নিছক ধর্ম সংস্কারের কাজ, এর মধ্যে দেশপ্রেমের কোন আদর্শ ছিলনা । রামমোহন ইংরেজ শাসনের পক্ষে ছিলেন, তাই তাকে দেশপ্রেমিক বলা যায় না। এরূপ মতাবলম্বীদের আমরা বলব ইতিহাস বিরোধী, প্রগতি বিরোধী, স্বার্থান্বেষী এবং সংকীর্ণতাবাদী।

কার্ল মার্কসও পরবর্তী কালে বলেছেন যে, ভারতে ইংরেজ শাসন শাপে বর হয়ে উঠেছিল ।

একদিকে যেমন ছিল নির্মম শোষণের যন্ত্রণা তেমনি অন্যদিকে ছিল আধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংগে পারচিত হবার অপূর্ব সুযোগ । এর ফলে সৃষ্টি হয়েছিল নবযুগের-উদ্বোধনী সংগ্রাম ।

ভারতের বুকে নবযুগের মশাল জ্বালিয়েছিলেন রামমোহন ।এবিষয়ে বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই । অবশ্য সংকীর্ণতারবাদীদের সমালোচনা আজো আছে।

কিন্তু কিছু রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবী রামমোহনের ঐতিহাসিক ভূমিকাকে পুনর্মূল্যায়নের নাম করে অবমূল্যায়নের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন । জাতীয়তাবাদের ইতিহাসকে বিকৃত করার এই অপচেষ্টা নতুন প্রজন্মের যুবক যুবতীদের মধ্যে বিভ্রান্তি

ছড়াবার চেষ্টা বলে গণ্য হওয়া উচিত। ভারতের অন্ধকার যুগ থেকে মুক্তির জন্য এবং নতুন ভারতবর্ষ গড়ার প্রস্তুতির জন্য রামমোহন ইংরেজ শাসন এবং ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানে শিক্ষা অত্যন্ত জরুরী বলে মনে করতেন। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ভারতীয় মনীষীরা রামমোহনের এই ধারণাকে বাস্তব সম্মত বলে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছেন । রবীন্দ্রনাথ মৃত্যু শয্যায় থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের খবর শুনে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান কামনা করেছেন । তার আগে ইউরোপীয় সভ্যতা সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন রবীন্দ্রনাথ ।

রামমোহন চিরকালের জন্য ইংরেজ শাসন থাকুক এমন মত পোষণ করেননি। লন্ডনে ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কাছে রামমোহন বলেছেন ভারতের জন্য প্রয়োজন একটি নতুন শাসনতন্ত্র । যেখানে বিচারপতি হবেন একজন মুসলমান, রাজস্ব বিভাগের দায়িত্বে থাকবেন একজন হিন্দু এবং পুলিশ বিভাগের দায়িত্বে থাকবেন একজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বা অন্য সম্প্রদায়ের কেউ ।

এই মনোভাবের মধ্যে রামমোহনের অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভারতীয় শাসন ব্যবস্থার চিন্তা স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে । তখনো পর্যন্ত আধুনিক প্রশাসন ব্যবস্থা কোথাও গড়ে উঠে নি ।

ইংলেন্ডেও তখন পর্যন্ত প্রকৃত গণতান্ত্রিক পরিকাঠামো ছিলনা ।আমেরিকা সবে মাত্র স্বাধীন সাধারণতন্ত্র ঘোষণা করেছে এবং ফরাসী বিপ্লবের ঢেউ ইউরোপে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছে ।ইউরোপেও তখনো প্রকৃত প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি ।

রামমোহনের ফ্রান্স ভ্রমনের অনুমতি না পাওয়ায় ফ্রান্সের বিদেশ মন্ত্রীর কাছে যে আবেদন পত্র পাঠিয়েছিলেন তাতে তিনি বলেছেন, যে দেশ সাম্য- মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী ঘোষণা করে বিশ্বমানব সভ্যতার গৌরবময় ইতিহাস সৃষ্টি করেছে । সেই দেশ ভ্রমনের প্রবল ইচ্ছাকে প্রতিরোধ করার জন্য সংকীর্ণতা থাকবে কেন ? মানবিক কান্ডজ্ঞান এবং বিজ্ঞান সাধনা - মানব জাতীকে যে পথে নিয়ে যাচ্ছে সেখানে বিশ্বের সব মানুষই একই পরিবারের মানুষ বলে গণ্য হবে।

রামমোহনের নতুন আবেদনের ভাষায় মুগ্ধ হয়ে ফ্রান্সের বিদেশ মন্ত্রী রামমোহনকে বিশেষ অতিথির সম্মান দিয়ে ফ্রান্স ভ্রমনের জন্য আমন্ত্রন জানিয়েছিলেন। রামমোহন ফ্রান্সে গিয়েও বিপুল সংবর্ধনা লাভ করেছেন । ফ্রান্সে রামমোহনের সংবর্ধনায় ফরাসীরা বলেছেন যে, রামমোহনের মত সংস্কারমুক্ত, অসাম্প্রদায়িক এবং

উদার মানবিক দৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ সমগ্র ইউরোপেও খুব বিরল ।

ইংলন্ডের রাজসভায় এবং পার্লামেন্টে রামমোহন যে সব বক্তব্য রেখেছেন তাতে তিনি ভারতে কৃষকের দুর্দ্দশার চিত্র তুলে ধরেছেন এবং প্রতিকার দাবী করেছেন। জমিদারী প্রথা প্রচলনের ফলেই যে ভারতীয় কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশা বেড়েছে তাও তিনি যুক্তি ও তথ্য সহ তুলে ধরেছেন ।

ভারতীয় কৃষকদের দুর্দশার কথা রামমোহনই প্রথম উপলব্ধি করেছেন এবং ইংরেজ শাসনের মাধ্যমে সামাজিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা এবং জাতীয় ঐক্যবোধ গড়ে তোলাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন । এটা তাঁর দূরদর্শিতারই প্রমাণ বহন করে ।

রামমোহন ইংরেজ শাসনের শুরুটাই দেখেছিলেন । রামমোহনের মৃত্যু হয় ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে। আশি বছর পরে ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় । এই সময় ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠে । এশিয়ার জাপানেও সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রের বিকাশ ঘটে । আবারও ২২ বছর পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং সাম্রাজ্যবাদের নিষ্ঠুর সভ্যতা-ধ্বংসকারী ফ্যাসীবাদীরূপ আত্মপ্রকাশ করে ।

মৃত্যু শয্যায় থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নায়কদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ যে সব মন্তব্য করেছেন। রামমোহন জীবিত থাকলে হয়তো আরো কঠোর মনোভাব প্রকাশ করতেন । কারণ রামমোহনের রাষ্ট্রচিন্তা আরো গভীর ব্যাপ্ত ছিল ।

রামমোহনের স্বদেশপ্রেম সম্পর্কে সন্দেহ করা বা সংশয় জাগিয়ে তোলার চেষ্টা খুবই অন্যায়। রামমোহনের ঐতিহাসিক কালের বাস্তবতার মধ্যেই রামমোহনের স্বদেশ প্রেমের বিচার করতে হবে । রামমোহন ছিলেন ভারতে অখন্ড জাতীয়তাবোধ গড়ে তোলার সংগ্রামে সে যুগের একমাত্র মহানায়ক। এই উদ্দেশ্যেই তিনি বেদ-বেদান্ত-কোরাণ-বাইবেল অধ্যয়ন করে সব ধর্মের মানুষের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি গড়ে তোলার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন ।

রামমোহনের এই দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে সব ধর্মের গোঁড়াপন্থীরা পৃথক পৃথক ভাবে আক্রমণ শুরু করেন । এবং রামমোহনকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেন । যথাসময়ে একটা যুক্তিবাদী গোষ্ঠী তৈরী হবার ফলে রামমোহন ষড়যন্ত্রকারীদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হন ।

ধর্ম ও সমাজের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে শাস্ত্রীয় সমর্থণ এবং সচেতন একটি গোষ্ঠী তৈরী করা প্রয়োজন এই চিন্তা বামমোহনের দূরদর্শিতাই প্রমাণ করে ।

সে যুগে গ্রামীণ মুসলমান সমাজে শিক্ষাব কোন আগ্রহ ছিল না । নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ধর্মান্তরিত হয়ে প্রকৃতপক্ষে নতুন কোন মর্যাদা লাভ করেনি । মোল্লা-মৌলবী ও উলেমাদেব হিন্দু বিদ্বেষী প্রচাবের ফলে প্রকৃত ধর্মেব সঙ্গেও তাদের পরিচয় ঘটেনি।

বামমোহন কোবাণেব প্রাচীন গ্রন্থ পাঠ করে ধর্মীয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে দেখালেন যে- কোরাণে বলা হয়েছে পৃথিবীর সব ধর্ম প্রচার কবতে আল্লার প্রতিনিধিবা এসেছেন । মানুষের কল্যাণের জন্য তাঁবা যে সব বাণী প্রচাব করেছেন তা সব ধর্মেব মানুষকেই মানতে হবে । হদিস গ্রন্থে বলা হয়েছে জ্ঞান লাভের জন্য বিশ্বজগতকে আত্মীয় মনে করতে হবে । সে বিদ্যা ও জ্ঞান যে দেশেই থাকুক তা সংগ্রহ কবতে হবে।

একই রকমভাবে বেদ-উপনিষদ ব্যাখ্যা করে বলেছেন হিন্দু শাস্ত্র মানুষকে অমৃতেব পুত্র - বলে ঘোষণা দিয়েছে । সব-মানুষের প্রতি ভালবাসা এবং আপন করে নেবার শিক্ষাই হিন্দু ধর্মের বৈশিষ্ট্য ।

রামমোহনের যুগে ধর্মীয় গোঁড়ামিকে ভেঙ্গে দিয়ে একটা অসাম্প্রদায়িক শিক্ষা ও ভারতীয়ত্ববোধ জাগিয়ে তোলাই ছিল একটা অতি প্রয়োজনীয় স্বদেশ প্রেমিক দায়িত্ব। এদিক থেকে রামমোহন ছিলেন সে যুগেব শ্রেষ্ঠ স্বদেশপ্রেমিক ।

বিশ্বপ্রেমিক রামমোহন

রামমোহনের বয়স যখন মাত্র তিন বছর তখনই শুরু হয় আমেরিকার স্বাধীনতাযুদ্ধ । উত্তর আমেরিকার তেরটি বৃটিশ উপনিবেশ ঐক্যবদ্ধভাবে স্বাধীনতার দাবীতে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল, বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ।

এই সময় আমেরিকার লোকসংখ্যা ছিল ৬০ লক্ষ । তাদের মধ্যে অর্ধেকের কিছু বেশী ইংরেজ, কুড়ি শতাংশ ফরাসী এবং বাকীরা ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছিল । দেশীয় আদিম অধিবাসীদের অধিকাংশই বিদেশীদের গুলিতে নিহত হয়েছিল। কিছু সংখ্যক দক্ষিণ আমেরিকায় পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করেছিল ।

ইংরেজরা ছিল ভয়ানক রাজভক্ত। নানারকম অত্যাচার, অবিচার সহ্য করেও তারা রাজার অনুগত থাকত । দেশের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে চাইতনা। আমেরিকা আবিষ্কারের পর বিশাল অঞ্চল জুড়ে বৃটিশ উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল ।

আমেরিকার আদিম অধিবাসী রেড ইন্ডিয়ানরা ছিল যাযাবর শ্রেণীর মানুষ। তারা কৃষিকাজ করতে রাজী না হওয়ায় সংঘাত শুরু হয়। বিপুল সংখ্যক আদিম অধিবাসী নিহত হয়।

আফ্রিকার সমুদ্র উপকূল থেকে নিগ্রোদের জোর করে বন্দী করে জাহাজ ভর্তি করে নিয়ে আসা হতো আমেরিকার জমিতে চাষের কাজ করার জন্য। তাদের ক্রীতদাস হিসেবে আমেরিকার বাজারে বেচা- কেনা করা হতো। এই ক্রীতদাস ব্যবসায় ইংরেজরা ছিল অগ্রণী। কারণ তাদের নৌবহর ছিল খুবই শক্তিশালী। ভারত থেকে বহু মানুষ ধরে নিয়ে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রী করা হতো-আমেরিকায়।

১৭৭৩ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতীয় চা বিক্রী করার জন্য আমেরিকার বাজারে হাজির হল। আমেরিকানরা বিদেশী চা বর্জন করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল । এর থেকে শুরু হল সংঘাত। বিদ্রোহীরা দাবী করেছিল স্বায়ত্ত শাসন। কিন্তু বিদ্রোহ দমনের জন্য বৃটিশ ফৌজ যখন সমুদ্র যাত্রা করল তখন বিদ্রোহীরাও সেনাদল গঠন করে স্বাধীনতা ঘোষণা করল ।

১৭৭৬ সালের ঘোষণাপত্রে আমেরিকার তেরটি বৃটিশ উপনিবেশ ঐক্যবদ্ধ হয়ে গঠন করা হল বিশ্বের প্রথম সাধারণতন্ত্র - আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র ।একজন বৃটিশ আবিষ্কারকের নাম অনুসারেই নতুন আবিষ্কৃত মহাদেশটির নাম রাখা হয়েছিল আমেরিকা।

আমেরিকা হাতছাড়া হবার পর কানাডা এবং অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্য বৃটিশ সরকার উদগ্রীব হল। কিন্তু ভারত তখনো সাম্রাজ্যে পরিনত হয়নি। বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিরোধ ভেঙ্গে ভেঙ্গে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতীয় সৈনিকদের সাহায্যে সাম্রাজ্য বিস্তার করে চলেছিল। ভারতের কোন অঞ্চলেই ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে উঠেনি । অসংখ্য ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা ও আঞ্চলিক শাসকরা একক শক্তিতেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সেনা বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। ফলে প্রতিটি রাজ্য দখল করা কোম্পানীর পক্ষে সহজ হয়েছে ।ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে উঠলে ইংরেজ শক্তির পক্ষে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হতো না ।

আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হবার তের বছর পর বিশ্ব আলোড়নকারী ফরাসী বিপ্লব ঘটে। রামমোহনের বয়স তখন সতের বছর । তখনো এদেশে সংবাদপত্রের মাধ্যমে এসব যুগান্তকারী ঘটনাবলীর খবর জানার কোন উপায় ছিলনা ।

কলকাতা ভারতের রাজধানী হবার ফলে বহু ইংরেজ রাজকর্মচারীর আগমন ঘটতে থাকে। বাংলা- ফার্সী ও আরবী ভাষা জানা থাকার ফলে রামমোহনের সঙ্গে ইংরেজ রাজকর্মচারীদের বন্ধুত্ব গড়ে উঠে। বিভিন্ন কাজে সহায়তার জন্য রামমোহনের ডাক আসতে থাকে ।

ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব সৃষ্টি হবার ফলে ইংরেজ বন্ধুরা রামমোহনকে ইংরেজী ভাষা শিখতে সাহায্য করেন এবং ইউরোপের রোমাঞ্চকর ঘটনাবলীর খবর জানাতে থাকেন।

ইংরেজ বন্ধুদের কাছ থেকে নানা বিষয়ের গ্রন্থ পাঠ করে রামমোহন আধুনিক ইউরোপ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে থাকেন।

এভাবে সমগ্র বিশ্বের মানবজাতির প্রতি রামমোহনের মমতাবোধ গভীরতর হতে থাকে। সমগ্র মানব জাতিই তখন রামমোহনের চিন্তা ভাবনাকে গ্রাস করতে থাকে। যারা রামমোহনকে শুধুমাত্র ধর্ম সংস্কারক এবং সমাজ সংস্কারক রূপে গণ্য করেন তারা রামমোহনের রাষ্ট্রচিন্তাকে সম্পূর্ণ অবহেলা করেন। এর ফলে রামমোহনের বহুমুখী প্রতিভার সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটেনা।

রামমোহনকে বলা হয় আধুনিক ভারতের জনক। রামমোহন যে ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেখানে থাকবে না জাতিভেদ, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা, কৃষকের দুর্দশা এবং জনগণের হতাশা । তাঁর সমগ্র চিন্তাকে ঘিরে ছিল বিশ্বমানবিকতাবোধ ।

স্বাধীন ভারতের ৫৮ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা নিজেরাই হতাশ হয়ে পড়ি। রামমোহনের স্বপ্নের ভারত হারিয়ে গেছে মনে হয় ।

রামমোহন আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং ফরাসী বিপ্লবের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলন। বৃটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত বিভিন্ন বন্ধুর কাজে লেখা পত্র এবং বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনার বিবরণী থেকে জানা যায় রামমোহন সেকালের সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি গভীর অনুরাগ প্রকাশ করেছেন।

সেকালের বৃটিশ সমাজতন্ত্রী দার্শনিক বেন্থাম, মিল এবং রবার্ট ওয়েনের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব হয়েছিল। তাঁদের স্মৃতি কথায় রামমোহনের সঙ্গে আলোচনার বিবরণ থেকে জানা যায় রামমোহন সমাজতন্ত্রের আদর্শ সমর্থণ করলেও নাস্তিকতা মেনে নিতে পারেননি। এনিয়ে বহুবার বিতর্ক হয়েছে।

রামমোহন ফরাসী দার্শনিক রুশো এবং ভলতেয়ারের গ্রন্থাবলীও গভীর মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করেছেন। কিন্তু সব বিষয়ে একমত হতে পারেননি।

রামমোহনের সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তায় মানব কল্যাণকেই সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্গে পরিচয়ের আগেই রামমোহনের প্রাচ্য জ্ঞানের ভান্ডার সমৃদ্ধ হয়েছিল ।

রামমোহন রবার্ট ওয়েনকে এক পত্রে লিখেছেন, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য মানুষের ধর্মকে নির্বাসন দেবার কোন প্রয়োজন নেই। পৃথিবীর সব ধর্মের মধ্যেই মানব কল্যাণমূলক বহু রীতিনীতি ও উপদেশ রয়েছে, যা মানুষ সহজে ত্যাগ করতে পারেনা। রামমোহনের সময় মার্কসবাদী সমাজতন্ত্রের জন্ম হয়নি। ১৮৩৩ সালে যখন রামমোহনের মৃত্যু হয় তখন মার্কসবাদের জনক কার্লমার্কসের বয়স ছিল মাত্র ১৫ বছর।

কার্লমার্কস সমাজতন্ত্রের ধারণা গুলিকে বিশ্লেষণ করে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী সূত্রে সুশৃংখল তত্ত্বরূপে প্রকাশ করেন। সমাজ বিকাশের দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক প্রগতির ধারা আবিষ্কার করেই তিনি বিশ্বব্যাপী খ্যাতি লাভ করেন।

রামমোহন ততদিন জীবিত থাকলে হয়তো সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি আরো গভীর ভাবে আকৃষ্ট হতেন। কিন্তু ধর্মকে নির্বাসন দিতে তিনি কখনোই রাজী হতেন না।

রামমোহনের ধর্ম সংস্কার, সমাজ সংস্কার মূলত: একটি নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রবর্তনের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়েছিল। ইউরোপের মাটিতে প্রথম তিনি রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করেন।

কার্লমার্কস সমগ্র মানব সমাজকে একটি রাষ্ট্রীয় চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করেছেন। রামমোহন এক্ষেত্রে অবশ্যই কার্লমার্কসের সঙ্গে হাত মেলাতেন। যদিও ধর্ম সম্পর্কে মতভেদ থেকেই যেত।

আধুনিক ইতিহাস প্রমাণ করেছে, রামমোহনের চিন্তাধারা সঠিক ছিল। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ধর্মকে বর্জন করার কোন প্রয়োজন নেই।

এভাবে রামমোহনের কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করলে আমরা বিশ্বপ্রেমিক রামমোহনকে সহজেই আবিষ্কার করতে পারি।

ভারতে বৃটিশ শাসন সম্পর্কে ১৮২৯ সালে রামমোহন যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন পনের বছর পর কার্লমার্কস প্রায় একই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। ভারত বৃটিশ শাসন শাপে বর হয়ে উঠেছিল।

রামমোহন ভারতে কৃষকদের দু:খ দুর্দশার জন্য কোম্পানীর শাসনে জমিদারী প্রথাকে দায়ী করে বৃটিশ পার্লামেন্টে বক্তব্য রেখেছেন। কৃষকদের দুর্দশা দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী করেছেন। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ইংরেজ শাসনের শোষণ ও অত্যাচার সম্পর্কে সচেতন থেকেও রামমোহন ভবিষ্যতে ঐক্যবদ্ধ ভারতরাষ্ট্র গড়ে উঠার সম্ভাবনাকে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন।

বৃটিশ শাসনের মাধ্যমে ভারতীয় সমাজের কুসংস্কারগুলো দূর করা সম্ভব বলে রামমোহন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। সতীদাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ, গঙ্গায় সন্তান বিসর্জন দেওয়ার মত বর্বর- প্রথা গুলো মুসলমান শাসনের সময়ই ব্যাপক আকার নিয়েছিল। কারণ মুসলমানরা নারী ধর্ষণকে ধর্মান্তর করনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় বলে মনে করত। ধর্ষিতা নারীকে হিন্দুসমাজে স্থান দেওয়া হতো না। তাই ধর্ষিতা নারীর পক্ষে ধর্মান্তরিত হওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা ছিলনা।

এজন্যই মুসলিম শাসনকালে হিন্দুসমাজে নারীর মর্যাদা রক্ষার নামে বাল্যবিবাহ এবং সামাজিক মর্যাদা ও পবিত্রতার নামে সতীদাহ প্রথা নির্মমভাবে অনুসরণ করা হতো। কোন মুসলমান শাসকই এসব কুপ্রথা বন্ধ করা বা নারীর জীবন ও অধিকার রক্ষার জন্য উদ্যোগ নেয়নি।

রামমোহন বিশ্বাস করতেন উন্নত শিক্ষা ও সভ্যতার অধিকারী ইংরেজরা এসব কুপ্রথা বন্ধ করতে দৃঢ় পদক্ষেপ নেবে। বাস্তবে তাই ঘটেছে। ইংরেজ শাসকরা আইন করে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে এসব কুপ্রথা বন্ধ করেছে।

দ্বিতীয়ত: আধুনিক পাশ্চাত্যশিক্ষা উন্নত যুক্তিবাদী দৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষিত সমাজ গড়ে তুলবে এবং ঐক্যবদ্ধ নতুন ভারতরাষ্ট্র গড়ে উঠতে সহায়ক হবে। রামমোহনের এই বদ্ধমূল ধারণার সঙ্গে পরবর্তীকালে কার্লমার্কসেরও দৃষ্টিভঙ্গীর সম্পূর্ণ মিল রয়েছে।

ফরাসী বিপ্লবের মহান আদর্শ-সাম্য - মৈত্রী ও স্বাধীনতা- সারা বিশ্বের মানব সমাজকে প্রভাবিত এবং আলোড়িত করবে এবং সৌভ্রাতৃত্ব মূলক বিশ্ব সভ্যতা গড়ে উঠবে, এমন বিশ্বাস রামমোহনের মধ্যে খুব দৃঢ়ভাবে দেখা দিয়েছিল। লন্ডনে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনার বিবরণে তা জানা যায়। ইংরেজ গবেষকরা রামমোহনের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে রাষ্ট্রসংঘ চিন্তার প্রথম বীজ বলে উল্লেখ করেছেন।

এসব ঘটনায় প্রমাণ হয় যে, রামমোহন প্রকৃতপক্ষে একজন বিশ্বপ্রেমিক হয়ে উঠেছিলেন। ইংলন্ডে অকাল মৃত্যু না হলে রামমোহনের আদর্শ ভারতীয় জীবনে আরো স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হতো। আধুনিকযুগে রামমোহনই প্রথম সারা বিশ্বজুড়ে এক মানবজাতিত্বের ধারণা খুব জোরের সঙ্গে প্রচার করেছেন। এবং সব ধর্মের সব জাতির মানুষের মধ্যে শান্তি ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন।

রামমোহনের ফার্সী সংবাদপত্র **মিরাৎ উল- আখবার-ভারতের** বাইরে পারস্য পর্যন্ত নিয়মিত গ্রাহকের কাছে যেত। কোন কারণে পত্রিকা বন্ধ হলে চারদিক থেকে প্রচুর চিঠি আসতো তাড়াতাড়ি পত্রিকা পাঠাবার দাবী নিয়ে।

তেমনিভাবে ইংরেজী পত্রিকার গ্রাহক ছড়িয়ে ছিল ইংল্যান্ড- আমেরিকা এবং ইউরোপের বহু দেশে। সেকালে রামমোহনের পত্রিকাগুলো ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং চাহিদা ছিল আর্ন্তজাতিক। রামমোহনকে প্রকৃত অর্থেই বিশ্বনাগরিক মনে করা হতো।

রামমোহনের ভারত চেতনাই ক্রমশ: বিশ্বচেতনায় রূপান্তরিত হয়েছিল। উপনিষদের যুগে ভারত মানুষকে অমৃতের পুত্র বলে গণ্য করতো। এ ভাবনায় কোন প্রকার সাম্প্রদায়িকতা ছিলনা, জাতি বিদ্বেষও ছিলনা। রামমোহন এই ধারারই বাহক হয়ে উঠেছিলেন।

পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও আমরা এই ধারারই প্রকাশ এবং বিকাশ দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথও উপনিষদের মধ্যেই প্রকৃত ভারতাত্মাকে খুঁজে পেয়েছিলেন। বিশ্বমানবতাই রবীন্দ্র কাব্যধারার মূল বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছিল। তাই তিনি বিশ্বকবি হিসেবেই পরিচিত হয়েছিলেন।

রামমোহনের চিন্তাধারা সুশৃংখল ভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে রেখে যাবার সময় তিনি পাননি। বহু ভাষায় প্রচারিত বিভিন্ন পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে রামমোহনের বিশ্লেষণমূলক বহু ভাবনা চিন্তা। রামমোহনের প্রকাশিত গ্রন্থগুলোও লেখা হয়েছে বিভিন্ন ভাষায়। আরবী, ফার্সী, বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় বেশীর ভাগ গ্রন্থ লিখিত হয়েছে। সংস্কৃত ভাষায়ও অনেক প্রবন্ধ লেখা রয়েছে।

প্রায় দুইশ বছর ধরে গবেষকরা চেষ্টা করছেন রামমোহনের চিন্তা সূত্রগুলোকে একসাথে গেঁথে নিয়ে এই মহান পুরুষের সঠিক মূল্যায়ন করতে। কিন্তু একাজ এখনো শেষ হয়নি। কারণ সেকালে পত্র- পত্রিকা এবং গ্রন্থ সংরক্ষণের সুব্যবস্থা ছিলনা। তবে রামমোহনের বিশ্বচেতনার বহু দলিল বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। গবেষকরা সেখান থেকে বহু তথ্য সংগ্রহ করার সুযোগ পাচ্ছেন ।

রামমোহনের ধর্মচিন্তা

রামমোহনের ধর্মচিন্তায় আমরা কয়েকটি পর্ব দেখতে পাই। প্রথম পর্বে জন্ম ও বাল্যকালের পারিবারিক শিক্ষা ও পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি গভীরনিষ্ঠা এবং উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও গভীর ধর্মীয় ভাবাবেগ লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন বৈষ্ণবীয় অনুষ্ঠানে রাধাকৃষ্ণের লীলা কীর্তনের প্রভাবে রামমোহনের মনে এমন ভাবাবেগ দেখা যেত যে তিনি বড় হয়ে একজন সন্ন্যাসী হবেন বলে বন্ধুদের কাছে প্রচার করতেন।

দ্বিতীয় পর্বে সেকালের সামাজিক প্রয়োজন অনুযায়ী আরবী ও ফার্সী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার জন্য পাটনায় অবস্থান কালে ইসলামী সাহিত্য ও ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে রামমোহন মূর্তিপূজা ও জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে নতুন ভাবধারায় উদ্‌বুদ্ধ হন। তিনি বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে, ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। ঈশ্বরকে খন্ড খন্ড ভাবে বিভিন্ন দেবতা রূপে পূজা করার ফলে হিন্দু ধর্মে বহু সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়েছে। শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব এই তিন প্রধান সম্প্রদায়ও নানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এর ফলে ধর্মীয় রীতিনীতি ও আচার অনুষ্ঠানেও নানা পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। ইসলাম ধর্মও তিন ভাগে বিভক্ত হয়েছে।

তৃতীয় পর্বে রামমোহন পাটনা থেকে কাশীতে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য আসেন। সেকালে পাটনা ছিল আরবী ও ফার্সী শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র এবং কাশী ও নবদ্বীপ ছিল সংস্কৃত শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র। একমাত্র কাশীতেই বেদ- বেদান্ত শিক্ষার উন্নত ব্যবস্থা ছিল। তাই রামমোহনকে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য কাশীতে পাঠানো হয়েছিল। সেকালেও প্রচীন বেদ- বেদান্ত পাঠের ছাত্র সংখ্যা ছিল নগণ্য।

রামমোহন ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। অল্পদিনের মধ্যেই সংস্কৃত ভাষায় দক্ষতা অর্জন করে বেদ- বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত অধ্যয়ণ করে হিন্দু শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। **এই সময় তিনি বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক গবেষণা করে নানা ধরনের অসঙ্গতিগুলো আবিষ্কার করেন। বিভিন্ন ধর্ম ও সাহিত্যের তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণের পদ্ধতি রামমোহনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান।**

রামমোহন প্রত্যেক ধর্মের মূল গ্রন্থগুলো পাঠ করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে নতুন নতুন ভাষা শিখতে থাকেন। তারপর বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা করে গ্রন্থ প্রকাশ করতে থাকেন।

আরবী, ফার্সী, বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় পর পর বহু গ্রন্থ রচনা করে দেশের ও বিদেশের পন্ডিত সমাজে অতিদ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করেন। ইংরাজী ভাষায় বেদ-বেদান্তের ব্যাখ্যাসহ মূল প্রাচীণ সংস্কৃত ভাষা থেকে অনুবাদ রামমোহনই প্রথম করেছেন।

ফলে ইউরোপের প্রাচ্যবিষয়ক পন্ডিতগণ একমাত্র রামমোহনের গ্রন্থ থেকেই বেদ- বেদান্তের সঠিক ব্যাখা এবং তুলনামূলক বিশ্লেষণ করার পদ্ধতি জানতে পারেন। বহুভাষাবিদ রামমোহন একজন শ্রেষ্ঠ প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদ রূপে ইউরোপের সর্বত্র পরিচিত হন। আমেরিকায় ও রামমোহনের পরিচিতি ও খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। রামমোহন- মাতৃভাষা বাংলা ছাড়াও আরো ৯ টি ভাষায় দক্ষ ছিলেন-- আরবী, ফার্সী, সংস্কৃতি, উর্দু, হিব্রু, ইংরেজী, গ্রীক, ল্যাটিন ও ফ্রান্স। এই ৯ টি ভাষায় বক্তব্য দিয়েছেন এবং প্রবন্ধ লিখেছেন।

রামমোহনই প্রথম সবধর্মের মূল ধর্মগ্রন্থ গুলোর আলোচনা করে দেখান যে সব ধর্মেরই মূলকথা এক। সবধর্মেই মানব কল্যাণের বিষয়টিকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

রামমোহনের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ **তুহফাত- উল- মুত্তহ-হিদিন** অর্থাৎ একেশ্বরবাদীর প্রতি উপহার --- প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পন্ডিত সমাজে আলোড়ন শুরু হয়ে যায়। সেকালে বাংলা ভাষার কদর ছিলনা। বাংলা গদ্য- সাহিত্য তখনও সৃষ্টি হয় নি। কাজেই প্রচলিত আরবী ও ফার্সী ভাষায় প্রথম গ্রন্থটি রচনা করে- একেশ্বরবাদের পক্ষে প্রচার শুরু করেন। তিনি প্রমাণ করেন যে ভারতীয় বেদ-বেদান্তে একেশ্বরবাদী চিন্তাধারারই প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। পৃথিবীর সব ধর্মই একেশ্বর বাদী।

ঈশ্বরকে বহু দেবতায় বিভক্ত করে সামাজিক ও ধর্মীয় বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়েছে। এর ফলে সমাজ-সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি হয়েছে।

১৮০৪ সালে ৩২ বছর বয়সে এই গ্রন্থ প্রকাশ করে আরবী ও ফার্সী ভাষায় এবং ধর্মশাস্ত্রে সুপন্ডিত রূপে রামমোহন স্বীকৃতি লাভ করেন। ১৮১৫ সালে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করার আগেই বেদান্তগ্রন্থ এবং বেদান্তসার নামে দুটি বাংলাগ্রন্থ

রচনা করেন। ফলে বেদবেদান্তে রামমোহনের গভীরজ্ঞান পন্ডিত সমাজকে চমৎকৃত করে। রামমোহনের লেখায় বাংলা গদ্য সাহিত্যেরও যাত্রা শুরু হয়।

১৮১৬ সালে রামমোহন, **বেদান্তসার**- এর ইংরেজী অনুবাদ Translation of an Abridgement of Vedant নামে গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থ দ্রুত ইউরোপের পন্ডিত সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। ইংরেজী ভাষায় রামমোহনের দক্ষতা দেখে সবাই মুগ্ধ হয়।

রামমোহনের প্রতিটি গ্রন্থই বিভিন্ন বিতর্কের পর প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে স্বীকৃতি লাভ করে। বহু ভাষায় এবং বহু ধর্মশাস্ত্রে সুপন্ডিত রামমোহনের সমকক্ষ সেকালের ভারতে বা ইউরোপে আর কেউ ছিলনা।

পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্মগ্রন্থের প্রাচীণ রূপ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান সম্পন্ন পন্ডিত ব্যক্তি রামমোহনের মত সেকালে আর কেউ ছিল না- একালেও কেউ নেই।

ধর্মশাস্ত্র বিষয়ে আধুনিক যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী রামমোহনের মধ্যেই সর্বপ্রথম দেখা গিয়েছিল। আজও এক্ষেত্রে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তিত্বরূপে বিরাজ করছেন।

কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু হবার পর রামমোহনের চতুর্থ পর্বটি শুরু হয়। এই পর্বে তিনি প্রমাণ করেন যে পৃথিবীর সমস্ত শ্রেষ্ঠ ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে প্রাচ্য- ভূমিতে।

হিন্দু- বৌদ্ধ- জৈন ও শিখ এই চারটি ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে ভারতভূমিতে ইহুদি- ইসলাম এবং খ্রীষ্টান ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে আরবের প্রাচ্যভূমিতে। একমাত্র খ্রীষ্টান ধর্মের বিকাশ হয়েছে ইউরোপে। বাকী সব ধর্মের বিকাশ হয়েছে প্রাচ্যভূমিতে

এতেই প্রমাণ হয় প্রাচ্য সভ্যতা ছিল বিশ্বের সর্বপ্রাচীণ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু মধ্য যুগে বিভিন্ন স্বার্থবাদীরা নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য নানা আচার অনুষ্ঠানের জঞ্জাল সৃষ্টি করে ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারের অন্ধকারে ডুবিয়ে দিয়েছে প্রাচ্য সভ্যতাকে। তাই বলে প্রাচীন সভ্যতার মঙ্গলকর দিকগুলোকে উপেক্ষা করা চলেনা। ভারতীয় বেদান্তশাস্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্য হল বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়কে একই সূত্রে গেঁথে রাখার ঐতিহ্য। বৈষ্ণব ও শৈব সম্প্রদায়ের ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে বেদান্ত দর্শনের প্রধান গ্রন্থ ব্রহ্মসূত্রে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ভাষ্য রচিত হয়েছে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতবর্ষে যে সব সাধক আবির্ভূত হয়েছেন তাঁদের মূল সাধনার দার্শনিক ভিত্তি ছিল বেদান্ত-চিন্তা। একজন ইউরোপীয় গবেষক ও ধর্মযাজক রেভারেন্ড-জে ডেভিস লিখেছেন যে, বিগত তিন হাজার বছর ধরে ভারতে এমন কোন সাধক ছিলেন না, যিনি বেদান্তের শিক্ষা গ্রহণ করেন নি।

আধুনিকযুগের সূত্রপাতে ধর্মপ্রবক্তা রামমোহন ধর্মসংস্কারের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করার জন্যও বেদান্তের সাহায্য নিয়েছেন।

বেদান্ত শাস্ত্রের মূল উপনিষদ ভাগ এবং চিরস্মরণীয় ভগবদগীতা ও ব্রহ্মসূত্র শাস্ত্রগ্রন্থ গুলোর মধ্যে অতি উচ্চ স্থানের অধিকারী। এগুলোকে অবলম্বন করেই আত্মতত্ত্ব চিন্তার সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটেছিল। রামমোহন এই আত্ম চিন্তাতত্ত্বকে বিচার করে হিন্দু জাতিকে পৃথিবীর সবচেয়ে অগ্রসর জাতি রূপে গণ্য করেছেন।

ইউরোপের কয়েকজন দার্শনিককে রামমোহন বলেছেন যে , হিন্দুদের আত্মতত্ত্ব বিদ্যার সমকক্ষ বিদ্যা ইউরোপের কোন দর্শনে তিনি খুঁজে পাননি।

উপনিষদের যুগে বেদান্ত দর্শনের জ্ঞানভান্ডার ছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিদ্যার প্রতিষ্ঠাভূমি। তখনও পৃথিবীর বর্তমান ধর্মগুলোর অধিকাংশের উৎপত্তি হয়নি।

বেদান্তশাস্ত্রের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও মধ্যযুগে শাস্ত্রের যে বিকৃতি ঘটেছে, তা থেকে মুক্ত মনের অধিকারী হবার জন্যই রামমোহন আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন শিক্ষার প্রচলন করতে আগ্রহী ছিলেন। বেদান্ত শিক্ষার জন্য ভারতীয় শিক্ষাকেন্দ্র গুলোকে আর্থিক সাহায্য প্রদানের দাবী জানিয়েছেন, যাতে বেদান্ত শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অনুশীলনের সুযোগ থাকে।

রামমোহন ধর্মচিন্তাকে এবং উপাসনা পদ্ধতিকে সব রকম সাম্প্রদায়িকতার উর্ধে স্থাপণ করতে চেয়েছিলেন। এ পথের প্রথম বাধা অন্ধ বিশ্বাস এবং যুক্তিহীন আচার অনুষ্ঠানকে ধর্মের অঙ্গন থেকে নির্বাসিত করার জন্যই তিনি ধর্মসংস্কার আন্দোলন শুরু করেছিলেন।

*১৮১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত- **আত্মীয় সভার**- মূল আলোচ্য বিষয় ছিল ধর্মান্ধতা* থেকে মুক্তির উপায় স্থির করা এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করা।

প্রতিটি পদক্ষেপে গোঁড়া ব্রাহ্মণ পন্ডিতদের কাছে বাধা পাওয়ার ফলে ধর্ম চর্চার স্বাধীন মঞ্চরূপে **ব্রহ্মসভার** প্রতিষ্ঠা করেন ১৮২৮ সালে। এই সভার অনুগামীরাই ব্রাহ্মসমাজ গঠন করেন। এই মঞ্চটিই হয়ে উঠে নবযুগের প্রবক্তা ও স্রষ্টা।

এই ব্রাহ্মসভায় যে কোন ধর্মের যে কোন শ্রেনীর মানুষকেই অবাধে অংশ গ্রহনের সুযোগ দেওয়া হতো। এই ব্রাহ্মসমাজই বাংলায় এবং ভারতে নবযুগ সৃষ্টির মূল নেতৃত্ব দিয়েছে। কেশবচন্দ্র সেন, দ্বারকানাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এই ব্রাহ্মসমাজেরই প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

হিন্দু- মুসলমান- খ্রীষ্টান এবং অন্যান্য ধর্মমতের মানুষেরা যাতে ধর্মান্ধতা থেকে মুক্ত হয়ে উদার মানবিক ধর্মের অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারে ব্রাহ্মসমাজ সেই লক্ষ্যেই কাজ করে গেছে। এভাবেই ভারতে প্রচলিত বহু ধর্মমতের মানুষের মধ্যে ভারতীয়ত্ব বোধ জাগিয়ে তোলা ব্রাহ্মসমাজের প্রধান লক্ষ্য ছিল।

রামমোহন কোন ধর্মকে আঘাত না করে, সব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই, সব ধর্মমতের মানুষকে মানব কল্যাণের পথে এক অভিযাত্রীদল রূপে ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। হিন্দুরা হিন্দুই থাকবে, মুসলমানরা মুসলমানই থাকবে, খ্রীষ্টানরা খ্রষ্টানই থাকবে, শিখরা শিখই থাকবে, বৌদ্ধরা বৌদ্ধই থাকবে। কিন্তু ভারতীয়ত্ব বোধে সকলেই ঐক্যবদ্ধ থাকবে এটাই ছিল রামমোহনের ধর্মীয় আদর্শ।

এই আদর্শ সাম্প্রদায়িকতার উর্ধে মনুষ্যত্বের অধিকারে ও শক্তিতে বলীয়ান। এই আদর্শ অনুসরণ করলে সাম্প্রায়িকতা, ধর্মান্ধতা এবং জাতিভেদ ও সংকীর্ণতা ভারতীয় সমাজ থেকে মুছে যাবে এটাই ছিল রামমোহনের সুদৃঢ় বিশ্বাস।

ভারতবর্ষকে একটা উপ-মহাদেশ বলা হয়। এটাকে একটা ক্ষুদ্র বিশ্বও বলা যায়। এখানে বিশ্বের প্রায় সব ধর্ম ও ভাষার মানুষেরা বাস করে। বহু ধরনের সামাজিক রীতিনীতি, আচার অনুষ্ঠান এখানে প্রচলিত রয়েছে।

আধুনিক মহাজাতিরূপে ভারতকে গড়ে তুলতে হলে সব ধর্ম, সব ভাষা ও সব রকম সামাজিক রীতিনীতিকে অক্ষুন্ন রেখেই ঐক্যের পথ গড়ে তুলতে হবে। যেখানে যুক্তিহীন আচার ও কুসংস্কার রয়েছে তা দূর করার জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস চালাতে হবে। আধুনিক জাতিগঠনের এই উদার চিন্তাই রামমোহনকে আধুনিক যুগের জনক রূপে চিহ্নিত ও প্রতিষ্ঠিত করেছে।

রামমোহনের ভারত চেতনা ক্রমশ: বিশ্বচেতনায় রূপান্তরিত হয়েছে। ফ্রান্সের বিদেশ মন্ত্রীকে লেখা একটি চিঠিতে রামমোহন বলেছেন যে,- আধুনিক জীবনচর্চা এবং বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত থেকে একথা বলা যায় যে, পৃথিবীর সব ধর্মের, সব ভাষার, সব জাতির মানুষেরা আসলে একই পরিবারভুক্ত। নানা জাতি ও উপজাতি হল একটি বৃহৎ মানব পরিবারেরই অংশ। কাজেই বর্তমান যুগের মানুষকে পারস্পরিক সম্প্রীতি প্রসারের মাধ্যমে একই মানব কল্যাণের লক্ষ্যে কাজ করতে হবে।

রামমোহনের মত – হল, কেবল মাত্র শাস্ত্রের উপর নির্ভর করে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ উচিত নয়। যুক্তিহীন বিচারের ফলে ধর্মেরও বিকৃতি ঘটে।

পৃথিবীর সব ধর্মেই একজন সর্বশক্তিমান স্রষ্টা বা বিধাতার কল্পনা করা হয়েছে। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসই সব ধর্মের মূল ভিত্তি। এক্ষেত্রে মানব সমাজের চিন্তাধারায় ঐক্য লক্ষ্য করা যায়।

দ্বিতীয়ত: সব ধর্মই পরলোকে বিশ্বাস করে। পরলোক সম্পর্কে মানুষ কল্পনা করে- মৃত্যুর পরে সেখানে মানুষের বিচার হয়। পৃথিবীতে ভাল কাজের জন্য পুরস্কার এবং খারাপ কাজের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। এই রহস্যজনক পরলোকের ভয়ে মানুষ পাপ কাজ থেকে বিরত থাকে। ভাল কাজের মাধ্যমে পুণ্য সঞ্চয়ের চেষ্টা করে। বিশেষ কোন দেবতা বা মহাপুরুষের উপাসনা মানুষ নিজের পরিবেশ থেকে শিখে অভ্যস্ত হয়। এজন্য সম্প্রদায় ভেদে আচার অনুষ্ঠানে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। এক ধর্মের আচার বিধি অন্য ধর্মে নিষিদ্ধ হয়।

এক ধর্মের মত সত্য অপর সব ধর্ম মিথ্যা এরূপ ধারণাও লক্ষ্য করা যায় । এখানেই বিভেদের মূল লুকিয়ে আছে।

ধর্মমত সম্পর্কে এরূপ দৃষ্টিভঙ্গী চরম সংকীর্ণতার পরিচয় বলে রামমোহন মনে করতেন। নিজ মতের সমর্থনে শাস্ত্রীয় বিধির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে প্রচার করতেন। এই লক্ষ্যেই সর্বধর্মের গভীরে গিয়ে সত্য আবিষ্কার করতেন ।

রামমোহনের সময় এদেশে প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে । ফলে রামমোহন সংবাদপত্র ও গ্রন্থ প্রকাশ করে সারাদেশের সর্বত্র নিজের মত প্রচার করতে পেরেছেন। একাজে শ্রীরামপুরের মিশনারীরা নানাভাবে সাহায্য করতেন।

রামমোহন অবতার বাদে বিশ্বাস করতেন না। তাই কোন মানুষকে দেবতা রূপে পূজা করার বিরুদ্ধে তিনি নিজের বক্তব্য প্রচার করেছেন। এজন্য মাঝে মাঝে বিপদেও পড়েছেন ।

মধ্যযুগের ভারতে অবতারবাদ এবং গুরুবাদ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। এর ফলে সামাজিক জীবনে অনেক সংকীর্ণতা প্রবেশ করেছে। ব্যক্তির স্বার্থে ধর্মের নামে নানা আচার অনুষ্ঠান প্রচলিত হয়েছে। ধর্মের নামে সৃষ্টি হয়েছে নানা সাম্প্রদায়িক বিভেদ।

রামমোহনের মতে অলৌকিক ও অতি প্রাকৃত বিশ্বাস এবং যুক্তিহীন সংস্কার সর্বদা বর্জনীয়। ধর্মগুরুদের অলৌকিক শক্তির কথা প্রচার করে সংকীর্ণতা ও যুক্তিহীন বিশ্বাস ও আচার আমদানী করা হয়।

হিন্দুশাস্ত্রের সব বিধি অন্ধ ভাবে মেনে চলা উচিত নয়। সব কিছুর মধ্যেই যুক্তি প্রয়োগ করতে হবে। বিচার বিশ্লেষণ করে সত্যকে আবিষ্কার করতে হবে।

মুসলমানধর্মে বিধর্মীদের হত্যা করার নির্দেশ রয়েছে। বাস্তবে এই বিধি ধর্মের নামে প্রয়োগ করা ধর্ম বিরোধী কাজ। এই দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যই ধর্মের সঙ্গে ধর্মের স্থায়ী শত্রুতা সৃষ্টি হয়। রামমোহন বলেন, - স্বাধীন বিচার বুদ্ধি ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ দান। অন্ধভাবে কোন বিধি বিধান গ্রহণ না করে বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করে সর্ব মানবের পক্ষে কল্যাণকর সিদ্ধান্ত নিতে হবে, - এটাই ঈশ্বরের নির্দেশ।

রামমোহনেব যুক্তি এবং শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা অত্যন্ত পরিকল্পিত এবং সুসংযত। গভীর অনুশীলন এবং অভিজ্ঞতার ফলেই তা সম্ভব হয়েছে।

ইসলাম ধর্মের মূল শাস্ত্র গ্রন্থ হিব্রু ভাষায় পাঠ করার পর যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে রক্ষণশীল শরিয়ত বিশ্বাসীদের গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে বক্তব্য হাজির করেছেন। ভারতে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে স্থায়ী সম্প্রীতি গড়ে তোলার জন্য মুসলমানদের গোঁড়ামী মুক্ত হতে হবে। এই উপলব্ধি থেকেই তিনি কঠোর পরিশ্রম করে প্রাচীণ কোরান ও শরিয়ৎ শাস্ত্রগুলো অধ্যয়ন করেছিলেন এবং সঠিক ব্যাখ্যা প্রকাশ করেছিলেন।

ভারতে আটশ বছর ধরে মুসলমান শাসনে সব হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করা যায় নি। আরো হাজার বছর মুসলিম শাসন থাকলেও সব হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করা যাবে না। এই যুক্তি মেনে নিলে হিন্দুদেরকে বিধর্মী বলে গণ্য করা অযৌক্তিক এবং

অন্যায় । এটা গোঁড়াপন্থী মুসলমানদের বোঝা দরকার।

খ্রীষ্টান মিশনারীদের ধর্মান্তরকরণ প্রচেষ্টাকেও তিনি সমর্থন করেননি। এবিষয়ে বহু পাদ্রীর সঙ্গে তিনি বিতর্ক করেছেন এবং বিভিন্ন গ্রন্থে নিজের মত প্রচার করেছেন।

সব ধর্মই ঈশ্বরকে কল্যাণময় বলে স্বীকার করে। তাহলে সব ধর্মের শাস্ত্র যদি ঈশ্বরের বাণী হয়, তবে ঈশ্বরের পরামর্শ ও নির্দেশ ভিন্ন ভিন্ন হতে পারেনা। সর্বত্র ঈশ্বরের মূল বাণী হবে এক এবং অভিন্ন। ভাষা ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু নীতি হবে এক এবং অভিন্ন। উপদেশে ও নির্দেশে বৈচিত্র্য থাকতে পারে, কিন্তু উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য হবে এক এবং অভিন্ন। পৃথিবীর কোন ধর্মেরই আদিরূপ এবং বর্তমান রূপ এক রকম থাকেনা। নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ধর্মেরও রূপ বদলায়।

রামমোহনের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মধর্মেরও আদিরূপ এবং বর্তমান রূপ এক নয়। দৃষ্টিভঙ্গীরও পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। ফলে ব্রাহ্মসমাজও বিভক্ত হয়েছে।

হিন্দু সমাজের আদিরূপও এখন আর খুঁজে পাওয়া যায়না। নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েছে হিন্দু সমাজ। তবে মূল ঐক্য ধরে রেখেছে বেদ- বেদান্তের মূল দৃষ্টিভঙ্গী।

মুসলমান সমাজও প্রধানতঃ তিনটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। শিয়া এবং সুন্নী সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা বিষয়ে পার্থক্যও সৃষ্টি হয়েছে

বৌদ্ধধর্মও নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের পৃথক পৃথক দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি হয়েছে।

জৈন এবং শিখ ধর্মেও ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য করা যায়। আদিপর্বের শিখধর্ম এবং বর্তমানের শিখধর্মের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে।

খ্রীষ্টান ধর্মের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়েছে। ক্যাথালিক, প্রটেস্টান্ট ও অরথোডক্স এই তিনটি প্রধান সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গীও আলাদা।

এভাবেই দেখা যায় কোন ধর্মই মূল আদর্শে স্থির নেই। যুগে যুগে বিবর্তনের ফলে মূল নীতি, আদর্শ এবং দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিবর্তন ঘটেছে।

ধর্মীয় বিবর্তনের এই বিচিত্র ধারাকে রামমোহন একটি মহামিলনের পথে

যুথবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। লন্ডনে অবস্থান কালে এই বিশ্বচেতনা রামমোহনকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছিল।

এটাও ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যেরই প্রতিফলন। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এবং বৈষম্যের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। রামমোহনের মধ্যে তা নবরূপে প্রকাশিত হয়েছিল। ভারতে বেদ ও উপনিষদের যুগ অতিক্রম করার পর দুটি নতুন ধারার আবির্ভাব ঘটে। একটি হল পুরান, অপরটি হল তন্ত্র।

এদুটি বিষয় বেদ ও উপনিষদের সঙ্গে তুলনীয় নয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছিল পুরাণ ও তন্ত্র শাস্ত্র।

পৌরাণিক যুগের বিশাল সাহিত্য সাধারণ মানুষের বিচিত্র জীবন ধারাকে ধরে রেখেছে। তান্ত্রিক সাহিত্যের ধারাও লোক সমাজে কম জনপ্রিয় নয়। পুরাণ হল বৈদিক ধারার সম্প্রসারণ আর তন্ত্র হল অনার্য ধারার সম্প্রসারণ।

পুরাণ এবং তন্ত্রের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হল- পুরাণ সম্পূর্ণরূপে বৈদিক ঐতিহ্য অনুসরণ করেছে। কিন্তু তান্ত্রিক ভাবধারা ও সাহিত্য প্রকাশ্যে বেদ বিরোধী না হলেও বৈদিক ঐতিহ্য বিরোধী সাধন মার্গ এবং পূজা পদ্ধতি অনুসরণ করেছে ।

তন্ত্রসাহিত্যের মূল ভাববস্তুকে বিচার বিশ্লেষণ করে বেদান্ত মতের সঙ্গে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা রামমোহনই প্রথম করেছেন।

রামমোহনের সময় পূর্ব ভারতে বেদ বেদান্তের চর্চা প্রায় ছিলই না। হিন্দু ধর্মের লোকাচার তৈরী হয়েছিল তন্ত্রশাস্ত্র অনুসারে।

পৌরাণিক সাহিত্য হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে। একদিকে বৈদিকযুগ অন্যদিকে মধ্যযুগ। এই বিশাল সময়ের বিচিত্র সৃষ্টির মধ্যে হিন্দু সংস্কৃতির বিপুল ঐতিহ্য সঞ্চিত রয়েছে। পুরাণের মধ্যে মিশ্রিত হয়েছে লোকাচার।

রামমোহন পৌরাণিক এবং তান্ত্রিক সাহিত্যের বিপুল সম্ভারকে নিরপেক্ষ বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে বেদান্ত সাহিত্যের সঙ্গে সমন্বয় সাধনের সূত্র নির্দেশ করেছেন।

এভাবেই রামমোহন হিন্দু ধর্মের ঐতিহ্য রক্ষা করেই সব ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। এটাই রামমোহনের ধর্মচিন্তার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

রামমোহনের শিক্ষাচিন্তা

রামমোহনের শিক্ষাচিন্তাকে বুঝতে হলে প্রথমেই সেকালের শিক্ষানীতি এবং শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে একটা ধারণা থাকা প্রয়োজন।

প্রাচীণ ও মধ্যযুগের ভারতে শিক্ষানীতি বলে কিছু ছিলনা। শিক্ষার অধিকারও সব মানুষের জন্য ছিলনা। পৃথিবীর সব দেশের ইতিহাসে দেখা যায় সাধারণ মানুষকে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। নারী শিক্ষার অবাধ সুযোগ কোন দেশেই ছিলনা।

প্রাচীণ ভারতে বৌদ্ধযুগে সুসংহত শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু মুসলমান আগমনের ফলে বৌদ্ধযুগের শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যায়।

হিন্দু এবং মুসলমান জনগণের প্রয়োজন অনুযায়ী একধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা ভারতীয় সমাজ থেকেই বিকাশ লাভ করেছিল। শিক্ষা বিস্তার ও উন্নয়নের জন্য সরকারী কোন নীতি বা দায়িত্ব ছিলনা।

রামমোহনের সময় ভারতে দু'ধরণের গ্রামীণ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। গ্রামের ব্রাহ্মণ পন্ডিত নিজ বাড়ীতে টোল বা পাঠশালা খুলে ব্যক্তিগত উদ্যোগে শিক্ষার আয়োজন করতেন। ছাত্র ভর্তির নির্দিষ্ট কোন নিয়ম ছিলনা। বছরের যে কোন সময় ছাত্র ভর্তি করা হত। আবার বছরের যে কোন সময় ছাত্ররা শিক্ষালয় ত্যাগ করে চলে যেতে পারত। শিক্ষার মূল্যায়নেরও কোন ব্যবস্থা ছিলনা।

সেকালের শিক্ষার মূল লক্ষ্য ছিল একটু পড়তে পারা, একটু লিখতে শেখা এবং একটু হিসেব করতে শেখা। এর জন্য নির্দিষ্ট কোন পাঠ্যক্রমও ছিলনা। পন্ডিত মশাই নিজের ইচ্ছে মত পড়ার বিষয় বস্তু ঠিক করে দিতেন। তিনি সন্তোষ্ট হলেই ছাত্রের শিক্ষা শেষ হতো ।

ইংলন্ডেও একসময় এরকম গ্রামীণ শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এটাকে বলা হতো- থ্রি আর শিক্ষা- অর্থাৎ রিডিং, রাইটিং এবং রেকনিং, পড়া- লেখা এবং হিসেব করার শিক্ষা। এব্যবস্থায় নারী শিক্ষার কোন সুযোগ ছিলনা। সবদেশেই নারী শিক্ষা প্রধানতঃ

পারিবারিক গন্ডীতেই সীমাবদ্ধ ছিল। ঘরের বাইরে মেয়েদের শিক্ষার জন্য পাঠানো সামাজিক অপরাধ বলে গণ্য হতো। সেযুগে সমাজচ্যুত হবার শাস্তি ছিল একটা ভয়ানক শাস্তি।

মুসলমানদের জন্য ছিল মাদ্রাসা শিক্ষা। সেখানে আরবী ও ফার্সী ভাষায় শাস্ত্রীয় শিক্ষা দেওয়া হত। গ্রামীণ শিক্ষালয়কে বলা হত মক্তব। উচ্চ শিক্ষালয়কে বলা হত মাদ্রাসা।

হিন্দুদের গ্রামীণ শিক্ষালয়কে বলা হত পাঠশালা। উচ্চ শিক্ষাকেন্দ্রকে বলা হত টোল বা চতুষ্পাঠি। নারী এবং নিম্নবর্ণের মানুষদের এসব শিক্ষালয়ে প্রবেশের অধিকার ছিলনা। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে শুধু ব্রাহ্মণ সন্তানদের ভর্তি করা হতো।

টোল বা চতুষ্পাঠিতে সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়া হতো ১২ বছর। তারপর কাব্য, শাস্ত্র ও দর্শন শিক্ষার সুযোগ পাওয়া যেত।

শিক্ষাপদ্ধতি ছিল বৈচিত্র্যহীন। শাস্তি দেবার ব্যবস্থা ছিল অমানুষিক। গ্রামের কোন মন্দিরের আটচালা মন্ডপে অথবা বড় কোন গাছতলায় পন্ডিত মশাই ক্লাস নিতেন।

সেকালে মুদ্রা যন্ত্র ছিলনা। তাই ছাপা বইও ছিলনা। শ্লেট, পেন্সিল, তালপাতা ছিল শিক্ষার প্রধান উপকরণ। অযোগ্য শিক্ষক, নিম্ন মানের পাঠ্যক্রম, কঠোর শাসন এবং বর্বর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল এই সব শিক্ষালয়ের সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

পন্ডিত মশাইদের নির্দিষ্ট কোন বেতন ছিলনা। গ্রামীণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সাহায্যই ছিল একমাত্র ভরসা।

কোন কোন এলাকায় জমিদার শ্রেণীর লোকেরা নিজবাড়ীতে পাঠশালা বা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে সামান্য বেতনে শিক্ষক নিয়োগ করতেন। দেশীয় উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র ছিল খুবই সীমিত। সংস্কৃত ভাষায় হিন্দুদের জন্য কাশী, নবদ্বীপ, মিথিলা ও বিক্রমপুর। আর আরবী ও ফার্সী ভাষায় মুসলমান শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল পাটনা, দিল্লী, আগ্রা এবং মুর্শিদাবাদ।

ফার্সী ভাষা সরকারী ভাষা হওয়ায় হিন্দুরাও আরবী ও ফার্সী ভাষায় শিক্ষার সুযোগ পেত। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন কালেও বেশ কিছুকাল ফার্সী ভাষাই ছিল সরকারী ভাষা। রামমোহন গ্রামের পাঠশালার পাঠ শেষ করে পাটনা থেকে আরবী-ফার্সী এবং কাশী থেকে সংস্কৃত ভাষায় পন্ডিত হয়েছিলেন। কর্ম জীবনে প্রবেশ করে

ইংরেজ বন্ধুদের সাহায্যে ইংরেজী ভাষায় পান্ডিত্য অর্জন করেন। পরে কোরান ও বাইবেলের প্রাচীণ গ্রন্থ পাঠ করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে হিব্রু ও গ্রীক ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন।

রামমোহন সারা ভারতের পূর্ব- পশ্চিম- উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চল ভ্রমণ করে ভারতের শিক্ষা- সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করেছিলেন। এই সময় কলকাতায় ও মাদ্রাজে ইউরোপীয় রাজকর্মচারী ও ব্যবসায়ীদের পুত্র কন্যাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত উন্নতমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও রামমোহনের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটেছিল। ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার তুলনামূলক বিচার করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল।

রামমোহন পরিস্থিতির গভীর পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ করে স্থির সিদ্ধান্তে পৌছেছিলেন যে, ভারতের সামগ্রিক উন্নতির জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন।

তবে প্রাচ্য শিক্ষার প্রাচীণ ঐতিহ্য সম্পর্কে রামমোহনের গভীর জ্ঞান ছিল এবং প্রাচীণ বেদ- বেদান্তের জ্ঞান ভান্ডারের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধও ছিল। তাই ভারতীয় পাঠ্যক্রম নির্মানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় সভ্যতার প্রতি সমান গুরুত্ব দেবার কথা তিনি বলেছেন।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতে ইংরাজী শিক্ষা প্রসারে রাজী ছিলনা, দুটি কারনে — **প্রথমতঃ** ভারতীয় জনগণ অসন্তোষ্ট হলে শাসন সংকট সৃষ্টি হবার ভয়। **দ্বিতীয়তঃ** ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ সৃষ্টি হলে গণবিদ্রোহের সম্ভাবনা।

উন্নত শিক্ষার কারণেই আমেরিকার জনগণ স্বাধীনতার দাবীতে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে। ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন কাল শুরু হবার সময়েই আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ হয়েছিল। সৃষ্টি হয়েছিল পৃথিবীর প্রথম সাধারণতন্ত্র। রামমোহন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার দুর্বলতার ফলেই ভারতীয় সমাজ অজ্ঞানতার অন্ধকাবে নিমজ্জিত হয়েছে।

এদেশকে উন্নত করে তুলতে হলে আধুনিক বিজ্ঞান, গণিত, যন্ত্রবিদ্যা, ইতিহাস, ভূগোল ও আধুনিক দর্শনের শিক্ষা জরুরী প্রয়োজন। এই শিক্ষাই চেতনার দরজা খুলে দেবে। অন্ধ অবেগ দূর করবে, যুক্তি ও বিচারের দ্বারা জীবনকে নতুনভাবে গড়ে তোলার উদ্যম সৃষ্টি হবে।

অনেকের ধারণা রামমোহন শুধু ইংরেজী ভাষা শিক্ষার কথা বলেছেন। আসলে তিনি পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস ও যন্ত্রবিদ্যায় শিক্ষা বিস্তারের উপরই জোর দিয়েছেন। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপীয় পন্ডিত সমাজের সমকক্ষ একটি আধুনিক শিক্ষিত ভারতীয় গোষ্ঠী সৃষ্টি করা, যারা ভারতে প্রকৃত নবযুগের বাহক হয়ে উঠবে এবং আধুনিক ভারত গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

পরবর্তী কালে কার্লমার্কস রামমোহনের এই দৃষ্টিভঙ্গীকে সমর্থন করে ভারতে বৃটিশ শাসনকে শাপে বর বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন।

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত নবীন শিক্ষিত ভারতীয়রাই রামমোহনের স্বপ্নকে সফল করেছিলেন। ইউরোপীয় পন্ডিতদের সমকক্ষ পান্ডিত্য ও দক্ষতার পরিচয় দিয়ে হা [illegible] ার ভারতীয় ইউরোপ এবং আমেরিকা সহ পৃথিবীর সর্বত্র নিজেদের প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। স্বাধীনতার পরে এই ধারা আরো গতিশীল হয়েছে। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাবই এদেশে জাতীয়তাবোধের জন্ম দিয়েছে। এরাই ছিল নবযুগের প্রকৃত পুরোহিত।

রামমোহন ১৮১৫ সাল থেকে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। ১৮৩০ সালে জাতীয় কর্তব্য পালনের জন্যই ইংলেন্ডে গমন করেন। সেখান থেকে আর দেশে ফিরতে পারেন নি। মানসিক ক্লান্তি এবং অর্থের অভাবই এই বিশাল প্রতিভার অকাল মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। মাত্র পনের বছর কলকাতায় বসবাস কালে রামমোহনকে গোঁড়াপন্থী - হিন্দু- মুসলিম ও খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই করতে হয়েছিল। এ লড়াই ছিল প্রধানতঃ শিক্ষানীতি— সমাজ সংস্কার এবং অন্ধ গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে।

১৮০০ সালে ইংরেজ রাজকর্মচারীদের মধ্যে দেশীয় ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে শিক্ষা দেবার জন্য **ফোর্ট উইলিয়াম কলেজটি** প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কলকাতার বিশিষ্ট হিন্দু পন্ডিতগণকে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিল। উদ্যোক্তাদের লক্ষ্য ছিল এই প্রতিষ্ঠানটিকে ইংলেন্ডের অকসফোর্ডের আদলে একটি উন্নত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিনত করা। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষা নিয়ে ভারতীয় পন্ডিত সমাজে তুমুল বিতর্ক এবং বিরোধ সৃষ্টি হওয়ায় কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ কলেজটির গুরুত্ব ধীরে ধীরে কমিয়ে দেন। ইংরেজ কর্মচারীদের শিক্ষার জন্য লন্ডনে একটি কলেজ স্থাপণ করা হয়।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ভূমিকা এখন ইতিহাস হয়ে আছে। রামমোহন শুরু থেকেই এই কলেজে যাতায়াত করতেন। বন্ধুদের

মধ্যে এই কলেজের উন্নতির জন্য সচেষ্ট হতে প্রতিনিয়ত উৎসাহ এবং পরামর্শ দিতেন। এখানেই বহু ইংরেজ রাজকর্মচারীর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপণ করেন। এখানেই রামমোহনের সঙ্গে জন ডিগবির পরিচয় এবং ক্রমে তা ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিনত হয়।

এই সময় শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশনারীরা খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে দেশীয় ভাষার চর্চা এবং প্রচারের উদ্দেশ্যে দেশীয় ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেন, ব্যাকরণ রচনা করেন, ছাপা খানা প্রতিষ্ঠা করেন এবং সংবাদ পত্র প্রকাশ করতে থাকেন। রামমোহন খুব খুশী হয়ে পাদ্রী উইলিয়াম কেরী এবং মার্শম্যানকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে যান।

পাদ্রীরা ভাবলেন, রামমোহনকে বোধ হয় খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা দেওয়া যাবে। কিন্তু রামমোহন নিজ ধর্ম ত্যাগ করে ধর্মান্তরিত হতে রাজী হলেন না। বাইবেলের অলৌকিকতা নিয়ে তিনি বিতর্কে জড়িয়ে পড়লেন। পাদ্রীরা হিন্দুধর্মকে খাটো করার চেষ্টা করায় রামমোহনের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি হয়। রামমোহন কোন ধর্মকে খাটো করে দেখার পক্ষপাতী ছিলেন না। সব ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা রেখে সবধর্মের কল্যাণমূলক দিকটি প্রচারের আলোয় নিয়ে আসাই ছিল রামমোহনের লক্ষ্য।

সে যুগে ধর্মকে বাদ দিয়ে কোন শিক্ষার কথা কল্পনা করা যেত না। ধর্মপ্রাণ মানুষকে আঘাত না দিয়েও তাদের বিবেক বুদ্ধিকে জাগিয়ে দেওয়া যায়, রামমোহন এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছিলেন। সারা দেশে পর্যটনের সময় জনসংযোগের মাধ্যমেই এই অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন।

একই সময়ে কিছু কিছু ইংরেজ শিক্ষাবিদ ব্যক্তিগত উদ্যোগে ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে এগিয়ে আসেন। তাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করতে থাকেন রামমোহন। কারণ এসব ব্যক্তিগত স্কুলে ভারতীয়দের ভর্তি করা হতো। রামমোহনের মূল লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল, ভারতীয়দের মধ্যে প্রাশ্চাত্য বিদ্যার প্রসার ঘটানো।

১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর এক বছর পর ১৮১৮ সালে শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। রামমোহন এসব শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় উৎসাহ যোগাতে থাকেন।

ডেভিড হেয়ারের চেষ্টাতেই হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ঘড়ির ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন। নিজের সব অর্থই ভারতীয় ছাত্রদের কল্যাণের জন্য দান করেন।

রামমোহনের সঙ্গে ডেভিড হেয়ারের খুব বন্ধুত্ব ছিল। ডেভিড হেয়ার পটল ডাঙ্গায় একটি ইংরেজী স্কুল স্থাপণ করেন। ছাত্রদের উৎসাহ দেবার জন্য নানা ধরনের পুরস্কার দিতেন। হিন্দু কলেজের মেধাবী ছাত্রদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে তাদের পড়াশোনায় সাহায্য করতেন। অসুখ বিসুখ হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতেন। এরকম এক ছাত্রের সেবা করতে গিয়ে কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে এই মহান ব্যক্তি অকালে মৃত্যু বরণ করেন। তিনি স্কটল্যান্ডের অধিবাসী হলেও ভারতকেই নিজের স্বদেশ বলে ভাবতেন। রামমোহন ডেভিড হেয়ারের প্রতিটি কাজেই সহযোগীতা করেছেন। ডেভিড হেয়ার স্কুল কলকাতায় একটি বিখ্যাত শিক্ষায়তন রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ্রীষ্টান মিশনারীরা ছাপা খানা প্রতিষ্ঠা করাব আগে এদেশে বিদ্যা চর্চা করা হতো হাতে লেখা তালপাতার পুঁথির সাহায্যে। পুঁথি লেখার জন্য একদল কর্মীও তখন সৃষ্টি হয়েছিল।

ছাপাখানার দৌলতে হাজার হাজার বই ছাপিয়ে গ্রামে গঞ্জে শিক্ষাপ্রসারের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হল। শহরের লোকদের জন্য প্রকাশিত হতে লাগল নানা ধরনের সংবাদ পত্র। দেশীয় লোকেরা মুদ্রণযন্ত্র নির্মান এবং ছাপাখানার কাজে নিযুক্ত হয়ে এক নতুন শ্রেণীর মানুষ রূপে আবির্ভূত হল। এরাই হল আধুনিক যুগের শিল্পী ও কারিগর। পত্রিকায় ছবি ছাপার নানা কৌশলও এই সময় আবিষ্কৃত হল।

রামমোহন চারটি ভাষায় পত্রিকা প্রকাশ করে আধুনিক শিক্ষার উপযোগীতা সম্পর্কে পাঠকদের সচেতন করে তুললেন। প্রাচীণ শাস্ত্র বিশ্লেষণ করে নারী শিক্ষার পক্ষে জনমত গঠন করলেন।

সংবাদপত্র এবং মুদ্রিত পুস্তকই এদেশে জনশিক্ষার বিস্তার এবং সমাজ সংস্কারের কাজে প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল। এই হাতিয়ারকে ব্যাপক ভাবে ব্যবহার করে রামমোহন রায়ই প্রথম শিক্ষিত সমাজকে যুক্তিবাদী করে তুলেছিলেন। এদেশে আধুনিক সমাজ সৃষ্টির ক্ষেত্রে এটাই ছিল রামমোহনের সবচেয়ে বড় অবদান।

মিশনারীদের চেষ্টায় বিভিন্ন অঞ্চলে শতাধিক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম প্রচার এবং খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা দিয়ে ধর্মান্তরকরণ।

রামমোহনের সঙ্গে মিশনারীদের দৃষ্টিভঙ্গীর মিল না থাকলেও তিনি চেয়েছেন ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে জ্ঞান লাভের সুযোগ যে কোন উপায়ে বৃদ্ধিলাভ করুক। এজন্যই তিনি মিশনারীদের উদ্যোগে সহযোগিতা ও সমর্থন দিয়ে সর্বতোভাবে সাহায্য

করেছেন। রামমোহনের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে ভারতীয়দের মধ্যে যুক্তিবাদী চিন্তাধারার দ্রুত বিকাশ ঘটবে। বাস্তবেও তাই ঘটেছে।

মিশনারীদের ব্যাপক প্রচারের ফলে প্রথম যুগে বহু শিক্ষিত মানুষ খ্রীষ্ট ধর্মের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে ধর্মান্তরিত হয়েছে। বহুলোক সরকারী চাকুরী পাবার লোভেও ধর্মান্তরিত হয়েছে।

কিন্তু এরূপ আবেগ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। যুক্তিবাদের প্রভাব বেড়েছে, কিন্তু ধর্মীয় সংস্কার কমেনি। ভারতে স্বাধীনতার উনষাট বছর অতিক্রম করার পরও শিক্ষিত মানুষের মধ্যে ধর্মীয় প্রভাব বেড়ে চলেছে। বহু কুসংস্কারও প্রচলিত রয়েছে।

কার্ল মার্কস বলেছেন- ধর্ম হল আফিং এর মত। একবার এই নেশায় অভ্যস্ত হয়ে যাবার পর খুব সহজে এর থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। সমাজ ব্যবস্থার রূপান্তরের পরও বহুকাল ধর্মীয় সংস্কার মানব সমাজকে প্রভাবিত করবে। তবে যুক্তিবাদী চিন্তার প্রসারের ফলে ধর্মীয় গোঁড়ামী কমতে থাকবে এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসার ঘটবে। সমাজের প্রগতিশীল রূপান্তরই কুসংস্কার দূর করতে পারে।

রামমোহনকে গোঁড়া পন্ডিতরা হিন্দু বলে স্বীকার করতনা। তাই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করে রামমোহন নিজের মত প্রকাশ করেছেন। তিনি কখনোই ধর্ম বিরোধী ছিলেন না। শুধু গোঁড়ামী থেকে মুক্ত থাকতে চেয়েছেন। আর চেয়েছেন একটি শক্তিশালী যুক্তিবাদী গোষ্ঠী গঠন করতে।

হিন্দু কলেজকে কেন্দ্র করে এরূপ এক টি যুক্তিবাদী গোষ্ঠী জন্ম নিয়েছিল কলেজের তরুন অধ্যাপক লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর নেতৃত্বে। মাত্র ১৭ বছর বয়সে ডিরোজিও হিন্দু কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অসাধারণ মেধাবী এবং সুবক্তা ডিরোজিও ছাত্রদের মধ্যে সেক্সপীয়ার, স্কট, বায়রণ, বেকন, হিউম, পেইন, বেনহাম, প্রভৃতি প্রগতিশীল চিন্তাবিদদের গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলীর পরিচয় করিয়ে দেন এবং ফরাসী বিপ্লবের আদর্শে মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণের আহ্বান রাখেন। এভাবে তৈরী হয় একটি শক্তিশালী যুক্তিবাদী গোষ্ঠী।

ডিরোজিও এবং তাঁর উৎসাহী ছাত্ররা রামমোহনের - **আত্মীয় সভায়** - নিয়মিত যোগ দিতেন। এই নবীন যুক্তিবাদী গোষ্ঠী একটি মাত্র বিষয়ে রামমোহনের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। সেটি হল ধর্মমত । তরুন ছাত্ররা কোন ধর্মকেই স্বীকার *করতে রাজী ছিলনা। সব ধর্মের বিরোধীতা করাই তাদের লক্ষ্য হয়ে উঠে। ফলে*

রামমোহনের সঙ্গে তাদের মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। কিন্তু রামমোহন অন্যান্য বিষয়ে ছাত্রদের সঙ্গে সহযোগীতা চালিয়ে যান।

এই যুবকদের ব্যাপক চঞ্চলতা নানা সমস্যার সৃষ্টি করে। ভারতের সব কিছু খারাপ এরূপ দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা প্রভাবিত হবার ফলে বিভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে এদের সংঘাত সৃষ্টি হয়। ডিরোজিও এবং রামমোহনের অকাল মৃত্যুর ফলে একসময় এই গোষ্ঠীর যুবকেরা উচ্ছৃংখল বলে নিন্দিত হয়।

কিন্তু পরবর্তী সময়ে ইয়ংবেঙ্গল নামে পরিচিত এই গোষ্ঠীর মধ্য থেকেই যুক্তিবাদী আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতাদের আবির্ভাব ঘটে এবং রামমোহনের স্বপ্ন সফল হয়।

১৮৩১ সালে মাত্র তেইশ বছর বয়সে অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ডিরোজিওর অকাল মৃত্যু ঘটে। এর ফলে যুক্তিবাদী আন্দোলন দারুন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১৮২৬ থেকে ১৮৩১ সালের মাত্র পাঁচ বছরের অধ্যাপক জীবনে ডিরোজিও ভারতীয় ছাত্রদের চিন্তার জগতে এক বিপ্লব সৃষ্টি করে গেছেন। তিনি সর্বদা বলতেন, সর্বপ্রকার সংস্কার মুক্ত, যুক্তিবাদী ও নৈতিক মূল্যবোধ রক্ষা করে চলতে হবে। কোন কিছুই যুক্তি ও বুদ্ধির সাহায্যে বিচার- বিশ্লেষণ না করে গ্রহণ করবেনা। সব রকম শঠতা, অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে নির্ভীক ভাবে প্রতিবাদ ও লড়াই করতে হবে। সেকালের কলকাতায় বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত সাতটি যুক্তিবাদী কেন্দ্রে ডিরোজিও নিয়মিত বক্তৃতা দিতেন। নতুন কথা শোনার জন্য ছাত্ররা ভীড় করতো এসব আলোচনা সভায়।

ডিরোজিও রামমোহনকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। রামমোহনও তাঁকে খুব ভালবাসতেন। উভয়েরই লক্ষ্য ছিল এক এবং অভিন্ন। অর্থাৎ যুক্তিবাদী গোষ্ঠী গঠন করা এবং সংস্কার মুক্ত বিবেক বুদ্ধি জাগ্রত করা।

ডিরোজিওর ছাত্রদের মধ্যে প্যারীচাঁদ মিত্র, রামতনু লাহিড়ী, রাধানাথ শিকদার, রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, হরচন্দ্র ঘোষ প্রমুখরা বাংলা সাহিত্যের সে যুগকে চমৎকার ভাবে তুলে ধরেছেন। পরবর্তী কালে হিন্দু কলেজের ছাত্র মধুসূদন দত্ত, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, ভোলানাথ চন্দ্র প্রমুখরাও ডিরোজিওর আদর্শে বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণীত হয়েছিলেন।

ডিরোজিও নিজেকে কখনো নাস্তিক বলে পরিচয় দেননি। তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সংশয়বাদী দার্শনিকদের যুক্তিগুলো বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যা করতেন, যাতে ছাত্রদের মধ্যে যুক্তিবাদী চিন্তাধারার বিকাশ ঘটে এবং অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত থাকতে পারে।

এবিষয়ে রামমোহনের সঙ্গে ডিরোজিওর দৃষ্টিভঙ্গীর কোন বিরোধ ছিলনা। রামমোহন ও চেয়েছেন শিক্ষার বিষয়বস্তু এমন হওয়া উচিত যাতে ছাত্ররা স্বাধীনভাবে চিন্তা ভাবনা করে বিচার বুদ্ধির সাহায্যে বিশ্লেষণ করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছতে পারে।

সমস্ত ধর্মের মানব কল্যানমুখী আদর্শ গুলোর সঙ্গে যথার্থ পরিচয় ঘটলে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মানুষ মুক্তি পাবে এবং মানবতাবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হবে। এটাই ছিল রামমোহনের শিক্ষা চিন্তার মূল কথা।

রামমোহনের শিক্ষাদর্শ লর্ড হেস্টিংস গ্রহণ করেন নি। কারণ তখনো গোঁড়াপন্থী রামমোহনের বিরুদ্ধবাদীরা ছিল তুলনায় অনেক বেশী শক্তিশালী। ইংরেজ শাসনের ভিত্তি তখনো সারা দেশ জুড়ে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাই হেস্টিংস দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন।

১৮২২ সালে হেস্টিংস ভারত ছেড়ে যান এবং লর্ড বেন্টিংকগভর্নর জেনারেল হয়ে আসেন। তিনি ভারতে এসেই রামমোহন রায়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপণ করেন। লর্ড বেন্টিংক - এর সাহায্যে রামমোহন শিক্ষা সংস্কার ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেবার সুযোগ লাভ করেন।

লর্ড বেন্টিংক এর উদ্যোগেই রামমোহনের অকাল মৃত্যুর দুই বছর পর ১৮৩৫ সালে ভারতে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন হয়। ভারতে নব যুগের যাত্রা শুরু হয়। রামমোহনের স্বপ্ন সফল হয়। প্রগতি বিরোধীরা ব্যর্থ হয়। রামমোহনের শিক্ষাচিন্তা বাস্তব রূপ নিতে থাকে। অবশ্য ইংরেজ সরকার রামমোহনের আদর্শকে পুরোপুরি গ্রহণ না করে বৃটিশ স্বার্থে শিক্ষানীতি স্থির করে।

রামমোহনের সমাজচিন্তা

রামমোহনের সময় ভারতের সামাজিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ অবস্থায়। চারদিকে চরম দারিদ্র, নিদারুণ নিরক্ষরতা, ধর্মান্ধতা ও সামাজিক কুসংস্কারে ডুবে ছিল ভারতীয় সমাজ। জাতিভেদ এবং অস্পৃশ্যতা সৃষ্টি করেছিল চরম সামাজিক বৈষম্য এবং দুর্দশা। আইন শৃংখলায় ছিল অরাজকতা।

ভারতের মুসলমানদের মধ্যে তিন শ্রেনীর মানুষ ছিল। একদল বহিরাগত আগন্তুক শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিল ভারতের বিপুল সংখ্যক ধর্মান্তরিত মানুষ, তৃতীয় শ্রেণীতে ছিল আগন্তুক ও ধর্মান্তরিত দের মিশ্রণে নতুন প্রজন্মের মানুষেরা। ভারতীয় সমাজের প্রভাবে মুসলমান সমাজেও সৃষ্টি হয়েছিল অভিজাত এবং নিম্ন বর্ণের জাতিভেদ। এছাড়াও ছিল শিয়া-সুন্নী বিরোধ।

সেকালে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল। হিন্দু বিবাহে বিচ্ছেদের ব্যবস্থা ছিলনা। ফলে হিন্দু বালিকাদের একবার বিবাহ হলে চিরকালের জন্য স্বামীর শ্রীচরণের দাসী রূপে গণ্য হত। মুসলমান সমাজে পুরুষেরা তিনবার তালাক দিলেই বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যেত। তবে মুসলমান সমাজে নারীর পুনর্বিবাহ স্বীকৃত ছিল।

চৈতন্য দেবের প্রভাবে মধ্যযুগে হিন্দু মুসলমানের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে সম্প্রীতির একটা নতুন বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল। শুধু বাংলাতেই ১২২ জন মুসলমান কবি বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ করেও অনেকে খ্যাতি অর্জন করেছেন।

রামমোহনের সময় ভারতে জাতীয়তাবোধ বা ভারতীয়ত্ববোধ বলতে কিছু ছিলনা। আঞ্চলিকতা, ধর্মান্ধতা, গোষ্ঠীতন্ত্র ইত্যাদি সংকীর্ণ মানসিকতা সকলের মধ্যেই বিরাজমান ছিল। অখন্ড ভারত চেতনা ইংরেজ শাসন এবং ইংরেজী শিক্ষারই ফল। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বঙ্কিমচন্দ্র ভারতের পরিবেশ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন -- এই ভারতবর্ষে নানা জাতি । বাসস্থানের প্রভেদে, ভাষার প্রভেদে, বংশের প্রভেদে, ধর্মের প্রভেদে নানা জাতি । কে কাহার সঙ্গে একতাযুক্ত হইবে? ধর্মগত ঐক্য থাকিলে বংশগত ঐক্য নাই, বংশগত ঐক্য থাকিলে ভাষাগত ঐক্য নাই। রাজপুত, জাঠ একধর্মাবলম্বী হইলেও বংশগত ঐক্য নাই বলিয়া ভিন্ন জাতি। বাঙ্গালী, বিহারী একবংশীয় হইলেও ভাষাভেদে ভিন্ন জাতি। কেবল ইহাই নহে, যাহাদের একধর্ম, একভাষা, একজাতি, একদেশ, তাহাদের মধ্যেও জাতির একতা জ্ঞান নাই।

জাতি এবং জাতীয়তাবোধ ইউরোপেও আধুনিক কালেরই সৃষ্টি। জার্মানীর সর্বত্র একই ভাষা এবং একই জীবন ধারা প্রচলিত থাকা সত্বেও জার্মানরা বহু রাজ্যে বিভক্ত হয়ে ছিল। ইতালী এবং জার্মানীতে নেপোলিয়ন নিজের অজ্ঞাতসারেই জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তুলেছিলেন, যেমন ইংরেজ শাসনে ভারতে জেগে উঠেছে জাতীয়তাবোধ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর ১৯১৮ সালে জার্মান জাতির একটা প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮৭১ সালে ফরাসী সাম্রাজ্য থেকে মুক্ত হয়ে বহু রক্ত এবং অস্ত্রের জোরে ঐক্যবদ্ধ জার্মান জাতির অভ্যুদয় ঘটেছিল ইউরোপ মহাদেশে। অন্যান্য রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। বহু রক্তের বিনিময়ে সৃষ্টি হয়েছিল একেকটি আধুনিক রাষ্ট্র।

রামমোহন এসব রাষ্ট্রবিপ্লবের ইতিহাস গভীর মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করেছিলেন। ইউরোপে প্রতিটি দেশে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের আগে প্রয়োজন হয়েছিল আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের এক জাতীয় জাগরণ।

আধুনিক ইতিহাস শিক্ষা দিয়েছে জনজাগরণ ছাড়া স্বাধীনতা আসেনা এবং জাতীয়রাষ্ট্র গঠন করা বা রক্ষা করাও সম্ভব হয়না। রামমোহনের সময় কালেই আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং ফরাসী বিপ্লব ঘটেছিল।

ভারতে জাতীয় জাগরণের প্রথম ধাপ হবে আধুনিক শিক্ষার বিস্তার এবং সমাজ সংস্কার। এই উপলব্ধি ভারতে প্রথম এসেছিল রামমোহনের মধ্যে। তাই তিনি এদেশে জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত বলে চিহ্নিত এবং অভিনন্দিত হয়েছেন।

ভারতে জাতীয়তাবোধের একটা ধারা প্রথমতঃ ভৌগোলিক আয়তন ও অবস্থানের ভিত্তিতে প্রাচীণ কাল থেকে গড়ে উঠেছে। দ্বিতীয়তঃ একই সভ্যতা ও

সংস্কৃতির প্রভাব শত শত বছর ধরে রামায়ণ ও মহাভারতের মাধ্যমে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। মুসলিম আক্রমণের পূর্ববর্তী সমস্ত আক্রমনকারীরা ভারতীয় সভ্যতায় বিলীন হয়ে গেছে।

মুসলমানরাই ভারতের নামকরন করেছে হিন্দুস্থান। মুসলমান আগমনের আগে এই শব্দটি সাহিত্যের বা ধর্মের কোন বিভাগেই উল্লেখ করা হয়নি। মুসলমানরা ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে না গেলেও ক্রমে ক্রমে সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে দেওয়া নেওয়ার বিনিময় ঘটার ফলে একটা ঐক্য বোধ গড়ে উঠেছে।

রামমোহন উপলব্ধি করেন যে, ভারতীয় সমাজের আধুনিকীকরণ মুসলিমদের বাদ দিয়ে হতে পারেনা। বৌদ্ধ, জৈন এবং শিখ ধর্মকে হিন্দু মানসিকতায় পৃথক ধর্ম রূপে কখনো গণ্য করা হয় নি। তাই এসব ধর্মের মানুষের এক পরিবারভুক্ত আত্মীয় বলেই বিবেচিত হয়েছে।

অভিজাত মুসলমানরা নিজেদের শাসক শ্রেণীর লোক বলে দাবী করতো। মৌলবীরা কঠোর শরীয়তী শাসনের মাধ্যমে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে একটা পাথর্ক্য সৃষ্টি করে রাখতে সচেষ্ট ছিল।

তাই রামমোহন হিন্দু মুসলমানের শাস্ত্রীয় বিকৃতি গুলো চিহ্নিত করে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতির পথকে প্রসারিত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এর জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছিল। অজস্র প্রবন্ধ রচনা করে প্রচার করতে হয়েছিল।

রামমোহন জীবিত কালে ধর্মান্ধদের মন জয় করতে পারেননি বরং আক্রমনের মূল লক্ষ্য হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু রামমোহনের গ্রন্থগুলো আধুনিক ভারত গড়ার অমূল্য দলিল রূপে গণ্য হয়েছে। ইউরোপীয় পন্ডিতরা বিশেষ ভাবে রামমোহনের গ্রন্থ পাঠ করেই ভারত প্রেমিক হয়ে উঠেছিলেন। ভারতীয় শিক্ষিত জ্ঞানী ব্যক্তিরাও রামমোহনের আদর্শে বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

বাঙ্গালীর সৌভাগ্য হল রামমোহনের পর রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলায় অসাধারণ প্রতিভাশালী বহুমুখী ব্যক্তিত্বের অধিকারী সমাজ সংস্কারক, কবি, সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ বাংলায় যথেষ্ট সংখ্যায় জন্ম গ্রহণ করেছেন। তাদের জীবন ও কর্ম শুধু

বাঙ্গালী সমাজকেই উন্নত করেনি, সারা ভারতবর্ষেই জাতীয় জাগরণ সৃষ্টি করেছে। মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলাম মানবিক কাব্যধারায় ভারতবাসীর বিবেক বুদ্ধিকে জাগিয়ে দিয়েছেন। বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ ও বঙ্কিমচন্দ্র সাহসে, শক্তিতে ঐক্যবদ্ধ জাতিগঠনে বিশাল ভূমিকা পালন করেছেন।

সামাজিক জীবনে বাঙ্গালীর সমস্যা এবং সারা ভারতের সমস্যা পৃথক ছিলনা। সতীদাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, শিশুবলি, ইত্যাদি ধর্মীয় কুসংস্কার সারা ভারতে সব হিন্দুদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। দারিদ্র্য- নিরক্ষরতা, যুক্তিহীন আচারের প্রতি আকষর্ণ সারা ভারতে সব ধর্মের মানুষের মধ্যেই ছিল।

রামমোহনের সমাজচিন্তা সঠিকভাবেই মূল সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করতে পেরেছিল। আধুনিক শিক্ষার প্রসার কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যেমন আঘাত করবে, তেমনি দারিদ্র্য দূরীকরণেও সহায়ক হবে। অন্যদিকে সামাজিক ঐক্য এবং সম্প্রীতির মানসিকতাও গড়ে তুলবে। রামমোহনের এই ধারণা সঠিক প্রমাণিত হয়েছে।

মুসলমানরা নবাবের জাত বলে অভিমান বশত: ইংরেজী শিক্ষা বয়কট করেছিল। তার ফলে মুসলিম সমাজের বিরাট ক্ষতি হয়েছে। ইংরেজী শিক্ষার অভাবে সরকারী চাকুরীতে এবং কারিগরী বিদ্যায় মুসলমানরা পিছিয়ে পড়েছিল। পরবর্তী কালে হিন্দুদের প্রতি অভিমান বশত: দেশটাকে ভাগ করে নিয়ে গোটা ভারতেরই ক্ষতি করেছে। এতে মুসলিম সমাজেরও মঙ্গল হয়নি। ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামিক আদর্শে রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব নয়। এরূপ চেষ্টা হিন্দু- মুসলমানের বিদ্বেষকেই শুধু বাড়িয়ে দেয়। এই চেতনা বিকাশের পথে প্রধান বাধা হল মৌলবাদ।

প্রাচ্য বিদ্যা বিশারদদের মধ্যে সে যুগের শ্রেষ্ঠ বিদেশী পন্ডিত কোলব্রুব ছিলেন রামমোহনের ঘনিষ্ট বন্ধু। প্রাচীণ ভারতের জীবন চর্চা, দর্শন, কাব্য, গণিত ও জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করে অসাধারণ জ্ঞানী পুরুষ রূপে খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

কোলব্রুক রামমোহনের সমাজচিন্তাকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন এবং সমর্থন করেছেন। **মানসিক উন্নতি ছাড়া সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব নয় এটাই ছিল বাস্তবোচিত সিদ্ধান্ত। এবিষয়ে রামমোহনের চিন্তা ছিল অভ্রান্ত। রামমোহন কোন সময়েই ইউরোপীয় সমাজকে অন্ধভাবে অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন না। ভারতীয় সংস্কৃতির কষ্টিপাথরে বিচার বিশ্লেষণ করে ভারতের পক্ষে সমাজ কল্যাণমূলক বিষয়কে গ্রহণ করতে আগ্রহী ছিলেন।**

রামমোহন জীবনের শেষ তিনটি বছর লন্ডনে কাটিয়েছেন। কিন্তু একদিনের জন্যও তিনি ইউরোপীয় পোষাক ব্যবহার করেননি। ইংলন্ডের রাজসভায় এবং পার্লামেন্টেও তিনি ভারতীয় পোষাকই ব্যবহার করেছেন।

সেকালে ইউরোপ যাত্রা এবং সমুদ্রপথে ভ্রমণ ভারতীয় কুলীন ব্রাহ্মণদের পক্ষে মহাপাপ বলে গণ্য হতো। কিন্তু রামমোহন এই সংস্কারকে গ্রাহ্য করেননি। সমাজের কল্যাণে তিনি যে কোন কাজ করতে প্রস্তুত ছিলেন।

রামমোহন সমাজ সংস্কার আন্দোলনকে ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। কারণ সেকালের সমাজে ধর্মকে বাদ দিয়ে কোন রকম সামাজিক পরিবর্তন সম্ভব ছিলনা। তবে রামমোহনের ধর্মচিন্তাকে কোন ভাবেই সাম্প্রদায়িক বলা যাবেনা। ধর্ম সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী রামমোহন চরিত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

রামমোহনের ধর্মচিন্তায় উপনিষদের যুগের সংকীর্ণতা মুক্ত উদার দৃষ্টিভঙ্গীই প্রবাহিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথই প্রথম রামমোহনের চরিত্রের এই বিশেষ দিকটি তুলে ধরেছেন, তিনি বলেছেন, — ‘ দ্বন্দ্বের মাঝখানে ভারতবর্ষের শাশ্বত বাণীকে জয়যুক্ত করতে কালে কালে যে মহাপুরুষেরা এসেছেন- বর্তমান যুগে রামমোহন রায় তাঁদেরই অগ্রণী’।

রামমোহনকে অধার্মিক বলে যে সব গোঁড়া হিন্দু পন্ডিতরা নিয়মিত সমালোচনা ও নিন্দা করতেন- তাদের বক্তব্যকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য ইতিহাসে অনেক তথ্য সংরক্ষিত রয়েছে। একটি প্রধান প্রমাণ হল, রামমোহন প্রতিদিন নিয়মিত উপাসনা এবং প্রার্থনা করতেন। দেশে এবং বিদেশে তার বহু সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে।

ডেভিড হেয়ারের ভাইঝি জ্যানেট হেয়ার তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে- রামমোহন রায় যখন যেখানেই ছিলেন তিনি নিয়মিত প্রার্থনা করতেন। কারো উপস্থিতিতেই এই নিয়মের ব্যতিক্রম হতো না। এমনকি যখনই তাঁর মনে কোন দুশ্চিন্তা বা দুর্বলতা দেখা দিত তখনও তিনি প্রার্থনা করতেন। রামমোহনের শাস্ত্রচিন্তা এবং ধর্মচিন্তা যদি ব্যক্তিগত সীমানার মধ্যেই আবদ্ধ থাকতো তাহলেও তিনি সে যুগের একজন শ্রেষ্ঠ সাধক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারতেন।

রামমোহনের বিরুদ্ধ বাদীরা দুইশ বছর ধরে রামমোহনকে সমাজ বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি রূপে প্রমান করার চেষ্টা করে চলেছেন। নিন্দা এবং সমালোচনাকে রামমোহন

কখনো গ্রাহ্য করেন নি।

এভাবে ভারতে সমাজ উন্নয়নে এবং জাতির বিবেক জাগ্রত করার প্রেরণা সঞ্চারের ক্ষেত্রে রামমোহনের ভূমিকাকে খাটো করে দেখাবার প্রচেষ্টা আজও অব্যাহত রয়েছে।

ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে কিছু অপরিবর্তনীয় তত্ত্ব আছে, আবার একটি সামাজিক দিকও রয়েছে। সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলো ধর্মীয় আচারেরও পরিবর্তন হয়। সমাজ পরিবর্তনের ধারা যে নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয় সে নিয়মের সঙ্গে ধর্মীয় রীতিনীতির একটা সমন্বয় সাধন প্রচেষ্টা সমাজ জীবনে সর্বদাই সক্রিয় থাকে। এই প্রক্রিয়ার যখন বিকৃতি ঘটে তখনই কোন একটি প্রতিভাবান পুরুষের চেষ্টায় বাস্তবোচিত চেতনার জন্য একটি আলোড়ন সৃষ্টি হয়।

রামমোহনের যুক্তিবাদ ভারতীয় সমাজে তেমনি একটি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এই আলোড়ন থেকেই জন্ম নিয়েছিল নতুন যুগের নতুন সমাজ।

কলকাতা ভারতের রাজধানী হওয়ায় কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি হয়েছে নবযুগের নব জাগরণ- যা ভারতের প্রধান প্রধান শহরগুলোকে প্লাবিত করেছে নতুন চিন্তা- ভাবনায়।

কিন্তু ভারতীয় গ্রামীণ সমাজে তার প্রভাব পড়েছে সামান্যই। স্বাধীনতার ৫৮ বছর পরও ভারতের গ্রামীন জীবণে ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার এবং জাতিভেদ প্রবল আকারে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে।

তাই বলা যায় রামমোহনের আরব্ধ কাজ এখনো সম্পন্ন হয়নি। রামমোহনের সমাজচিন্তাকে গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে দেবার মত শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজ এখনো খুব জরুরী। হিন্দুত্ব এবং ইসলামের গোঁড়ামীর সঙ্গে জাত পাতের বিদ্বেষ দূর করতে গড়ে তুলতে হবে নতুন গণজাগরণ।

রামমোহনের রাষ্ট্রচিন্তা

রামমোহনের সময় ভারতে ইংরেজ শাসনের মাত্র সূত্রপাত হয়েছে। ভাবতীয়রা ছিল ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায়। সারা ভারতে তখনো ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সাধারণ মানুষের মধ্যে কোন রাজনৈতিক চেতনা ছিলনা। সমাজের কোন স্তরেই স্বাধীনতা বোধ ছিলনা।

ভারতে ইংরেজরা এসেছিল ব্যবসা বাণিজ্য করতে। তারা চেয়েছিল অবাধ ব্যবসা বাণিজ্যের অধিকার। মুসলিম বাদশাহরা এদেশে পতুর্গীজ - ফরাসী এবং ইংরেজ ব্যবসায়ীদের বাণিজ্য করার অধিকার দিয়েছিল। কিন্তু আঞ্চলিক স্তরে দিল্লীর বাদশাহের নিয়ন্ত্রণ ছিলনা।

বাংলার নবাবের নিয়ন্ত্রণে ছিল বাংলা- বিহার- উড়িষ্যা। মারাঠীরা পাঞ্জাব পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেছিল। অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যেও ছিল চরম অস্থিরতা।

ভারতীয়রা বিশ্বাসঘাতকতা না করলে ইংরেজরা কখনোই ভারতবর্ষ দখল করতে পারতো না। ইংরেজ এবং ফরাসীদের মধ্যেও বাণিজ্য অঞ্চল দখল করা নিয়েছিল. চলছিল নিয়মিত সংঘাত।

বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার প্রধান সেনাপতি মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় ইংরেজরা নবাবকে পরাজিত করে ভারতের বুকে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের অপ্রত্যাশিত সুযোগ লাভ করে। নবাবের সেনা বাহিনীর তুলনায় ইংরেজ বাহিনী ছিল নগণ্য। নবাব বাহিনীর অধিকাংশ সৈনিক সেনাপতির নির্দেশে নিষ্ক্রীয় ছিল। ইংরেজদের সেনাবাহিনী গঠন করার সুযোগ এবং আর্থিক সঙ্গতি ছিলনা। জগৎশেঠ, উমিচাঁদের মত ভারতীয় মহাজনরা ইংরেজ বাহিনী গঠন করার জন্য প্রচুর অর্থ ধার দিয়েছিল। মীরজাফরও নবাবী পাওয়ার লোভে প্রচুর অর্থ ধার দিয়েছিল।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সেনাবাহিনীতে যোগ দেবার জন্য হাজার হাজার ভারতীয় যুবক ভীড় করেছিল। ইংলন্ড থেকে সেনাবাহিনী এনে ভারতবর্ষ জয় করা ইংরেজদের পক্ষে সম্ভব ছিলনা। সেকালে সমুদ্রপথে নৌবহর নিয়ে আসা ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ খোলা ছিলনা। ভারতের নৌবহর ছিল খুবই দুর্বল। ভারতীয় স্থলবাহিনীই ছিল ইংরেজদের সাম্রাজ্য বিস্তারের একমাত্র সম্বল। ভারতের প্রশাসনিক কাঠামো নির্মাণের প্রথম যুগে ইংরেজ শাসকরা নানা কারণে দোদুল্যমান ছিল।

ভূমি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিতেও প্রায় ৫০ বছর সময় লেগেছে। একশালা, পাঁচশালা, দশশালা, বন্দোবস্তের পর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা প্রবর্তন করে ইংরেজ শাসকরা স্থায়ী আয়ের পথ খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু এই ব্যবস্থার ফলে কৃষকদের জীবনে সর্বনাশ নেমে এসেছে। এক কলমের খোঁচায় জমির উপর থেকে কৃষকের সব অধিকার বাতিল করা হয়েছে। অন্যদিকে যারা খাজনা আদায় করতো তারাই জমিদার হয়ে কৃষক শ্রেণীর উপর অন্যায় শাসন, শোষণ এবং অত্যাচার চালাবার অধিকার লাভ করলো।

এরকম পরিস্থিতিতে রামমোহন নিজে একজন জমিদার হয়েও কৃষকের দুর্দশা লাঘব করার জন্য বৃটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে দাবী করেছেন এবং জমিদারী ব্যবস্থাই কৃষকের এই দুর্দশার কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। ঐ সময় দেশের শতকরা নব্বই জন মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল।

রামমোহন উপলব্ধি করেছিলেন যে ভারতের সমকালীন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রচিন্তা ঐক্যবদ্ধ ভারতরাষ্ট্র গড়ার উপযোগী ছিলনা। তার জন্য প্রয়োজন ছিল আধুনিক রাষ্ট্রচেতনার। কিন্তু ভারতে তখন এরূপ রাষ্ট্র চেতনার অভাব ছিল।

আধুনিক জাতীয়তা বোধের আদর্শ অনুযায়ী ভারতবাসীকে বিশ্বের দরবারে একজাতি রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে আধুনিক জ্ঞান নির্ভর পাশ্চাত্য রাষ্ট্রশাসনের অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। ইংরেজ শাসনের মাধ্যমেই আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তা এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে। রামমোহনের এই চিন্তার মধ্যেই আধুনিকতার সূত্রপাত হয়েছে।

পরবর্তী একশ বছর ধরে ভারতে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে যে

বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে তারা সকলেই রামমোহনের রাষ্ট্রচিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এজন্যই ১৯৩০ সালের আগে কংগ্রেস দলের পক্ষে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী পাস করা সম্ভব হয়নি।

রামমোহনের মৃত্যুর পর ২৪ বছরের মধ্যেই ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় সিপাহীরা বিদ্রোহ করেছিল। কিন্তু সারা দেশে তখনো ইংরেজ বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশ ঘটেনি। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে নিশ্চিত পরাজয়ের মুখে ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং দেশীয় রাজারাই বিদ্রোহীদের দমন করে ইংরেজ শাসকদের রক্ষা করেছিল। জনগণের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা থাকলে এটা সম্ভব হতোনা এই ঘটনাতেও ভারতীয়দের দুর্বল রাষ্ট্রচিন্তা সম্পর্কে রামমোহনের ধারণা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

সারা ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার এবং আধুনিক প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিস্তারের মধ্য দিয়ে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাবের পরই ভারতে জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার বিকাশ ঘটেছে এবং পরাধীনতার হাত থেকে মুক্তির কামনা জেগে উঠেছে। রামমোহনের মৃত্যুর সত্তর বছর পরে স্বদেশী চিন্তা এবং স্বদেশী আন্দোলন ভারতবাসীকে আলোড়িত করেছিল।

রামমোহন এরূপ সম্ভাবনার কথা সত্তর বছর আগেই বলে গেছেন। তবে ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ চরিত্র কেমন হবে তা রামমোহন বিশ্লেষণ করার সুযোগ পাননি।

রামমোহন ইংলন্ডের এক বন্ধুকে লিখেছিলেন ভারতবাসী যখন আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তায় সমৃদ্ধ হবে এবং ঐক্যবদ্ধ ভারতরাষ্ট্র পরিচালনায় সক্ষম হবে তখন ইংরেজদের বাণিজ্য স্বার্থ যাতে ক্ষুন্ন না হয় সে ভাবে শান্তিপূর্ণ একটা মীমাংসা সম্ভব হবে।

রামমোহনের এই অনুমান কিছুটা সত্য হলেও ইংরেজ শাসকরা নির্মম দমন নীতির শেষ স্তরে গিয়ে বাধ্য হয়েই ক্ষমতা হস্তান্তর করেছিল। আসলে সিপাহী বিদ্রোহের পরে বৃটিশ শাসকদের দৃষ্টিভঙ্গীর অমূল পরিবর্তন ঘটেছিল। উদারনীতি বাতিল করে দমননীতির পথ ধরেছিল।

রামমোহনের সময় ইংরেজ শাসকরা ভারতীয়দের সহানুভূতি এবং সমর্থনের

উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিল। তাই ভারত শাসনের পূর্ণ অধিকার পাওয়ার পর সুসভ্য ইংরেজ জাতির লোকেরা যে বর্বর দমন নীতি চালাতে পারে এমন ভাবনা কারো মাথায় ছিলনা। ভারতসাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য যেসব যুদ্ধ পরবর্তী কালে সংঘটিত হয়েছে, সেগুলি দেখলে রামমোহন অবশ্যই শাসক শ্রেণীর ভবিষ্যৎ চরিত্র বিশ্লেষণ করার সুযোগ পেতেন। এবং দেশবাসীকে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দিতেন।

ইউরোপে প্রটেস্টান্ট খ্রীষ্টানরা আধুনিক ধনতন্ত্রেরই বাহক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ভিত্তি স্থাপন করেছে। এবিষয়ে রামমোহনের স্পষ্ট উপলব্ধি ছিল।

১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারী একজন ইংরেজ বন্ধুর কাছে চিঠিতে রামমোহন লিখেছেন- **"আমি স্বীকার করি যে, ইউরোপ ও আমেরিকার খ্রীষ্টানদের তুলনায় ভারতীয়রা তুচ্ছ নয়। কিন্তু আমি দু:খিত যে বর্তমান ধর্মীয় প্রচলিত বিধি অনুযায়ী তাদের রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ সম্ভব নয়" শুধু তাই নয়, "ভারতে বিভিন্ন ধর্ম, জাতি, উপজাতি ও সম্প্রদায়গত বিচ্ছিন্নতা, ভেদাভেদ ও অসংখ্য উপবিভাগ এত তীব্র যে, এখানে স্বদেশ প্রেমের কোন অনুভূতি পর্যন্ত নেই। ধর্মীয় ও সামাজিক স্তরে একটা পরিবর্তন ছাড়া রাজনৈতিক সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব নয়।" (অনুবাদ-লেখকের)**

ধর্মসংস্কার ও সমাজ সংস্কার চিন্তার পেছনে যে রামমোহনের একটি সুদূর প্রসারী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল উপরোক্ত উদ্ধৃতি তারই প্রমাণ।

আরেকটি পত্রে রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গী আরো স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে, তিনি বলেছেন-**"বর্তমান কালের সংগ্রাম শুধু সংস্কারবাদী এবং সংস্কার বিরোধীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং বিশ্বব্যাপী অত্যাচারীর বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংগ্রাম, অবিচারের বিরুদ্ধে সুবিচারের জন্য সংগ্রাম এবং ভ্রান্তির বিরুদ্ধে সত্যের সংগ্রাম"(অনুবাদ লেখকের)**

এখানে রামমোহনের রাষ্ট্রচিন্তার বিশ্বব্যাপী বিস্তার লক্ষ্যনীয়। সেকালে এমন

স্পষ্ট বক্তা আর কেউ ছিল না। ইউরোপের রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার বিশ্লেষণেও রামমোহনের গভীর জ্ঞান ও দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় বন্ধুদের কাছে লিখিত পত্র গুলোতে ।

তিনিই প্রথম ভারতবাসী যিনি ফরাসী বিপ্লবের তাৎপর্য এবং ইউরোপের প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার ধারাটি সঠিক ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন।

ইউরোপে সামন্ততান্ত্রিক অভিজাত শ্রেনীর বিলুপ্তি এবং নতুন বুর্জোয়া শ্রেনীর আবির্ভাব সম্পর্কে রামমোহন সচেতন ছিলেন। এই প্রগতির ধারা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে এটাও বিশ্বাস করতেন।

রামমোহন গোষ্ঠীর মুখপত্র ---- **বেঙ্গল হেরাল্ড** — পত্রিকার ১৮২৯ সালের ১৩ই জুন সংখ্যার সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে— অল্প কয়েক বছরের মধ্যে কলকাতা ও বঙ্গদেশে অর্থনৈতিক দ্রুত উন্নতি ঘটেছে। এর তিনটি লক্ষণের মধ্যে **প্রথমটি** হল ত্রিশ বছরের মধ্যে জমির দাম কুড়ি গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। **দ্বিতীয়টি** হল---- অবাধ বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে। **তৃতীয়টি** হল বহু--- সংখ্যায় ইউরোপীয়দের সমাগম হওয়ার ফলে বাণিজ্যের উন্নতি ঘটেছে। এসবের ফলে সমাজে নতুন এক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম হচ্ছে যা এর আগে ছিলনা। এদের প্রভাব ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে । এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই নবযুগের সূচনা করেছে ।

এই সম্পাদকীয় থেকে সহজেই বোঝা যায় রামমোহনের রাষ্ট্র চিন্তা স্পষ্ট ছিল । পৃথিবীর সর্বত্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীই স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছে এবং নবযুগের সূত্রপাত ঘটিয়েছে।

রামমোহন ধর্মসংস্কার এবং সমাজ সংস্কারকে ব্যক্তিগত পুণ্যকর্ম বলে কখনোই মনে করেন নি । পাশ্চাত্য সভ্যতায় ধন বন্টণের নতুন ব্যবস্থা সূচিত হওয়ায় ধর্মীয় এবং সামাজিক ব্যবস্থায় প্রচলিত ধারণাগুলোর দ্রুত পরিবর্তন জরুরী হয়ে উঠেছিল । কারণ নবযুগের মধ্যবিত্ত শ্রেণী সর্বক্ষেত্রে স্বাধীনতা দাবী করে ।

রামমোহনের এই উপলব্ধি এবং বিশ্লেষণ থেকে দুটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে। **প্রথমতঃ** সংস্কার আন্দোলন কোন ব্যক্তিগত কল্পনার ফল নয়, সামাজিক প্রয়োজন থেকেই এর উৎপত্তি । **দ্বিতীয়তঃ** ধর্ম, সমাজ এবং রাষ্ট্র পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয় । ধর্মীয় সংস্কার, সমাজ সংস্কার এবং রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন এক সূত্রে গাঁথা ।

ভারতে মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তন সূচিত হয়েছে ইংরেজ শাসনে । শাসক গোষ্ঠীর স্বার্থেই ধর্মীয় এবং সামাজিক পরিবর্তন ঘটাতে হবে । রামমোহনের এই উপলব্ধিও ছিল সঠিক । ইংরেজ শাসকদের সাহায্য ছাড়া ধর্মীয় এবং সামাজিক কুসংস্কারের পরিবর্তন ঘটানো যাবে না এই উপলব্ধি থেকেই রামমোহন ভারতে কিছুকাল ইংরেজ শাসন থাকা প্রয়োজন মনে করেছেন ।

এ বিষয়ে কার্লমার্কস বলেছেন--- ভারতে বৃটিশ শাসকরা অচেতন ভাবে এক সামাজিক বিপ্লব ঘটিয়ে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করছে । তবে তাদের শাসন পদ্ধতি অমানবিক অত্যাচারীর রূপ নিচ্ছে । ইংরেজরা ভারতে একদিকে যেমন ধ্বংসকারীর ভূমিকায় রয়েছে অন্যদিকে তেমনি মধ্যযুগীয় সমাজের পরিবর্তন ঘটিয়ে পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করছে ।

ইংরেজ শাসকদের এই দ্বিমুখী ভূমিকা সম্পর্কে রামমোহন সচেতন ছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলনের উপযুক্ত পরিস্থিতি না থাকায় সংস্কার চিন্তাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

কার্লমার্কস বলেছেন---- ইউরোপীয় কায়দায় শিক্ষিত ভারতীয় সৈনিকরাই একসময় দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল শক্তি হয়ে উঠবে। বৃটিশ শাসকরাই প্রথম স্বাধীন ছাপাখানা ও সংবাদপত্র প্রকাশের অধিকার দিয়ে নতুন চেতনা বিকাশের সুযোগ করে দিয়েছে।

রামমোহন সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করে নিজের মতামতকে দেশে বিদেশে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

প্রতিটি দেশের সমাজ ও সভ্যতায় কতকগুলো নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে। তাই এক দেশের ইতিহাস অন্য একটি দেশের সঙ্গে হুবুহু মিলেনা। রামমোহন এবিষয়ে সচেতন ছিলেন বলেই ইউরোপের অবিকল নকল করার বিরুদ্ধে সতর্ক ছিলেন।

ধর্ম বা সমাজের সংস্কার কর্ম কখনোই সম্পূর্ণ নবীকরণ হয়না। সামাজিক ঐতিহ্য ও ইতিহাসের ধারাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে একটা জাতিকে নতুন পথে টেনে নেওয়া যায়না। রামমোহনের রাষ্ট্রচিন্তায় এবিষয়ে সচেতনতা লক্ষ্যনীয়।

সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে রামমোহনের সংগ্রাম

ভারতীয় হিন্দু সমাজে বেশ কিছু বর্বর প্রথা ধর্মের নামে প্রচলিত হয়েছিল। স্বামীর চিতায় বিধবা নারীকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা তার মধ্যে একটি।

সতীদাহ প্রথা কবে কখন প্রচলিত হয়েছিল তা সঠিক ভাবে নির্ণয় করা খুবই কঠিন। পৃথিবীর আর কোন জাতি বা ধর্মে এমন বর্বর প্রথা কখনো প্রচলিত ছিলনা। ভারতীয় বেদ এবং উপনিষদেও এমন প্রথার উল্লেখ নেই। তবে প্রাচীন মিশরে শুধু সম্রাটের সঙ্গে স্ত্রীসহ দাস, দাসী ও প্রহরীদের জীবন্ত সমাধি দেওয়া হতো।

ভারতে শত শত বছর ধরে কত লক্ষ লক্ষ সদ্য বিধবা নারীকে স্বামীর চিতায় প্রাণ দিতে হয়েছে তার হিসেবও কখনোই পাওয়া যাবেনা। রামমোহনের আগে আর কেউ এই বর্বর প্রথা রদ করার দাবী করতে সাহস পাননি। এই ব্যবস্থাকে ধর্মের একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ হিসেবেই সকলে মেনে নিয়েছিল। সদ্য বিধবার মা বাবারাও গোপণে চোখের জল ফেললেও কন্যাটি স্বামীর চিতায় প্রাণ দিয়ে স্বর্গে গিয়ে সতী হবে এই ভেবে সান্ত্বনা লাভ করতো।

স্বর্গ ও নরকের ধারণা সব ধর্মেই ছিল। মৃত্যুর পরে পুণ্যবানরা স্বর্গে যায় এবং পাপীরা নরকে যায়, এই বিশ্বাস অধিকাংশ ধর্মেই রয়েছে। কিন্তু পুণ্য অর্জনের জন্য একটি বিধবা নারীকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারতে হবে এমন অমানবিক অন্ধবিশ্বাস হিন্দু ধর্মের অতীত গৌরবকেই কলংকিত করেছে।

রামমোহন হিন্দু সমাজকে এই কলঙ্ক থেকে মুক্ত করার সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন। অন্ধ ধর্মবিশ্বাসকে আঘাত করার জন্য হিন্দু ধর্মের মূল গ্রন্থগুলো গভীর মনোযোগ দিয়ে পাঠ করেছেন। পরবর্তী কালের শাস্ত্র গ্রন্থগুলোর সঙ্গে তুলনা মূলক বিশ্লেষণ করে শাস্ত্রীয় সত্য আবিষ্কার করেছেন।এভাবেই সৃষ্টি হয়েছিল তুলনামূলক শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার নতুন শাখা। সমস্ত শাস্ত্রীয় গ্রন্থে গভীর পান্ডিত্য না থাকলে এরূপ কাজে সাফল্য লাভ করা যায়না।

ভারতে বেদ- উপনিষদের চর্চা শুধুমাত্র ব্রাহ্মণদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তী কালে বৈদ্যরা এই শাস্ত্র পাঠের অধিকার পেয়েছিল। কিন্তু শূদ্ররা এসব গ্রন্থের পাঠ শোনার চেষ্টা করলেও কানের ভিতর গলন্ত শিসা ঢেলে দেওয়া হতো।

রামমোহন ছোটবেলায় নিজের গ্রামে এবং পরিবারে সতীদাহ অনুষ্ঠান দেখে তীব্র বেদনায় বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলেন। নিজের বৌদি রামমোহনের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন, তিনি সতী হতে চাননা, তাকে যেন জোর করে পুড়িয়ে মারা না হয়। কিন্তু রামমোহন নিজের বৌদিকেও রক্ষা করতে পারেননি।

ধর্মীয় রীতিনীতি ও অনুষ্ঠান বিষয়ে রামমোহনের সঙ্গে পিতামাতা এবং পরিবারের অন্যান্যদের মত বিরোধ খুব তীব্র হওয়ায় মাত্র ষোল বছর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করে তীর্থ পর্যটনে বেরিয়ে পড়েন।

তীর্থ পর্যটনের মাধ্যমে ভারতে ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারের গভীরতা সম্পর্কে রামমোহন বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ১৭ বছর বয়সে তীর্থ পর্যটন শেষ করে পিতার আহ্বানে রামমোহন বাড়ীতে ফিরে আসেন।

রামমোহনের পিতা সমস্ত সম্পত্তি তিন পুত্রের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে বর্ধমান রাজার অধীনে চাকরী নিয়ে চলে যান।

রামমোহন নিজের পরিবার প্রতিপালনের জন্য বৈষয়িক চিন্তায় নিমগ্ন হন। উপযুক্ত আর্থিক সঙ্গতি অর্জনের পর তিনি কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

১৮১৫ সালে কলকাতায় বসবাস শুরু করার পর ১৮৩০ সালে বিদেশ যাত্রার সময় পর্যন্ত রামমোহন ধর্মসংস্কার এবং সমাজ সংস্কারের কাজে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে নিযুক্ত রাখেন। এই উদ্দেশ্যে- আত্মীয়সভা- নামে সংস্থা গঠন করে প্রতিদিন ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে আলোচনা সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। এভাবেই কলকাতায় একটি যুক্তিবাদী গোষ্ঠী সৃষ্টি হয়।

এই গোষ্ঠীর সকলেই ধর্মীয় সংস্কার ও গোঁড়ামী ত্যাগ করতে পারেননি। তাই কেউ কেউ সরে গিয়ে ভিন্ন সংস্থা গড়েছেন। তবে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে মতবিরোধ ছিলনা। একেশ্বরবাদের আদর্শ অনেকের মনঃপূত হয়নি। তবে রামমোহনের আত্মীয়সভার প্রভাব সারা কলকাতায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রচন্ড

আলোড়ন সৃষ্টি করে। রামমোহন বেদান্ত ব্যাখ্যা করে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, সর্ব জীবের প্রতি ভালবাসা এমনকি কীট পতঙ্গকেও ঘৃণা না করার নির্দেশই বেদান্তের শিক্ষা।

পরবর্তী সময়ে যারা শাস্ত্র লিখেছেন তাদের সকলের মধ্যে ঐক্যমত ছিলনা। প্রত্যেকেই নিজের চিন্তাকে অভ্রান্ত প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। ব্রাহ্মণ পন্ডিতরা উপযুক্ত জ্ঞানের অভাবে শাস্ত্রীয় নির্দেশের বিকৃত ব্যাখ্যাও করেছেন।

রামমোহন সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে বাংলা ভাষায় বেদান্ত শাস্ত্র অনুবাদ করে মহাপাপ করেছেন বলে ব্রাহ্মণ পন্ডিত সমাজ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। তারা রামমোহনকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেন। রামমোহন দু'বার আক্রান্ত হবার পর নিরাপত্তা বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করেন।

রামমোহন সংস্কৃত, ফার্সী এবং ইংরেজী ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। বাংলা ভাষায় ধর্মগ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ শিক্ষিত মানুষের বিবেক বুদ্ধিকে জাগ্রত করা। মূল শাস্ত্রের সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

বাংলাগদ্য ছিল তখনো একেবারে শৈশব অবস্থায়। ধর্মপ্রচারের জন্য খ্রীষ্টান মিশনারীরা গদ্য ভাষায় গ্রন্থ রচনা শুরু করেন। রামমোহন এই ব্যবস্থায় দ্রুত আকৃষ্ট হন। বাংলা গদ্যের ভাষা তখন খুব আরস্ট অবস্থায় থাকলেও সাধারণ মানুষের বোঝার পক্ষে খুবই উপযোগী ছিল।

বিভিন্ন ভাষায় গভীর জ্ঞান থাকার ফলে রামমোহন বাংলা গদ্যের ভাষায় নিজের যুক্তিগুলোকে সাজিয়ে সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য করে তুললেন। মিশনারী অ্যাডাম ছিলেন এবিষয়ে রামমোহনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। তিনিই পরে লর্ড বেন্টিংক এর নির্দেশে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার একটি রিপোর্ট তৈরী করেছিলেন। তিনি প্রস্তাব করেছিলেন ভারতের গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত করে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে অক্ষুন্ন রেখেই উচ্চ শিক্ষার জন্য আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা উচিত। রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গীও ছিল এরকমই। কিন্তু ইংরেজ সরকার এই প্রস্তাব গ্রহণ না করে লর্ড মেকলের উপর শিক্ষানীতি তৈরীর দায়িত্ব দেয়। মেকলের প্রস্তাব অনুযায়ী ১৮৩৫ সালে ইংরেজী শিক্ষা চালু হয়। রামমোহনের অর্ধেক স্বপ্ন সফল হয়।

১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় রক্ষণশীল পন্ডিতরা রামমোহনকে

কমিটিতে স্থান দিতে রাজী হননি। রামমোহনের পক্ষে প্রচুর সমর্থন থাকা সত্ত্বেও তিনি বিরোধ সৃষ্টি না করে কমিটিতে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। রামমোহনকে বাদ দিয়েই রামমোহনের স্বপ্ন সফল হল। ভারতে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার উচ্চ শিক্ষাকেন্দ্র সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হল। এটিই পরে বিখ্যাত প্রেসিডেন্সি কলেজে পরিণত হয়েছে।

আলেকজান্ডার ডাফ একটি আধুনিক স্কুল খুলতে স্কটল্যান্ড থেকে ছুটে এলেন। কিন্তু একজন খ্রীষ্টানকে কেউ বাড়ী ভাড়া দিতে রাজী হলনা। রামমোহন একটি বাড়ীর ব্যাবস্থা করলেন। পরিচিত বন্ধুদের বাড়ী ঘুরে ঘুরে ছাত্র যোগাড় করে দিলেন। পরবর্তী কালে এটিই হল স্কটিশচার্চ কলেজ।

রক্ষণশীল পন্ডিতদের খুশী করার জন্য লর্ড আমহার্স্ট ১৮২৩ সালে কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তার আগেই বড়লাট হেস্টিংস কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ।

রামমোহন প্রতিবাদ করে জানান, ভারতে সংস্কৃত শিক্ষার অনেক কেন্দ্র রয়েছে। এখন প্রয়োজন দ্রুত আধুনিক শিক্ষার বিস্তার। সংস্কৃত ব্যাকরণ শিখতে বার বছর সময় লাগে। তারপর যে সব শাস্ত্র পড়ানো হয় তা কোন কাজে লাগেনা। ভারতবাসীর পক্ষে বর্তমানে বেদান্ত. মীমাংসা, ন্যায়শাস্ত্র অপেক্ষা গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ণ, শারীরবিদ্যা চর্চা অনেক বেশী প্রয়োজন।

রামমোহনের দাবী গ্রাহ্য হলোনা। ১৮২৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হল সংস্কৃত কলেজ, যেখানে শুধু ব্রাহ্মণদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা হল। পরবর্তী কালে বিদ্যাসাগর এই কলেজের দরজা সকলের জন্য খুলে দিয়েছিলেন এবং ইংরেজী ভাষা শিক্ষারও ব্যবস্থা করেন। কিন্তু নিম্নবর্ণের মানুষদের ভর্তির সুযোগ দেয়নি গোঁড়াপন্থীরা।

রামমোহনের মনে সতীদাহ প্রথা রদ করার ভাবনা ছিল খুবই গভীর। শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা বিচার বিশ্লেষণের প্রচারের মাধ্যমে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে একদল সমর্থক রামমোহন খুঁজে পেলেন। লর্ড ওয়েলেসলিকে সতীদাহ প্রথা রদ করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানালেন। লর্ড ওয়েলেসলি আইন তৈরী করতে সাহস পেলেন না। কারণ দেশের অধিকাংশ মানুষই সতীদাহ প্রথার পক্ষে রয়েছে। তবে তিনি সতীদাহ সংখ্যা কমিয়ে আনার জন্য নির্দেশ দিলেন যে, কারো ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে সতীদাহ করা যাবেনা। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে বিধবার পক্ষে দাঁড়াবার জন্য

একজনও ছিলনা। তাই সতীদাহ অবাধে চলতে থাকলো।

তখন কলকাতা শহরে লোক সংখ্যা বেশী ছিলনা। তবুও শহর ও শহরতলীতে সতীদাহ বেড়েই চলছিল। সরকারী সমীক্ষায় দেখা গেল ১৮১৫ থেকে ১৮১৮ সালের মধ্যে মাত্র চার বছরে কলকাতা শহরের আশেপাশে ১৪২৮ (চৌদ্দশ আটাশ) জন বিধবাকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। এই হিসেব থেকে বোঝা যায় গ্রামে গঞ্জে কত হাজার হাজার বিধবা নারীকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে।

রামমোহন পর পর গ্রন্থ প্রকাশ করে সতীদাহের বিরুদ্ধে বিবেকবান মানুষকে এগিয়ে আসার আবেদন জানালেন।

এই সময় লর্ড বেন্টিংক গভর্নর জেনারেল হয়ে এলেন। রামমোহনের সঙ্গে আলোচনা করে বন্ধুত্ব স্থাপিত হল। রামমোহনের কথা লন্ডনে বসে অনেক আগেই বন্ধুদের কাছে শুনেছেন। রামমোহনের লেখা ইংরেজী গ্রন্থগুলো পড়েছেন। কলকাতায় এসে রামমোহনের কাছ থেকে সব শুনে নিজেও কয়েকটি সতীদাহের ঘটনা স্বচক্ষে দেখলেন।

১৮২৯ সালে লর্ড বেন্টিংক সতীদাহ প্রথা রদ করার আইন পাস করলেন। এই আইন ভঙ্গকারীকে খুনের আসামীর মতই কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে বলে ঘোষণা করলেন।

এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার হিন্দুসমাজে প্রচন্ড ঝড় সৃষ্টি হল। রামমোহনের পক্ষে সংখ্যায় কম হলেও সেকালের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একটা অংশ যোগ দিলেন।

আইনের বিরুদ্ধবাদীরা ছিল সংখ্যায় বেশী। তারা লর্ড বেন্টিংক এর কাছে আর্জি জানালেন এই আইন কার্যকর করা থেকে বিরত থাকুন। হিন্দুদের হিন্দুত্ব ধ্বংস করা সরকারের কাজ হতে পারে না।

লর্ড বেন্টিংক নিজের সিদ্ধান্তে অবিচল রইলেন। ফলে রক্ষণশীল সমাজ লন্ডনের প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করার সিদ্ধান্ত নিলেন। রামমোহনও লড়াই এর জন্য প্রস্তুত হলেন। সতীদাহ আইনের বিরোধীরা একটা সভা ডেকে ধর্মসভা নামে একটি সংস্থা গঠন করলেন। নাস্তিকদের শাস্তিদান ছিল এই সভা গঠনের মূল উদ্দেশ্য। এই ধর্মসভার রক্ষণশীল পন্ডিতরা ৮০০ (আটশ) সদস্যের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে সতীদাহ

আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন । লন্ডনে প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করার জন্য একজন ইংরেজ আইনজ্ঞ নিযুক্ত করা হল ।

প্রচুর টাকা চাঁদা আদায় করে অ্যাটর্নি ফ্রান্সিস বেথিকে লন্ডন পাঠাবার ব্যবস্থা করা হল ।

এসব ঘটনা দেখে লর্ড বেন্টিংকও কিছুটা বিচলিত হলেন । রামমোহন বেন্টিংককে আশ্বাস দিয়ে বললেন তিনি নিজেই লন্ডনে গিয়ে সতীদাহ আইনের পক্ষে সওয়াল করবেন ।

রামমোহনের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম সমাজও চুপ করে বসে রইল না। তারাও রামমোহনকে লন্ডনপাঠাবার জন্য বিভিন্ন উপায়ের কথা ভাবতে লাগলেন ।

এই সময় জানা গেল দিল্লীতে নামমাত্র বাদশাহ দ্বিতীয় আকবর শাহ বার্ষিক ভাতা বৃদ্ধির দাবীতে ইংলন্ডের রাজার কাছে উপযুক্ত একজন দূত পাঠাতে চান । রামমোহন এই সুযোগ গ্রহণ করতে রাজী হলেন ।

আকবর শাহ রামমোহনকে রাজা উপাধি দিয়ে বাদশাহের দূত নিযুক্ত করলেন। কিন্তু ইস্ট --- ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ বললেন - দিল্লীর বাদশাহের কোন উপাধি দেবার ক্ষমতা নেই। তাই রামমোহন রাজা উপাধি ব্যবহার না করেই ইংলন্ডে যাবার অনুমতিপত্র গ্রহণ করলেন।

রক্ষণশীল বিরোধী পক্ষ ঘোষণা করলেন, রামমোহন সমুদ্রযাত্রা করলে তাঁকে সমাজচ্যুত করা হবে । সেকালের সমাজে এটা ছিল সবচেয়ে বড় শাস্তি ।

এদিকে খবর পাওয়া গেল বিরোধী পক্ষের অ্যাটর্নি বেথি সাহেবেরর জাহাজ সমুদ্রে ড়বে গেছে । সাহেব বেঁচে গেলেও আপীলের সব কাগজপত্র সমুদ্রের জলে ভেসে গেছে ।

রামমোহনের জাহাজ যথা সময়ে ইংলন্ডে পৌছে গেল । রামমোহনের বহু ইংরেজ বন্ধু জাহাজ ঘাটে এসে সংবর্ধণা জানালেন । প্রিভি কাউন্সিল রামমোহনের বক্তব্যে মুগ্ধ হয়ে সতীদাহ আইন বহাল রাখলেন এবং রামমোহনের রাজা উপাধিও স্বীকার করে নিলেন । সতীদাহ নিবারণ আইন বহাল থাকার খবরে রামমোহন পন্থীরা উৎসব করলেন আর রক্ষণশীল বিরোধী পক্ষ একেবারে হতাশ হয়ে পড়লেন ।

নেশাগ্রস্ত করে সতী বানানো হচ্ছে

জোর করে সতী বানানো হচ্ছে

বিদেশের মাটিতে রামমোহন

১৮৩০ সালের নভেম্বর মাসের ১৯ তারিখে রামমোহন কলকাতা থেকে জাহাজে সমুদ্রপথে লন্ডন যাত্রা করেন । তিনিই প্রথম কুলীন ব্রাহ্মণ যিনি সমাজচ্যুত হবার ভয় উপেক্ষা করেই সমুদ্রযাত্রা করলেন । এরপর হাজার হাজার ভারতীয় রামমোহনকে অনুসরণ করে ইউরোপে গিয়েছেন এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় জ্ঞান অর্জন করে কর্মজীবনে ইউরোপীয়দের মতই দক্ষতার পরিচয় দিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন ।

সেকালের সমাজে সমাজচ্যুতিকে উপেক্ষা করা ছিল রীতিমত দুঃসাহসিক কাজ । রামমোহনের এই ঐতিহাসিক যাত্রা ভারতীয়দের কাছে পথপ্রদর্শক রূপে চিহ্নিত হয়ে আছে ।

তখনকার ইউরোপের লোকেরা ভারতের অধিবাসীদের সম্পর্কে অদ্ভুত সব গল্প শুনতো। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর লোকেরা প্রচার করতো ভারতীয়রা হল একটা অসভ্য জাতি । ধর্মীয় রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিক ব্যবস্থা এবং পোষাক পরিচ্ছদ সব কিছু সম্পর্কেই ছিল একটা চরম অবজ্ঞার মনোভাব ।

রামমোহনকে প্রথম ভারতীয় ব্যক্তিরূপে দেখে সেদেশের সাহেবরা একেবারে অবাক হয়ে গেল। রামমোহনের দেহ ছিল মজবুত গায়ের রং ছিল সাহেবদেরই মত, পোষাক পরিচ্ছদ এবং আদব-কায়দা ছিল রাজার মত । ভারতে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী রামমোহনকে রাজা বলে স্বীকার না করলেও লন্ডনের অধিবাসীরা দেখামাত্রই রামমোহনকে রাজা বলে স্বীকার করে নিল ।

রামমোহনের মুখে বিশুদ্ধ ইংরেজী ভাষা শুনে ইংরেজ পন্ডিতরাও মুগ্ধ হয়ে গেলেন । রামমোহন দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন । কিন্তু লন্ডনে গিয়ে ভারতীয় প্রাচীণ সভ্যতা ও সংস্কৃতির রূপ প্রচারের ভূমিকায় সর্বতোভাবে সচেষ্ট হলেন ।

ইউরোপের যে সব পন্ডিতরা প্রাচ্য বিদ্যা বিষয়ে গবেষণারত ছিলেন তারা

রামমোহনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য আগ্রহী হয়ে উঠলেন । রামমোহনের বিদ্যাবুদ্ধি, দৈহিক গঠন, বিরাট ব্যক্তিত্ব প্রমাণ করে দিল যে ভারতবাসী একটা প্রাচীন সভ্য জাতি । ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ সমগ্র ইউরোপে বেড়ে গেল ।

ইউরোপে তখন শুরু হয়েছিল বিপ্লবের ঢেউ । রামমোহনের বয়স যখন ১৭ বছর তখন ঘটেছিল ফরাসী বিপ্লব । কিন্তু সেই বিপ্লবেরই এক নেতা নেপোলিয়ন বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেন । সারা ইউরোপে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য বহু যুদ্ধ করেন। দশ বছর ভীষণ দাপটে রাজত্ব করেন ।

প্রায় সমগ্র ইউরোপ নেপোলিয়নের অধীনতা স্বীকার করেছিল । ইংল্যান্ড রক্ষা পায় সমুদ্রের ব্যবধানের জন্য । রাশিয়া থেকে নেপোলিয়নকে প্রচন্ড ক্ষতি স্বীকার করে প্রচুর লোক ক্ষয় করে ফিরে আসতে হয়েছিল । শেষ পর্যন্ত সমগ্র ইউরোপ ঐক্যবদ্ধ হয়ে নেপোলিয়নকে বন্দী করে দ্বীপান্তরে পাঠালো ।

নেপোলিয়নের পতনের পর ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন শুরু হল । স্পেন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে যে সংবিধান রচনা করেছিল তা উৎসর্গ করা হয় রামমোহনের নামে ।

এই ঘটনাই প্রমাণ করে যে, রামমোহন প্রজাতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন তা ইউরোপের সর্বত্র জানা ছিল । নেপোলিয়ন আত্মজীবনীতে লিখে গেছেন — "ইউরোপকে অস্ত্র দিয়ে জয় করার চেষ্টা ভুল ছিল । বর্তমান যুগের বাস্তব পন্থা হচ্ছে যুক্তি দিয়ে জয় করা । অতিমাত্রায় শক্তি সাধনা বিপজ্জনক । তার সাধকরা তার জাতির একসময় পতন ঘটবেই ।"

রামমোহন প্রথম প্রকাশ্যে বক্তৃতা করেন লিভার পুলের ইউনিটারিয়ান চ্যাপেলের জনসভায়। ইংরেজদের মতোই সুন্দর ও সাবলীল ইংরেজী ভাষায় রামমোহনের বক্তৃতা শুনে উপস্থিত জনগণ মুগ্ধ হন । রামমোহনই ছিলেন ইংল্যান্ডের মাটিতে প্রথম ভারতীয় এবং প্রথম এশীয় বক্তা, যিনি ইংরেজদের মত বক্তৃতা দিয়ে প্রতিটি মানুষকে অবাক করে দিয়েছিলেন ।

জাহাজ থেকে নেমে রামমোহন লিভার পুলে কয়েকদিন ছিলেন । প্রতিদিনই বহু-লোক রামমোহনকে দেখার জন্য এবং করমর্দন করে ধন্যবাদ জানাবার জন্য ভীড়

করতো ।

এরপর লন্ডনের পথে ম্যাঞ্চেস্টারে কয়েকটি কারখানা তিনি পরিদর্শণ করেন। শ্রমিকদের অবস্থা জানার জন্য আলাপ-আলোচনায় যোগ দেন ।

রাজধানী লন্ডনের পার্লামেন্টে তখন রিফর্ম বিল নিয়ে আলোচনা চলছিল । ইংল্যান্ডেও তখন প্রকৃত গণতন্ত্র ছিল না । শ্রমিক, কৃষক এবং নারীর ভোটাধিকার ছিল না । অথচ সারা ইউরোপ জুড়ে তখন চলছিল প্রজাতান্ত্রিক শাসনের জন্য আন্দোলন।

রামমোহন রিফর্ম বিলের ব্যাপারে খুবই আগ্রহী ছিলেন । কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন ইংল্যান্ডে গণতন্ত্রের প্রসার ঘটলে ভারতেও তার প্রভাব পড়বে, তাতে ভারতবাসী উপকৃত হবে । পার্লামেন্টে প্রথমবার-বিল পাশ না হওয়ায় দেশ গৃহ--যুদ্ধের মুখোমুখী হয়েছিল । পরে নতুন পার্লামেন্ট তা পাশ করে ।

সেকালের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক বেন্থাম রামমোহনের সঙ্গে দেখা করে অভিনন্দন জানালেন এবং বন্ধুত্ব স্থাপণ করলেন । এই ঘটনা পত্রিকা মারফত ছড়িয়ে পড়ার ফলে লন্ডনের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা রামমোহনের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপণের জন্য ছুটে এলেন । ইউরোপের সর্বত্র এই খবর ছড়িয়ে পড়ল ।

রামমোহন রিফর্ম বিলের সমর্থণে প্রচার শুরু করেন । এই বিলের বিরোধীবাও তখন রামমোহনের সঙ্গে আলোচনার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠলো । অভিজাত শ্রেণীর অধিকাংশই তখন রিফর্ম বিলের বিরুদ্ধে ছিল ।

ভারতের ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী রামমোহনকে ভারতের দূত হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি । কিন্তু ইংল্যান্ডের সরকার এবং রাজা রামমোহনকে ভারতের দূতরূপেই গ্রহণ করলেন এবং রাজকীয় সম্মান দিয়ে অভ্যর্থণা জানালেন । এই ঘটনায় ভারতের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষেরও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হল এবং লন্ডনের অফিসকে উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে রামমোহনকে অভ্যর্থণা জানাবার নির্দেশ দেওয়া হল ।

১৮৩২ সালের ৬ই জুলাই তারিখে লন্ডনের ইস্ট ইন্ডিয়া অফিস রামমোহনের সম্মানে এক নৈশ ভোজের আয়োজন করেছিল । রামমোহন ভোজসভায় যোগ দিয়ে ভারতীয় খাদ্য গ্রহণ করেন ।

রামমোহনের ভারতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে দেবার জন্য রামরতন মুখোপাধ্যায়

নামে একজন পাচক, রামহরি দাস নামে একজন ভৃত্য, শেখ বক্‌সু নামে একজন কর্মচারী এবং পালিত পুত্র রাজারামকে সঙ্গে করে নিয়েছিলেন ।

রক্ষণশীল ব্রাহ্মণরা পালিতপুত্র রাজারামকে , রামমোহনের কোনও রক্ষিতার পুত্ররূপে প্রচার করে নিন্দা ও সমালোচনা করেছিল । তারা আরো প্রচার করেছিল যে রামমোহন লন্ডনে একজন ইংরেজ মহিলাকে বিয়ে করেছেন ।

রামমোহনের নির্মল চরিত্রকে কলংকিত করার এই চেষ্টার বিরুদ্ধে বৃটিশ মহাফেজ খানায় রক্ষিত একটি চিঠি গবেষকরা সংগ্রহ করেছেন । তাতে লেখা রয়েছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর এক পদস্থ কর্মচারী মিঃ ডিক সাহেব হরিদ্বারের মেলায় একটি শিশুকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন । তিনি দেশে ফিরে যাবার সময় শিশুটিকে পালন করার দায়িত্ব রামমোহনকে দিয়ে যান । তখন থেকে রামমোহন নিজের পুত্রের মতই লালন পালন করেন । শিশুটির মাতা পিতার পরিচয় জানা যায়নি।

লন্ডনে রামমোহন পৃথকভাবে বাড়ী ভাড়া করেই নিজস্ব আভিজাত্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন । বহু বন্ধু নিজ বাড়ীতে নিয়ে যাবার আমন্ত্রণ করা সত্ত্বেও তিনি যাননি ।

১৮৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইংলন্ডের রাজার সঙ্গে রামমোহন দেখা করেন । রামমোহনকে রাজকীয় সম্মান দিয়ে অভ্যর্থণা জানানো হয় । সেকালের সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে এটাই ছিল সর্ব্বোচ্চ সম্মান ।

এই সময় ইংলন্ডের রিফর্ম বিল পাশ হবার ফলে আধুনিক বৃটিশ গণতন্ত্রের সূত্রপাত হয়। ইংলন্ডের জনগণ খুবই খুশী হয় এই ঘটনায় । রামমোহনও এইসব আনন্দ উৎসব যোগ দেন।

সেকালের ইংলন্ডের সুপরিচিত সমাজতন্ত্রী রবার্ট ওয়েনের সঙ্গেও রামমোহনের পরিচয় এবং বন্ধুত্ব হয় । সমাজতন্ত্রের প্রতি রামমোহন গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন । কিন্তু ধর্ম সম্পর্কে নাস্তিকতা তিনি মেনে নিতে পারেন নি । তখনো পৃথিবীতে মার্কসবাদী ধারণার উৎপত্তি হয়নি । তখন কার্লমার্কসের বয়স ছিল ১৫ বছর।

লন্ডনের বিলাস বহুল বাড়ীতে বসবাস করা কঠিন হয়ে উঠল। রামমোহনকে

বাধ্য হয়ে বন্ধু ডেভিড হেয়ারের ভাই জন হেয়ারের বাড়ীতে উঠে আসতে হল। মৃত্যু পর্যন্ত এখানেই বসবাস করেছেন। হেয়ার পরিবার অত্যন্ত যত্ন নিয়ে রামমোহনের সেবা করেছেন।

কঠোর পরিশ্রমে এবং আর্থিক অভাবে রামমোহনের স্বাস্থ্য এবং মন দ্রুত ভেঙ্গে পড়েছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাছ থেকে ঋণ চেয়েও তিনি ঋণ পাননি। অনেকগুলো দায়িত্ব নিয়ে রামমোহন ইংলন্ডে গিয়েছিলেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল সতীদাহ নিবারণ আইন বহাল রাখা। রামমোহনের বিরোধীরা ৮০০ লোকের স্বাক্ষরযুক্ত আবেদনপত্র প্রিভি কাউন্সিলে জমা দেবার জন্য আইনজীবির হাতে দিয়েছিল। পথে জাহাজ ডুবির ফলে সে সব কাগজপত্র সমুদ্রের জলে ভেসে গিয়েছিল।

রামমোহন সঙ্গে করে সতীদাহ নিবারণ আইনের পক্ষে তখনকার কলকাতার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সাক্ষর সহ আবেদনপত্র এনেছিলেন। লন্ডনের প্রিভি কাউন্সিলে এই আবেদনপত্র জমা দেন। প্রিভি কাউন্সিলের আলোচনায় রামমোহনকে অংশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়। রামমোহন শাস্ত্রীয় যুক্তি উল্লেখ করে প্রমাণ করেন যে, সতীদাহ প্রথার মত বর্বর ব্যবস্থা ভারতীয় শাস্ত্র সম্মত নয়। এই প্রথা বন্ধ করা সরকারের পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ মানবিক দায়িত্ব।

১৮৩২ সালের ১১ই জুলাই প্রিভি কাউন্সিল সর্বসম্মত ভাবে সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার আইন বহাল রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

এই ঘোষণায় রামমোহন উৎসবের আয়োজন করেন। কলকাতায় রামমোহন গোষ্ঠীর পক্ষ থেকেও উৎসবের আয়োজন করা হয়। সতীদাহ নিবারণ আইনের বিরোধীরা হতাশ হয়ে পড়েন।

রামমোহনের দ্বিতীয় দায়িত্ব ছিল দিল্লীর নামমাত্র বাদশাহ আকবর শাহের বার্ষিক ভাতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা। ইংলন্ডের রাজা রামমোহনকে রাষ্ট্রদূতের সম্মান দেন। রামমোহন ইংলন্ডের রাজা চতুর্থ জর্জের কাছে দিল্লীর বাদশাহের বার্ষিক ভাতা বৃদ্ধির দাবীতে যে স্মারকলিপি পেশ করেন তা যুক্তি- ভাষা ও ভাবের গাম্ভীর্যে একটি অতুলনীয় দলিল রূপে গণ্য হয়েছে।

রামমোহন এই স্মারক লিপির কপি ইস্ট - ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ এবং ইংলন্ডের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যে বিলি করেন।

বহু আলোচনার পর ১৮৩৩ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালক সভা দিল্লীর বাদশার বার্ষিক ভাতা বার লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে পনের লক্ষ টাকা করে দেন। কিন্তু বাদশাহর দাবী ছিল বার্ষিক কুড়িলক্ষ টাকা। রামমোহনের আকস্মিক মৃত্যু হওয়ায় বাদশা এই বর্ধিত ভাতাই মেনে নেন।

রামমোহনের আরেকটি লক্ষ্য ছিল ইস্ট - ইন্ডিয়া কোম্পানীর কার্যকাল শেষ হবার ফলে নতুন ভাবে সনদ মঞ্জুর করার সময় ভারতবাসীর স্বার্থে কিছু ব্যবস্থা যাতে থাকে তা দেখা। এই নতুন সনদে ভারতবাসীর জন্য চাকুরীর সংস্থান করা হয়েছিল।

১৮৩৩ সালের ২০ শে আগষ্ট রাজার সম্মতিলাভ করে একটি আইন তৈরী হল। ইস্ট — ইন্ডিয়া কোম্পানী এই আইন অনুসারে একটি বাণিজ্য সংস্থার পরিবর্তে একটি রাজনৈতিক সংস্থায় পরিণত হল। ফলে ভারতীয়দের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে স্বাধীনভাবে কিছু পদক্ষেপ নেবার অধিকার পেল। এটাই ছিল ইস্ট - ইন্ডিয়া কোম্পানীর শেষ সনদ। ১৮৫৭সালে সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতে কোম্পানীর শাসন বাতিল করে সরাসরি বৃটিশ সরকারের শাসন চালু করা হয়।

ইংলন্ডে এসে রামমোহন প্রথম রাজনীতি বিষয়ে উৎসাহ প্রকাশ করতে থাকেন। ইংলন্ডে রি ফর্ম বিলকে কেন্দ্র করে বৃটিশ নাগরিকদের উত্তাল আন্দোলন এবং ইউরোপের প্রজাতান্ত্রিক আন্দোলন রামমোহনকে বিশেষভাবে রাজনীতি বিষয়ে আকর্ষণ করে।

১৮৩২সালের মাঝামাঝি সময়ে ফ্রান্সে গিয়ে কয়েকমাস প্যারিসে বসবাস করেন। এই সময় ফরাসী ভাষা শিখে ফরাসী দার্শনিকদের মূল গ্রন্থগুলো পাঠ করেন। ইউরোপের অন্যান্য কয়েকটি দেশও ঘুরে দেখার ইচ্ছা ছিল। আমেরিকা যাবার জন্যও তিনি যোগাযোগ করেছিলেন। কিন্তু স্বাস্থ্য ও অর্থের কারণে এসব পরিকল্পনা বাতিল করতে বাধ্য হন।

১৮৩৩সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে রামমোহন ইংলন্ডে ফিরে আসেন।

রামমোহন দাবী করেছিলেন ভারতবাসীর অবস্থা বৃটিশ পার্লামেন্টে পেশ করার জন্য বৃটিশ পার্লামেন্টে ভারতীয় প্রতিনিধি থাকা প্রয়োজন। কিন্তু বৃটিশ সংসদ বিশেষজ্ঞ ডাব্লিউ উইন বলেন, বৃটিশ সংবিধান অনুযায়ী ইংলন্ডের মাটিতে যারা জন্মগ্রহণ

করবে, তারাই শুধু বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্য হতে পারবে। বৃটেনের লিখিত সংবিধান না থাকলেও একটা নির্দিষ্ট ট্র্যাডিশান তারা অনুসরণ করে।

কঠোর পরিশ্রমে ক্লান্ত এবং আর্থিক অনটনে মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত রামমোহন কিছু দিন বিশ্রামের জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলেন। এছাড়া দেশে দ্বিতীয়া স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ, রক্ষণশীল বিরোধী পক্ষের বিষোদগার, নানা রকমের চক্রান্ত এবং মিথ্যা মামলার খবর পেয়ে রামমোহনের উদ্বেগ আরো বেড়ে গেল। প্রকৃতপক্ষে মানসিক উদ্বেগই রামমোহনের অকাল মৃত্যুর কারণ হয়েছিল।

সমুদ্রপথে আসার সময় জাহাজের সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে আঘাত পেয়েছিলেন। অসুস্থ অবস্থায় সেটারও যন্ত্রণা দেখা দিয়েছিল।

লন্ডনের বিলাসবহুল জীবনযাত্রা থেকে মুক্তির জন্য কিছু দূরের শহর ব্রিস্টলের বন্ধুদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে রামমোহন ব্রিস্টলে চলে আসেন।

কলকাতা থেকে রওনা হবার সময় দুটি ব্রিটিশ ব্যাংকে প্রচুর টাকা জমা রেখে এসেছিলেন। ইউরোপ এবং আমেরিকা ভ্রমণের খরচ বহণ করার মত যথেষ্ট অর্থের সংস্থান করেই এসেছিলেন। কিন্তু দুটি বৃটিশ ব্যাংকই একসঙ্গে ফেল পড়ে যাওয়ায় রামমোহনের অর্থ আগমনের পথ বন্ধ হয়ে যায়। সেকালে ঘন ঘন জাহাজ ডুবির ফলে বড় বড় ব্যাংক গুলো হঠাৎ করে ফেল করে যেতো।

রামমোহনের দুর্ভাগ্য, ভারতবাসীরও দুর্ভাগ্যের কারণ হল। নতুন আইন প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর যে সব ত্রুটি ছিল তার মোকাবিলা করার মত জনমত সৃষ্টি করা একমাত্র —রামমোহনের পক্ষেই সম্ভব ছিল। এই অভাব পূরণ না হওয়ায় কোম্পানীর শাসনে অনেক সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে ভারতবাসী।

ব্রিষ্টলে রামমোহনের মিশনারী বন্ধু কার্পেন্টারের এক আত্মীয়া মিস ক্যাসলের বাড়ীতে রামমোহনকে নিয়ে এলেন ডেভিড হেয়ারের বোন মিস হেয়ার। এখানেও খুব যত্নেই তাঁকে রাখা হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ করে ১৯শে সেপ্টেম্বর জ্বর এবং মাথার যন্ত্রণায় রামমোহন কাতর হয়ে পড়লেন। ব্রিস্টলের সেরা ডাক্তার এবং নার্সকে চিকিৎসার জন্য নিযুক্ত করা হল। কিন্তু রামমোহন মানসিক শক্তি হারিয়ে ফেলায় চিকিৎসায় কোন কাজ হলনা। সেকালের চিকিৎসা খুব উন্নত ছিলনা।

১৮৩৩সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর ভারত পথিক এবং বিশ্বপ্রেমিক রামমোহন

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। বিদেশের মাটিতে আত্মীয় স্বজন থেকে বহু দূরে রামমোহনের এই আকস্মিক মৃত্যু ঘটায় অন্ত্যেষ্টি নিয়ে একটা সমস্যা সৃষ্টি হয়।

রামমোহন হিন্দু ধর্মের সংস্কার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করেননি। খ্রীষ্টান ধর্মও গ্রহণ করেননি। তিনি ধর্মচ্যুত হলে সেকালের আইন অনুসারে সম্পত্তির অধিকার থেকেও বঞ্চিত হতেন। তাঁর মৃত্যু এতটাই আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত ছিল যে, এসব বিষয়ে কেউ রামমোহনের সঙ্গে আগে আলোচনাও করেননি।

রামমোহন কথা প্রসঙ্গে এক বন্ধুকে বলেছিলেন, ইংলন্ডের মাটিতেই যদি তাঁর মৃত্যু হয়, তবে যেন তাঁর নামে এক খন্ড জমি কিনে সেখানেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। সেখানে থাকবে একটা কুটির, যাতে কোনও দরিদ্র ব্যক্তি বিনা ভাড়ায় বসবাস করতে পারেন।

শেষ পর্যন্ত রামমোহনের সমস্ত বন্ধুদের ডাকা হল আলোচনার জন্য। লন্ডন থেকেও বন্ধুরা এলেন। আলোচনা সভায় রামমোহনের পালিত পুত্র রাজারাম এবং অন্য দুইজন ব্রাহ্মণ ভৃত্যকেও রাখা হল। মিস ক্যাসল নিজ বাড়ীতে রামমোহনের নামে একখন্ড জমি দান করলেন। সেখানেই রামমোহনের ইচ্ছাকে সম্মান দিয়ে শবাধার নিয়ে মিছিল করে সসম্মানে সমাধিস্থ করা হল। এই অনুষ্ঠানটি সরকারী দলিলে রেজেষ্ট্রি করার সুযোগ না থাকায় একটি বিশেষ দলিল রচনা করা হল। উপস্থিত সকলেই এই দলিলে স্বাক্ষর করেন।

কিছুকাল পরে মিস ক্যাসলের বাড়ীটি বিক্রী হয়ে যাওয়ায় রামমোহনের সমাধিটি সরিয়ে নেবার প্রয়োজন হল। ১৮৪২সালে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর লন্ডনে গিয়ে নতুন একটি জায়গায় রামমোহনের নতুন সমাধি রচনা করে একটি সুন্দর সমাধি মন্দির নির্মাণ করেন। ভারতীয় বন্ধুরা চাঁদা তুলে এই খরচ বহণ করেছিল। ভারতীয়দের কাছে এই সমাধিস্থলটি একটি তীর্থস্থানে রূপান্তরিত হল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনের স্মৃতি হয়ে রইল এই সমাধি মন্দির।

ভারতীয় সমাজ জীবনে স্মরনীয় রামমোহন

ভারতীয় সমাজ জীবনে রামমোহন চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। কারণ তিনিই প্রথম এদেশে নবযুগের মশাল জ্বেলেছেন। সেই মশাল থেকে আলো ছড়িয়েছে ক্রমে ক্রমে সারা ভারতের কোণে কোণে।

ভারতে মধ্যযুগের শুরুতে মুসলিম সুলতানরা ইসলামধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্মে পরিণত করে। হাজার হাজার স্থানীয় অধিবাসীকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করে। মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর শাসক গোষ্ঠীর আত্মীয় স্বজনেরা এবং মুসলিম ধর্মগুরুরা দলে দলে ভারতে প্রবেশ করেছিল। তখন ভারতকে ইসলাম জগতের অঙ্গীভূত করার চেষ্টা শুরু হয়েছিল।

ফলে ভারতে হিন্দু ধর্মের রক্ষকরা নানা কৌশলে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছে। বহু হিন্দু রাজা বিভিন্ন হিন্দু রাজাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুসলিম শাসন উৎখাত করার চেষ্টা করেছেন। এজন্যই মুসলিম শাসকরা শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গঠনের দিকে জোর দিয়েছিল। পরাজিত হিন্দু রাজাদের সঙ্গে সন্ধির শর্ত হিসেবে যুদ্ধের সময় অর্থ এবং সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতে বাধ্য থাকার ব্যবস্থাটির উপর অত্যাধিক জোর দিয়েছিল।

মধ্যযুগের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ভারতের হিন্দু রাজারা ঐক্যবদ্ধ থাকলে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার কোন সম্ভাবনাই সৃষ্টি হতোনা। ঠিক তেমনি হিন্দু মুসলমানের ঐক্য থাকলে ইংরেজরাও কখনো ভারতের শাসকশ্রেণী হয়ে উঠতে পারতো না।

মুসলমান শাসকরা ইতিহাস থেকে কিছুটা শিক্ষা নিয়ে বুঝতে পেরেছিল যে, সমগ্র ভারত জুড়ে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তাই তারা হিন্দুধর্ম ও মুসলিম ধর্মকে পাশাপাশি অবস্থান করার সুযোগ করে দিয়েছিল। তার ফলে রাষ্ট্রনীতির দিক থেকে ভারতে একটা সমন্বয় ও সম্প্রীতির পরিবেশ গড়ে উঠেছিল।

কিন্তু সামাজিক জীবনে মুসলিম মোল্লা, মৌলবীদের মধ্যে ছিল চরম সংকীর্ণতা। ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব এবং মুসলমানদের নবাবের জাত বলে প্রচার করা হতো। হিন্দুদের

বলা হতো কাফের। জোর করে ধর্মান্তর করাকে মনে করা হতো ধর্মীয় কর্তব্য।

এরূপ পরিস্থিতিতে হিন্দু ব্রাহ্মণ পন্ডিতরা ধর্মরক্ষার নাম করে নতুন নতুন নিয়ম বিধির প্রচলন করেছিল। পুরোহিততন্ত্র হিন্দু সমাজে ধর্মান্ধতা এবং কুসংস্কারকে কঠোরভাবে চাপিয়ে দিয়েছিল।

মধ্যযুগের মাঝামাঝি সময়ে বাংলায় ধর্মান্তরিত করণের কাজ দ্রুতবেগে চলতে থাকে। বহু হিন্দু রাজা রাজ্য রক্ষার জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে রাজ্যের হিন্দু প্রজাদের জোর করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করে। হিন্দু সমাজের চরম সংকীর্ণতা এবং অবহেলার কারণেও নিম্নবর্ণের বহু হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

এই সময় চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে হিন্দু সমাজ রক্ষা পায় এবং হিন্দু মুসলমানের মধ্যে মিলনের এক নতুন সেতুবন্ধন সৃষ্টি হয়। বহু মুসলমান স্বেচ্ছায় বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করে। কিন্তু চৈতন্যদেবের তিরোভাবের পর আবার সেই অন্ধকার যুগ নেমে আসে।

রামমোহনের সময় হিন্দুসমাজে ধর্মান্ধতা এবং কুসংস্কার এমন এক স্তরে নেমে আসে যে, ধর্মের নামে উন্মত্ত হিন্দুরা জোর করে হিন্দু বিধবাদের পুড়িয়ে মারতে থাকে। সতীদাহ প্রথা আরো আগে থেকে প্রচলিত থাকলেও এই সময় অত্যধিক ব্যাপকতা লাভ করে। ধর্মের নামে শিশু বলি দেওয়া, প্রথম সন্তানকে গঙ্গার জলে বিসর্জন দেওয়া, ব্যাপক ভাবে বাল্যবিবাহ প্রচলন করা, এই সময়ের হিন্দু সমাজে প্রবল আকারে প্রচলিত হয়।

মুসলিম শাসকরা এসব ধর্মান্ধতাকে বন্ধ করার কোন উদ্যোগ নেয়নি। ধর্মের নামে এসব অমানবিক ব্যবস্থা আকবরের সময়ও প্রচলিত ছিল। কিন্তু মুসলমান শাসকরা এসব বন্ধ করতে সাহস পান নি

হিন্দুরা রাজনৈতিক বিষয়ে যেমন একেবারে উদাসীন ছিল তেমনি ধর্মীয় ব্যাপারে ভীষণ ঐক্যবদ্ধ ছিল। রাজ্য চলে যাক, জীবনও চলে যাক, তবুও ধর্ম রক্ষা করা প্রধান কর্তব্য। এটাই ছিল হিন্দু রাজা ও প্রজার মানসিকতা।

মুসলমানরা হিন্দু নারীর প্রতি সহজেই প্রলুব্ধ হতো, তাই যৌবন ফোটার আগেই নারীর বিবাহ এবং বিধবাকে পুড়িয়ে মারার বিধান হিন্দুসমাজের সর্বস্তরে সমর্থণ লাভ করেছিল। এছাড়াও সম্পত্তির লোভে বিধবাকে জোর করে পুড়িয়ে মারা

হতো। স্বামীব চিতায জীবন দিলে স্বর্গে গিযে সতী হওযা যায এটাই ছিল ধর্মীয সান্ত্বনা।

বামমোহন সাবা দেশ পর্যটন কবে যখন দেখলেন যে হিন্দুসমাজে এসব কুসংস্কাব সমাজেব সর্বস্তবে এমন গভীব প্রভাব ফেলেছে যে, শাসক শক্তিব আইনী ব্যবস্থা ছাড়া এসব বন্ধ কবা সম্ভব নয এবং একসঙ্গে সবকযটি কুসংস্কাবেব বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওযাও সহজ ব্যাপাব নয। আবাব এসব ব্যবস্থা শুধু আইনেব সাহায্যে নেওযাও সম্ভব নয। প্রযোজন হল শাস্ত্রীয সমর্থণ।

বামমোহনেব এই বাস্তব উপলব্ধিটাই ছিল সে যুগে সম্পূর্ণ নতুন। ইতিহাস প্রমান কবেছে এটাই ছিল সঠিক পথ। বামমোহনই প্রথম শাস্ত্রীয প্রমাণেব দ্বাবা ধর্মীয গোঁড়ামীব প্রাচীব ভেঙ্গে দিযেছিলেন ।

বামমোহন বেদ- বেদান্তেব প্রাচীণ শাস্ত্রীয নির্দেশ গুলোকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ কবে হিন্দু সমাজেব মধ্যে যেমন একটি যুক্তিবাদী গোষ্ঠী সৃষ্টি কবতে পেবেছিলেন, তেমনি ইংবেজ শাসকগোষ্ঠীব একটি অংশেব বিবেক বুদ্ধিকে জাগ্রত কবতে পেবেছিলেন।

ইষ্ট ইন্ডিযা কোম্পানীব দুজন গভর্নব জেনাবেল বামমোহনেব যুক্তি মেনে নিযেও ধর্মীয ব্যবস্থায হস্তক্ষেপ কবতে বাজী হর্ননি। শেষ পর্যন্ত লর্ড বেন্টিংক বামমোহনেব দাবী অনুযাযী সতীদাহ প্রথা বদ কবাব আইন পাশ কবলেন। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীবা লন্ডনেব প্রিভি কাউন্সিলে আপীল কবায তিনিও বিচলিত হযে পডলেন। কাবণ আইনেব বিরুদ্ধবাদীদেব পক্ষে সমর্থক সংখ্যা বেশী ছিল।

বামমোহন কিন্তু বিচলিত হলেন না। কাবণ তিনি বিশ্বাস কবতেন ইংবেজদেব মত একটি সভ্য জাতি এমন একটি বর্বব ব্যবস্থা মেনে নিতে পাবেনা। এরূপ মনোবল নিযেই তিনি লন্ডনে গিযে প্রিভি কাউন্সিলেব বিশিষ্ট সদস্যদেব সামনে শাস্ত্রীয সমর্থণ এবং মানবিক আবেদন পেশ কবলেন। ফলে বিরুদ্ধবাদীদেব আপীল অগ্রাহ্য হযে যায় এবং ভাবতেব বুক থেকে চিবকালেব জন্য সতীদাহেব মত একটি বর্বব প্রথাব অবসান ঘটে। বামমোহনেব মশাল হাতে নিযে আবো দীর্ঘকাল সামাজিক গোঁড়ামীব বিরুদ্ধে লডাই কবতে হবে ।

অবশ্য স্বাধীনতার অর্দ্ধ শতাব্দী পবও ভাবতেব কোন কোন অঞ্চলে সতীদাহ এবং শিশু বলি দেওয়ার ঘটনা ঘটছে। দেশে এখন বৃটিশ শাসন নেই। আধুনিক

শিক্ষায় শিক্ষিত নতুন যুগের আলোক প্রাপ্ত প্রজাতন্ত্রের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। তবুও অপরাধীরা শাস্তি পায়না। তবে সারা দেশব্যাপী প্রতিবাদের আলোড়ন উঠে। এটাই রামমোহনের অবদান।

রামমোহনের যুগে ধর্মান্ধরা সংখ্যায় বেশী ছিল। বর্তমানে ধর্মান্ধদের সংখ্যা তুলনায় কম। কিন্তু প্রায় দুইশ বছরের মধ্যেও গ্রামীণ হিন্দুদের মধ্যে ধর্মীয় কুসংস্কার প্রবল আকারেই রয়েছে মনে হয়।

কিছুকাল আগে রাজস্থানে রূপকানোয়ার নামে এক যুবতী বধুকে জোর করে হাত পা বেঁধে যখন স্বামীর চিতায় তুলে পুড়িয়ে মারা হল তখন শত শত গ্রামবাসী কাঁসা- ঘন্টা বাজিয়ে এ দৃশ্য দেখে পুণ্য অর্জন করেছে। পরে সেখানে সতীমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। হয়তো প্রশাসনের অনুমতি নিয়েই তা হয়েছে। কাজই এখানে অপরাধী খুঁজতে যাওয়া মানে মহাপাপ করা। স্বাধীন ভারতেও ধর্মান্ধরা জনতার ভোটে নির্বাচিত হয়ে সরকারী ক্ষমতার অধিকারী হয় ।

কয়েকটি রাজ্যে শিশুবলির ঘটনা ঘটেছে। কারো শাস্তি হয়েছে কিনা জানা নেই।

এসব ঘটনা দেখে মনে হয়, রামমোহনের যুগ এখনো শেষ হয়নি। পণের দাবীতে বধূহত্যা, যুবতীবধূকে পুড়িয়ে মারার ঘটনা সতীদাহের মত ভয়াবহ রূপে দেখা দিয়েছে স্বাধীন ভারতে।

রামমোহন জীবিত থাকলে আজকের ভারতে এসব নিয়ে বড় ধরণের সামাজিক আন্দোলন গড়ে উঠতো। বর্তমানে রামমোহনের যুক্তিবাদী চিন্তাধারার সমর্থকও কম নয়। এখন লন্ডনে গিয়ে প্রিভি কাউন্সিলে সওয়াল করারও দরকার নেই। দিল্লীতেই রয়েছে ভারতীয় জনগণের পার্লামেন্ট এবং সুপ্রিম কোর্ট। রয়েছে জনকল্যাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। কিন্তু নেই শুধু রামমোহনের মত প্রখর ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানবতাবাদী নেতা। এটাই হল স্বাধীন ভারতের দুর্ভাগ্য।

স্বাধীন ভারতে মুসলিম সমাজে তিন তালাক দিয়ে বিচ্ছেদ ঘটালে স্ত্রী যদি অন্য কাউকে বিয়ে না করে তবে স্বামীকে স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব বহণ করতে

হবে, সুপ্রিমকোর্টের এই আদেশকে বাতিল কবার জন্য প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী সংবিধান সংশোধন করেছিলেন। মুসলিম নারীর এই গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেবার জন্য আইন পাশ করতে ভোট দিয়েছিলেন পার্লামেন্টের অধিকাংশ সদস্য। স্বাধীন ভারতের গণতান্ত্রিক শাসনের ইতিহাসে এটা চিহ্নিত হয়েছে কলংকজনক ঘটনা হিসেবে।

রামমোহন জীবিত থাকলে কি এবকম ঘটনায় চুপ করে থাকতেন? প্রায় দুইশ বছরের যুক্তিবাদী আন্দোলনে মুসলিম সমাজেও কি রামমোহনের মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সমর্থক সৃষ্টি হয়নি?

ভারতীয় গণতন্ত্রে আসলে মানবতন্ত্রের চেয়ে ভোটতন্ত্রেরই প্রভাব অনেক বেশী। সকলেই চেষ্টা করে ভোট ব্যাংক অক্ষুন্ন রেখে নীতি ঠিক করতে। এই সুবিধাবাদই গণতন্ত্রে বিপদ ডেকে আনে।

রামমোহন ইউরোপে গিয়ে প্রথম রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং ভারতেব ভূমিব্যবস্থায কৃষকের দুর্দশা বর্ণনা করে যে সব চিঠিপত্র এবং স্মারকলিপি পেশ কবেছেন তাতে প্রজাদের স্বার্থবক্ষার জন্য প্রজাতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ কবাব কথা বলা হয়েছে। ফ্রান্সেব বিরুদ্ধে ইংলন্ডের নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গীবও সমালোচনা তিনি করেছেন।

রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল ধর্ম, বর্ণ, জাতি এবং ভৌগোলিক সীমানার উর্ধে, সমস্ত দেশের, সব মানুষের, মানবিক অধিকার রক্ষার জন্য যুক্তিবাদী ব্যবস্থা প্রচলন করা।

ভারতে আকবরের সময় হিন্দু- মুসলমানের মধ্যে মিলনের যে প্রয়াস চলেছিল, তা সঠিকভাবে অনুসরণ করলে হয়তো অখন্ড ভারতীয় - জাতীযতাবাদ গড়ে উঠতো।

রামমোহন সেরূপ ঐতিহ্য গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু তা সফল হয়নি। আমরা পেয়েছি খন্ডিত জাতীয়তাবাদ। হিন্দু জাতীয়তাবাদ এবং ইসলামী জাতীয়তাবাদ।

রবীন্দ্রনাথ গোড়া উপন্যাসে রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গীকে অনুসরণ করেই প্রার্থনা করেছেন,— **"আমরা মানবজাতিকে সেই স্থানে লইয়া যাইতে চাই, যেখানে বেদও**

নাই, বাইবেলও নাই, কোরানও নাই, অথচ বেদ- বাইবেল এবং কোরানের সমন্বয়ের দ্বারাই তা করতে হবে।"

ভারতবর্ষে মধ্যযুগে দুই সভ্যতা পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছিল পরস্পরের প্রতি মুখ ফিরিয়ে। তাদের মধ্যে মিশ্রণ ও সমন্বয় ঘটেছে তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য। একদিকে ছিল মুসলমান ধর্মের অসহিষ্ণুতা অন্যদিকে ছিল হিন্দুধর্মের নানা বিধি নিষেধের বেড়াজাল।

উচ্চবর্ণের মুসলমানরা ইংরেজী শিক্ষা বয়কট করেছে। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা ইংরেজী শিখে সরকারী চাকুরী ও ব্যবসা বাণিজ্যে সুযোগ সুবিধা ভোগ করেছে। কিন্তু নিম্নবর্ণের হিন্দুরা এবং মুসলমান কৃষক , শ্রমিকরা ইংরেজী শিক্ষার কোন সুযোগই পায়নি। ফলে সৃষ্টি হয়েছিল গ্রাম ও শহরের মধ্যে বিরাট ব্যবধান, যা আজও বর্তমান।

এদেশের শিক্ষানীতি যা প্রচলিত হয়েছে, তা রামমোহনের শিক্ষাচিন্তার আংশিক প্রতিফলনমাত্র। আশা করা গিয়েছিল স্বাধীনতার পর রামমোহনেব চিন্তাধারা গুরুত্ব পাবে। অখন্ড ভারতীয় সংস্কৃতির মূল্যবোধ গড়ে উঠার মতো শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠবে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা ঘটছেনা।

ইংরেজী শিক্ষার প্রথম যুগে ইয়ংবেঙ্গল কালচার গ্রপ যে ভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তীব্র অবজ্ঞা প্রকাশ করে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, ঠিক তেমনি ভাবে সাম্প্রতিক কালে ইয়াংকি কালচার নতুন প্রজন্মের যুবক যুবতীদের ভারতীয় সমাজ থেকে বিছিন্ন করে ফেলছে।

তাই রামমোহনের আদর্শকে নতুন করে স্মরণ করা জরুরী প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের প্রকৃত ভারতীয় জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলার অত্যাবশ্যক মনে হচ্ছে। আমাদের শিক্ষা সংস্কৃতির মূল্যায়ন ছাড়া ভারতীয় সভ্যতার প্রকৃত আদর্শ স্থাপন করা যাবেনা। এবিষয়ে রামমোহন আমাদের স্মরণীয় আদর্শ। রামমোহনের রচনাবলী নতুনভাবে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে । এই পর্যালোচনা সরকারী এবং বেসরকারী উভয় স্তরেই হওয়া প্রয়োজন ।

রামমোহনের কয়েকটি চিঠি ও স্মারক লিপির নিদর্শণ

রামমোহন ইংরেজ বন্ধুদের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে মতামত জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন এবং সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে কিছু স্মারক লিপি পেশ করেছেন, যা থেকে রামমোহনের ভারতীয়ত্ববোধ, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী, এবং জনগণের প্রতি কর্তব্যবোধেব পরিচয় পাওযা যায় । তার কিছু নির্দশণ পর্যালোচনা কবলেই রামমোহনের চরিত্রের আসল পরিচয় এবং মানসিকতা, উপলব্ধি করা যায় ।

রামমোহন রায় লর্ড বেন্টিংক্ষ এর কাছে ভাবতের ভূমি ব্যবস্থা, কৃষকের দুর্দশা এবং প্রতিকারের প্রস্তাবসহ একটি স্মারকলিপি পেশ কবেছিলেন । তার থেকে প্রাসঙ্গিক কিছু কিছু অংশ নিম্নরূপ ।

Rammohan Ray's Memorandum on the system of Land holding in British India

It is an undeniable fact that during the former Government such class of persons as are now termed proprietors of land and such as are called Ryots or common cultivators of the soil stood practically on an equal footings both as to the uncertainty of assessment on the lands in their hands and liability to be dispossessed of them on failure to meet the demand of a higher authority.

The British Government of Bengal conforming to established usage acted on this system until so late as 1793, when with a view to facilitate the collection of the revenue and to afford to the Land holders fair encouragement to

improve their respective estates, the permanent settlement with them was established assessing each estate for perpetuity at a particular annual sum payable to Government by ir stalments. This system has emply met the wishes of Government and has exceeded the hope of advantage then entertained by the land holders themselves.

Waste Lands have been cultivated on every direction and the rents payable by the Ryots have been raised to a great extend under various pretences on the part of the land holders, so that many estates yield at present double the revenue paid to the Government by the propiertors.

Nevertheless the Land holders have not directed to ameliorate the condition of that most numerous idigent class of British subjects called Ryots in admitting them to a participation in the extensive benefit they themselves enjoy from the perpetual settlement.

After continued succéssful exertions by the Zumeendars during a period of 36 yrs (1773 - 1829) to raise the rent of lands in their respective e' tates, they cannot understand the present state of things.

It is now desirable that Government should adopt such measures as may be best calculated to secure the rights and independence of the Ryots without depriving the Zumeendars of those revenues hitherto permitted to appropriate to themselves.

It is accordingly suggested that in the first instance every land holder should be required to prepare a correct

statement, containing under the title of each estate he may hold and the rent for each portion and lastly the name of the cultivator by whom the rent is actually paid. The land holder should be also required to deliver a copy of the statement to the collector of the District.

When the collector is satisfied of the accuracy of the statement he should affixe his signature to every page of the statement.

The land holder should then be required to grant leases duly attested by the collector and should be declared perpetual to the individuals concerned and their heirs and assignees after a counterpart contract entered by that party. **No powers should be given to the Landholders which can enable them to harsass the Ryots.**

Every Zuminder should be strictly prohibited under penalty and confinement from demanding of the Ryots under the name of subscriptions, for granting permission for the perfomance of marriages or any other religious ceremony, any payment beyond what is specfied in their puttas.

Zuminders should be publicly informed that in case of failure in rendering the statement and leases required within six months, no complaint for the recovery of arrears of revenue from the Ryots shall be recognised in any Judicial Court.

সে যুগের সামাজিক পরিস্থিতিতে রামমোহনের এই স্মারক লিপি কৃষকের স্বার্থ এবং নিরাপত্তার নিশ্চিত ব্যবস্থারই বলিষ্ঠ দাবীরূপে গণ্য হয়েছে। জমিদাররা ক্ষিপ্ত হয়েছে। কিন্তু রামমোহন লন্ডনে গিয়েও সিলেক্ট কমিটিতে স্মারক লিপির

পক্ষে আরো তথ্য এবং দলিল হাজির করে বলিষ্ঠ বক্তব্য রেখেছিলেন ।

সে যুগের বিরুদ্ধবাদী জমিদার শ্রেণীর অস্তিত্ব এখন আর নেই । কিন্তু রামমোহনের প্রগতিশীল চিন্তাধারাকে অগ্রাহ্য করার মানসিকতা সম্পন্ন বিরুদ্ধবাদীরা এখনো আছেন ।

লন্ডনের সুপরিচিত সমাজতন্ত্রী রবার্ট ওয়েনের পুত্রকে লেখা এক চিঠিতে রামমোহন সমাজতন্ত্র সম্পর্কে নিজের মনোভাব প্রকাশ করেছেন । সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ধর্মকে বর্জন করার কোন প্রকার যুক্তি বা প্রয়োজনীয়তা আছে বলে রামমোহন মনে করতেন না ।

48 Bedfored
April 19th - 1833

Dear Sir,

I think you will agree that - it is not necessary either in England or America to oppose Religion in promoting the social domestic and political welfare of their inhabit-ants. particularly a system of religion which inculcates the doctrine of Universal love and charity.

B)Did such philanthropists as Locke or Newton op-pose Religion ? No, they rather tried to remove the perver-sions gradually introduced in Religions.

I grieve to observe that by opposing religion your most benevolent Father has hitherto impeded his success.

He, I sriously Believe is a follower of christianity in the above sense though he is not aware of being so.

Two thousand years ago wise and pious Brahmans of India entertained almost the same opinions which your father offers though they by no means were destitudes of religion.

এই চিঠিতে বামমোহন উপনিষদেব যুগে হিন্দুদের মানবিক চিন্তাধারাব সঙ্গে আধুনিক সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধাবাব মিল খুঁজে পাচ্ছেন । এভাবে প্রতিটি লেখায বামমোহন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যেব মিল খুঁজে খুঁজে আধুনিক চিন্তাধাবাব সমন্বয় সাধনের চেষ্টা কবেছেন ।

রামমোহনের স্বদেশ প্রেম বিশ্বপ্রেমে রূপান্তরিত হয়েছিল। ভারতীয় হিন্দু ধর্ম মানবধর্ম রূপে বিকশিত হয়েছিল। বিশ্বের সব ধর্মের গোঁড়ামী ও অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যুক্তিবাদী সংগ্রামী রূপে রামমোহনের জীবন আমাদের কাছে চিরস্মরণীয় আদর্শ রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
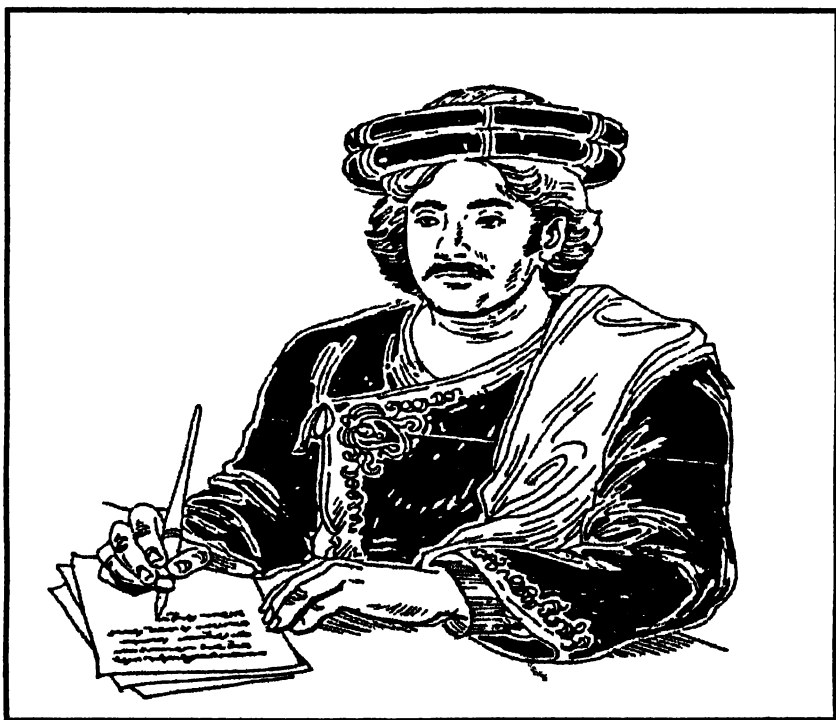
রাজা রামমোহন রায়
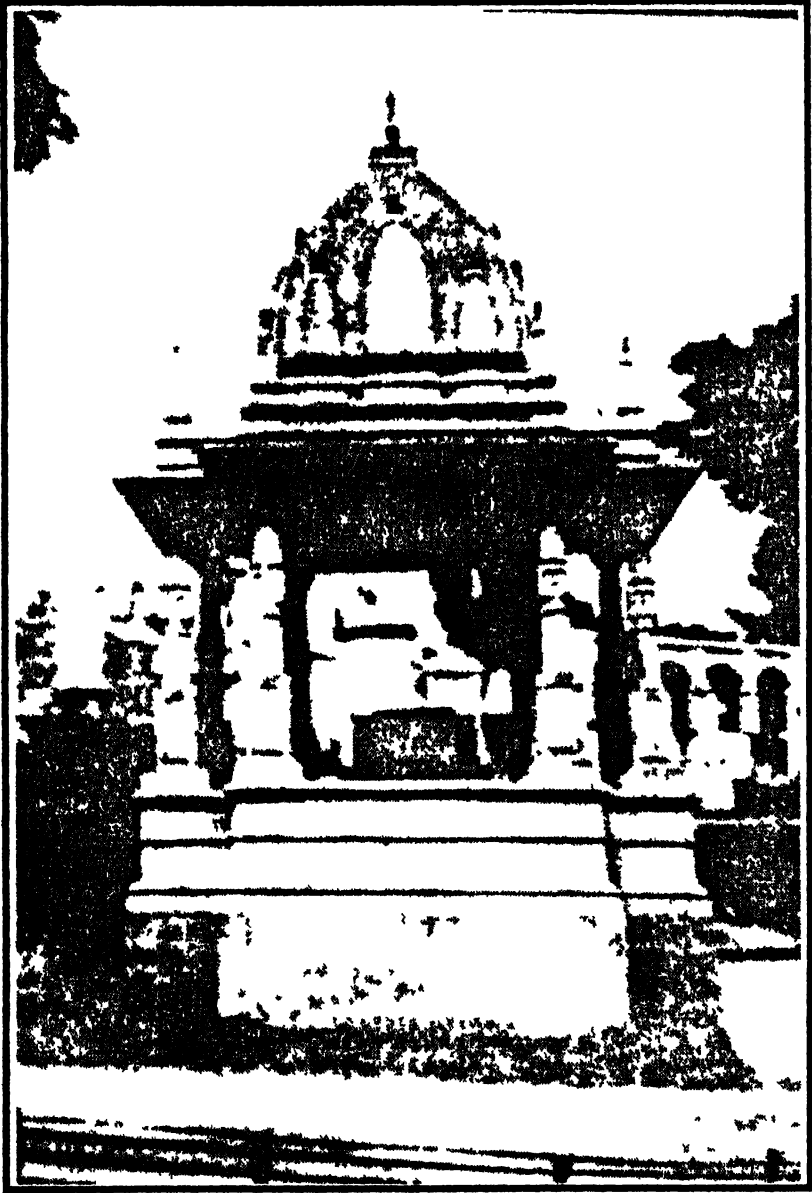
ব্রিস্টলে রামমোহনের সমাধি মন্দির

নবযুগের সমাজবিপ্লবী
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
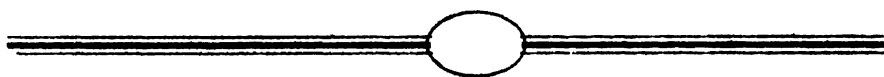
মনুষ্যত্ব অর্জন এবং চরিত্র গঠনের জন্য যারা মানবিক আদর্শ স্থাপন করে গেছেন তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে।

দীনেশ চন্দ্র সাহা
গ্রন্থকার

ভূমিকা

উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের অন্যতম মহানায়ক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আজকের ভারতে অতি সুপরিচিত একটি নাম। কিন্তু তিনি যে আদর্শ, যে মনুষ্যত্ববোধ, যে স্বদেশ প্রেম দেশবাসীর সামনে দৃষ্টান্ত স্বরূপ রেখে গেছেন তা আজ ক্রমশ: ম্লান হয়ে যাচ্ছে। জাতি যেন জাতীয় জীবনের আদর্শকেই ভুলে যাচ্ছে। মনুষ্যত্ববোধের মহান আদর্শ হারিয়ে যাচ্ছে। স্বদেশ প্রেম যেন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাচ্ছে।

বিদ্যাসাগর বিশ্বাস করতেন, শিক্ষার মূল লক্ষ্য চরিত্র গঠন । এই উদ্দেশ্যে তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের জীবন চরিত পাঠ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বাধ্যতা মূলক করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের এই আদর্শ চিন্তা চিরকালই আমাদের জাতীয় জীবনে অত্যাবশ্যক অনুকরনীয় বিষয় বলে গণ্য হবে।

বিদ্যাসাগরের চিন্তায় শিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হল মনুষ্যত্ব অর্জন। কিন্তু স্বাধীন ভারতে এ দিকটি বিশেষভাবে অবহেলিত হচ্ছে। আজকের সমাজে তীব্র প্রতিযোগিতায় অন্য সবাইকে পেছনে ফেলে দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়াই হচ্ছে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী ও অভি ভাবকদের একমাত্র লক্ষ্য। এর ফলে সামাজিক বন্ধন এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের মধুর সম্পর্ক ভেঙ্গে যাচ্ছে। সামাজিক মনের উৎকর্ষতার পরিবর্তে স্বার্থপরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিদ্যাসাগর সারা জীবন সমাজের কল্যাণে এবং অবহেলিত মানুষদের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। মানুষের প্রতি ভালবাসায় হৃদয় পূর্ণ করে মানব সেবার আদর্শ স্থাপন করেছেন।

বিদ্যাসাগরের মত মহান চরিত্রের মানুষদের জীবনকথা যত বেশী পাঠকের কাছে পৌছে দেওয়া যায় তত বেশি সমাজের ও দেশের মঙ্গল হবে। এই ভরসাতেই আমার এই গ্রন্থ রচনার প্রেরণা লাভ করেছি।

নতুন প্রজন্মের কিছু পাঠকও যদি এ গ্রন্থ পাঠ করে উপকৃত হয়, তবেই আমার শ্রম ও প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

যারা আমাকে এ গ্রন্থ রচনায় বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন তাদের সকলকেই আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আগরতলা
জানুয়ারী ২০০৬

দীনেশ চন্দ্র সাহা
গ্রন্থকার।

সূচীপত্র

বীরসিংহ গ্রামের ঈশ্বরচন্দ্র

বর্তমান মেদিনীপুর জেলার এক অখ্যাত গ্রাম বীরসিংহ। ১৮২০ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বরের দুপুর বেলায় এই গ্রামেব এক দরিদ্র কুলীন ব্রাহ্মণ ঠাকুর দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন। এই ঈশ্বরচন্দ্র যখন বিদ্যাসাগর হয়ে সারা দেশ আলোড়িত করেন এবং দেশবাসীকে মনুষ্যত্ব অর্জনের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন, ঠিক তখনই বীরসিংহ গ্রামটি ভারতের ইতিহাসে চিরস্থায়ী গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সাবা ভাবতে এমন অনেক অখ্যাত গ্রাম বয়েছে যেখানে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির উজ্জ্বল জোতিষ্কবা জন্মগ্রহণ কবে অখ্যাত গ্রাম গুলোকে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিবস্থায়ী আসনে প্রতিষ্ঠিত কবে গেছেন।

ঈশ্ববচন্দ্রেব জন্ম মুহুর্তে পিতা ঠাকুরদাস বাড়ীতে ছিলেননা। বিশেষ প্রয়োজনে গ্রামের হাটে গিয়েছিলেন। দাদু বামজয় তর্কভূষণ সদ্যজাত নাতিব ছটফটানি দেখে অবাক হলেন। মনে হল শিশুটি হাত পা ছুঁড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ছুটতে চাইছে। তিনি খুশীতে উচ্ছ্বাসিত হয়ে ঘোষণা কবলেন, এই নাতিটি অসাধারণ ব্যক্তি হবে। বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে। খববটা পুত্র ঠাকুরদাসকে দেবার জন্য হাটের দিকে ছুটতে লাগলেন।

পথেই ঠাকুব দাসেব সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তিনি ঠাকুর দাসকে বললেন. আমাদের বাড়ীতে একটা এঁড়ে বাছুর হয়েছে, তাড়াতাড়ি বাড়ী চল।

ঠাকুরদাস বাড়ীতে ঢুকেই গোয়াল ঘরের দিকে ছুটলেন। কারণ এঁড়ে বাছুর গোয়াল ঘরে থাকারই কথা। এই সময় একটি গাভী আসন্ন প্রসবা ছিল।

রামজয় পন্ডিত ছেলেকে ডেকে বললেন, ওরে, ওখানে নয়, আমাদের ঘরে এসে দেখ। ঠকুরদাস পুত্রের মুখ দেখে আনন্দে বিহ্বল হলেন।

একজন জ্যোতিষীর গণনা অনুযায়ী ভগবতী দেবীর গর্ভে ঈশ্বরের অনুগৃহীত এক তেজস্বী পুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে বলে পুত্রের নাম রাখা হয় ঈশ্বরচন্দ্র। দাদু রামজয় তর্কভূষণ নিজেকে ঈশ্বরচন্দ্রের দীক্ষাগুরু বলে ঘোষণা করেন।

রামজয় তর্কভূষণের আদি বাড়ী ছিল হুগলী জেলার বনমালীপুর গ্রামে। দরিদ্র হলেও তারা ছিলেন বিখ্যাত পন্ডিত বংশ। রামজয়ের পিতা ভুবনেশ্বর তর্কালঙ্কার

' ামে চতুষ্পাঠীতে ছাত্র পড়িয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

রামজয়ের পিতার মৃত্যুর পর ভুবনেশ্বরের পাঁচ পুত্রের মধ্যে বিরোধ খুব তীব্রভাবে ' ব্খা দেয়। তখনো যৌথ পরিবার ছিল। রামজয় ছিলেন ভাইদের মধ্যে তৃতীয়। ব' দুই ভাইয়ের জ্বালাতন সহ্য করতে না পেরে তেজস্বী রামজয় পরিবার বাড়ীতে রেখেই ৃহত্যাগ করেন। তিনি আশা করেছিলেন তাঁর অনুপস্থিতিতে ভাইয়েরা যৌথ পরিবারের ায়িত্ব পালন করবে। স্ত্রী ও পুত্র কন্যাদের কোন অসুবিধা হবে না।

রামজয়ের স্ত্রী দুর্গাদেবী বুঝতে পারলেন যে, এই পরিবারে থেকে তিনি শুধু লাঞ্ছনাই ভোগ করবেন। পুত্র কন্যাদের শিক্ষার কোন উপায় করতে পারবেন না। তাই তিনি বীরসিংহ গ্রামে পিতা উমাপতি তর্ক সিদ্ধান্তের আশ্রয়ে চলে এলেন। কিন্তু এখানেও ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধুরা সাতজনের একটি পরিবাবের দায়িত্ব নিতে রাজি হলেন না।

শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ পিতা গ্রামের একখন্ড জমিতে কন্যার জন্য একটি বাড়ী তৈরী করে দিলেন। দুর্গাদেবী দুই নাবালক পুত্র ঠাকুরদাস এবং কালীদাস এবং চার কন্যাকে নিয়ে চরকায় সূতা কেটে অতি কষ্টে এই বাড়ীতে জীবন অতিবাহিত করতে লাগলেন। বৃদ্ধ পিতা মাঝে মাঝে কিছু সাহায্য করতেন।

ঠাকুরদাস গ্রামের পাঠ শালার পাঠ শেষ করে মা-ভাই-বোনদের রক্ষা করার জন্য অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে কলকাতায় এসে এক আত্মীয় বাড়ীতে আশ্রয় পেলেন। এই বাড়ীতে একটি চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু তখনকার কলকাতায় অল্প কিছু ইংরেজী শব্দ শিখলেই ইংরেজ বণিকদের অফিসে কাজ পাওয়া যেত।

ঠাকুরদাসের পক্ষে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অর্থ উপার্জনের উপায় করা প্রয়োজন। অবস্থা বুঝে আশ্রয়দাতা আত্মীয়টি এক বন্ধুর কাছে ঠাকুরদাসকে পাঠালেন, যাতে কাজ চলার মত ইংরেজী শেখা যায়। ভদ্রলোক চাকরী করতেন বলে সন্ধ্যার পর ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা হল।

ঠাকুরদাস গভীর মনোযোগ দিয়ে ইংরেজী শিখতে শুরু করেন। কিন্তু বাড়ী ফিরতে বেশী রাত হত বলে রাতের খাবার পাওয়া যেতনা। ইংরেজী শিক্ষক লক্ষ্য করলেন যে, ঠাকুবদাসের শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তিনি এর কারণ জানতে চাইলেন।

ঠাকুরদাস ছিলেন অত্যন্ত সত্যবাদী। তিনি সত্য কথাটিই বললেন। সেখানে উপস্থিত এক ভদ্রলোক ঠাকুরদাসের দুর্গতির কথা শুনে প্রস্তাব দিলেন — যদি রান্না করে খেতে রাজী থাক তবে আমার সঙ্গে থাকতে পার। ভদ্রলোক, একটি ইংরেজ কোম্পানীর দালালী করতেন, একলাই থাকতেন। ঠাকুরদাস এই প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলেন।

কিন্তু কিছুদিন পরই ভদ্রলোকের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায়। দুবেলা খাবার জুটতোনা। মাঝে মাঝে না খেয়েই থাকতে হতো। একদিন পথ চলতে চলতে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে ঠাকুরদাস এক বিধবা দোকানীর কাছে একটু পাণীয় জল চাইলেন। ঠাকুরদাসের চেহারা দেখেই মহিলাটি বুঝতে পারলেন, সারাদিন খাওয়া হয়নি। জলের সঙ্গে কিছু মুড়কি খেতে দিলেন। মহিলার এই করুণা মূর্তি দেখে ঠাকুরদাস সব দুঃখ ভুলেগেলেন। মায়ের ছবিটি চোখের সামনে ভেসে উঠলো। বিধবা মহিলাটি সমাদর করে বললেন, যখনই অসুবিধা হবে তখনই এখানে চলে আসবে।

ঈশ্বর চন্দ্র পিতার কাছ থেকে এই কাহিনী শুনে নারী জাতীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় মাতা নত করেন। নিজের আত্মজীবনীতে এসব ঘটনা তিনি উল্লেখ করেছেন। এসব ঘটনার কথা মনে পড়লেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়তেন।

ঠাকুরদাস ১৫ বছর বয়সে কলকাতায় আসেন। কয়েকমাস কঠোর পরিশ্রম করে কিছু ইংরেজী শব্দ আয়ও করেন। ফলে মাসিক দুইটাকা বেতনের একটি চাকুরী পেয়ে যান। এই দুটি টাকা হাতে পেয়েই প্রতি মাসে মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। নিজে কষ্ট করেই চলতেন। অল্পদিন পরেই কাজের দক্ষতার জন্য মাসিক বেতন হয় পাঁচ টাকা। প্রায় দুইশ বছর আগে এদেশে পাঁচ টাকায় একটি দরিদ্র পরিবারের খাওয়া পড়ার ব্যবস্থা করা যেত। ঐ সময় এক টাকায় দেড় মন চাউল পাওয়া যেত।

এই সময় ঠাকুরদাসের পিতা রামজয় তর্কভূষণ সন্ন্যাসী বেশে তীর্থ ভ্রমণ করছিলেন। একঁদিন স্বপ্নে দেখলেন তাঁর অভাবে স্ত্রী-পুত্র-কন্যারা ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে। তিনি নিজ গ্রামে ফিরে এসে সব খবর জানলেন। বীরসিংহ গ্রামে এসে সবার সঙ্গে মিলিত হলেন এবং পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। রামজয় ছিলেন বলিষ্ঠ, সাহসী এবং তেজস্বী পুরুষ। তাঁকে কাছে পেয়ে পরিবারে শান্তি ফিরে এল।

ঐ সময় গ্রামাঞ্চলে প্রায়ই ডাকাতি হতো। রামজয় একটি লোহার ডান্ডা হাতে নিয়ে একাকী ঘুরে বেড়াতেন। একবার একটি ভালুকের আক্রমণে ক্ষত বিক্ষত হয়েও লোহার ডা ন্ডা দিয়ে ভালুকটি হত্যা করেন। এই সাহসী পুরুষকে সবাই সমীহ করতো।

রামজয় জ্যেষ্ঠপুত্র ঠাকুরদাসকে দেখার জন্য কলকাতায় এলেন। পূর্ণ বয়স্ক যুবক পুত্রকে দেখে অভিভূত হলেন। অচিরেই পুত্রের বিবাহের ব্যবস্থা করলেন এবংএক বন্ধুর সাহায্যে ঠাকুরদাসের জন্য মাসিক ৮ টাকা বেতনের একটি চাকুরীরও ব্যবস্থা করলেন। ঠাকুরদাসের কষ্ট দূর করার জন্য বড় বাজারে তর্কভূষণের এক বন্ধু ভাগবত চরণ সিংহের বাড়ীতে ঠাকুরদাসের থাকার ব্যবস্থা করেন।

কিছুদিনের মধ্যেই গোঘাট গ্রামের রামকান্ত তর্কবাগীশের দ্বিতীয়া কন্যা ভগবতী

দেবীর সঙ্গে ঠাকুরদাসের বিয়ে দিলেন। ভগবতী দেবী ছিলেন যেমন সুন্দরী তেমনি গুণবতী। তাদেরই প্রথম পুত্র হলেন ঈশ্বরচন্দ্র।

ছোটবেলায় ঈশ্বরচন্দ্র খুবই দুরন্ত প্রকৃতির ছিলেন। দাদু রামজয়ের বর্ণনা অনুযায়ী গরুর এঁড়ে বাছুরের এক গুঁয়েমির মতই ঈশ্বরচন্দ্রের চরিত্র বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছিল।

এই একগুয়েমি স্বভাবের জন্যই বিদ্যাসাগরের বহুমুখী প্রতিভার বিস্ফোরণ ঘটেছিল। নতুবা হয়তো একজন শ্রেষ্ঠ পন্ডিত হিসেবেই তিনি জীবন কাটাতেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনে ও স্বভাবে দাদু রামজয় তর্কভূষণের তেজস্বিতা, বাবা ঠাকুরদাসের কঠোর শৃঙ্খলাবোধ ও কর্তব্য পরায়নতা, এবং মাতা ভগবতী দেবীর অতি কোমল হৃদয়ের অসাধারণ দানশীলতা ইত্যাদি গুণের সমাবেশ ও বিকাশ ঘটেছিল।

ঈশ্বরচন্দ্র পাঁচ বছর বয়সে গ্রামের পাঠশালায় ভর্তি হন। গুরুমশায় সনাতন বিশ্বাস ছিলেন অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির লোক। প্রতিটি ছাত্রকে সামান্য ত্রুটির জন্যও অসামান্য শাস্তি দিতেন। ঠাকুরদাস এসব শুনে গ্রামেরই আরেক পন্ডিত কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়কে দিয়ে একটি পাঠশালা খুলে নিজের পুত্রকেই প্রথম ভর্তি করে দেন। অল্প দিনের মধ্যেই এই পাঠশালা সকলের প্রশংসা লাভ করে।

ঈশ্বরচন্দ্র মাত্র তিন বছরে গ্রামের পাঠশালার পাঠ সম্পূর্ণ করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেন। অন্যেরা সাধারণতঃ এই শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে পাঁচ বছর সময় নেয়।

ঈশ্বরচন্দ্রের অসাধারণ মেধার পরিচয় পেয়ে ঠাকুরদাস কলকাতায় নিয়ে উচ্চ শিক্ষা দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন। পন্ডিত কালীকান্তও এই সিদ্ধান্তে খুশী হলেন।

গুরু কালীকান্ত ঈশ্বরচন্দ্রকে নিজের সন্তানের মতই স্নেহ করতেন। কোলে বসিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত নানা বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। তারপর নিজে সঙ্গে করে নিয়ে বাড়ীতে মায়ের কাছে পৌঁছে দিতেন।

ঈশ্বরচন্দ্র সব সময় নিজে যা ভাল বুঝতেন তাই করতেন। অন্যের পরামর্শকে গ্রাহ্য করতেন না। যে কাজ করতে নিষেধ করা হতো, তিনি সে কাজটি করার জন্যই জেদ ধরতেন। তাই সব সময় যে কাজ করতে হবে ঠিক তার বিপরীত নির্দেশ দেওয়া হতো। যেমন, যেদিন পরিষ্কার কাপড় পরা দরকার, সেদিন ময়লা কাপড় পরতে বলা হতো। সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র পরিষ্কার কাপড় পরার জেদ ধরতেন। পিতা-মাতা এবং দাদুর এই কৌশল যখন বুঝে ফেলতেন তখন তিনি নিজের ইচ্ছে মত কাজ করতেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স যখন আট বছর তখন দাদু রামজয় তর্কভূষণ পরলোক প্রাপ্ত হন। খবর পেয়ে ঠাকুরদাস কলকাতা থেকে বাড়ীতে আসেন। শ্রাদ্ধ কাজ সম্পন্ন হবার পর ঈশ্বরচন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় রওনা হন। সেকালে রাস্তাঘাট ভাল

ছিলনা। রেলপথও তখন ছিলনা। বীরসিংহ গ্রাম থেকে কলকাতা পর্যন্ত দীর্ঘপথ হেঁটে যেতে হবে।আট বছর বয়সের শিশু ঈশ্বরচন্দ্রকেকাঁধে করে নেবার জন্য একজন বাহক সঙ্গে নেওয়া হল। পন্ডিত কালীকান্তও তাদের সঙ্গী হলেন।

সে কালে এত কম বয়সে কেউ নিজের সন্তানকে গ্রামের বাইরে পড়াশোনা করতে পাঠাতেন না। ভগবতী দেবী খুব কান্নাকাটি করেও ঠাকুরদাসের সিদ্ধান্ত পাল্টাতে পারেননি।

ঠাকুরদাসের সাতপুত্র এবং তিনকন্যা জন্মে ছিল। তারা সকলেই গ্রামের পাঠশালা থেকে পড়াশোনা শেষ করেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র যখন বিদ্যাসাগর হয়ে অর্থ উপার্জন শুরু করেন, তখন ভাইদের একে একে কলকাতায় নিয়ে উচ্চ শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। শুধু সহোদর ভাইদেরই নয়, অন্যান্য আত্মীয়দেরও পড়াশোনার ব্যবস্থা করেছিলেন।

ভগবতীদেবীর আশঙ্কার কারণ ছিল দুটি, প্রথমতঃ তখন উচ্চ বর্ণের ছেলেরা কলকাতায় গিয়ে খ্রীষ্টান হয়ে যেত। দ্বিতীয়তঃ গ্রামে আর্থিক অভাব থাকলেও খাবার জুটে যেত। কিন্তু কলকাতায় অনাহারে, অর্ধাহারে থেকে স্বাস্থ্য ভঙ্গের ঘটনা ঠাকুরদাসের বেলায়ও ঘটেছে। প্রথমপুত্র হিসেবে ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন সকলেরই খুব আদরের পাত্র।

ভগবতী দেবীর দ্বিতীয় আশংকাটি মিথ্যা ছিলনা। প্রথম যাত্রায় ছযমাসের মধ্যেই ঈশ্বরচন্দ্র পেটের অসুখে আক্রান্ত হয়ে গ্রামে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। পিতার মতই কঠোর দারিদ্রের মধ্যে কলকাতার পাঠ্য জীবন কেটেছিল। কিছুকাল বীরসিংহ গ্রামে থেকে স্বাস্থ্য উদ্ধার হবার পর, ঈশ্বরচন্দ্র বাবার সঙ্গে আবার কলকাতায় আসেন। দাদুর বন্ধু ভাগবতীচরণ সিংহের আশ্রয়ে সকলের যত্নে ও আদরে ঈশ্বরচন্দ্রের নুতন জীবন শুরু হয়।

ঠাকুরদাসের মাসিক আয় ছিল মাত্র আট টাকা। বীরসিংহের বিরাট পরিবার এবং কলকাতায় পিতা-পুত্রের সংসার চালানো সত্যিই খুব কঠিন ছিল।

কিন্তু নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়েই ঠাকুরদাস বুঝেছিলেন, ইংরেজী শিক্ষা থাকলে কলকাতায় একটা চাকুরী পাওয়া মোটেই কঠিন কাজ নয়। গ্রাম থেকে দলে দলে মানুষ তখন কলকাতায় ছুটে আসছে ভাগ্য পরিবর্তনের আশায়।

ঠাকুরদাস কলকাতায় এসেছিলেন ১৫বছর বয়সে। অনেক কষ্ট তিনি সহ্য করেছেন। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স মাত্র আট বছর। এরকম একটি শিশুর যত্ন নেওয়ার পরিবর্তে কষ্টের জীবনে অভ্যস্ত করে তোলা বোধ হয় সেকালের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থারই ফল।

কলকাতার পথে ঈশ্বরচন্দ্র

১৮২৮ সালের নভেম্বর মাসে ঈশ্বরচন্দ্র মাত্র আট বছর বয়সে গ্রামের সীমানা থেকে অচেনা জগতে পা বাড়ালেন। আনন্দে, উচ্ছ্বাসে প্রাণ ভরে উঠলো। মা ও ঠাকুরমার চোখের জল পথের বাধা হলোনা। গ্রামের প্রতি আকর্ষণও ছিল খুব। মাঝে মাঝে বাড়ী আসবেন বলে সবাইকে আশ্বাস দিলেন। তিনি যে গ্রামটিকে ভালবাসতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় পরবর্তী কালে, গ্রামের উন্নতির জন্য যে সব কাজ করেছেন তার মধ্যে।

শৈশবে ঈশ্বরচন্দ্র দুরন্ত হলেও সকলের স্নেহ ভালবাসা পেয়েছেন। দুরন্তপনাকে গ্রামের মানুষ বিশাল প্রতিভার লক্ষণ বলেই গণ্য করেছে। চৈতন্য দেবও ছোট বেলায় প্রচন্ড রকমের দুরন্ত ছিলেন। তাঁর জীবনীকাররা দুরন্তপনার বহু দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ করেছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র দুরন্ত হলেও পড়াশোনায় ছিলেন অত্যন্ত মনোযোগী। একবার যা পড়তেন বা, শোনতেন তা কখনো ভুলতেন না। এই মেধার জন্যেই তিনি সকলের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন।

সেকালে কলকাতাকে কেন্দ্র করে যোগাযোগ ব্যবস্থা সবে মাত্র শুরু হয়েছে। ১৮২৮ সালে ঈশ্বরচন্দ্র যখন বীরসিংহ গ্রাম থেকে কলকাতায় যাচ্ছিলেন তখন সর্বত্র রাজপথ ছিলনা। ভারতে রেলপথ চালু হয়েছে আরো পঁচিশ বছর পরে ১৮৫৩ সালে।

তখনকার গ্রামাঞ্চলে চোর ডাকাতের ভয় ছিল সর্বত্র। তাই দিনের বেলায় দল বেঁধে হাঁটাচলা করাই ছিল নিয়ম। পথে পথে যে সব গ্রামে আত্মীয় স্বজনের বাড়ী থাকতো সেখানে রাত কাটিয়ে, পরদিন ভোর বেলায় আবার যাত্রা শুরু হতো। কোন কোন গ্রামে পান্থশালা ছিল। সেখানেও আশ্রয় পাওয়া যেত।

পথে পথে ঈশ্বরচন্দ্র অবাক বিস্ময়ে প্রকৃতির নানা দৃশ্য খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার চেষ্টা করলেন। শিশু মনে কৌতুহলের সীমা নেই। মাঝে মাঝে নানা প্রশ্ন করে বাবার কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয় জেনে নেবার চেষ্টা করেন। বাবা কখনো খুশী মনে উত্তর দেন আবার কখনো বিরক্ত হয়ে ধমক দেন। ঈশ্বরচন্দ্রের প্রশ্নের মধ্যে এমন একটা আবেদন থাকতো যে উত্তর না দিয়ে উপায় নেই।

প্রথমবার কলকাতায় আসার সময় একজন বাহকের কাঁধে চড়ে আট বছরের বালক ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতার পথে যাত্রা করেছিলেন। মাঝে মাঝে কাঁধ বদল করে এবং কোন কোন পান্থশালায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হচ্ছিল। রাত্রিতে কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে বিশ্রাম নিয়ে পরদিন ভোরে আবার পথ চলা শুরু হতো। এভাবে দুদিনের পথ অতিক্রম করার পর সিয়াখালায় সালিখার বাঁধা রাস্তায় এসে মনে হলো কলকাতার কাছে আসা হল। এ যাত্রায় প্রথম রাতের বিশ্রাম নিতে হয়েছিল খানাকোলের কাছে ঈশ্বরচন্দ্রের মামার বাড়ীতে।

পাকারাস্তায় বাটনা বাটা শিলের মত পাথর রাস্তার ধারে পোতা দেখে বালক ঈশ্বরচন্দ্রের কৌতুহল হল , এটা কি জানার জন্য। বাবাকে প্রশ্ন করে জানা গেল এটাকে মাইলস্টোন বলে।

ঈশ্বরচন্দ্র আবার প্রশ্ন করলেন মাইলস্টোন কি ? বাবা ঠাকুরদাস উত্তর দিলেন মাইলস্টোন হল ইংরেজী শব্দ। এক মাইল হল আধক্রোশ রাস্তা, স্টোন শব্দের অর্থ পাথব। এই রাস্তার আধক্রোশ অন্তর অর্থাৎ প্রতি মাইলে একটি করে এরকম পাথর পোতা আছে। এই পাথবে এক, দুই, তিন ইত্যাদি ইংবেজী অংক খোদাই করা আছে। এখানে এই পাথবটিতে ঊনিশ লেখা আছে। এটা দেখে লোকে বুঝতে পারে এখান থেকে কলকাতা ঊনিশ মাইল দূরে আছে। পাথরে খোদাই করা অংকটা দেখবার জন্য ঠাকুরদাস পুত্রকে পাথবটির কাছে নিয়ে গেলেন।

বালক ঈশ্বরচন্দ্রের মাথায একটা বুদ্ধির বিদ্যুৎ বিচ্ছুড়িত হল। বাংলায় একের পিঠে নয দিযে ঊনিশ লেখা হয়। তাহলে এই পাথরে ইংরেজী এক এবং নয় দুটি অংক শেখা হযে গেল।

ঈশ্ববচন্দ্র বাবাকে বললেন, তাহলে এর পরের পাথরে আঠার এবং পরেরটিতে সতের এভাবে ইংরেজী অংক গুলো দেখতে পাব। এভাবে কলকাতায পৌঁছে আমরা এক অংকটি দেখতে পাব।

পিতা ঠাকুরদাস জবাব দিলেন, আজ আমবা দুই পর্যন্ত অংকটি রাস্তায় যেখানে রয়েছে সেখান থেকে অন্য একটি রাস্তা দিয়ে কলকাতায় যাব। কাজেই এক অংকের পাথরটি আজ দেখতে পাবেনা।

ঈশ্বরচন্দ্র চটপট জবাব দিলেন এখানেই আমি ইংরেজী এক এবং নয় দুটি অংক শিখে ফেলেছি। আজ পথে যেতে যেতেই আমার ইংরেজী অংকগুলি শেখা হয়ে যাবে।

ঠাকুরদাস বালক পুত্রের বুদ্ধি দেখে অবাক হয়ে গেলেন। ঈশ্বরচন্দ্র পথে পথে

প্রতি পাথর দেখে অংক গুলো শিখতে লাগলেন। দশ নম্বর পাথরটি দেখার পরই বাবাকে বললেন - বাবা আমার ইংরেজী অংকগুলো শেখা হয়ে গেছে।

ঠাকুরদাস পরীক্ষা করার জন্য পরবর্তী নবম, অষ্টম, সপ্তম, সংখ্যা গুলো দেখিয়ে জানতে চাইলেন সংখ্যাগুলো চিনতে পারে কিনা। ঈশ্বরচন্দ্র সঠিক উত্তর দিলেন। এরপর আরেকটু পরীক্ষা করার জন্য ছয় নম্বর মাইলস্টোনটি দেখতে না দিয়ে পরবর্তী মাইলস্টোনটি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন এই পাথরের নম্বরটি কত বল দেখি ?

ঈশ্বরচন্দ্র নম্বরটা দেখে বললেন, বাবা এটা মনে হয় ভুল করে পাঁচ নম্বর লিখেছে। এখানে তো ছয় নম্বর মাইলস্টোন হবার কথা। একথা শুনে ঠাকুরদাস এবং অন্যান্য সঙ্গীরা নিশ্চিত হলেন যে, ঈশ্বরচন্দ্র ইংরেজী সংখ্যাগুলো শিখে ফেলেছে। গুরু মশাই কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় ঈশ্বরচন্দ্রকে আশীর্বাদ করে, ঠাকুরদাসকে বললেন, ঈশ্বরচন্দ্র অতি বুদ্ধিমান পুরুষ হবে। এর শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ যত্ন নিতে হবে।

কলকাতায় রামজয়ের বন্ধু ভাগবতী চরণ সিংহের বাড়ীতেই তাঁরা উঠলেন। ইতিমধ্যে ভাগবতী চরণও পরলোক গমন করেছেন। তাঁর পুত্র কন্যারা অতি নিকট আত্মীয়ের মত ঠাকুরদাস ও ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতিআচরণ করতে লাগলেন। সবচেয়ে বেশী দরদী ছিলেন ছোট কন্যা বালবিধবা বাইমণি।

ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর স্বরচিত আত্ম জীবনীতে বলেছেন, — 'এই পরিবারে থেকে একদিনের জন্যও মনে হয়নি যে, আমরা পরেব বাড়ীতে আছি। বিশেষত রাইমণির আদর যত্ন দেখে মাতৃদেবীর ছবিটি বার বার মনের মধ্যে ভেসে উঠেছে।

পিতা ঠাকুরদাসের ইচ্ছে ছিল ঈশ্বরচন্দ্রকে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে উচ্চ শিক্ষা দিয়ে গ্রামে চতুষ্পাঠি খুলে জীবিকা নির্বাহের সুব্যবস্থা করবেন। তাঁদের পরিবার বহু পুরুষ ধরে পাঠশালা, টোল ও চতুষ্পাঠী শিক্ষা দিয়ে সসম্মানে জীবিকা নির্বাহ করেছেন। পন্ডিত বংশ হিসেবে খুবই সুনাম রয়েছে তদের।

কিন্তু ইতিমধ্যে দেশের অবস্থা বদলে গেছে। ইংরেজী শিক্ষার কদর বেড়েছে। তাই ঠাকুরদাস আত্মীয় বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে একটা সিদ্ধান্ত নেবার কথা ভাবলেন। তখন ইংরেজী শিক্ষার একমাত্র কেন্দ্র হিন্দু স্কুলে শুধু ধনীর ছেলেরাই ভর্তি হতে পারতো। ঠাকুরদাসের আয় তখন মাত্র দশ টাকা। কাজেই বন্ধুরা পরামর্শ দিলেন সংস্কৃত কলেজে 'বিনামূল্যে শিক্ষার সুযোগ নেওয়াই উচিত হবে।

সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে পার্শ্ববর্তী একটি পাঠশালায় ঈশ্বরচন্দ্রকে ভর্তি করে দেওয়া হল। গ্রামের মুক্ত হাওয়া থেকে কলকাতায় এসে নতুন পরিবেশে খাপ খাওয়াতে কষ্ট হল। ছয়মাসের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। খবর পেয়ে ঠাকুরমা

দুর্গাদেবী কলকাতায় এসে আদরের নাতিকে গ্রামের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন।

গ্রামে কিছুকাল থেকে ঈশ্বরচন্দ্র সুস্থ হয়ে উঠলেন। ঠাকুরদাস পুত্রকে নিয়ে আবার কলকাতায় রওনা হলেন। এবার ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, কোন বাহক নিতে হবেনা। তিনি নিজেই হেঁটে কলকাতায় যেতে পারবেন। ঠাকুরদাসও ভাবলেন মাঝে মাঝে কোলে নিয়ে নির্বিঘ্নে কলকাতায় যেতে পারবেন।

কিন্তু প্রথম দিন হাঁটার পরই ঈশ্বরচন্দ্রের পা ফোলে গেল। একপাও এগোতে পারছেননা। ঠাকুরদাস কিছু রাস্তায় কোলে করে হেঁটে গেলেন। তারপর কিছু রাস্তা হেঁটে যেতে পুত্রকে নানা ভাবে উৎসাহ দিলেন। পরের গ্রামে ভাল তরমুজ খাওয়াবেন বলে লোভ দেখালেন।

প্রথম রাত পাতুল গ্রামের মামার বাড়ীতে এবং দ্বিতীয় রাত পিসীর বাডীতে কাটিয়ে তৃতীয় রাত শ্রীরামপুরেব এক আত্মীয় বাড়ীতে বিশ্রাম নিয়ে, পর দিন সকালে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র হাঁটতে পাবছেনা দেখে ঠাকুরদাস ভীষণ বিবক্ত হয়ে ধমক দিলেন,- তবে তুই একা এখানেই পরে থাক। কিছুদুব এগিয়ে গিয়ে দেখলেন ঈশ্বরচন্দ্র সত্যই আর হাঁটতে পারছে না। বাধ্য হয়ে কাঁধে নিয়ে বার বার বিশ্রাম করতে কবতে গন্তব্য স্থলে পৌঁছে ছিলেন।

পুত্রের কথায বাহক না নিয়ে পিতা পুত্র দুজনই খুব কষ্ট পেলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র নিজের আত্মজীবনীতে কলকাতায় আসার এই দুইটি অভিজ্ঞতার কথা প্রাঞ্জল ভাষায় লিখেছেন। প্রথমবার আসার সময় ছিল আনন্দ- উত্তেজনা ও বিষ্ময়। দ্বিতীয়বার বার আসার সময় ছিল চরম দুর্ভোগ বিরক্তি ও কষ্টকর অভিজ্ঞতা।
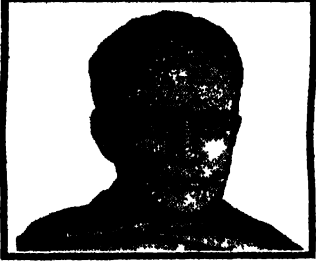
সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্র

দ্বিতীয়বার কলকাতার আসার পর ঠাকুর দাস বন্ধুদের পরামর্শ মত সংস্কৃত কলেজে ঈশ্বরচন্দ্রকে ভর্তি করার ব্যবস্থা করলেন। অধ্যাপক গঙ্গাধর তর্কবাগীশের সঙ্গে ঠাকুর দাসের বন্ধুত্ব ছিল। তিনি বললেন,ঈশ্বরচন্দ্র যে রকম মেধাবী ছাত্র, ছয় মাসের মধ্যেই প্রথম পরীক্ষার পরই মাসিক পাঁচটাকা বৃত্তি সে অবশ্যই পাবে। ১৮২৯ সালের ১ লা জুন ঈশ্বরচন্দ্রকে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করা হল।

গঙ্গাধর পন্ডিতের কথাটা সত্যি হল। প্রথম পরীক্ষার পর সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে সংস্কৃত কলেজে ঈশ্বরচন্দ্র এক আলোড়ন সৃষ্টি করলেন। মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তি পেয়ে দারুণ উৎসাহিত হলেন।

এই সময় কলকাতায় সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষারও যথেষ্ট কদর ছিল। ইংরেজী জানা লোকেরও প্রচন্ড চাহিদা ছিল। সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষা থেকে নানা বিষয়ে ইংরেজী অনুবাদ করার প্রয়োজন হতো । সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষায় ভাল জ্ঞান না থাকলে ভাল অনুবাদক হওয়া সম্ভব হতো না। এজন্যই ইংরেজ সরকার কলকাতা মাদ্রাসা এবং সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিল। সংস্কৃত টোলেরও চাহিদা ছিল । পঞ্চাশের দশকে রামকৃষ্ণকে কলকাতায় টোল খুলে জীবিকা অর্জনের জন্যই দাদা রামকুমার কলকাতায় নিয়ে এসেছিলেন ।

সংস্কৃত শিক্ষার সঙ্গে সাধাবণ ইংবেজী জ্ঞান থাকলেই চাকরী পাওয়া যেত । ইংরেজীতে একটু ভাল জ্ঞান থাকলে সংস্কৃত পন্ডিতরাও আদালতে জজ পন্ডিত পদে নিযুক্ত হতেন। হিন্দু আইন ব্যাখ্যা করার জন্যই এরূপ পদ সৃষ্টি করা হয়েছিল । মুসলিম আইন ব্যাখ্যা করার জন্যও এরূপ পদ সৃষ্টি করা হয়েছিল । সংস্কৃত বা ফার্সী ভাষায় শিক্ষার পর এই পদের জন্য ল কমিটির দ্বারা পরিচালিত একটি পরীক্ষায় পাশ করতে হতো । সংস্কৃত কলেজে এই পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

১৮২৭ সালের মে মাস থেকে একজন ইংরেজ অধ্যাপক নিয়োগ করে সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী শিক্ষারও একটা সংক্ষিপ্ত ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এটা বাধ্যতা মূলক ছিল না । যারা ইচ্ছুক তারা এই কোর্স পড়ে জজ পন্ডিতের যোগ্যতা অর্জন করতে পারতো। ঈশ্বরচন্দ্র ব্যাকরণ ক্লাসে ভর্তি হয়ে ইংরেজী ক্লাসেও যোগ দিয়েছিলেন ।

ইংরেজী পরীক্ষায়ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র মাসিক সাড়ে পাঁচ টাকা বৃত্তি লাভ করেন।

১৮৩৫ সালে সংস্কৃত কলেজ থেকে ইংরেজী ক্লাসটি তুলে দেওয়া হয় । ফলে ঈশ্বরচন্দ্রের ইংরেজী শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায় । পরবর্তী কালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে হেড পন্ডিতের কাজ করার সময় ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করে দক্ষতা অর্জন করেন।

১৮৩৯ সালে সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা যৌথভাবে স্বাক্ষর দিযে ইংরেজী শিক্ষা আবার চালু করার জন্য আবেদন করেছিল । এই আবেদন পত্রে ঈশ্বরচন্দ্রেরও স্বাক্ষর আছে। ইংবেজ কতৃপক্ষ এই আবেদন গ্রাহ্য করেনি। তিন বছর পব ঈশ্বরচন্দ্র যখন সংস্কৃত কলেজের সহ-সম্পাদক পদে কাজে যোগ দিয়েছিলেন তখনই আবার সংস্কৃত কলেজে ইংবেজী শিক্ষার ব্যবস্থা চালু করা হয়।

সংস্কৃত কলেজকে কেন্দ্র করেই ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনেব ৩০ টি বছর আবর্তিত হয়েছে। ছাত্র হিসেবে বার বছর পাঁচ মাস এবং তারপরে সহ সম্পাদক, অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষ হিসেবে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন ঈশ্ববচন্দ্র । তখন অবশ্য তিনি প্রধানত বিদ্যাসাগর নামেই বিশেষভাবে পবিচিত হযেছিলেন।

এই সময় দেশের শিক্ষানীতি ,শিক্ষা পদ্ধতি ,পাঠ্য বিষয,পাঠ্যক্রম শিক্ষক শিক্ষণ ,পবিচালন পদ্ধতি ইতাদি যাবতীয় বিষয়ে নব ভারত গড়ার কারীগর রূপে বিদ্যাসাগরের অবদান চিরস্মবনীয় হয়ে থাকবে।

পিতা ঠাকুরদাসের ইচ্ছে ছিল পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে পন্ডিত হযে গ্রামে গিয়ে টোল বা চতুষ্পাঠি স্থাপন করে পুরুষানুক্রমিক পেশা গ্রহণ করে বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র হলেন পন্ডিতেরও পন্ডিত এবং সেকালে সারা দেশের শ্রেষ্ঠ পন্ডিত ।এতবড় প্রতিভা একটি গ্রামের সীমাবদ্ধ গন্ডীতে আবদ্ধ থাকতে পারেন না।

ঈশ্বরচন্দ্র যখন গ্রাম থেকে কলকাতায় আসেন তখন শহরটা মাত্র গড়ে উঠছে। নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র মানুষের জন্য এই শহরের জীবনটা ছিল অত্যন্ত কঠিন । কঠোর পরিশ্রম করে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করে তবেই এ শহরে জীবন ধারণ করা যেত । ঠাকুরদাস এবং ঈশ্বরচন্দ্র দুজনেই কঠোর পরিশ্রম করেই এ শহরে টিকে থাকার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র যখন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র তখন কলকাতায় শুরু হয়েছে পুরাতন

ও নতুন ভাবাদর্শের দ্বন্দ্ব ও সংঘাত। সংস্কৃত কলেজ এবং হিন্দু কলেজ একই বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত য়ছিল। মাঝখানে শুধু একটা রেলিং দিয়ে ভাগ করা হয়েছিল বাড়ীটি।

সং ত কলেজে তখন শুধু ব্রাহ্মণ এবং বৈদ্য পরিবারের সন্তানরাই ভর্তি হতে পারতো। ছাত্রদে র অধিকাংশই ছিল দরিদ্র পরিবারের মেধাবী সন্তান। অন্যদিকে হিন্দু কলেজে ভর্তি হতো ধনী ও বিত্তবান পরিবারের সন্তানেরা। সেখানে কোন জাতি-ধর্মের বাধা ছিল না। তবে হিন্দু কলেজেও মেধাবী ছাত্ররাই ভর্তি হতো। প্রথমদিকে হিন্দু কলেজেও শুধু হিন্দু ছাত্রদেরই ভর্তি করা হতো।

এই হিন্দু কলেজটিই পরে প্রেসিডেন্সী কলেজ হয়েছে। এই কলেজে আজও দেশের সেরা ছাত্র ছাত্রীরা ভর্তিহবার সুযোগ পায়। তেমনি দেশের শ্রেষ্ঠজ্ঞানী ব্যক্তিরাই এখানে শিক্ষকতা করার সুযোগ পান। এই আদর্শ যতদিন কঠোরভাবে মেনে চলা হবে ততদিনই দেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্রের মডেল হয়ে থাকবে প্রেসিডেন্সী কলেজ। দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো স্বাধীনতার পর দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি সব মডেলই ভেঙ্গে দিচ্ছে।

ঈশ্বরচন্দ্র যখন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র, মধুসূদন তখন হিন্দু কলেজের ছাত্র। নবযুগের ভাব ধারায় হিন্দু কলেজের ছাত্ররা এতটাই আলোড়িত ছিল যে, তারা এদেশের সব কিছুকেই ঘৃণা করতে শুরু করেছিল এবং ইউরোপের সব কিছুকেই নির্বিচারে অনুকরণ করতে চেষ্টা করছিল। এদের বলা হতো ইয়ংবেঙ্গল। এদের নেতা ছিলেন অধ্যাপক ডিরোজিও।

এই উদারপ্রাণ অধ্যাপকের অকাল মৃত্যুর ফলে ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর ছাত্ররা অনেকটা দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। প্রয়োজনীয় সংযম তাদের মধ্যে ছিল না। ধনীর ছেলে বলে অনেক ক্ষেত্রে প্রশ্রয়ও পেত।

কিন্তু কিছুকাল সংঘাতের পর যখন ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর ছেলেরা সংযত হল তখন এরাই সৃষ্টি করল **"নব জাগরণের জোয়ার"** সংবাদ পত্রের মাধ্যমে জাগিয়ে দিতে লাগল শহরের শিক্ষিত মানুষদের। একই বিল্ডিং এর একদিকে ছিল প্রাচীন পন্থী পন্ডিতদের অসংযত আচরণ। অন্যদিকে ছিল ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর ছাত্রদের উদ্দাম ব্যবহার।

এই পরিবেশে মেধাবী ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন অনেকটা নির্বিকার। কারণ দুই গোষ্ঠীর কোনটিকেই তিনি মনে প্রাণে সম্পূর্ণ সমর্থন করতে পারছিলেন না। প্রাচীন পন্থার যেমন ব্যাপক পরিবর্তন প্রয়োজন, তেমনি নব্য যুগের ভাবধারাও নির্বিচারে গ্রহণ করা উচিত নয়। এরকম দৃষ্টিভঙ্গী ঈশ্বরচন্দ্র পরবর্তী জীবনেও অনুসরণ করেছেন।

তবে ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রতি ঈশ্বরচন্দ্রের মমতাবোধ বেশী ছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্র সহযোগিতা করেছেন এমন কিছু দৃষ্টান্ত ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনীকাররা অবিষ্কার করেছেন। মধুসূদনের চিঠি পত্রেও তার কিছু ইঙ্গিত রয়েছে। মধুসুদন ঘনিষ্ট বন্ধুদের কাছে চিঠিতে ঈশ্বরচন্দ্রের সুদৃঢ চরিত্রের প্রশংসা করে কিছু ঘটনার উল্লেখ কবেছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র জন্মেছিলেন অতি আচার নিষ্ঠ ধর্মপবায়ণ একটি পন্ডিত বংশে। কিন্তু নিজের জীবনে কোন রকম আচার নিষ্ঠা এবং জাত পাতের ভেদাভেদ তিনি স্বীকার করেন নি। এই দৃষ্টিভঙ্গী ছাত্র-জীবন থেকেই লক্ষ্য কবা যায় । অবশ্য পিতা ঠাকুরদাসও কলকাতায় থেকে কিছু ইংরেজী শিখে অনেকটা বদলে গিয়েছিলেন । বিধবা বিবাহের প্রতি সমর্থন তারই প্রমান ।

ঈশ্বরচন্দ্র থাকতেন বড বাজাবে আব সংস্কৃত কলেজ ছিল পটল ডাঙ্গায়,- বর্তমানে যা কলেজ স্কোয়ার নামে পরিচিত। এই দীর্ঘ পথ তাকে হেঁটে আসতে হতো । প্রথম দিকে পিতা ঠাকুর দাস সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন আবাব বিকেল বেলায় ছুটির পর সঙ্গে করে নিয়ে আসতেন। ক্রমে পথঘাট চেনা হয়ে যাবার পব ঈশ্বরচন্দ্র একাই হেঁটে স্কুলে যাতাযাত করতে শুরু করেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের মাথাটা বেশ বড় ছিল। তাই দুষ্ট ছেলেরা যশোরে কৈ বলে ঠাট্টা করতো । সেকালে যশোর থেকে বড় বড় কই মাছ নৌকায় করে কলকাতায় আনা হতো । আসার পথে কয়েকদিনে কৈ মাছগুলো শুকিয়ে রোগা হয়ে যেত । শরীরের চেয়ে মাথা বড় বলে যশোরে কৈ নাম পড়েছিল।

ঈশ্বরচন্দ্রকে যশোরে কৈ বলে ঠাট্টা করলে ভীষণ চটে যেতেন । কিন্তু তোৎলা ছিলেন বলে প্রতিবাদ করতে গিয়ে আরো বেকায়দায় পড়তেন । এই তোৎলামীর জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বড় বড় সভায় বক্তৃতা দিতে রাজী হতেন না ।

কলেজে রোজ যে পড়া হতো বাড়ীতে পিতার কাছে তা আবৃত্তি করে শোনাতে হতো । পিতা ঠাকুরদাস এ বিষয়ে খুব কঠোর ছিলেন। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত দশ টাক বেতনের কেরানীর চাকরী করে অনেক রাতে বাড়ী ফিরতেন। ঈশ্বরচন্দ্রকে তখন পর্যন্ত রাত জেগে পড়াশোনা করতে হতো । কোথাও কোন ভুল হলে ঠাকুরদাস কঠোর শাস্তি দিতেন । বাবার জ্ঞানবুদ্ধি দেখে ঈশ্বরচন্দ্রের মনে হয়েছিল যে, তিনিও সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকদের মতই একজন পন্ডিত ব্যক্তি ।

ঈশ্বরচন্দ্র পড়াশোনায় কখনো ফাঁকী দিতেন না এবং ফাঁকী দেবার কোন উপায়ও ছিল না । পিতা ঠাকুরদাসের ফিরতে অনেক বেশী রাত হয়ে গেলে অনেক সময় পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন। পিতা এসে পুত্রকে ঘুম থেকে তুলে প্রচন্ড মার দিতেন। ঈশ্বরচন্দ্রের কান্না শুনে বাড়ীর মালিকের ছোট কন্যা রাইমনি ছুটে আসতেন। মায়ের মত স্নেহ যত্ন করতেন এবং একটা শিশুকে এভাবে শাসন করার জন্য ঠাকুরদাসকে তিরস্কার করতেন।

এত রাত করে খেয়ে দেয়ে বাসন পত্র ধুয়ে ঘুমোবার পর পিতা ঠাকুরদাস শেষ রাতে ঈশ্বরচন্দ্রকে জাগিয়ে দিয়ে পড়তে বাধ্য করতেন। এই সময় ঠাকুরদাস পুত্রকে নানা বিষয়ে সংস্কৃত শ্লোক মুখস্থ করাতেন এবং সেগুলোর অর্থ বুঝিয়ে দিতেন।

ঈশ্বরচন্দ্র সব পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করতেন কিন্তু একবার এক সাহেব পরীক্ষক হয়ে আসেন। তোৎলামীর জন্য ঈশ্বরচন্দ্র ধীরে ধীরে প্রশ্নের উত্তর দিতেন। এজন্য সাহেব বিরক্ত হয়ে ঈশ্বরচন্দ্রকে অনেক কম নম্বর দেন। ঈশ্বরচন্দ্র জেদ করে কলেজের পড়া বন্ধ করে গ্রামে চলে যাবার সংকল্প করেন। অন্যান্য অধ্যাপকরা অনেক বুঝিয়ে ঈশ্বরচন্দ্রকে শান্ত করেন।

সেকালে ১২ বছর সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়ান হতো । কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র মাত্র, তিন বছরে ব্যাকরণ পাঠ শেষ করেন। ঠাকুরদাসের বন্ধু গঙ্গাধর তর্কবাগীশ অতি যত্নে ব্যাকরণের দুর্ভেদ্য দুর্গ-অতিক্রমে সাহায্য করেন। ব্যাকরণের পাঠ শেষ করে তখনকার নিয়ম অনুযায়ী ঈশ্বরচন্দ্র ইংরেজী শিক্ষা ক্লাসে ভর্তি হন। দুই বছর ইংরেজী শিখে কৃতি ছাত্র হিসেবে বেশ কিছু ইংরেজী বই পুরস্কার লাভ করেণ। কিন্তু হঠাৎ করে ১৮৩৫ সালে ইংরেজী ক্লাস বন্ধ করে দেওয়ায় ঈশ্বরচন্দ্রের ইংরেজী শিক্ষা এই সময় অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

এরপর শুরু হয় সাহিত্যের পড়া । অল্পদিনের মধ্যেই ঈশ্বরচন্দ্র রঘুবংশ ,কুমার সম্ভব মেঘদূত ,শকুন্তলা, কাদম্বরী উত্তর রামচরিত ,রত্নাবলী ইত্যাদি সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিগুলো অধ্যয়ন করে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করেন। এখানে অধ্যাপকদের উৎসাহে ও প্রেরণায় সংস্কৃত শ্লোক রচনাও শুরু করেন। প্রকৃত পক্ষে এই সাহিত্য শ্রেনীর পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নাম্বার পেয়ে ঈশ্বরচন্দ্র , বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন।

এই সময় ঈশ্বরচন্দ্রের দ্বিতীয় ভাই দীনবন্ধুও কলকাতায় এসে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। খুব অভাব অনটনের মধ্যে দিয়েই দুই ভাই পড়াশোনা চালিয়ে গেছেন। বড় ভাই হিসেবে ঈশ্বরচন্দ্রই বেশী কষ্ট স্বীকার করতেন। ভোর বেলায় গঙ্গাস্নান করে

ফেরার পথে আলু, পটল, বা অন্য কোন সবজী কিনে এনে নিজেই কেটে কুটে রান্না করতেন, মশল্লা বাটতেন ,খাওয়ার পর বাসনপত্র ধুয়ে ঘর মুছে তারপর কলেজে যেতেন।

সেকালের নিয়ম অনুযায়ী কলেজে পড়ার সময়ই ১৪ বছর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্রের বিয়ে হয় । বাল্য বিবাহের বিরোধী হয়েও তখন পর্যন্ত প্রতিবাদের সুযোগ খুঁজে পাননি। আট বছরের দীনময়ী দেবীকে স্ত্রী রূপে বরণ করে নিতে হয়েছিল।

সাহিত্য শ্রেণীর পাঠ শেষ হবার পর ঈশ্বরচন্দ্র অলংকার শ্রেণীতে ভর্তি হলেন। অলংকার শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ পন্ডিত প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ ছিলেন এই ক্লাসের অধ্যাপক। সাহিত্য দর্পণ, কাব্য প্রকাশ , রসগঙ্গাধর প্রভৃতি কঠিন গ্রন্থগুলো আয়ত্ত করে ঈশ্বরচন্দ্র সবাইকে অবাক করে দেন। এই ক্লাসেও তিনি সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

এর পরই শুরু হয় বেদান্ত ,ন্যায়শাস্ত্র এবং স্মৃতি শাস্ত্রের অধ্যয়ন। এই ক্লাসে গদ্য ও পদ্য রচনার পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। প্রথম স্থানাধিকারীকে একশ টাকা পুরস্কার দেওয়া হতো। ঈশ্বরচন্দ্র গদ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে একশ টাকা পুরস্কার পেলেন। সব টাকাই পিতার হাতে তুলে দিলেন। পরের বছর পদ্য রচনায় প্রথম স্থান অধিকার করে আরো একশ টাকা পুরস্কার পান। ঠাকুর দাসের এই সময় আর্থিক অনটন বেড়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের কাছ থেকে দুইশ টাকা পেয়ে দ্বিতীয় পুত্র দীনবন্ধুর বিয়ের ব্যবস্থা করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র কলেজের সর্বোচ্চ শ্রেণী বেদান্ত ও ন্যায় শাস্ত্রের ক্লাসে পড়ার সময় কলেজের সাহিত্য শ্রেণীর একটি অধ্যাপক পদ দুই মাসের জন্য খালি হয়। কলেজের অধ্যাপকদের সুপারিশ অনুযায়ী কলেজের ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্রকে ঐ অধ্যাপকের পদে দুই মাসের জন্য নিযুক্ত করা হয়। দুই মাসের বেতন ৮০ টাকা পিতার হাতে তুলে দেবার পর আর্থিক অভাব দূর হয়।

সংস্কৃত কলেজের সেরা ছাত্র হিসেবে ঈশ্বরচন্দ্র প্রত্যেক অধ্যাপকের স্নেহ -ভালবাসা এবং আশীর্বাদ লাভ করেছেন। প্রত্যেক শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ অধ্যাপকগণ কলেজের বাইরেও ঈশ্বরচন্দ্রকে নানা বিষয়ে শিক্ষা দিতেন।

বিভিন্ন সময়ে ঈশ্বরচন্দ্রের বিভিন্ন লেখা থেকে জানা যায় ব্যাকরণের শ্রেষ্ঠ পন্ডিত ছিলেন গঙ্গাধর তর্কবাগীশ । তার শিক্ষাদান পদ্ধতিও ছিল খুব আকর্ষনীয়। সাহিত্য বিভাগের শ্রেষ্ঠ পন্ডিত ছিলেন জয়গোপাল তর্কালঙ্কার তিনি সমাচার দর্পণেরও একজন সম্পাদক ছিলেন । তিনি অনর্গল মধুর ছন্দে শ্লোক রচনা করতে পারতেন।

অলংকার শাস্ত্রে অসামান্য পান্ডিত্য ছিল অধ্যাপক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের। তিনি কবি গানের আসর বসিয়ে প্রিয় ছাত্রদের আমন্ত্রণ করে আনতেন। ঈশ্বরচন্দ্র এরূপ আসরে বসে কবিগান শুনে খুব আনন্দ পেতেন। পরবর্তীকালে বিখ্যাত কবিয়াল ভোলা ময়রার আসরে ঈশ্বরচন্দ্রকে প্রায়ই দেখাতে পাওয়া যেত।

স্মৃতি শাস্ত্রের বিখ্যাত পন্ডিত হরচন্দ্র ভট্টাচার্য ঈশ্বরচন্দ্রকে খুব ভালবাসতেন। স্মৃতি শাস্ত্র পাঠ শেষ হবার পর হিন্দু 'ল' পরীক্ষা পাশ করে ঈশ্বরচন্দ্র ত্রিপুরায় জজ পন্ডিতের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু পিতা ঠাকুরদাস এত দূরে আসতে বাধা দিলেন। এভাবেই ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্রের সংস্কৃত কলেজের ছাত্র জীবন শেষ হয়। শুরু হয় বিদ্যাসাগরের নতুন জীবন।
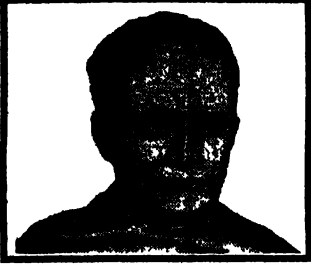
ঈশ্বরচন্দ্র হলেন বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগর হল একটা উপাধি। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে যে কোন পন্ডিত ব্যাক্তিই বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করতে পারতেন। কিন্তু ভারতবর্ষে বিদ্যাসাগর বলতে একজন ব্যক্তিকেই বোঝায় । তিনি হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । বিদ্যাসাগর উপাধিটি এতই জনপ্রিয় হয়েছিল যে আসল নাম ঈশ্বরচন্দ্র ক্রমশ চাপা পড়ে গেছে।

সংস্কৃত কলেজে প্রথম দিকে শুধু ব্রাহ্মণরাই ভর্তি হতে পারতেন। পরে বৈদ্যদেরও ভর্তির সুযোগ দেওয়া হয়। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হবার পর সকলেব জন্য ভর্তির পথ খুলে দেন। কিন্তু কমিটিব মধ্যে অধিকাংশই শূদ্রদেব ভর্তি হবার অনুমতি দেন নি । পববর্তীকালে ইংরেজী শিক্ষা প্রসার ঘটার ফলে সংস্কৃত কলেজের পন্ডিত উপাধিব আকর্যণ কমে যায।

১৮৪১ সালেব ৪ঠা ডিসেম্বর সংস্কৃত কলেজের ১২ বছর ৫ মাসের শিক্ষা সমাপ্ত হবার পর কলেজ কর্তৃপক্ষ সরকারীভাবে ঈশ্বরচন্দ্রকে বিদ্যাসাগর উপাধি দান কবে সার্টিফিকেট দেন। ছযদিন পব ১৮৪১ সালের ১০ই ডিসেম্বর কলেজের সমস্ত বিভাগের অধ্যাপকবা মিলিত হয়ে সংস্কৃত কলেজের সেরা ছাত্র হিসেবে ঈশ্বরচন্দ্রকে আরেকটি প্রশংসাপত্র প্রদান কবেন। এই সময় থেকে ঈশ্বরচন্দ্র, বিদ্যাসাগর নামেই পরিচিত হন।

পরবর্তীকালে গবেষকরা দেখতে পান যে দুই বছর আগে -ল- পরীক্ষার সার্টিফিকেটে ঈশ্বরচন্দ্র নামের পাশে বিদ্যাসাগর উপাধিটি লেখা ছিল, বন্দ্যোপাধ্যায় নয়। কারণ অনুসন্ধান করে গবেষক শক্তি সাধন মুখোপাধ্যায় আবিষ্কার করেন যে, সেকালে সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা পরিকল্পনার মধ্যে প্রত্যেক বিভাগের শেষ পরীক্ষার পর অনেকগুলো উপাধির মধ্যে থেকে কৃতি ছাত্ররা নিজেদের পছন্দ মত একটি উপাধি- বেছে নিতে পারতো । ঈশ্বরচন্দ্র সাহিত্য শ্রেণীর শেষ পরীক্ষার পর বিদ্যাসাগর উপাধিটি বেছে নেন।

গবেষক গোপিকা মোহন ভট্টাচার্য- তাঁর রচিত, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস গ্রন্থে- সেকালে সংস্কৃত কলেজ থেকে যে সব উপাধি দেওয়া হতো তার বর্ণনা

প্রসঙ্গে লিখেছেন,

বিষয় **উপাধি**

সাধারণ সাহিত্য - বিদ্যারত্ন ,বিদ্যালংকার, বিদ্যাসাগর ,বিদ্যাভূষণ, বিদ্যাবিনোদ, বিদ্যানিধি,কবিরত্ন ।

সংস্কৃত সাহিত্য বিভাগে তিন বছরের ক্লাস শেষ করার পর কৃতি ছাত্ররা উপরোক্ত সাতটি উপাধি থেকে যে কোন একটি বেছে নিতে পারতো ।

হিন্দু দর্শন ----- ন্যায়রত্ন, ন্যায়ভূষণ, ন্যায়লংকার, তর্করত্ন,তর্কভূষণ তর্কালংকার তর্কচূড়ামণি ,তর্কবাচস্পতি ,তর্কশিরোমণি,বেদান্ত বাগীশ, তর্কপঞ্চানন তর্কসিদ্ধান্ত, ন্যায়পঞ্চানন ।

হিন্দু দর্শনে তিন বছরের ক্লাস শেষ করে কৃতিছাত্ররা উপরোক্ত তেরটি উপাধির যে কোন একটি বেছে নিতে পারতো ।

স্মৃতি শাস্ত্রে --- স্মৃতিরত্ন ,স্মৃতি চূড়ামণি, স্মৃতি শিরোমণি, স্মৃতি ভূষণ, স্মৃতি কণ্ঠ,

দুই বছরের স্মৃতি শাস্ত্র পাঠ শেষ করে উপরোক্ত পাচটি উপাধির যে কোন একটি কৃতি ছাত্ররা বেছে নিতে পারতো ।

এছাড়া বেদশাস্ত্র পাঠ শেষ করে বেদরত্ন বা বেদকণ্ঠ উপাধি পাওয়া যেত।

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সংস্কৃত কলেজে এরূপ উপাধি দানের ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছিল ।এই রীতি অনুযায়ী ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে বিদ্যাসাগর উপাধিটি বেছে নেন। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে কলেজের সমস্ত বিভাগের সেরা ছাত্র হিসোব বিদ্যাসাগরকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

এছাড়াও কলেজের প্রত্যেক বিভাগের প্রধান অধ্যাপকদের স্বাক্ষর যুক্ত দ্বিতীয় সার্টিফিকেটটি দেওয়া হয় ১০ ই ডিসেম্বর ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে । এতে স্বাক্ষর করেন,- ব্যাকরণ, কাব্য, অলংকার, বেদান্ত, ন্যায়, জ্যোতিষশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্রের সাতজন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপকরা ।

ঈশ্বরচন্দ্র যে প্রকৃতই বিদ্যাসাগর হয়েছিলেন তা পরবর্তী জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে স্বর্ণাক্ষরে চিহ্নত হয়ে আছে। তিনজন জীবনীকারই বিদ্যাসাগর উপাধির সার্থকতা প্রমান করেছেন।
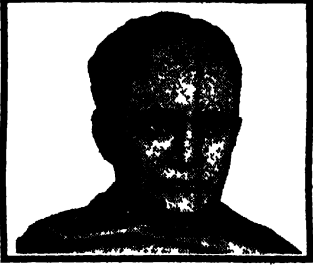
ফোর্ট ওইলিয়ম কলেজের হেড পন্ডিত বিদ্যাসাগর

ইংরেজ সরকার নবাগত ইংরেজ যুবক রাজ কর্মচারীদের দেশীয় ভাষায় শিক্ষা দানের জন্য। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা কবে। দেশীয় সংস্কৃত পন্ডিতরা এই কলেজে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হতেন।

সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন সম্পাদক মার্শাল সাহেব যখন ফোর্ট উলিয়ম কলেজের প্রধান পরিচালকের পদে কাজ করছিলেন,তখনই ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের পাঠ শেষ কবে কর্ম জীবনে প্রবেশ করার জন্য তৈরী হয়েছিলেন।

মার্শাল সাহেব ঈশ্বরচন্দ্রকে খুব ভাল ভাবেই চিনতেন ।এই সময় হেড পন্ডিতের পদটি খালি হওয়ায় মার্শাল সাহেব ঈশ্বরচন্দ্রকে এই পদে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানান।

১৮৪১ সালের ১০ই ডিসেম্বর ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজ ছেড়ে আসেন। ঐ মাসেরই ২৯ তারিখে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেড পন্ডিতের পদে মাসিক ৫০ টাকা বেতনে কাজে যোগ দেন।

পিতা ঠাকুরদাস তখনো সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করে মাসিক দশ টাকা বেতন পেতেন। ঈশ্বরচন্দ্র বাবাকে বললেন- আপনি বহুদিন প্রচুর পরিশ্রম করেছেন এবার বিশ্রাম প্রয়োজন ।এখন থেকে ২০ টাকা করে আপনাকে প্রতি মাসে দিতে পারব । আপনি গ্রামে গিয়ে পরিবারের প্রতি যত্ন নিন।

ঠাকুরদাস প্রথমে আপত্তি করলেও শেষ পর্যন্ত চাকরী ছেড়ে দিয়ে গ্রামে ফিরে যেতে রাজী হলেন।

কলকাতায় ঈশ্বরচন্দ্র নতুন সংসারের পুরো দায়িত্ব নিলেন। সঙ্গে রইল দুইভাই দীনবন্ধু এবং শম্ভুচন্দ্র , দুজন খড়তুতো ভাই, দুজন পিসতুতো ভাই ,একজন মাসতুতো ভাই এবং একজন কাজের লোক ।এতদিন তারা বড় বাজারে ভাগবতীচরণ সিংহের বাড়ীতেই ছিলেন ।এই সময় তাদের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ায় বাড়ী ভাড়া দিয়ে আয়ের প্রশ্ন দেখা দিল। ঈশ্বরচন্দ্র ৯জন পোষ্য সহ বৌ বাজারে একটি বাড়ীতে নতুন বাসা ভাড়া করে উঠে এলেন। তখন ৩০ টাকায় ৯ জনের ভরনপোষণ চালানো কঠিন হয়ে উঠেছিল ।ভাইদের পড়াশোনার খরচও বেড়েছিল।

এই সময় কর্মক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর নামটি প্রচলিত হতে থাকে । ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কাজ শুরু করার পর বিদ্যাসাগর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা দুর্গা চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ইংরেজী শিখতে শুরু করেন। তখন বিদ্যাসাগরের বয়স ২২ বছর । এর পরে হিন্দু কলেজের কৃতি ছাত্র রাজনারায়ণ গুপ্তের কাছে ইংরেজী শিখে দক্ষতা অর্জন করেন। একজন হিন্দি পন্ডিতের কাছে হিন্দি ভাষাও শিখে নেন।

অন্যদিকে নিজের বাসায় সংস্কৃত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। অনেক ছাত্র সংস্কৃত শিখতে আসতো । সংস্কৃত শিক্ষায় প্রধান বাধা ছিল ব্যাকরণ। ছাত্ররা সংস্কৃত ব্যাকরণের নামে আতংকিত হতো । ঈশ্বরচন্দ্র ছাত্রদের জন্য সহজ ভাষায় একটি ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তারই ফলশ্রুতিতে কিছুকালের মধ্যেই প্রকাশিত হল **সহজ সংস্কৃত ব্যাকরণ -উপক্রমণিকা ও ব্যাকরণ কৌমুদী।**

এই সময়ের একটি কাহিনী প্রবাদ বাক্যের মত প্রচলিত আছে। ঈশ্বরচন্দ্রেব তৃতীয় ভাই শম্ভুচন্দ্রের বিবাহে যোগ দেবার জন্য মা ভগবতী দেবী খবব পাঠলেন। বিদ্যাসাগর মার্শাল সাহেবেব কাছে বাড়ী যাবার জন্য ছুটি চাইলেন । কিন্তু কলেজে কতকগুলো জরুরী কাজ থাকায় মার্শাল সাহেব ছুটি দিতে অস্বীকার করেন ।

কিন্তু বিদ্যাসাগব মায়ের আদেশ পালন করার জন্য চাকরী ছেড়ে দেবার ইচ্ছা জানালেন । মার্শাল সাহেব ঈশ্বরচন্দ্রের মাতৃভক্তি দেখে খুশী হলেন এবং ছুটি মঞ্জুর করলেন। তখন ছিল বর্ষাকাল । পথে দামোদর নদী ভীষণ মূর্তি ধারণ করেছে । তারপরেও আছে দ্বারকেশ্বর নদী। মাঝি নৌকা দিয়ে পারাপার করতে অক্ষম হওয়ায় ঈশ্বরচন্দ্র সাঁতার দিয়ে বহু কষ্টে নদী পার হয়ে ভাইয়ের বিবাহে যোগ দেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের তৃতীয় ভাই শম্ভুচন্দ্র এরূপ ঘটনার কথা অস্বীকার করেন। বর্ষায় দামোদরের যে চেহারা দেখা যায় তা সাঁতার কেটে পার হওয়া মানুষের অসাধ্য।

তবে ঈশ্বরচন্দ্রের মাতৃভক্তি সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। মায়ের আদেশ পালন করার জন্য চাকরী ছেড়ে দেওয়া ঈশ্বরচন্দ্রের কাছে মোটেই কঠিন কাজ নয়।

ইংলন্ড থেকে যে সব উচ্চ শিক্ষিত যুবকরা এদেশে চাকরী করার জন্য আসতো তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পরীক্ষায় ফেল করে দেশে ফিরে যেতে বাধ্য হতো । মার্শাল সাহেব এদের পরীক্ষার খাতা একটু সহানুভূতির সঙ্গে দেখার জন্য অনুরোধ জানান। বিদ্যাসাগর ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে জবাব দেন, প্রয়োজনে চাকুরী ছেড়ে দেব,তবু কোন অন্যায় অনুরোধ রাখতে পারব না ।

বিদ্যাসাগর পাঁচ বছর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেড পন্ডিত পদে চাকুরি করেন। এরপর সংস্কৃত কলেজের একটি অধ্যাপক পদে যোগ দেন।

অধ্যক্ষ মার্শাল সাহেব বিদ্যাসাগরের তিনটি কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। (১) বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের সেরা ছাত্র হিসেবে সার্টিফিকেট পেয়েছেন । (২) তিনি হিন্দু-ল-পরীক্ষায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। (৩) তিনি সংস্কৃত এবং বাংলা খুব ভালভাবে পড়াতে পারেন। এছাড়া ইংরেজীতেও তিনি ভাল দক্ষতা অর্জন করেছিলেন ।

লর্ড ওয়েলেসলী ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় এটাকে ভারতের অকসফোর্ড রূপে গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছিলেন । কিন্তু ক্রমে ক্রমে ইংরেজ সরকার এই পরিকল্পনা বাতিল করেন। বহু অধ্যাপক পদ বিলুপ্ত করা হয়। অর্থ বরাদ্দও কমিয়ে দেওয়া হয়।

১৮৪১ সালের ২৯ শে ডিসেম্বব থেকে ১৮৪৬ সালের ৫ই এপ্রিল পর্যন্ত বিদ্যাসাগব এই কলেজে চাকুরী করেন। এই সময় বহু ইংরেজ পন্ডিতের সঙ্গে বিদ্যাসাগরেব বন্ধুত্ব হয়। শিক্ষানুরাগী ইংরেজ কর্মচাবীদের উদার দৃষ্টিভঙ্গী দেখে মুগ্ধ হন। এই সমযটা ছিল বিদ্যাসাগরের কর্ম জীবনেব প্রস্তুতিকাল। শিক্ষাচিন্তা ও সমাজচিন্তা এই সময় পরিনত রূপ নিতে থাকে ।

মার্শাল সাহেবের অনুরোধে বিদ্যাসাগর পাঠ্যপুস্তক রচনা শুরু করেন। **বাসুদেব চরিত** এবং **বেতাল পঞ্চবিংশতি** এই সময়েই রচিত হয়।

এই সময়েব আরেকটি উল্লেখযাগ্য ঘটনা হল দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ববোধিনী পত্রিকাব সম্পাদক বিদ্যাসাগরের প্রিয় বন্ধু অক্ষয় কুমার দত্ত বিদ্যাসাগরকে পত্রিকা কমিটির সদস্য নির্বাচিত করেন । বিজ্ঞান ও দর্শনকে সহজ ভাষায় বাঙ্গালী পাঠকের সামনে হাজির করাই ছিল এই পত্রিকার প্রধান লক্ষ্য।

বিদ্যাসাগর পত্রিকার কাজেও নিজের দক্ষতাব পবিচয় দেন এই সময় বয়স ছিল ২৫ বছব। এই বয়সেই সব গুণীমহল বিদ্যাসাগরের প্রশংসায় ছিল পঞ্চমুখ।
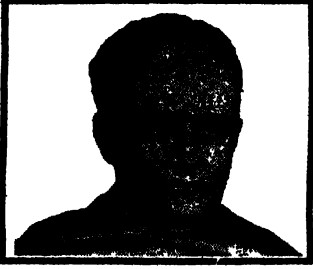
সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের সর্বোচ্চ ক্লাশের ছাত্র থাকা অবস্থাতেই অধ্যাপকদের পরামর্শে দুই মাসের জন্য সাহিত্য বিভাগের একটি শূন্য পদে অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেছিলেন। সমস্ত অধ্যাপকই বিদ্যাসাগরের অধ্যাপনার কাজ দেখে খুশী হয়েছিলেন।

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ৫ই এপ্রিল তিনি সংস্কৃত কলেজের সহ সম্পাদক পদে নিযুক্ত হয়ে এলেন । ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হেড পন্ডিতের কাজটি ছেড়ে দিলেন। কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখলেন।

দু'বছর আগে সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক পদে বিদ্যাসাগরকে যোগ্য প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করা হয়। বেতনও ছিল প্রায় দ্বিগুন । হেড পন্ডিতের পদে বেতন ছিল মাসিক ৫০ টাকা । অধ্যাপক পদের বেতন ছিল মাসিক ৯০ টাকা ।

কিন্তু বিদ্যাসাগর অধ্যাপক পদে আরেকজন প্রার্থী কালনা নিবাসী পন্ডিত তারাপদ বাচস্পতিকে যোগ্যতম বলে বিবেচনা করে নিজে পায়ে হেঁটে কালনা গিয়ে পন্ডিতকে ডেকে এনে অধ্যাপক পদে নিযুক্তির ব্যবস্থা করেন। সংস্কৃত কলেজের প্রতি গভীর ভালবাসাই বিদ্যাসাগরকে এ কাজে প্রেরণা যুগিয়েছিল।

দুই বছর পরে সংস্কৃত কলেজের সহ সম্পাদক পদে যোগ দিলেন মাসিক ৫০ টাকা বেতনে। তখন কলেজের সম্পাদক ছিলেন বিচারপতি রসময় দত্ত। তিনি আশ্বাস দিলেন কলেজের উন্নতি ঘটাতে পারলে বেতন বৃদ্ধি করা হবে । অবশ্য বিদ্যাসাগর বেতন নিয়ে মাথা ঘামান নি । তিনি শুধু স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ চেয়েছিলেন ।

সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগর বার বছর পাঁচ মাস ছাত্র ছিলেন । কলেজের নানা ত্রুটি ও দুর্বলতা স্বচক্ষে দেখেছেন। পাঁচ বছর কলেজের বাইরে থেকে বিভিন্ন মহলের সমালোচনা লক্ষ্য করেছেন। প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলার কথাও শুনেছেন । এই সময় সংস্কৃত কলেজের শিক্ষার মান ছিল নিম্নমুখী। পাঠ্যসূচিতেও দেখা গেল চরম

বিশৃংখলা । জুনিয়র বালকদের বিভাগে ব্যাকরণ শিক্ষাকে উপেক্ষা করা হচ্ছে এবং সিনিয়রদের জ্যোতিষ ক্লাসে জুড়ে দেওয়া হয়েছে গণিতকে । সংস্কৃত থেকে বাংলা এবং বাংলা থেকে সংস্কৃত অনুবাদের অনুশীলন একেবারে অনিয়মিত । একজন অদক্ষ রুগ্ন পন্ডিত কাব্য পড়াচ্ছেন ।

এ রকম পরিস্থিতির আমূল সংস্কার করার কথা ভাবলেন বিদ্যাসাগর । মার্শাল সাহেবকে সবকিছু জানিয়ে প্রয়োজনীয় সংস্কারের পরিকল্পনা তৈরী শুরু করলেন বিদ্যাসাগর । নিজেও ক্লাশ নিতে শুরু করলেন নিয়মিতভাবে । অল্প দিনের মধ্যেই সংস্কৃত কলেজের পরিবেশ বদলে গেল। পরীক্ষার ফলাফলে উন্নতির লক্ষণ ফুটে উঠলো।

বিদ্যাসাগরের সংস্কার পরিকল্পনা তৈবী হল। মার্শাল সাহেব পরিকল্পনা খুঁটিয়ে দেখে খুশি হলেন । কিন্তু সম্পাদক বসময় দত্তের সঙ্গে বিদ্যাসাগবের মতের মিল হল না । সম্পাদক বললেন, পরিকল্পনার অংশ বিশেষ কাউন্সিলের কাছে পাঠানো যেতে পাবে । সব বিষয়ে সংশোধন চাইলে তা গ্রাহ্য হবে না ।

বসময় দত্তের ভয় ছিল বিদ্যাসাগরেব পরিকল্পনা কাউন্সিলে গৃহীত হলে সমস্ত বিশৃঙ্খলাব দায় সম্পাদক হিসেবে বসময দত্তের বিরুদ্ধে যাবে । এ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তীব্র মত বিরোধ সৃষ্টি হওয়ায বিদ্যাসাগব চাকুরী ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন ।

রসময় দত্ত খবরটা শুনে টিপ্পনি কেটে বললেন, চাকরী তো ছেড়ে দেবে কিন্তু খাবে কি ? বিদ্যাসাগর এরূপ মন্তব্য শুনে জবাব দেন---সম্পাদককে বলে দিও, বিদ্যাসাগর রাস্তায় আলু,পটল বিক্রী কবে খাবে, তবু যেখানে মর্যাদা নেই, সেখানে চাকরী করবেন না ।

এরকম দুর্ঘটনা ঘটতে পারে তা বিদ্যাসাগর আগেই অনুমান করেছিলেন । তাই মার্শাল সাহেবকে বলে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হেড পন্ডিতের পদে ছোট ভাই দীনবন্ধুকে নিযুক্তির ব্যবস্থা করেছিলেন।

প্রায় এক বছর বিদ্যাসাগর বেকার রইলেন । এই সময় বন্ধু ময়েট সাহেব এক ইংরেজ সাহেবকে বিদ্যাসাগরের কাছে পাঠলেন সংস্কৃত,বাংলা ও হিন্দি কিছুটা কাজ চালাবার মতো শিখিয়ে দিতে । সাহেব শিক্ষান্তে যখন গুরু দক্ষিণা দিতে চাইলেন তখন বিদ্যাসাগর কিছুতেই তা নিলেন না । বললেন ,বন্ধুর বন্ধু আমারও বন্ধু । বন্ধুর কাছ থেকে গুরু দক্ষিণা নেওয়া সম্ভব নয়। চরম অভাবের মধ্যেও বিদাসাগরের মানসিকতা ছিল এরকম।

বিদ্যাসাগর বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে অংশীদার করে একটি ছাপাখানা খুললেন নাম দিলেন সংস্কৃত যন্ত্র ।একাজে ধার করতে হয়েছিল ৬০০ টাকা ।

মার্শাল সাহেব খবরটা শুনে এগিয়ে এলেন কোনওভাবে সাহায্য করার জন্য । তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছাত্রদের জন্য একশ কপি অন্নদামঙ্গল অর্ডার দিলেন । প্রচলিত পুরানো বইটির মধ্যে নানা রকমের ভুল ছিল্ল।

বিদ্যাসাগর কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ীতে নিজে গিয়ে মূল পুঁথি সংগ্রহ করে আনলেন এবং নিজে দায়িত্ব নিয়ে নির্ভুল অন্নদামঙ্গল ছাপিয়ে মার্শাল সাহেবকে একশ কপি দিলেন ।মার্শাল সাহেব একশ কপি বইয়ের দাম দিলেন ৬০০ টাকা। এতে বিদ্যাসাগরের দেনা শোধ হয়ে গেল। বাকী বই বন্ধুদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন।

বন্ধু মার্শাল সাহেবের চেষ্টায় ১৮৪৯ সালের ১লা মার্চ বিদ্যাসাগর আবার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হেড ক্লার্ক কাম কোষাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হলেন। আর্থিক অভাব দূর হল। কিন্তু পারিবারিক দুটি দুর্ঘটনা ঘটে গেল এই সময় । ছোট দুই ভাই হরচন্দ্র ও হরিশচন্দ্র কলকাতায় পড়তে এসে কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেল। ঐ সময় কলেরা রোগের ভাল কোন চিকিৎসাব ব্যবস্থা ছিল না।

১৮৫০ সালে সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক পদের চাকরী ছেড়ে দিয়ে মদনমোহন জেলা আদালতেব জজ পণ্ডিতের চাকুরীতে যোগ দেন। সরকাবী শিক্ষা সংসদের সচীব ময়েট সাহেব এই অধ্যাপক পদে বিদ্যাসাগরের নাম প্রস্তাব করলেন। বিদ্যাসাগর জানালেন সংস্কৃত কলেজের সংস্কার কাজে স্বাধীন ক্ষমতা পেলে তিনি অধ্যাপক পদে যোগ দিতে রাজী আছেন।

ময়েট সাহেব বিদ্যাসাগরের প্রস্তাবে রাজী হয়ে যাওয়ায়, সম্পাদক রসময় দত্ত পদত্যাগ করেন। এই সময় থেকে সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক এবং সহ সম্পাদক দুটি পদ বাতিল করে প্রথম অধ্যক্ষের পদ সৃষ্টি করা হল। ১৮৫১ সালের ২২শে জানুয়ারী বিদ্যাসাগর হলেন সংস্কৃত কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্তি পত্রে দায়িত্ব ও ক্ষমতা অর্পণ করা হয়, এবং সরকারের কাছে অনুমোদনের জন্য প্রেরিত পত্রে শিক্ষা সংসদের সব সদস্য এক বাক্যে বিদ্যাসাগরকে একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি বলে স্বীকৃতি দেন।

অবশ্য সাত বছর পরে সিপাহী বিদ্রোহের কারণে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে ইংরেজ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী বদলে য়ায়।

১৮৫০ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিদ্যাসাগর যে শিক্ষা সংস্কার পরিকল্পনা পেশ

করেছিলেন তাতে ২৬ টি অনুচ্ছেদের মধ্যে প্রথম পাঁচটি অনুচ্ছেদে শিক্ষার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। বাকী ২১ টি অনুচ্ছেদে সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং উন্নয়নের বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে । ছয় থেকে সাতেরো অনুচ্ছেদে পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে সুচিন্তিত মত প্রকাশ করা হয়েছে । পরবর্তী তিনটি অনুচ্ছেদে শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে এবং পরের ছয়টি অনুচ্ছেদে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে পরিকল্পনা প্রকাশ করা হয়েছে । সর্বশেষ অনুচ্ছেদে সংস্কার ও রূপান্তরের ছবি তুলে ধরা হয়েছে ।

দেড়শ বছর পরেও বিদ্যাসাগরের এই প্রস্তাবিত সংস্কার পরিকল্পনা গুরুত্ব হারায়নি । বর্তমান যুগেও পরিকাঠামো,পাঠ্যক্রম,পাঠদান পদ্ধতি ,পাঠ্যবিষয় নির্বাচন ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের পরিকল্পনা নতুন পথের সন্ধান দিতে পারে ।

বিদ্যাসাগরের প্রস্তাবের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় আজো বিশেষভাবে বিবচনা করার যোগ্য, যেমন ঃ---------------

(১) যাঁরা এদেশে শিক্ষা তত্ত্বাবধানের ভার নিয়েছেন তাঁদের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত সুসমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি । তখন কলকাতা ছিল ভারতের রাজধানী। রাজধানীর নাগরিকদের ভাষা ছিল বাংলা । তাই বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি প্রথম প্রয়োজন মনে হয়েছে।

(২) যাঁরা ইউরোপীয় আকর গ্রন্থ .থকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপকরণ সংগ্রহ করতে অক্ষম এবং পরিচ্ছন্ন ভাববহ সহজ বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে অক্ষম,তাঁরা এরূপ সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারবেন না।

(৩) যাঁরা সংস্কৃত ভাষায় সুশিক্ষিত নন তাঁরা পরিচ্ছন্ন ও ভাববহ বাংলা ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারবেন না । এজন্যই সংস্কৃত পন্ডিতদেরও ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে সুশিক্ষিত হতে হবে।

এখানে আমরা ত্রিভাষা ফরমূলার প্রস্তাব দেখতে পাচ্ছি । সংস্কৃত-ইংরেজী ও বাংলা শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন মনে করেছিলেন বিদ্যাসাগর। বর্তমানে সংস্কৃতের স্থান নিচ্ছে হিন্দি ভাষা এবং বাংলার স্থান নিচ্ছে মাতৃভাষা ।

(৪) অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যাঁরা শুধু ইংরেজীতে পারদর্শী তাঁরা প্রাঞ্জল বাংলায় নিজেদের ভাব প্রকাশ করতে পারেন না ।

(৫) এটা পরিস্কার যে সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা যদি ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে

পরিচিত হয় তবে তারাই হবে সুসমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্যের রচয়িতা।

এভাবে বিদ্যাসাগর তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনায় (১) সংস্কৃত শিক্ষা (২) প্রয়োজনীয় ইংরেজী শিক্ষা এবং (৩)বাংলা সাহিত্য সৃষ্টিতে উৎসাহ দান, এই তিনটি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়েছেন।

তিনি ব্যাকরণ শিক্ষার সময় কমিয়ে দিলেন। মূল নিয়মগুলো ঠিক রেখে বাংলা ব্যাকরণ শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন । সহজ ভষায় সংস্কৃত পাঠের গুরুত্ব দিলেন ।

শিশু সাহিত্যের পরিবর্তে সংস্কৃত ও বাংলা রচনা শিক্ষার কথা বললেন । অলংকারের পাঠ্যসূচীতে সাহিত্য ও দর্শনের কঠিন অংশ বাদ দেবার পক্ষে মত দিলেন। গণিতের উপর সংস্কৃতের ভাষ্য বদল করে ইংরেজী ভাষ্য প্রচলনের প্রস্তাব দিলেন।

জুনিয়ার বিভাগে সাহিত্য, ব্যাকরণ, অলংকার এর সঙ্গে বাংলা ভাষা শেখাবার প্রয়োজনীয়তার কথা বললেন । প্রয়োজনীয় বাংলা পাঠ্য পুস্তক লেখার ভার নিলেন বিদ্যাসাগর। ইংরেজী ভাষাকে অবশ্য পাঠ্য করার কথা বলা হল । আগে ঐচ্ছিক ভাষা হিসেবে ইংরেজী পড়ানো হতো সংস্কৃত কলেজে । ১৮৩৫ সালে এ ক্লাসটি তুলে দেওয়া হয়।

ন্যায় শাস্ত্রের নতুন নামকরণ হল, দর্শন । যাতে ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্রও পড়ানো যায় । স্মৃতি ও ন্যায় শাস্ত্রের কিছু অংশ বাদ দেওয়া হল । এসব ব্যবস্থার ফলে ইউরোপীয় দর্শনকে ভারতীয় রূপ দেবার পথ প্রশস্ত হল।

বিদ্যাসাগর প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আনলেন । নিয়ম শংখ্খলার ব্যাপারে খুব কঠোর হলেন। সংস্কৃত কলেজে বিনা পয়সায় পড়ার সুযোগ ছিল বলে অনেকেই মনে করতো এটা হল গরীব ব্রাহ্মণদের স্কুল । এখানে লেখাপড়া হয় না। শিক্ষকরা ছিলেন অনিয়মিত । যখন খুশী কলেজে আসতেন, যখন খুশী চলে যেতেন। কলেজে না আসলেও কোন শাসন ছিল না । ড্রপ আউটের সংখ্যা ছিল খুব বেশী । হিন্দু তিথি অনুযায়ী কলেজ ছুটির ব্যবস্থা ছিল।

বিদ্যাসাগর প্রথমে ছাত্র ও অধ্যাপক সকলের জন্য কলেজে হাজিরা দেওয়া এবং বাড়ী যাওয়ার সময় নির্দিষ্ট করে দিলেন। ক্লাসে ক্লাসে ঘুরে ঘুরে লক্ষ্য রাখলেন যাতে ক্লাশে ঘুমিয়ে থেকে কেউ ফাঁকী দিতে না পারেন । ছাত্রদের জন্য একটাকা ফি চালু করা হল। গরীব ছাত্রদের ক্ষেত্রে ফ্রি পড়ার ব্যবস্থা রইল। ক্লাস থেকে বাইরে যেতে হলে পাশ নিয়ে যাবার প্রথা চালু হল।

ছাত্রদের শাস্তি দেবার প্রথা বন্ধ করলেন। সামান্য কারণে বেতমারা শিক্ষকদের

একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। নির্দেশ অমান্য করে ছাত্রকে বেত্রাঘাত করলে শিক্ষককে বরখাস্ত করা হতো । খেলাধুলার জন্যও একঘন্টা বরাদ্দ করা হয়েছিল ।

বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় সংস্কৃত কলেজের মর্যাদা অনেক বেড়ে গেল। এখান থেকে পাশ করে বহু ছাত্র উচ্চ পদে চাকুরী করার সুযোগ পেয়েছিল । বহু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং জজ পণ্ডিত নিযুক্ত হয়েছিল সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের মধ্যে থেকে।

অধ্যক্ষপদে যোগ দেবার সময় বিদ্যাসাগরের বয়স ছিল ৩১ বছর । এই পদে চাকরী করেছেন মাত্র ৮ বছর । এই সময়ের মধ্যেই সংস্কৃত কলেজেব যে উন্নতি ঘটেছিল তাকে বলা যায় স্বর্ণযুগ । তিনি যদি পুরো সময় অধ্যক্ষের পদে চাকুরী করতেন তাহলে সংস্কৃত কলেজের অনেক উন্নতি হতো কিন্তু তাতে দেশের ও সমাজের অনেক ক্ষতি হতো।

স্বাধীনচেতা বিদ্যাসাগর কোন কারণেই কারো কাছে মাথা নত কবতে রাজী ছিলেন না । তাই আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্য বারবার চাকুরী ছেড়ে আর্থিক দুর্দশা মাথা পেতে নিয়েছেন। অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগরের পরিচালনায় সংস্কৃত কলেজ হয়ে উঠল একটি যৌথ পরিবার । পরীক্ষা গ্রহণ---থেকে শুরু করে ফল প্রকাশ পর্যন্ত পাশ্চাত্য ধারা অনুসরণ করা হল । ঘন ঘন পরীক্ষার ব্যবস্থা করে ছাত্রদের সজাগ করা হল । উৎসাহ বৃদ্ধিব জন্য নানা প্রকার বৃত্তি ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হল।

সংস্কৃত কলেজে আগে মাদুরে বসে পড়াশোনা করতে হতো । বিদ্যাসাগর এই ব্যবস্থা তুলে দিয়ে চেয়ার ও বেঞ্চের ব্যবস্থা করলেন। আগে শুধু ব্রাহ্মণ এবং বৈদ্যরাই সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হবার সুযোগ পেত । বিদ্যাসাগব সকলের জন্য কলেজের দরজা খুলে দিলেন । কিন্তু কমিটির অধিকাংশ সদস্য গোঁড়াপন্থী হওয়ায শূদ্ররা দীর্ঘকাল যাবত ভর্তি হবার যোগ্য বিবেচিত হল না । এসব কারণেই পরবর্তীকালে সংরক্ষণ ব্যবস্থার কথা ভাবতে হয়েছে। অবশ্য ১৮৬০ সালে শিক্ষা বিভাগ সমস্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য সংস্কৃত কলেজের দরজা খুলে দিয়েছিল।

বিদ্যাসাগরের মূল ভাবনা ছিল সংস্কৃত ভাষাকে সহজ ও গতিশীল করা এবং ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয ঘটিয়ে দেওয়া এবং বাংলা ভাষায় উন্নত সাহিত্য রচনার পথ খুলে দেওয়া ।

সংস্কৃত পণ্ডিতেরা সংস্কৃত ভাষাকে ক্রমাগত কঠিন থেকে কঠিনতর পথে চালিত করে সাধারণ মানুষের কাছে দুর্বোধ্য করে তুলেছিল। সন্ধি ও সমাসের বেড়াজাল থেকে ভাষাকে মুক্ত করার সহজ পথ তিনি আবিষ্কার করেছিলেন । ব্যাকরণের কঠিন

নিয়মগুলোকে গবেষকদের ব্যবহারের জন্য আলাদা করে ফেলেছিলেন।

যারা বিশেষজ্ঞ হতে চান তারাই শুধু প্রাচীন শাস্ত্র গ্রন্থ থেকে মূল ভাব উদ্ধারের জন্য ব্যাকরণের কঠিন নিয়মগুলো শিখবেন । সকলের জন্য তা প্রয়োজনীয় নয়। বিদ্যাসাগরের মধ্যেই প্রথম এই উপলব্ধি ঘটেছিল। তাই তিনি সহজ ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করতে পেরেছিলেন, যা দেড়শ বছর পরেও আমাদের সংস্কৃত শিক্ষার প্রধান সহায়ক গ্রন্থরূপে গণ্য হচ্ছে। এর মধ্যেই এর কয়েকশত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। আরো বহুকাল উপক্রমণিকা ও ব্যাকরণ কৌমুদী গ্রন্থ দুখানার উপযোগীতা থাকবে।

বিদ্যাসাগরের সামনে নির্দিষ্ট কোন মডেল ছিল না । দরিদ্র পরিবেশে জন্ম গ্রহণ করে চরম দারিদ্র্যকে উপেক্ষা করে বাস্তব জীবনে শিক্ষা ক্ষেত্রে যে সব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন তার ভিত্তিতেই তৈরী হয়েছিল শিক্ষা পরিকল্পনা ।

বিদ্যাসাগরেব পরিকল্পনা কতটা কার্যকরী তা নিজেই তিনি প্রমান করেছেন। আজ দেড়শ বছর পবও স্বাধীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যাসাগরের পরিকল্পনা বিভিন্ন দিক থেকেই উপযোগী।

প্রশাসনিক দুর্বলতার জন্যই শিক্ষার পরিকাঠামো ভেঙ্গে পড়ে , শিক্ষক ও ছাত্ররা কাজে ফাঁকী দেয়। শিক্ষাব মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস তার দৃষ্টান্ত। আবার প্রশাসক যদি সক্রিয় এবং দায়িত্বশীল হয় তবে শিক্ষার পরিবেশ কিভাবে দ্রুত উন্নতিলাভ করে বিদ্যাসাগরের অধ্যক্ষ জীবন তারই দৃষ্টান্ত হয়ে আছে ।আরো বহুকাল বিদ্যাসাগবের জীবন আমাদের দেশে ও সমাজে অনুপ্রেরণার উৎসস্থল হয়ে থাকবে ।

কলকাতা সংস্কৃত কলেজের কাজকর্ম পর্যালোচনা করে রিপোর্ট পেশ করার জন্য বেনারস সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ব্যালেন্টাইনকে শিক্ষা সংসদ থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তিনি ১৮৫৩ সালে কলকাতায় এসে সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করে একটা রিপোর্ট পাঠান । তাতে বলা হয় যে সংস্কৃত কলেজে দুটি ধারায় শিক্ষা চলছে। একটি সংস্কৃত ধারা এবং অপরটি ইংরেজী ধারা । এতে ছাত্ররা বিভ্রান্ত হচ্ছে। তিনি পরামর্শ দিলেন হিন্দু ভাববাদী দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে মিল আছে এমন পাশ্চাত্য দর্শন শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করলে ছাত্রদের বিভ্রান্তি দুর হবে ।

বিদ্যাসাগর এই পরামর্শ মেনে নিতে রাজী হলেন না। কারণ তাঁর মতে হিন্দু বেদান্ত ও সাংখ্য দর্শন ভ্রান্ত জেনেও দীর্ঘকাল হিন্দু বিশ্বাসের কথা বিবেচনায় রেখে তা কলেজে পড়াতে হবে। আধুনিক শিক্ষার সুফল জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের সেরূপ কাজে লাগানো দরকার ।

সে যুগে বেদান্ত এবং সাংখ্য দর্শনকে ভ্রান্ত বলে লিখিতভাবে মত প্রকাশ করা রীতিমত দু:সাহসিক কাজ । বিদ্যাসাগরের এই মতকে অনেকে বলেছেন বিপ্লবী চিন্তা । এরকম বয়সেই রামমোহন ব্রাহ্মণ্য গোঁড়ামিকে আঘাত করার জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বেদান্ত কলেজ।

এদেশে দীর্ঘকাল বেদান্ত চর্চা বন্ধ ছিল । রামমোহন কঠোর পরিশ্রম করে প্রাচীন বেদান্তেব ভাষ্য তৈরী করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছিলেন । রামমোহনের উদ্দেশ্য ছিল বেদান্তের মূল ভাষ্য পাঠ করে ছাত্ররা একেশ্বরবাদী চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে যুক্তিবাদী হয়ে উঠুক ।

অন্যদিকে বেনারস সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ব্যালেন্টাইনের উদ্দেশ্য ছিল ভাবতীয় হিন্দু ছাত্ররা প্রাচীন পন্থী চিন্তায় আবদ্ধ থাকুক। বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্য ছিল পাশ্চাত্য যুক্তিবাদী দর্শনের সঙ্গে তুলনা মূলক শিক্ষাব মাধ্যমে ছাত্ররা ন্যায় ও সাংখ্য দর্শনের ভ্রান্তি নিজেরাই আবিষ্কার করুক ।

ব্যালেন্টাইনের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে বর্তমান ভারতেব বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দৃষ্টিভঙ্গীর মিল বয়েছে। প্রাচীন হিন্দুত্বকে আদর্শ হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করাই তাদের মূল লক্ষ্য।

দুই সংস্কৃত কলেজের বক্তব্য লিখিতভাবে জানার পর শিক্ষা সংসদ বিদ্যাসাগরের ভূমিকাব প্রশংসা করেও নির্দেশ দিলেন বিদ্যাসাগব যেন ব্যালেন্টাইনের পরামর্শ মেনে নেন এবং মাঝে মাঝে চিঠি পত্রের আদান প্রদান করেন । কলেজের ছাত্রদের উন্নতির জন্য বিদ্যাসাগব যেন ব্যালেন্টাইনের মতামতকে গুরুত্ব দেন ।

বিদ্যাসাগর শিক্ষা সংসদের সম্পাদক ময়েট সাহেবকে জানালেন—একজন অধ্যক্ষের পক্ষে আরেকজন অধ্যক্ষের কাছে প্রগ্রেস রিপোর্ট পাঠানোর ব্যবস্থা অমর্যাদাকর । অধ্যক্ষ হিসেবে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ থাকতে হবে। কলেজের পঠন- পাঠনের ব্যাপাবে অন্য কারো নির্দেশ মেনে চলা সম্ভব নয়।

এরপর ১৮৫৪ থেকে ১৮৫৬ তিন বছর বিদ্যাসাগর স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন । এই সময় ছোটলাট ছিলেন বিদ্যাসাগরের বিশেষ পরিচিত ও অনুরাগী ফ্রেডরিক হ্যালিডে। তিনি বিদ্যাসাগরের শিক্ষা পরিকল্পনাকে সমর্থন করে সুপারিশ করে অনুমোদনের জন্য বড়লাটের কাছে পাঠান। এই সময় শিক্ষা সংসদের পরিবর্তে ডিরেক্টর অব্ পাবলিক ইনস্ট্রাকশান গঠন করা হয়।

ছোট লাট হ্যালিডের সুপারিশে বিদ্যাসাগর অধ্যক্ষের কাজের সঙ্গে সহকারী

বিদ্যালয় পরিদর্শক পদে নিযুক্ত হন। এই নতুন কজের জন্য মাসিক ২০০ টাকা বেতন বৃদ্ধি করা হয়। অধ্যক্ষ পদ সৃষ্টি হয়েছিল সম্পাদক এবং সহসম্পাদক পদ বিলুপ্ত করে । ঐ দুই পদের বেতন ছিল ৩০০ টাকা । অধ্যক্ষ যেহেতু দুটি পদেরই কাজ করবেন তাই অধ্যক্ষের বেতন হয়েছিন মাসিক ৩০০ টাকা । এখন সব মিলে বিদ্যাসাগরের মাসিক বেতন হল মাসিক ৫০০ টাকা । তখনকার ৫০০ টাকা বর্তমান কালের পঞ্চাশ হাজার টাকার চেয়েও বেশী । সামাজিক মর্যাদাও ছিল খুব উঁচুতে ।

বিদ্যাসাগরের পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রামাঞ্চলে মডেল স্কুল স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছিল । বিদ্যাসাগরের কাজ ছিল এসব স্কুলের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক নির্বাচন করা । সেকালে যোগ্য শিক্ষক মনোনয়নের জন্য একটি পরীক্ষা গ্রহণের বিজ্ঞাপণ দেওয়া হল। দুইশ প্রার্থী পরীক্ষায় বসলেও মডেল স্কুলের শিক্ষক হবার উপযুক্ত প্রার্থী ছিল খুবই কম। এই অভাব পূরণের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রস্তাব দিলেন বিদ্যাসাগর ।

শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রস্তাব অনুমোদিত হল। এর জন্যও চাই যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক । বিদ্যাসাগর সেকালের বিখ্যাত লেখক, বাংলা,সংস্কৃত ও ইংরেজীতে দক্ষ অক্ষয় কুমার দত্ত ও মধুসূদন বাচস্পতিকে শিক্ষক প্রশিক্ষণের শিক্ষক পদে নিয়োগের ব্যবস্থা করলেন। প্রতি ছয় মাসে ৬০ জন করে শিক্ষক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ নিয়ে কাজে নিযুক্ত হতে লাগল।

প্রতি জেলায় ৫টি করে মডেল স্কুল স্থাপণ করা হল । গ্রামের লোকেরাই স্কুলবাড়ী তৈরী করে দিল।

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হবার পর সরকারের খুব আর্থিক সংকট দেখা দিল । শিক্ষা সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি ভঙ্গীরও পরিবর্তন হল। শিক্ষা সম্পর্কে বিভাগের কর্তা গর্ডন ইয়ং সাহেবের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের মত বিরোধ দেখা দিল। শিক্ষা বিভাগের অনুমোদন নিয়ে প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়গুলোর খরচ বহণ করতে সরকার রাজী হল না। শিক্ষকদের বেতন বন্ধ হয়ে গেল । বিদ্যাসাগর বিরক্ত হয়ে সরকারী চাকরী ছেড়ে দিলেন । বন্ধুরা হায় হায় করতে লাগল। মাসিক ৫০০ টাকা বেতনের চাকরী ছেড়ে দেওয়া সহজ ব্যাপার নয় । কিন্তু বিদ্যাসাগর সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। বাকী জীবনে আর কখনো সরকারী চাকরীতে গেলেন না।
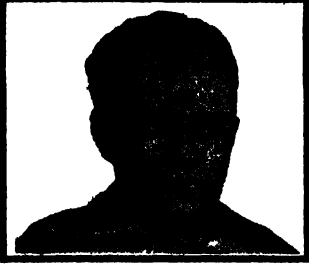
শিক্ষা বিস্তারে বিদ্যাসাগর

সংস্কৃত কলেজের মোটা বেতনের চাকরী ছেড়ে দিয়ে হঠাৎ করে বিদ্যাসাগর আর্থিক সংকটে পড়লেন । দুই ভাইয়ের চাকরী থাকায় কিছুটা ভরসা পেলেন। কলকাতায় এবং গ্রামের বাড়ীতে দুটি বিরাট সংসার চালাতে হবে এবং ভবিষ্যতের কথাও ভাবতে হবে।

বিদ্যাসাগর ছাপাখানার দিকে আবার বিশেষ মনোযোগ দিলেন। অংশীদার বন্ধু মদনমোহন সরকারী চাকরী পাওয়ার পর ছাপাখানার প্রাপ্য অর্থ নিয়ে যাবার ফলে ছাপাখানার মালিক এখন একা বিদ্যাসাগর । কাজেই স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ এল।

বিদ্যাসাগর ছিলেন তেজস্বী পুরুষ। শিক্ষা বিস্তারে বাধা পেয়ে তিনি চাকরী ছেড়ে এসেছেন। ইংরেজ বন্ধুদের বিশেষ অনুরোধেও আর চকরীতে ফিরে যেতে রাজী হলেন না। স্থির করলেন বাকী জীবনে আর সরকারী চাকরী করবেন না ।

বিদ্যাসাগরের এই সিদ্ধান্ত দেশের পক্ষে মঙ্গলজনকই হল। এই সময় থেকে বিদ্যাসাগর বাঙ্গালী জাতির মেরুদন্ড শক্ত করার জন্য শিক্ষা বিস্তারের কাজকেই জীবনের ব্রত রূপে বরণ করে নিলেন।

শিক্ষা বিভাগের বড় কর্তা ইয়ং সাহেবের সঙ্গে দুটি বিষয়ে বিদ্যাসাগরের মত বিরোধ দেখা দিয়েছিল। প্রথমটি হল--- সিপাহী বিদ্রোহে বিপুল খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকার শিক্ষা বিভাগে নতুন নিয়োগ স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছিল। বিদ্যাসাগর এই নির্দেশ অগ্রাহ্য করে সংস্কৃত কলেজে চারজন বিশিষ্ট পন্ডিতকে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করেছিলেন।

ইয়ং সাহেব বললেন,--- এতে দুদিক থেকে নিয়ম ভঙ্গ হয়েছে। প্রথমত: নতুন নিয়োগ বন্ধের নির্দেশ অগ্রাহ্য করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত এসব পদে নিয়োগের আগে বিজ্ঞাপণ দেবার নিয়ম আছে, তাও মানা হয়নি।

বিদ্যাসাগর জবাব দিলেন, উপযুক্ত অধ্যাপক সব সময় পাওয়া যায় না । কলেজের জরুরী প্রয়োজন মেটাবার জন্য চার জন যোগ্য অধ্যাপককে নিয়োগ করতে হয়েছিল । বিশিষ্ট পন্ডিত ব্যক্তিদের নিয়োগের ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজনবোধ করেন নি। কারণ এদের চেয়ে যোগ্যতর প্রার্থী পাওয়া সম্ভব ছিল না।

গর্ডন ইয়ং বিদ্যাসাগরের চিঠির জবাবে জানান—আপনার বিশেষ মর্যাদার কথা বিবেচনা করে চারজন অধ্যাপক নিয়োগ অনু মোদন করা গেল। তবে ভবিষ্যতে যাতে এরূপ অনিয়ম না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে অনুবোধ করা গেল। তর্ক বিতর্ক না করে আপানার সিদ্ধান্তকে উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হবে।

দ্বিতীয় বিরোধের বিষয়টি ছিল, স্কুল পাঠ্য বই প্রকাশনা নিয়ে। ইয়ং সাহেব বিদ্যাসাগরকে অনুরোধ করেন স্কুল পাঠ্য বই ছাপার দায়িত্ব যেন স্কুল বুক সোসাইটিকে দেওয়া হয়। কিন্তু বিদ্যাসাগর এই প্রস্তাবে রাজী হননি। ইয়ংসাহেব মনে করেছিলেন স্কুল বুক সোসাইটি কম দামে বই দিতে পাববে । কিন্তু বিদ্যাসাগরের মনে হয়েছে স্বাধীনভাবে কাজ করার পথে সরকারী হস্তক্ষেপ শুরু হয়েছে।

শিক্ষা বিভাগের প্রধান ইয়ং সাহেব বিভিন্ন জেলায় বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজকে সমর্থন করেছিলেন এবং সরকারী সাহায্যের জন্য সুপারিশও করেছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহ দেখা না দিলে এসব কাজে কোন বাধা সৃষ্টি হতোনা । কারণ ইয়ং সাহেবের সঙ্গেও বিদ্যাসাগরের বন্ধুত্ব ছিল।

চাকরী ছেড়ে দেবার আগে শিক্ষা দপ্তরে এক চিঠি দিয়ে বিদ্যাসাগর স্বীকার করেছেন যে,**তিনি নিজের উদ্যোগে কোন আদেশ নামা ছাড়াই বালিকা বিদ্যালয়গুলো প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু তিনি আশা করেছিলেন যে, সরকার এসব কাজে উৎসাহ যোগাবেন।** স্কুলগুলো তৈরীর সময় বা শিক্ষক নিয়োগেব সময় শিক্ষা দপ্তর থেকে কোন আপত্তি উঠেনি । সরকারের কাছে ৩৫ টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার রিপোর্ট পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগরের লেখা থেকে জানা যায় ৪০ টি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ছোট লাট হ্যালিডে সব সময় বিদ্যাসাগবের প্রচেষ্টাকে উৎসাহ দিয়েছেন।

গর্ডন ইয়ং সাহেব স্কুলগুলোর দায়িত্বভার গ্রহণ করার জন্য সরকারের কাছে বিশেষভাবে সুপারিশ করেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, উপরওয়ালার সাহায্য ছাড়াই একজন উৎসাহী ব্যাক্তি যে কাজ একা করেছেন তাকে উৎসাহ দিলে কাজের গতি বহুগুণ বেড়ে যাবে। সরকার লাভবান হবে।

ইংরেজ সরকার শেষ পর্যন্ত বালিকা বিদ্যালয়গুলোর অনুমোদন দিয়ে বিদ্যাসাগরকে ঋণ মুক্ত করেছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর তার আগেই পদত্যাগ করেন।

বিদ্যাসাগরের অসন্তোষের আরেকটি কারণ ছিল । সেটি হচ্ছে সিপাহী বিদ্রোহের সময় সরকার সেনা বাহিনীর শিবির করার জন্য হঠাৎ করে সংস্কৃত কলেজের দখল নিয়ে নেয় । ইয়ং সাহেব বিদ্যাসাগরের অসন্তোষ লক্ষ্য করে অবিলম্বে বৌ বাজারে দুটি ভাড়া বাড়ী সংস্কৃত কলেজের জন্য ব্যবস্থা করে দেন।

ছোট লাট হ্যালিডে বিদ্যাসাগরের মত একজন যোগ্য ব্যক্তি চাকরী ছেড়ে যাবেন তা কিছুতেই ভাবতে পারেন নি । হ্যালিডের অনুরোধে বিদ্যাসাগর পদত্যাগ পত্র জমা দেবার পরও একবছব কাজ চালিয়ে গেছেন। পদত্যাগের আরেকটি কারণ হল নেটিভদের জন্য আর কোন প্রমোশনের ব্যবস্থা তখন ছিল না । কাজের স্বাধীনতাও ছিল খুবই সীমাবদ্ধ ।

বিদ্যাসাগর নিজের গ্রামে জমি কিনে নিজের দায়িত্বে একটি স্কুল খুলে ছিলেন। স্কুলের যাবতীয় খরচ তিনি বহণ করতেন । এভাবে ক্রমে ক্রমে নিজের উদ্যোগে নতুন নতুন স্কুল স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ থাকা অবস্থায় সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শকের পদেও কাজ করেছেন । অধ্যক্ষের কাজের সঙ্গে কিভাবে পরিদর্শকের কাজ চালাবেন এ বিষয়ে শিক্ষা সংসদের কিছু সদস্য আপত্তি তুলেন । কিন্তু ছোট লাট হ্যালিডে সাহেব ইতিপূর্বে লর্ড হার্ডিঞ্জের অনুরোধে গ্রামাঞ্চলে ১০: টি স্কুল প্রতিষ্ঠার কাজে বিদ্যাসাগবের সক্রিয় সহযোগীতা, শিক্ষক নিয়োগে দক্ষতা এবং পরিচালন ব্যবস্থায় বিচক্ষণতার দৃষ্টান্ত তুলে ধরে সদস্যদের আপত্তি অগ্রাহ্য করেই বিদ্যাসাগরকে সরকারী বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাজে নিযুক্ত করেছিলেন এবং এই কাজের জন্য অতিরিক্ত ২০০ টাকা মাসিক বেতন স্থির করে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

প্রথম স্তরে মেদিনীপুর, বর্ধমান, হুগলী ও নদীয়া এই চারটি জেলায় ঘুরে ঘুরে বিদ্যাসাগর জনগণের মধ্যে শিক্ষা বিষযে উৎসাহ জাগিয়ে তুলেন। বহুগ্রামে জনসাধারণ নিজেদের উদ্যোগে স্কুলঘর তৈরী করে দিতে থাকে । গ্রামাঞ্চলে সংস্কৃত পন্ডিতদের প্রশিক্ষণ দিয়ে শিক্ষক পদে নিযুক্ত করেন। বিদ্যাসাগরের লক্ষ্য ছিল বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে মডেল স্কুল স্থাপন করা, যাতে ভবিষ্যতের শিক্ষক তৈবী করা সহজ হয় এবং গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারের আগ্রহ বৃদ্ধি করা যায়।

নতুন স্কুল থেকে পাশ করলে সরকারী চাকরী পাওয়া সহজ হয়। ফলে শিক্ষার আগ্রহ দ্রুত বাড়তে থাকে । পুরানো সংস্কৃত পন্ডিতদের পাঠশালা ও চতুস্পাঠীগুলো উঠে যেতে থাকে ।

এই সময় নতুন শিক্ষা বিস্তারের জন্য দুটি বিষয়ে চূড়ান্ত অভাব লক্ষ্য করা যায়। উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব এবং উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তকের অভাব।

পুরানো গ্রামীণ শিক্ষায় ছাপানো পুস্তকের কোন ব্যবস্থা ছিল না। খ্রীষ্টান মিশনারীদের উদ্যোগেই প্রথম ছাপাখানা ও ছাপানো পুস্তক চালু হয়। মিশনারীদের উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম প্রচার এবং মূল লক্ষ্য ছিল ধর্মান্তর করণ। কিন্তু বিদ্যাসাগরের প্রয়োজন

হল শিক্ষা বিস্তার এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসার ।

কাজেই ছোট লাট হ্যালিডের পরামর্শ ও উৎসাহে বিদ্যাসাগর পাঠ্যপুস্তক রচনায় উদ্যোগী হলেন।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইংরেজ রাজ কর্মচারীদের মধ্যে দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে । সংস্কৃত পন্ডিতরা এখানে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। মৃত্যুঞ্জয় তর্কালংকার বাংলা ভাষায় কয়েকটি পাঠ্য পুস্তক রচনা করেন। কিন্তু সংস্কৃত শব্দ ও ব্যাকরণের প্রাধান্য থাকায় এই ভাষাকে বলা হতো পন্ডিতি ভাষা । সাধারণের বোধগম্য ভাষায় পাঠ্য পুস্তক রচনার পরিকল্পনা বিদ্যাসাগরের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় বহন করে ।

মিশনারীরা খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচার শুরু করেন অশিক্ষিত, নিরক্ষর নিম্নবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে । কারণ ঐ সময় মুসলমানরা ইংরেজী শিক্ষা বয়কট করেছিল। নিরক্ষর মানুষের শিক্ষার জন্য শ্রীরামপুরের মিশনারীরা ৩১টি ভারতীয় ভাষা শিখে দেশীয় ভাষায় বাইবেল ছাপিয়ে প্রচার শুরু করেছিল । মিশনারী স্কুল প্রতিষ্ঠা করে স্কুলের জন্য পাঠ্য পুস্তক রচনাও শুরু করেছিল। রামমোহন এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছিলেন এবং পাঠ্য পুস্তক রচনায় সাহায্য করেছিলেন।

বিদ্যাসাগরের মনে হল এসব পাঠ্যপুস্তক সাধারণ মানুষের বোধগম্য হচ্ছেনা । সংস্কৃত কলেজের ছাত্র, অধ্যাপক, সহ-সম্পাদক এবং অধ্যক্ষ হিসেবে কাজ করার পর বিদ্যাসাগরের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রথমে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম কানুন সহজ করা এবং বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ ও প্রাঞ্জল করে তোলা জরুরী কর্তব্য হলে গণ্য করেছেন।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের জন্যও বিদ্যাসাগর পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছেন। কিন্তু তখনো বাংলা ভাষার আরষ্টতা ছিল । **বেতাল পঞ্চবিংশতি** , **বাংলার ইতিহাস**, **জীবন চরিত**, ওই পর্যায়ের রচনা ।

সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষের পদে যোগদানের পর প্রথমেই সংস্কৃত ব্যাকরণের সহজ সোপান স্বরূপ উপক্রমনিকা রচনা করেন। গ্রন্থটি এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে প্রথম প্রকাশের দেড়শ বছর পরেও সংস্কৃত শিক্ষার আদর্শ ব্যাকরণ গ্রন্থ হিসেবে এটি আজো প্রচলিত রয়েছে। ইতিমধ্যে শত শত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। এর পরে উচ্চতর সংস্কৃত শিক্ষার জন্য রচিত হয়েছে ব্যাকরণ কৌমুদী, প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড । এ গ্রন্থটিও আজ পর্যন্ত অপ্রতিদ্বন্দ্বি পাঠ্য পুস্তক রূপে প্রচলিত রয়েছে।

বাংলা ভাষায় প্রাথমিক পাঠ্য পুস্তক রূপে রচিত হয়েছে **বোধোদয়**,---সংস্কৃত

সাহিত্য পাঠের প্রাথমিক পুস্তক রূপে রচিত হয়েছে---**ঋজু পাঠ**- প্রথমভাগ ,দ্বিতীয় ভাগ ও তৃতীয় ভাগ ।

মহাভারতের গল্প অবলম্বনে রচিত হয়েছে **শকুন্তলা উপাখ্যান**। এখান থেকেই বাংলা প্রাঞ্জল ভাষার রূপ পেয়েছে। পরে-- **সীতার বনবাসে**-- তা আরো সমৃদ্ধ হয়ে সাহিত্য রস সৃষ্টি করেছে।

একটি আরষ্ট গদ্য ভাষাকে মধুর ও প্রাঞ্জল সাহিত্যের ভাষায় রূপান্তব করা বিদ্যাসাগরের এক অপূর্ব কীর্তি । কথামালা , চরিতাবলী, আখ্যান মঞ্জুরী এসব গ্রন্থ মূলত শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যেই রচিত হয়েছে। ইংরেজী থেকে অনুবাদেও বিদ্যাসাগর অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সেক্সপীয়ারের---কমেডি অব্ এররস--- গ্রন্থের অনুবাদ করে **ভ্রান্তি বিলাস** নামে প্রকাশ করেছেন। এটিও বিদ্যাসাগরের রচিত একটি মৌলিক সাহিত্যের মর্যাদা পাবার উপযুক্ত হয়েছে।

এভাবে বিদ্যাসাগর· বাংলা ভাষাকে উচ্চতব শিক্ষাদানের উপযুক্ত করে তুলেছেন। শিশু পাঠ্য হিসেবে **বর্ণমালা**- প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ রচনা করে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের নতুন যুগেব সূত্রপাত ঘটিয়েছেন।

উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক তৈরী হবার পর শিক্ষা বিস্তারে একটা জোয়ার সৃষ্টি হল। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালেই শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য---নর্মাল স্কুল স্থাপন করেছিলেন। কাজেই নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একদল শিক্ষক সরবরাহ কবাও সহজ হয়ে গেল। এর ফলে গ্রামাঞ্চলে নতুন যুগের উপযোগী আধুনিক স্কুল প্রতিষ্ঠার কাজ দ্রুত এগিয়ে গেল।

বিদ্যাসাগর গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে মাতৃভাষাকে শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হিসেবে গণ্য করেছেন , সংস্কৃত বা ইংরেজী নয়।

এই সময় একদল পন্ডিত সংস্কৃত ভাষাকেই শিক্ষার মাধ্যম করার জন্য জোরালো আন্দোলন শুরু করেছিলেন । আরেক দল আধুনিক শিক্ষিত যুবক ইংরেজী ভাষাকেই শিক্ষার মাধ্যম করার জন্য দাবী করতে থাকে । কিন্তু বিদ্যাসাগর মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করে সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষাকেও শিক্ষার অন্তর্ভূক্ত করার প্রস্তাব করেন। এখান থেকেই শুরু হয় শিক্ষাক্ষেত্রে ত্রিভাষা ফরমূলা, যা আজো বাস্তবোচিত বলে গণ্য হচ্ছে।

কলকাতা শহরে বেশ কিছু উদারপন্থী ইংরেজ সাহেব শিক্ষা বিস্তারের কাজে এগিয়ে আসেন। ডেবিড হেয়ার এবং বেথুন সাহেব ছিলেন তাদের মধ্যে অগ্রণী ।

বিদ্যাসাগর তাদের কাজে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন । বেথুন বালিকা বিদ্যালয় যা বর্তমানে বেথুন কলেজ নামে পরিচিত, বিদ্যাসাগর ছিলেন এই বিদ্যালয়ের সম্পাদক । মেয়েরা যাতে পড়তে না আসে তার জন্য গোঁড়াপন্থী পন্ডিতেরা নানাভাবে বাধা সৃষ্টি করতে থাকেন। বিদ্যাসাগর বন্ধুদের বাড়ী ঘুরে ঘুরে তাদের পরিবারের মেয়েদের স্কুলে ভর্তি করার ব্যবস্থা করেন।

লন্ডন থেকে রামমোহনের এক ভক্ত মিস কার্পেন্টার ৬০ বছর বয়সে ভারতে নারী শিক্ষা বিস্তারের কাজে সাহায্য করার জন্য কলকাতায় আসেন। তিনি প্রথমেই বিদ্যাসাগরের সাহায্য প্রার্থনা করেন। বিদ্যাসাগর সর্বতোভাবে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসেন।

বিদ্যাসাগরের শিক্ষানীতি এবং আধুনিক বিদ্যালয় স্থাপনের পেছনে মূলত তিনটি লক্ষ্য ছিল (১) মাতৃ ভাষায় ভাব প্রকাশের ক্ষমতা অর্জন করা (২) সংস্কৃত সাহিত্য আয়ত্ত করা এবং ভাষাকে সমৃদ্ধ করা (৩) আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার জন্য ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করা ।

সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগর ছাত্র থাকাকালে ঐচ্ছিক ইংরেজী শিক্ষাব ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু হঠাৎ করে এই ব্যবস্থা বাতিল করে দেওয়া হয়। ফলে বিদ্যাসগরের ইংরেজী শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায় । ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে কাজ করার সময় বিদ্যাসাগর ইংরেজী শিক্ষা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করেন। পরে সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষ হবার পর ইংরেজী ভাষা শিক্ষা বাধ্যতা মূলক করেন সংস্কৃত কলেজে।

গ্রামাঞ্চলে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে বিদ্যাসাগর গ্রামবাসীদেব উদ্যোগকে প্রয়োজনীয় সাহায্য দিয়েছিলেন । সরকারী উদ্যোগকেও সহায়তা দিয়েছেন।

শিক্ষানীতি,পাঠ্যপুস্তক ,শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে সরকারের উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিরা সর্বদাই বিদ্যাসাগবেব পরামর্শ নিতেন। বিদ্যাসাগরও সম্ভাব্য সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা করতেন।

ইংরেজ সরকার ১৮১৩ সাল পর্যন্ত ভারতীয় প্রজা সাধারণের শিক্ষার কোন দায়িত্ব নিতে রাজী হয়নি। ১৮১৩ সালে পার্লামেন্টের নতুন সনদে ভারতে কোম্পানীর সরকারকে সাধারণ শিক্ষার দায়িত্ব নিতে বলা হয় । ঐ বছর শিক্ষাখাতে একলক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়।

১৮১৮ সালের মিশনারীদের উদ্যোগে ১১১টি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এগুলোতে ছাত্র সংখ্যা ছিল দশ হাজার । এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল সরকারী

অনুদানে। তারাও বাংলা ভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। কারণ দেশীয় ভাষায় ধর্ম শিক্ষা না পেলে খ্রীষ্ট ধর্মের প্রকৃত অর্থ তারা বুঝতে পারবে না।

১৮৩৫ সালে এদেশে ইংরেজ সরকারের অফিসে কেরানীর কাজ করার যোগ্যতা অর্জনের জন্য ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের নীতি প্রচলিত হয়। কিন্তু বড়লাট হার্ডিঞ্জের সময় ইংরেজী স্কুলের পাশাপাশি বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ শুরু হয়। গভর্নর হার্ডিঞ্জ বিদ্যাসাগরকে এসব বিদ্যালয়ের দায়িত্ব দেন। এই সময়ের অভিজ্ঞতায় বিদ্যাসাগর বুঝতে পারেন, মাতৃ ভাষায় শিক্ষা বিস্তার জরুরী প্রয়োজন।
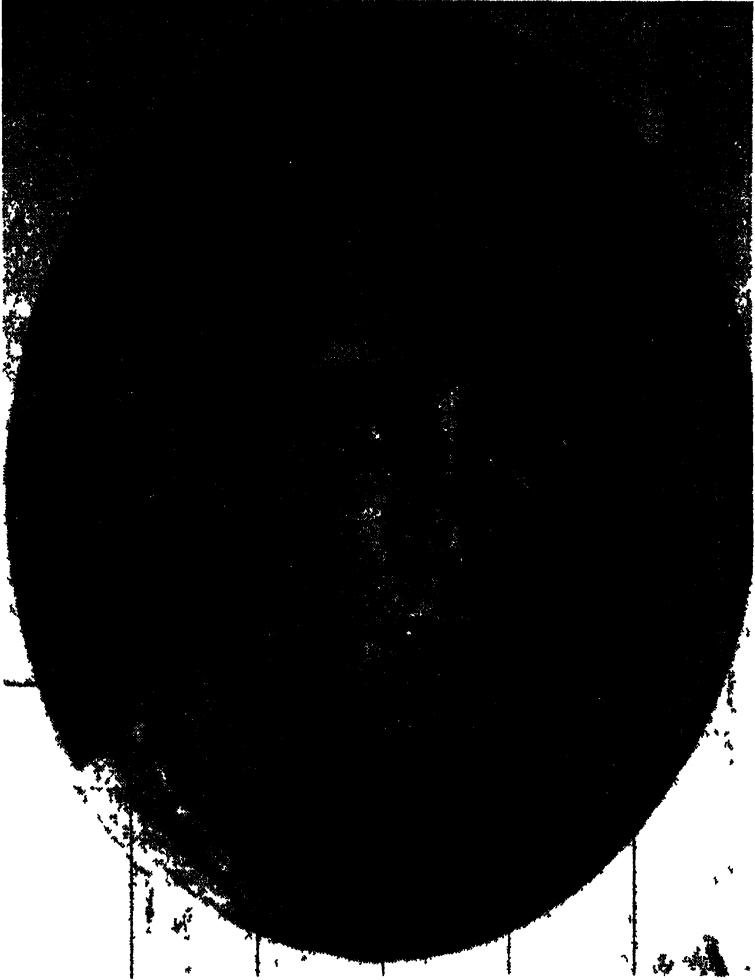
শিশু শিক্ষায় বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগর মাত্র আট বছর বয়সে গ্রামের পুরাতন শিক্ষা বাবস্থার গন্ডী পার হয়ে পিতার হাত ধরে কলকাতায় এসে নতুন যুগের শিক্ষা পরিবেশে প্রবেশ করেন।

বীরসিংহ গ্রাম থেকে কলকাতায় আসার পথে বড় রাস্তার ধারে দশটি মাইলস্টোন দেখে আট বছরের শিশু ঈশ্বরচন্দ্র ইংরেজী সংখ্যা শিখে ফেলেছিলেন। ওই ঘটনাই প্রমান করেছিল ঈশ্বরচন্দ্র এক অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ।

পিতা ঠাকুরদাস পুত্রকে সংস্কৃত পন্ডিত বানিয়ে গ্রামে চতুষ্পাঠী খুলে বংশগত পেশায় নিযুক্ত করার কথা যেমন ভেবেছিলেন ঠিক তেমনি নিজের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতায় ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে পুত্রকে শিক্ষিত করে সরকারী চাকুরীতে প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্নও দেখেছিলেন ।

কিন্তু সেকালে ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ শুধু বিত্তবানদের জন্যই খোলা ছিল। কাজেই ঈশ্বরচন্দ্রের যথেষ্ট যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও মাসিক আট টাকা বেতনের কর্মচারীর পক্ষে পুত্রকে হিন্দু কলেজে ভর্তি করার স্বপ্ন ত্যাগ করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না ।

এই ঘটনা শেষ পর্যন্ত দেশের পক্ষে খুবই মঙ্গলদায়ক হয়েছিল। সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হয়ে প্রাচীন ভারতের বিপুল সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনের ভান্ডার সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে আধুনিক যুগের প্রয়োজনীয় ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে জ্ঞান অর্জন করা বিদ্যাসাগরের পক্ষে মোটেই কঠিন হয় নি। বরং প্রাচ্য বিদ্যার শ্রেষ্ঠ পন্ডিত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে বিদ্যাসাগরের মর্যাদা ইংরেজ পন্ডিতদের কাছে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল ।

মাত্র একুশ বছর বয়সে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হেড পন্ডিত হিসেবে বিদ্যাসাগরের কর্মজীবন শুরু হয়। এখানে বিদ্যাসাগরের সমবয়সী ছাত্ররা ছিলেন ইংলন্ড থেকে আগত উচ্চ শিক্ষিত রাজ কর্মচারী পদে নিযুক্ত কর্মীরা। তাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন উদার পন্থী । তাদের মধ্য থেকেই সরকারের উচ্চ পদে নিযুক্ত হয়ে দীর্ঘকাল প্রশাসনিক কাজ করেছেন অনেকেই । সমবয়সী বলেই তাদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের বন্ধুত্ব হয়েছিল গভীর এবং আন্তরিক ।

বিদ্যাসাগরের শিক্ষা সংস্কার ও বিস্তারের পরিকল্পনা তৈরী হয়েছিল সংস্কৃত কলেজকে কেন্দ্র করেই । তিনি প্রথম সুযোগেই সংস্কৃত কলেজের আমূল সংস্কার করেন।

এখান থেকেই নতুন যুগের উপযোগী শিক্ষকদের তৈরী করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

এদেশে পন্ডিতরা হাতে লেখা পুঁথির সাহায্যে মুখে মুখে শিক্ষা দিতেন। ছাপা বই পড়লে জাত যাবে এমন একটি সংস্কার সমাজে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। কারণ ছাপানো বইয়ের ব্যবহার শুরু করেছিলেন খ্রীষ্টান মিশনারীরা ।

শ্রীরামপুরের মিশনারীরা শিশু শিক্ষার জন্য কিছু পাঠ্য বই ছাপিয়ে প্রকাশ করেছিলেন। হিন্দু কলেজের সঙ্গে যুক্ত পাঠশালা এবং তত্ত্বোধিনী পাঠশালার পক্ষ থেকেও কয়েকটি শিশু পাঠ্য বই প্রকাশ করা হয়েছিল ।

শিশু-বোধক নামে একটি বই প্রকাশিত হয়। এতে স্বরবর্ণ,ব্যাঞ্জনবর্ণ ,অংক ,চিঠিপত্র ,জমির মাপ ইত্যাদি শিক্ষার সাধারণ ব্যবস্থা ছিল।

স্কুল বুক সোসাইটি থেকে পিয়ারসনের--বাংলা পাঠ--নামে একটি সংকলন প্রকাশিত হয় । মিঃ মে রচিত একটি গণিতের বইও প্রকাশ করা হয়।

শ্রীবামপুর মিশন থেকে- লিপিধারা-- নামে একটি শিশু পাঠ্য বই প্রকাশিত হয়। এতে প্রাথমিক পাঠ ,বিশুদ্ধ বানান শিক্ষা ,ব্যাকরণ, গণিত , ভূগোল ,ইতিহাস , নীতিকথা ইত্যাদি বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট বর্ণমালা,উপদেশকথা,তমনাশক ইত্যাদি কয়েকটি বই পাঠশালার জন্য প্রকাশ করেন।

অক্ষয় কুমার দত্ত ভূগোল ,অংক ও পদার্থ বিদ্যার উপর কয়েকটি বই প্রকাশ করেন।

এসব বই তখনকার সরকারী কর্তৃপক্ষ শিশু পাঠ্যের উপযুক্ত বলে বিবেচনা করেনি। ফলে স্কুল বুক সোসাইটিকে উপযুক্ত পাঠ্য বই তৈরী করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

হিন্দু কলেজের পাঠ্য বইগুলো নিম্নমানের ছিল । উপযুক্ত পাঠ্যবই না থাকায় শুধু অনুবাদ করে কিছু কিছু বাংলা শেখানো হতো ।

লর্ড হার্ডিঞ্জের সময প্রতিষ্ঠিত ১০১টি সরকারী বাংলা বিদ্যালয়ে সহজ বর্ণের সাহায্যে ক্রমে ক্রমে সংযুক্ত বর্ণের শিক্ষা দেওয়ার সিদ্ধান্ত দেওয়া হয় । কিন্তু এর জন্যও উপযুক্ত বই ছিলনা।

বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করার সময় বিদ্যাসাগর শিশু পাঠ্য বইয়ের অভাব তীব্রভাবে অনুভব করেন। বন্ধু মদনমোহন তর্কালংকারকে এ বিষয়ে উদ্যোগী হতে অনুরোধ করেন।

মদন মোহন--- শিশুশিক্ষা--নামে একটি বই লিখেন । বিদ্যাসাগর রচনা করেন বোধোদয় নামে একটি বই । আরেক বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করেন--- নীতিবোধ-- নামে একটি বই।

এই সময় ঈশ্বরচন্দ্রের ছোটভাই হরিশচন্দ্রের আকস্মিক মৃত্যু সংবাদ পেয়ে পিতার নির্দেশে গ্রামের বাড়ীতে ছুটে যেতে হয় । ফলে বিদ্যাসাগরের উদ্যোগ সাময়িক বাধাপ্রাপ্ত হয়।

পরে কলকাতায় ফিরে এসে বিদ্যাসাগর--- বোধোদয়--- প্রকাশ করেন। প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় বলা হয়,--- "বোধোদয় নানা ইংরেজী পুস্তক হইতে সংকলিত হইল, পুস্তক বিশেষের অনুবাদ নহে। বোধ করি অমূলক কল্পিত গল্পের পাঠ অপেক্ষা অনেক উপকার দর্শিতে পারিবেক।"

বিদ্যাসাগরের হাতে সময়ের অভাব ছিল বলেই নীতিবোধ লেখার দায়িত্ব বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়েছেন বলে বইটির ভূমিকায় উল্লেখ করা হয়েছে । বইটির বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে যে,------

"পরিশেষে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন পূর্বক অঙ্গীকার করিতেছি যে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় পরিশ্রম স্বীকার করিয়া আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়াছেন বলিয়াই আমি সাহস করিয়া এই পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম । এস্থলে ইহাও উল্লিখিত হওয়া আবশ্যক যে, তিনি প্রথমে এই পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন । কিন্তু তাঁহার অবকাশ না থাকাতে তিনি আমার প্রতি এই পুস্তক প্রস্তুত করিবার ভারার্পন করেন।"

বিদ্যাসাগর জীবনী মূলক পাঠ্য বইকে প্রধান হাতিযার হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন জীবনে উন্নতি করার জন্য- কঠোর শ্রম,অধ্যবসায়,সহিষ্ণুতা এবং জ্ঞানলাভ প্রয়োজন । বিখ্যাত ব্যক্তিরা কিভাবে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তা জানতে পারলে ছাত্রদের মধ্যে উৎসাহ এবং প্রেরণা সৃষ্টি হবে । তদ্বারা বিভিন্ন দেশের রীতিনীতি সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় ঘটবে।

ছোট লাট হ্যালিডে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের জন্য বিদ্যাসাগরকে একটি পরিকল্পনা তৈরী করার অনুরোধ করেন। বিদ্যাসাগর একটি পরিকল্পনা তৈরী করে মুখবন্ধে বলেন,---- কেবল লিখন পঠন ও সামান্য অংক শিক্ষার মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা হবে না ।

ইতিহাস, ভূগোল, জীবনচরিত, পদার্থবিদ্যা, নীতিশিক্ষা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, পাটিগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি ও শারীর বিজ্ঞান শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে ।তিনি পাঠ্য-পুস্তক সম্পর্কে নিম্নরূপ একটি প্রস্তাব পেশ করেন।

(১) শিশু শিক্ষা- পাঁচ ভাগ। প্রথম তিনভাগ বর্ণমালা,বানান ও পঠন শিক্ষা। চতুর্থ ভাগে- বোধোদয়, সাধারণজ্ঞান। পঞ্চম ভাগে- নীতিবোধ, নীতিশিক্ষা বিষয়ক ।

(২) পশু পাখীর প্রাকৃতিক ইতিহাস

(৩) মার্শম্যান রচিত বাংলাব ইতিহাসের বঙ্গানুবাদ

(৪) চারুপাঠ

(৫) জীবনচরিত

(৬) গণিত, পদার্থবিদ্যা,ভূগোল, অর্থনীতি,শারীরতত্ত্ব,ইতিহাস।

এই বিষয়গুলো বিদ্যালয় স্তরে পড়াবার ব্যবস্থা করতে বিদ্যাসাগর সুপারিশ করেন।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালে বিদ্যাসাগবের উপর পাঠ্যবই রচনা এবং অন্যের প্রকাশিত বই নির্বাচনেব দায়িত্ব ছিল। তখনকাব বাজারে প্রচলিত অধিকাংশ বইযের ভাষা, লেখার ধরণ, প্রকাশভঙ্গী, নানাদিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ ছিল। চাণক্য শ্লোকও তিনি স্কুলের ছাত্রদের পক্ষে উপযুক্ত বিবেচনা করেন নি । অনেক ক্ষেত্রে ভ্রান্ত এবং অশ্লীল শ্লোকও পাঠ্য বিষয়ে অন্তর্ভূক্ত কবা হতো । বিদ্যাসাগব এসব পছন্দ করতেন না।

বিভিন্ন বিদ্যালযে পবিদর্শণ করাব সময় প্রচলিত শিশু শিক্ষার বইটি ছাত্রদের উপযুক্ত বিবেচিত না হওয়ায় বিদ্যাসাগর নিজেই- বর্ণপরিচয়- প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ রচনা করেন । বর্ণমালার পবেই শিশুদের পক্ষে বোধোদয় এবং নীতিবোধ বুঝতে অসুবিধে হবে বিবেচনা করে বিদ্যাসাগব---কথামালা-- বচনা করেন। যাতে পরবর্তী বিষয় বুঝতে সহজ হয়। বইটির ভূমিকায় বিদ্যাসাগর বলেন.--- "প্রাচীন গ্রীস দেশে ঈশপ নামে একপন্ডিত ছিলেন। তিনি কতকগুলি নীতিগর্ভ গল্প রচনা করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন । গল্পগুলি পাঠ করিলে কৌতুক জন্মে এবং আনুষ্ঠানিক সদুপদেশ লাভ হয।"

কথামালার পরেই বিদ্যাসাগর শিশুদের মধ্যে ভাষাজ্ঞান এবং নীতিবোধ বৃদ্ধির জন্য আখ্যানমঞ্জুরী নামে একটি বই রচনা করেন। পরে এটিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করে বিভিন্ন স্তরের ছাত্রদের উপযোগী বিভাগ করেন।

বর্ণপরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের পর শিশুশিক্ষা তৃতীয় ভাগ পড়াবার

প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। মদনমোহনের মৃত্যুর পর শিশুশিক্ষা তৃতীয় ভাগ বিদ্যাসাগর নিজেই নতুন করে অতি যত্নে রচনা করেন। অর্থবোধ সহজ করার জন্য প্রয়োজনীয় সংশোধন করেন।

শিশুদের শিক্ষায় ভাষা এবং উচ্চারণ অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । বিদ্যাসাগর এ বিষয়ে খুবই সতর্ক ছিলেন। শিশুপাঠ্য বই রচনা করতে বিদ্যাসাগর শব্দ ব্যবহারের দিকে এবং ভাব-প্রকাশের সহজ পদ্ধতির দিকে বিশেষভাবে নজর দিতেন । শিশুরা ছোট ছোট বাক্য পছন্দ করে । যেমন- হাত ধর। বাড়ী যাও। বিদ্যাসাগর শিশুদের এই মানসিকতা উপলব্ধি করেছিলেন।

জল পড়ে। পাতা নড়ে। এ দুটি ছোট বাক্য রবীন্দ্রনাথকে ছোট বেলায় কি পরিমাণ আবেগে আপ্লুত করেছিল তা কবি নিজেই বর্ণনা করেছেন।

সহজ, সরল বাক্য থেকে ক্রমশ: কঠিন ও জটিল বাক্যের দিকে শিশু মন অগ্রসর হয়। বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় দুই খন্ডে বিদ্যাসাগর তারই উদাহরণ দিয়েছেন । প্রথমভাগে সরল বাক্য, দ্বিতীয় ভাগে সংযুক্ত বর্ণের সঙ্গে পরিচয় ঘটানো, এভাবেই বর্ণপরিচয় পরিকল্পিত হয়েছে।

স্বরবর্ণের ক্ষেত্রে স্বরে অ, স্বরে আ এভাবে পড়ানোর পরিবর্তে শুধু অ, আ পড়ার অভ্যেস করা দরকার বলে বিদ্যাসাগর মনে করতেন।

বাংলা ভাষায় বিরাম চিহ্নের ব্যবহার ছিল না । কবিতায় একটি বা দুটি দাঁড়ী চিহ্ন ব্যবহার করা হতো । ইংরেজী সাহিত্য পাঠ করার পর বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষায়ও ইংরেজীর মত যতি চিহ্ন ব্যবহার চালু করেন। এর ফলে বাংলা ভাষার ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে একটা বিপ্লব ঘটে যায়। বাংলা গদ্যে ভাব, রস এবং মাধুর্য সৃষ্টি হয়। শিশুকে শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করে তোলার জন্য বিদ্যাসাগর শব্দ এবং বাক্য গঠন ছাড়াও ছবি ব্যবহারের কথাও ভেবে ছিলেন।

বিদ্যাসাগরের যুগে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার চিন্তাভাবনার সুত্রপাত হয়েছিল মাত্র । ইংলন্ডে, বেন্থাম, মিল, হার্বার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি শিক্ষাবিদগণ শিশুকে জোর করে পড়ানোর বিরোধীতা করেছেন । কারণ তাতে বই পড়ার প্রতি শিশুদের আকর্ষণ কমে যায়। পড়ার ব্যাপারটা খেলার মতই আকর্ষনীয় এবং আনন্দদায়ক হওয়া উচিত । তবে পড়াশোনার একটা সুঅভ্যেস শিশু বয়স থেকেই গড়ে তোলা প্রয়োজন।

পরিশ্রম ছাড়া জ্ঞান লাভ করা যায় না এবং জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে হলে সুশিক্ষিত হতে হবে । এই ধারণাটা শিশুর মনে বিভিন্নভাবে গেঁথে দিতে হবে।

শিক্ষককে মনে রাখতে হবে চরিত্র গঠনই শিশু শিক্ষার মূল লক্ষ্য । কিন্তু এর

জন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রয়োগ করা চলবে না।

বিদ্যাসাগর ছোট বেলায় প্রথম যে পাঠশালায় পড়েছিলেন সেখানে দেখেছেন পন্ডিত মশাই বিনা কারণে কঠিন শাস্তি দিতেন। এরূপ নির্মম আচরণের তীব্র বিরোধী ছিলেন বিদ্যাসাগর । তিনি স্কুলের ছাত্রদের উপর বেত্রাঘাত করা নিষিদ্ধ করেন।

বিদ্যাসাগর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছিলেন এদেশে দরিদ্র পরিবারের শিশুদের পক্ষে শিক্ষালাভ ছিল কঠিন ব্যাপার । তাই চরিতাবলীতে এমন সব খ্যাতিমান ব্যাক্তির জীবন কাহিনী তুলে ধরেছেন যারা কঠোর পরিশ্রম করে নানা রকম অপমান ও কষ্ট স্বীকার করে শিক্ষালাভ করেছেন এবং জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

শিশু শিক্ষায় ধর্মীয় মতবাদ প্রচারের বিরোধী ছিলেন বিদ্যাসাগর । ধর্ম নিরপেক্ষতাই হতে হবে শিক্ষার আদর্শ । ইংলন্ডেও এই সময় শিক্ষার মাধ্যমে ধর্মমত প্রচারের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠেছিল। ভারতেও মিশনারীদের এ বিষয়ে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল।

সংস্কৃত কলেজ থেকে বেরিয়ে আসার পর বিদ্যাসাগর মেট্রোপলিটান স্কুলটিকে একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রূপে গড়ে তোলার কাজে বিশেষভাবে মনোযোগী হয়েছিলেন।

বেসরকারী উদ্যোগে এবং দেশীয় শিক্ষকদেব দ্বারা পরিচালিত একটি প্রতিষ্ঠান যে বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ অনুযায়ী সর্বোচ্চ মানের শিক্ষা দিতে পারে মেট্রোপলিটন স্কুলটি তারই দৃষ্টান্ত ।

ইংবেজ পন্ডিতদের ধারণা ছিল আধুনিক যুগের উপযোগী উচ্চ শিক্ষা দেওয়ার মত যোগ্যতা দেশীয় শিক্ষকদের নেই । বিদ্যাসাগব এই ধারণা ভেঙ্গে দেন। দেশের সেরা পন্ডিতদের শিক্ষক পদে নিয়োগ কবে বিদ্যাসাগর মেট্রোপলিটন স্কুলটিকে কলেজ স্তরে উন্নীত করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সর্বোচ্চ ফলাফল দেখিয়ে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন।

ভারতে আধুনিক শিশু শিক্ষার ভিত্তিস্থাপনে বিদ্যাসাগরের অবদান চিরস্মরনীয় হয়ে থাকবে। শিক্ষানীতি, শিক্ষা পরিকল্পনা, এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি নির্মাণে যুগের দাবীকে গুরুত্ব দিতে হয়। তেমনি পাঠ্যক্রম তৈরীর ক্ষেত্রেও শিশুর মানসিকতা এবং সামাজিক প্রয়োজনের দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হয়।

বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিভঙ্গী আজো আমাদের শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুসরণযোগ্য।

নারী শিক্ষায় বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগরের সমকালে ভারতের কোন অঞ্চলেই নারী শিক্ষার কোন সুযোগ ছিল না। সমাজে নারী শিক্ষার অধিকারও স্বীকৃত ছিল না। নারী শিক্ষিত হলে সমাজে অস্থিরতা ও উচ্ছৃংখলতার সৃষ্টি হবে, সমাজ ধ্বংস হবে, এমন সংকীর্ণ চিন্তাধারাই সমাজে প্রচলিত ছিল।

প্রাচীন ভারতে এবং বৌদ্ধ যুগে গ্রামীণ শিক্ষার যেটুকু সুযোগ ছিল, মুসলমান শাসন স্থায়ী হবার পর পাঠশালা এবং মাদ্রাসায় হিন্দু ও মুসলমান ছেলেদের লেখাপড়ার কিছুটা সুযোগ সৃষ্টি হলেও মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়।

বিত্তশালী পরিবারের মেয়েরা পারিবারিক পরিবেশে সামান্য শিক্ষার সুযোগ পেলেও সাধারণ পরিবারের মেয়েদের শিক্ষার কোন সুযোগই সৃষ্টি হয়নি।

ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর নারীশিক্ষা বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয়। ধর্মান্ধতা এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলেও নারী শিক্ষার প্রয়োজন।

বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন তখন সংস্কৃত কলেজে শুধু ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ছেলেরাই ভর্তির সুযোগ পেত। নারী শিক্ষার প্রশ্নই উঠেনা।

সাত-আট বছর বয়সে মেয়েদের বিয়ে হয়ে যেত। বিয়ের পর ঘরের বৌ বাইরে পড়তে যাবে, এটা কেউ ভাবতেই পারতো না।

কাজেই বিদ্যাসাগরও মেয়েদের জন্য শুধু পাঠশালার পড়া নিশ্চিত করার বিষয়ে গভীরভাবে বিবেচনা করেছেন। সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শকের দায়িত্ব পাবার পর অল্প দিনের মধ্যেই ৩৫ টি বালিকা বিদ্যালয় খুলে উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। এই সময় বুঝতে পারেন যে, শিক্ষক তৈরী করার কাজটি বেশী জরুরী। তাই সরকারী অনুমোদন নিয়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য নর্মাল স্কুল স্থাপণ করেন। সংস্কৃত পন্ডিতদের ছয়মাসের প্রশিক্ষণ দিয়ে শিক্ষক পদে নিয়োগ করেন। এই পদ্ধতি প্রচলিত থাকলে গ্রামাঞ্চলে অতি দ্রুত নতুন নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হতো এবং বালিকাদের শিক্ষাও দ্রুত প্রসার লাভ করতো। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের কারণে সরকারের আর্থিক সংকট দেখা দেওয়ায় শিক্ষা বিস্তার পরিকল্পনা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত হয়। সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিবর্তন হয়। বিদ্যাসাগর শিক্ষাবিভাগের মৌখিক নির্দেশ অনুযায়ী নিজের দায়িত্বে যে সব শিক্ষক নিয়োগ করেছিলেন, তাদের

বেতন বন্ধ হয়ে যায়। ক্ষুব্ধ হয়ে বিদ্যাসাগর সরকারী চাকরী থেকে ইস্তফা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। শিক্ষাকার্যে নিযুক্ত শিক্ষকদেব বেতন ও বিদ্যালয়গুলোর পরিচালন খরচ নিজে বহন করবেন বলে স্থির করেন।

বহু বিত্তশালী বন্ধু শিক্ষা বিস্তারের কাজে মাসিক সাহায্য দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েও শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে যান। বিদ্যাসাগর পাঠ্য বই রচনা করে নিজের প্রেসে ছাপিয়ে বই বিক্রী করে স্কুলগুলো চালিয়ে যেতে থাকেন । দেখা গেল এভাবে বহু স্কুল চালিয়ে যাওয়া সম্ভব ।

বিদ্যাসাগর উপলব্ধি করলেন যে, সব গ্রামে একসঙ্গে স্কুল প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তাই উৎসাহী গ্রামগুলোতে মডেল স্কুল স্থাপন কবে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা জরুরী কাজ বলে বিবেচনা করেন এবং তদনুযায়ী পবিকল্পনা তৈরী করেন।

মেয়েদের জন্য উচ্চ শিক্ষাদানের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে বিদ্যাসাগর উৎসাহ বোধ করলেন না। কারণ বাল্য বিবাহ ব্যাপকভাবে প্রচলিত থাকার ফলে স্কুলে ছাত্রী পাওয়া যাবেনা, এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন।

বড়লাটের প্রধান সচীব বেথুন সাহেব একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বিদ্যাসাগরকে এই বিদ্যালযের সম্পাদক পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। বিদ্যাসাগর সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলেন। কিন্তু ছাত্রী সংগ্রহ করা খুবই কঠিন হল। চারদিক থেকে বেথুন সাহেব এবং বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে অসংযত ভাষায় আক্রমণ ও সমালোচনা শুরু হল। বেথুন সাহেব হতাশ হলেন কিন্তু বিদ্যাসাগরের জেদ বেড়ে গেল। বিদ্যাসাগর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের বাড়ী বাড়ী ঘুরে ছাত্রী সংগ্রহ করতে উদ্যোগী হলেন। মদনমোহন তর্কালংকার নিজের দুই কন্যাকে ভর্তি করলেন। রাজা দক্ষিনারঞ্জন,শম্ভুনাথ পন্ডিত এবং রাম গোপাল ঘোষ নিজ নিজ কন্যাকে বেথুন স্কুলে ভর্তি করলেন। এর জন্য এসব সম্মানিত ব্যক্তিরাও সামাজিক লাঞ্ছনা ভোগ করেন।

সেকালের গোঁড়াপন্থী সংবাদপত্রগুলোও নাবী শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করেছিল।

এই রকম একটি জটিল পরিবেশে নারী শিক্ষা বিস্তারের আশায় লন্ডন থেকে রামমোহন রায়ের এক ভক্ত মিস কার্পেন্টার ৬০ বছর বয়সে কলকাতায় এলেন। বেথুন সাহেব বিদ্যাসাগরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

মিস কার্পেন্টার বিদ্যাসাগরকে দেখা মাত্রই আত্মীয়রূপে বরণ করে নিলেন এবং ভারতে নারী শিক্ষা বিস্তারে নিজের পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করলেন।

বিদ্যাসাগর সর্বপ্রকারে সহযোগীতার আশ্বাস দিলেন। বিভিন্ন এলাকায় বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বিষয়ে খোঁজ খবর নিতে মিস কার্পেন্টারের সঙ্গে বিদ্যাসাগর ও যেতেন।

একদিন উত্তর পাড়ায় একটি বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শনে যাবার সময় বালির কাছে রাস্তায় মোড় ঘুরতেই বিদ্যাসাগরের ঘোড়ার গাড়ী উল্টে যায়। বিদ্যাসাগর কোমরে ভীষণ আঘাত পান। দীর্ঘদিন বিছানায় পড়ে থাকতে হয়। মিস কার্পেন্টার এই সময় মায়ের মত সেবা যত্ন করেন। এই দুর্ঘটনায় বিদ্যাসাগরের লিভার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এজন্যই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নানা রকম কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল।

মিস কার্পেন্টারের ইচ্ছে ছিল বেথুন স্কুলে নারী স্কুল পরিচালনার উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা। কারণ নারী স্কুলে নারী শিক্ষয়িত্রী না থাকলে ছাত্রী পাওয়া যাবে না।

বিদ্যাসাগর এই পরিকল্পনায় বিশেষ উৎসাহ দেখালেন না। কারণ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন হিন্দু সমাজের বর্তমান অবস্থায় ছাত্রী এবং শিক্ষয়িত্রী পাওয়া যাবেনা। কোন বিবাহিতা বধু শিক্ষয়িত্রীর চাকরী করতে আসবেনা, পড়তেও আসবেনা।

বিদ্যাসাগরের ইংরেজ বন্ধুরা বিদ্যাসাগরের যুক্তি মানতে চাইলেন না। বেথুন স্কুলে একটি শিক্ষয়িত্রী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হল। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও কোন ছাত্রী যোগাড় করা গেল না। ফলে কেন্দ্রটি বন্ধ করে দিয়ে মিস কার্পেন্টার লন্ডনে ফিরে যান।

এই সময় বেথুন সাহেব একদিন কিছু ভদ্রলোকের অনুরোধে একটি গ্রামীণ বিদ্যালয় পরিদর্শনে যান। ফেরার পথে বৃষ্টিতে ভিজে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই অসুখেই এই মহাপ্রাণ ব্যক্তির অকাল মৃত্যু হয়।

বেথুন সাহেবের অকাল মৃত্যুতে বিদ্যাসাগর শিশুর মত কেঁদেছেন। বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য এবং স্কুলঘর নির্মানের জন্য প্রচুর অর্থ তিনি খরচ করেছেন। মেয়েদের যাতায়াতের জন্য গাড়ী ভাড়ার খরচ তিনি বহন করতেন। মৃত্যুকালে সঞ্চিত সমস্ত অর্থই স্কুলের উন্নতির জন্য দান করে গেছেন। এই স্কুল পরে বেথুন কলেজ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্ত্রী শিক্ষার পক্ষে বিদ্যাসাগরের বন্ধু রাধাকান্ত দেব একটি মহিলা সমিতি গঠন করে বার্ষিক পরীক্ষা নেবার ব্যবস্থা করেন। তাতে অনেক বালিকা পাশ করে পুরস্কার লাভ করেছিল। একটি প্রবন্ধ পুস্তক লিখে রাধাকান্ত দেব প্রচার করেন যে, হিন্দুদের কোন শাস্ত্র গ্রন্থে স্ত্রী শিক্ষার বিরুদ্ধে কোন নির্দেশ নেই। বহু শিক্ষিতা নারীর দৃষ্টান্ত

উপস্থাপন করে দেখান যে, যে কোন নারী উপযুক্ত শিক্ষা পেলে সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে ।

রানী ভবানীর দৃষ্টান্ত দেখিয়ে বলেন যে, বাল্যকালে শিক্ষার সুযোগ পাওয়ায় তিনি নিজ রাজ্যের পরিচালনা এবং হিসেব নিকেষ সুষ্ঠভাবেই করতে পেরেছিলেন। প্রাচীন ও মধ্যযুগের অনেক দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি প্রমান করার চেষ্টা করেন যে নারী শিক্ষা সমাজের পক্ষে কল্যাণকর। স্ত্রী শিক্ষা বিধায়ক এই প্রবন্ধ গ্রন্থটি প্রকাশের পরও স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে গোঁড়াপন্থীদের সমর্থন পাওয়া যায়নি।

হিন্দু সমাজের গোঁড়ামীর গভীরতা উপলব্ধি করে বিদ্যাসাগরও অনেকটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন । বৃহত্তর উদ্যোগ নিতে আগ্রহ বোধ করেন নি। তবে কেউ কোথাও স্ত্রী শিক্ষার উদ্যোগ নিলে তিনি সর্বতোভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে যেতেন।

প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা লাভের আগে ভারতের কোন রাজ্যেই স্ত্রী শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে নি।

স্বাধীনতার পর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিপুল পরিবর্তনের সূচনা হয়। সরকারী ও বেসরকারী চাকরীতে নারীর অধিকার ব্যাপকভাবে স্বীকৃতি লাভ করে । সামাজিক গোঁড়ামী অতি দ্রুত ভেঙ্গে পড়ে । সর্ব বিষয়ে নারী শিক্ষার প্রসার ঘটে এবং প্রতিটি পেশায় নারী কর্মিরা পুরুষের পেশায় নারী কর্মিরা পুরুষের সমান দক্ষতার পরিচয় দেয়।

ভারতে আধুনিক নারী শিক্ষাব ভিত্তি স্থাপন করেছেন বিদ্যাসাগর এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ভারত হিতৈষী ইংবেজ শিক্ষানুরাগীরাও নানাভাবে বিদ্যাসাগরবে সাহায্য, সহযোগীতা এবং উৎসাহ যুগিয়ে নীরী শিক্ষা বিস্তারের পথকে সমৃদ্ধ করেছেন এটাও সত্য।

ইংরেজ সরকারের সহযোগীতা ছাড়া সে যুগে নারী শিক্ষার বিস্তার ঘটানো মোটেই সহজ কাজ ছিল না। গোঁড়াপন্থীরা অধিকাংশই নারী শিক্ষার বিরোধী ছিল। এক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগর চিরস্মরনীয় হয়ে রইলেন।
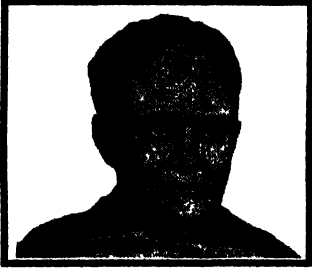
বিধবা বিবাহ প্রচলনে বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগর নিজের ছোট ভাই শম্ভুচন্দ্রকে এক চিঠিতে বলেছেন, "বিধবা বিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। এ জন্মে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোন সৎকর্ম করিতে পারিব,তাহার সম্ভাবনা নাই । এ বিষয়ের জন্য আমি সর্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি । সে বিবেচনায় কুটুম্ব বিচ্ছেদ অতি সামান্য কথা।"

বিদ্যাসাগরের একমাত্র পুত্র নারায়ণ স্বেচ্ছায় বিধবা বিবাহ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় পরিবারের আপত্তি জানিয়ে শম্ভুচন্দ্র একটি পত্র লিখেছিলেন। তার উত্তরে বিদ্যাসাগর উপরি উক্ত চিঠি লিখেছিলেন।

বিদ্যাসাগর বীরসিংহ গ্রামের স্কুল প্রতিষ্ঠা বিষয়ে একদিন পিতা ঠাকুরদাসেব সঙ্গে আলোচনা করছিলেন। এমন সময় মা ভগবতী দেবী কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসে বিদ্যাসাগরকে বলেন— "তুই এত শাস্ত্র পড়েছিস- বাল বিধবাদের একটা উপায় করতে পারিস না?"

সেদিন বাড়ীতে এক বাল বিধবার আবির্ভাবে মাতা ভগ বতীব হৃদয় দুঃখে,ক্ষোভে ও বেদনায় প্লাবিত হয়েছিল।

মায়ের এই আর্তনাদ বিদ্যাসাগরকে খুবই বিচলিত করেছিল । তিনি সেদিনই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যেভাবেই হোক বিধবা বিবাহ প্রচলণ করাই হবে এ জীবনের প্রধান ব্রত।

বিদ্যাসাগর জানতেন শাস্ত্রীয় সমর্থন ছাড়া বিধবা বিবাহ প্রচলন করা মোটেই সহজ কাজ হবে না । তাই কলকাতায় ফিরে এসে সংস্কৃত কলেজের প্রাচীন গ্রন্থগুলি গভীর মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন কবতে থাকেন । বহুদিন সারা বাত জেগেও পড়াশোনা করেছেন।

শেষ পর্যন্ত পবাশর সংহিতায় বিদ্যাসাগর আবিষ্কার করেন একটি শ্লোক,যেখানে পাঁচটি ক্ষেত্রে নারী'র পুনঃ বিবাহের সমর্থন ঘোষণা করা হয়েছে। এই পাঁচটি কারণ

(১) স্বামী যদি নিরুদ্দেশ হয়।
(২) স্বামী যদি অকালে মারা যায়
(৩) স্বামী যদি সন্ন্যাস গ্রহণ করে
(৪) স্বামী যদি ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হয়
(৫) স্বামী যদি পতিত হয়।

এই পাঁচটি কারণে নারীর পুণর্বিবাহ শাস্ত্রসম্মত হবে।

সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারে গভীর রাতে বিদ্যাসাগর এই প্রাচীন গ্রন্থের শ্লোক আবিষ্কার করার পর আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেন।

এর আগে ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকার রাজা রাজবল্লভ নিজের আট বছরের বিধবা কন্যা অভয়ার পুনর্বিবাহ অনুমোদন করাব জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ব্রাহ্মণ পন্ডিতদের সঙ্গে দেখা করে আবেদন জানিযেছিলেন। নবদ্বীপের সমস্ত পন্ডিতবা পাঁচটি কারণে বিধবা বিবাহ অনুমোদন যোগ্য বলে স্বীকাব করলেও শাস্ত্রীয় বিধির উৎস বলতে পারেন নি। ফলে রাজা রাজবল্লভ কন্যার পুনর্বিবাহের অনুমোদন লাভে ব্যর্থ হন।

রামমোহন রায় - আত্মীয়সভায়- সতীদাহ নিবারণ, বিধবা বিবাহ প্রচলন, এবং বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করণ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বহুদিন আলোচনা করেছেন। কিন্তু সেই মহুর্তে সতীদাহ নিবারণ সমস্যাটি সর্বাধিক জরুরী মনে হয়েছিল। ১৮২৯ সালে সতীদাহ নিবারণ আইন পাশ হয়েছে এবং পরের বছরই রামমোহন ইংলন্ডে রওনা হয়ে যান। লন্ডনের প্রিভি কাউন্সিলে সতীদাহ নিবারণ আইন পাশ হওয়ার পর রামমোহন গভীর তৃপ্তি লাভ করেন। রাম মোহনের অকাল মৃত্যু না হলে দেশে ফিরে এসেই বিধবা বিবাহের দাবীতে আন্দোলন শুরু করতেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

রামমোহনের মৃত্যুর পর হিন্দু কলেজের ছাত্ররা ডিরোজিওর নেতৃত্বে বিধবা বিবাহ প্রচলনের দাবীতে আন্দোলন শুরু করেন। কিন্তু তারা বিধবা বিবাহের সমর্থনে কোন শাস্ত্রীয় অনুমোদনের দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে পাবেন নি। হিন্দু শাস্ত্রের প্রতি তাদের আস্থাও ছিল না ।

হিন্দু কলেজের ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর ছাত্ররা সকলেই ছিল বিদ্যাসাগরের সমবয়সী । তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বও ছিল। তাদের প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানোপর্জিকা সভার একজন সদস্যও ছিলেন বিদ্যাসাগর । এই সভার মাসিক অধিবেশনে ১৮৩৯ সালের জানুয়ারী মাসে-ভারতে নারী জাতির অবস্থান সম্পর্কে এক ইংরেজী প্রবন্ধে খুব ধারালো ভাষায় বাল্য বিবাহ, বহুবিবাহের তীব্র সমালোচনা এবং বিধবা বিবাহের সমর্থনে যুক্তিপূর্ণ

বক্তব্য তুলে ধরা হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র যে বছর সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন, সে বছরই সতীদাহ নিবারণ আইন পাশ করা হয়। ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স তখন মাত্র ৯ বছর । এই বয়সের একজন বালকের পক্ষে সতীদাহ নিবারণ আইনের তাৎপর্য উপলব্ধি করা সম্ভব ছিল না । কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই সংস্কৃত কলেজের অন্যপাশে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের আন্দোলন ঈশ্বরচন্দ্রের মনে সমাজ সংস্কারের চেতনা জাগিয়ে তুলেছিল। কিন্তু এ দেশের সমাজে শাস্ত্রীয় বিধানের প্রামান্য দৃষ্টান্ত ছাড়া সমাজ সংস্কারের কাজে সাফল্য লাভ করা যাবেনা, রাম মোহনের এই মতকেও তিনি সমর্থন করতেন।

বিধবা বিবাহের সমর্থনে শাস্ত্রীয় বিধান খুঁজে পাওয়ার পর ঈশ্বরচন্দ্র লড়াইয়ের ময়দানে সেনাপতির ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন।

এই সময়ের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র হয়েছেন বিদ্যাসাগর । সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে রয়েছে অত্যন্ত প্রভাবশালী সব বন্ধু বান্ধব । ইংরেজ সরকারের বড় লাট , ছোট লাট এবং প্রশাসনের অন্যান্য প্রধানদের অনেকেই ছিলেন বিদ্যাসাগরের বন্ধু ।

রামমোহনের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের প্রধান নেতারাও ছিলেন বিদ্যাসাগরের বন্ধু ।

দেড়শ বছর আগের কলকাতা আজকের তুলনায় ছিল অনেক ছোট শহর । সবাই সবাইকে ভাল করেই চিনতো , জানতো ।

ইংরেজ শাসনের প্রায় একশ বছর পূর্ণ হতে চলেছে। সংস্কৃত পন্ডিতদের অনেকেই ইংরেজী শিখে সরকারী চাকরীতেও যোগ দিতে শুরু করেছেন । কাজেই রামমোহনের সময়ের তুলনায় বিদ্যাসাগরের সময় কলকাতার সমাজটাও অনেকটা বদলে গেছে।

এরকম সময় ১৮৫৫ সালে বিদ্যাসাগর---বিধবা বিবাহ প্রবর্তন উচিত কিনা ---এই শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় প্রচন্ড সামাজিক আলোড়ন । পক্ষে বিপক্ষে শুরু হয়ে যায় বিতর্কের ঝড়। এই সময় গ্রামাঞ্চলেও আধুনিক শিক্ষার প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল। বিতর্ক শুরু হল গ্রামে এবং শহরে।

মানবিক বিচারে বিধবা বিবাহের পক্ষে শিক্ষিত মানুষের সমর্থন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু গোঁড়াপন্থীদের প্রভাবও কম ছিল না । নিরক্ষর গ্রামীণ মানুষেরা দেশাচারকেই বেশী প্রধান্য দিয়েছিল। তাই যুক্তি সেখানে হার মানে।

সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ হওয়ায় এবং প্রশাসন কঠোর ভাবে আইন প্রয়োগ করার ফলে সতীদাহের ঘটনা দ্রুত কমতে থাকে । সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ বিধবার সমস্যা নতুন সংকট রূপে দেখা দেয়। কোথাও সম্পত্তির দ্বন্দ্ব কোথাও ব্যাভিচারের অভিযোগ,

বিধবাদের পক্ষে খুবই যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠে। ৮-৯ বছর বয়সে বাল বিধবারা সারা জীবন ত্যাগ স্বীকারের ব্রত গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। পারিবারিক জীবনে দুঃসহ জ্বালা ও অবহেলা ভোগ করতে বাধ্য হয় । স্বামীর বাড়ী বা বাপের বাড়ী কোথাও শান্তিপূর্ণ আশ্রয় মিলেনা ।

এমন দুঃসহ জীবন থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় দ্বিতীয়বার বিবাহ করে নতুন করে সংসার পাতা। কিন্তু হিন্দু সমাজ সে পথে প্রধান বাধা ।

শাস্ত্রীয় সমর্থন পাওয়ার ফলে বিদ্যাসাগরের পক্ষে সমর্থন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। তবু তা ছিল বিরোধীদের তুলনায় অনেক কম।

১৮১৩ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নতুন সনদে ভারতীয় সমাজে প্রচলিত সংস্কার ও ধর্মীয় রীতিনীতির বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ না করার জন্য নির্দেশ ছিল। ফলে হেস্টিংস সাহেব রামমোহনের অনুবোধে সতীদাহ নিবারণ আইন পাশ করতে রাজী হন নি।

লর্ড বেন্টিং মানবিকতার দাবীকে অগ্রাধিকার দিয়ে আইন পাশ করেছিলেন । সেই আইন বাতিল করার জন্য বিরোধীরা লন্ডনে প্রিভি কাউন্সিলে আপিল করেছিল। সেই আইন বহাল রাখার জন্য রামমোহনকে ছুটে যেতে হয়েছিল লন্ডনে সওয়াল করতে । তখনো বিরোধী পক্ষে সমর্থন ছিল অনেক বেশী । কিন্তু কাউন্সিলের সদস্যরা বেশী সংখ্যায় স্বাক্ষরদানকারীদের চেয়ে রামমোহনের যুক্তি ও মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীকে অধিকতর মূল্য দিয়ে সতীদাহ নিবারণ আইন বহাল রেখেছিলেন । ঐ ঘটনার পর গোঁড়া পন্থী পন্ডিতদের মধ্যে কিছুটা হতাশা দেখা দিয়েছিল।

বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ প্রচলনের জন্য মাতা ভগবতীদেবীর শুধু সমর্থন নয়,একটা কিছু ব্যবস্থা করার জন্য নির্দেশই পেয়েছিলেন। আরেকবার গ্রামে গিয়ে ছোট বেলার এক খেলার সাথীকে বাল বিধবা অবস্থায় দেখে মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন।

হিন্দু সমাজের প্রগতি বিরোধী গোঁড়া ব্রাহ্মণ পন্ডিতদের কেন্দ্রস্থল ছিল সংস্কৃত কলেজ । সেখানেই সতীদাহ নিবারণ আইনের বিরোধীরা ধর্মসভা নামে একটি সংস্থা গঠন করেছিলেন । এটা ছিল রামমোহনের আত্মীয়সভা এবং ব্রাহ্ম সমাজের সম্পূর্ণ বিরোধী একটি সংগঠন।

বিদ্যাসাগরের বাল্য-কৈশোর এবং যৌবনের বেশীর ভাগ সময়টাই কেটেছে এই ঝড়ের কেন্দ্র সংস্কৃত কলেজে । হিন্দু শাস্ত্রের উপর বিদ্যাসাগরের গভীর পাণ্ডিত্য

সংস্কৃত কলেজের পন্ডিতরাও স্বীকার করতেন। কিন্তু বিধবা বিবাহের সমর্থনে অনেকেই এগিয়ে এলেন না বরং বিরোধীতার সিদ্ধান্ত করলেন।

১৮৩৭ সালে ভারতীয়- ল -কমিশন হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহ বিষয়ে মতামত চেয়ে দেশের সব অঞ্চলের বিচারকদের কাছে প্রস্তাব পাঠালেন। সব আদালতের বিচারপতিরা সরকারকে এ বিষয়ে উদ্যোগী হতে নিষেধ করেন। কারণ এতে হিন্দু ধর্মে ও সামাজিক সংস্কারে হস্তক্ষেপ করা হবে বলে আশঙ্কা করা হয়।

রামমোহনের মৃত্যুর পর থেকেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিধবা বিবাহের পক্ষে কিছু কিছু লেখা- লেখি এবং প্রচার শুরু হয়েছিল। প্রয়োজন ছিল একজন সাহসী সেনাপতির । বিদ্যাসাগর এই শূন্যতা পূরণ করেন।

পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগরের কিছু পন্ডিত বন্ধু স্বীকার করেন যে, তাদের মধ্যে অনেকেই বিধবা বিবাহকে সমর্থন করতেন। কিন্তু সামাজিক শাস্তির ভয়ে তারা মুখ খুলতে সাহস পান নি । ধর্ম বিরোধী নাস্তিক ঘোষণা দিয়ে সমাজচ্যুত করা হলে ব্রাহ্মণ পন্ডিতদের জীবিকা অর্জনের পথ বন্ধ হয়ে যেতো।

বিদ্যসাগরের পিতা ঠাকুরদাস যখন শুনলেন যে, বেদ,স্মৃতি,পুরাণ, পাঠ করে বিদ্যাসাগর নিশ্চিত হয়েছেন যে, বিধবা বিবাহ শ্রাস্ত্র বিরোধী কাজ নয়, তখন ঠাকুরদাস পুত্রকে আর্শীবাদ করে বলেছিলেন যে,— তুমি যে কাজে প্রবৃত্ত হয়েছ তা থেকে কিছুতেই পশ্চাদপদ হবে না ।

বিদ্যাসাগর রচিত বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা— এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব গ্রন্থাকারে প্রকাশিতহওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অল্প সময়ের মধ্যে তিনটি সংস্করণে ১৫ হাজার কপি ছাপানো হল। প্রতিটি সংস্করণ অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই নিঃশোষিত হল । কাজেই বিষয়টির সমর্থনে জনমত এবং আগ্রহী পাঠকদের মনোভাব বোঝা গেল ।

বিরোধীরা অত্যন্ত কটুভাষায় বিদ্যাসাগরকে আক্রমণ করে একটি পুস্তক প্রকাশ করলেন ।তার জবাবে বিদ্যাসাগর দ্বিতীয় পুস্তকটি রচনা করেন ।এতে বিভিন্ন যুক্তি ও দৃষ্টান্ত দিয়ে বিরোধীদের বক্তব্য খন্ডন করেন।

বিদ্যাসাগরের প্রস্তাবের পক্ষে বিপক্ষে পত্রিকায় নানা ধরনের কবিতা - গান, ছড়া প্রকাশিত হয়। শান্তিপুরের তাঁতিরা তাঁদের বিখ্যাত শাড়ীতে বিদ্যাসাগরের পক্ষে ছড়া লিখে বাজারে ছাড়তে থাকে । এগুলি বিদ্যাসাগরী শাড়ী নামে পরিচিত হয়।

এক হাজার বিশিষ্ট ব্যক্তির স্বাক্ষরসহ বিধবা বিবাহের পক্ষে আইন পাশ করার

জন্য আবেদন পত্র পেশ করা হয়। বিরোধীরা ত্রিশ হাজার স্বাক্ষর সংগ্রহ করে এরূপ আইনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন।

শেষ পর্যন্ত এবারও মানবতার দাবী ও যুক্তি জয়ী হল। ১৮৫৬ সালের ২৬শে জুলাই বিধবা বিবাহ বৈধ আইন পাশ হয়ে গেল।

কিন্তু বিধবা বিবাহ করার জন্য উৎসাহী পাত্র খুঁজে পাওয়া গেল না। এবার বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে টিটকারীমূলক কবিতা ও ছড়া প্রকাশিত হতে লাগল। এমনকি ঈশ্বর গুপ্তের মত কবি শ্লেষাত্মক কবিতা লিখলেন।

বিদ্যাসাগর এবার কোমর বেঁধে নামলেন। আইন পাশ হবার চার মাস পরেই আইনের ছাত্র মধুসূদন ঘোষের সঙ্গে বার বছর বয়স্কা বাল বিধবা থাকমনি দাসের বিবাহ অনুষ্ঠিত হল মহা ধুমধামে। সমস্ত খরচ বহন করলেন বিদ্যাসাগর। তারপরেই ক্রমাগত বিধবা বিবাহের অনুষ্ঠান হতে থাকল। সবই বিদ্যাসাগরের দায়িত্বে এবং অর্থে।

পরবর্তীকালে দেখা গেল অনেকে অর্থের লোভে বিধবা বিবাহ করে বিধবা কনের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। বিধবা আবার স্বামী পরিত্যক্তা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগব মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করে অসহায় মেয়েদের রক্ষা করেছেন। অনেকে বিধবা বিবাহ করে জীবনে খুব সুখী হয়েছে। বিদ্যাসাগরের একমাত্র পুত্র নারায়ণ স্বেচ্ছায় বিধবা বিবাহ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠানের জন্য বিদ্যাসাগরকে বহু টাকা ঋণ করতে হয়েছিল। বহু বন্ধু সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে পিছিয়ে গেছে। ছাপাখানার আয় থেকে তিনি সব ঋণ পরিশোধ করেছিলেন।

বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে-ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার অংশ বিশেষ

বাঁধিয়াছে দলাদলি লাগিয়াছে গোল।
বিধবার বিয়ে হবে বাজিয়াছে ঢোল।।
কতবাদী প্রতিবাদী করে কত রব।
ছেলে বুড়ি আদি করি মাতিয়াছে সব।।
কেহ উঠে শাখা পরে, কেহ থাকে মূলে।
করিছে প্রমান জড়ো, পাঁজি পুঁথি খুলে।।
একদলে যত বুড়ো, আর দলে ছোঁড়া।
গোঁড়া হতে মাতে সব দেখে নাকো গোড়া।।
[illegible]নে বচন করি কতকথা বলে।

ধর্মের বিচার পথে কেহ নাহি চলে।।
পরাশর প্রমানেতে বিধি বলে কেউ ।
কেহ বলে এসে দেখি সাগরের ঢেউ।।
অনেকেই এই মত দিয়েছে বিধান।
অক্ষত যোনির বটে বিবাহ বিধান ।।
কেহ বলে এই বিধি কেমনে হইবে ?
হিঁদুর ঘরের রাঁড়ী, সিঁদুর পরিবে।।
ঘাটে যারে নিয়ে যাব চড়াইয়া খাটে।
শাড়ী পরা চুড়ী পরা তারে নাকি খাটে?

প্রভাকর সম্পাদক লিখেছেন

কোলে কাকে ছেলে ঝোলে যে সকল রাঁড়ী
তাহারা সধবা হইবে পরে শাঁকা শাড়ী ।।
এ বড় হাসির কথা শুনে লাগে ডর ।
কেমন কেমন করে মনের ভিতর ।।
শাস্ত্র নয় যুক্তি নয় হবে কি প্রকারে ?
দেশাচারে ব্যবহারে বাধো বাধো করে।।

সে কালের বিখ্যাত কবি ও বহু পত্রিকা সম্পাদক বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে দৃষ্টি ভঙ্গী উপরোক্ত দুটি কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। আজকের যুগেও বহু শিক্ষিত মানুষের মানসিকতায় বিধবা বিবাহের প্রতি মনোভাব খুব বেশী পার্থক্য ঘটেনি। তবে বর্তামানে বিধবা বিবাহে অইনী স্বীকৃতি এবং সামাজিক সমর্থন থাকায় প্রকাশ্যে সমালোচনা কমই হয়। বিদ্যাসাগরের যুগে বিধবা বিবাহ একটি সামাজিক বিপ্লব রূপেই চিহ্নিত হয়েছে।
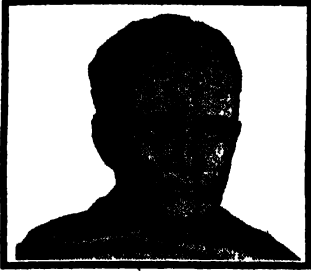
সমাজ সংস্কারক বিদ্যাসাগর

মধ্যযুগীয় সমাজে সামন্ততন্ত্রের প্রভাব সর্বস্তরে বহুদূর ব্যাপ্ত ছিল। সাধারণ মানুষের বিবেকবোধ শাস্ত্রীয় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। নিরক্ষর মানুষের অন্ধ বিশ্বাস দেশাচারে পরিণত হয়েছিল। মানসিক শক্তি ,সাহস, চেতনা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল।

হিন্দুসমাজের সবচেয়ে অবহেলিত অংশ ছিল নারী সমাজ । বাল্যবিবাহ,বহুবিবাহ, অকাল বৈধব্য, সহমরণ এই ধারায় নারী জীবনে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হতো।

রামমোহন বুঝেছিলেন ধর্মের সাহায্যেই ধর্মীয় গোঁড়ামী ভাঙ্গতে হবে। সে কাজে তিনি সফল হয়েছিলেন। সতীদাহ প্রথা নিবারণ আইন পাশ করা রামমোহনের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ বলে গণ্য হয়েছে । শাস্ত্রীয় নির্দেশ এবং সরকারী আইন সতীদাহ প্রথা বন্ধ করতে সাহায্য করেছে।

অবশ্য ইতিমধ্যে প্রমানিত হয়েছে যে, আইন পাশ করলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংস্কারমুক্তি ঘটেনা । নির্মম দেশাচার এবং প্রশাসনিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ধর্মান্ধ সংস্কার সুদীর্ঘকাল টিকে থাকতে পারে । ১৮২৯ সালে সতীদাহ নিবারণ আইন পাশ করা হয়েছিল । কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৫৮ বছর পরও অর্থাৎ আইন পাশ হবার ১৭৫ বছর পরও ভারতের কোন কোন অঞ্চলে সতীদাহের ঘটনা ঘটছে । সতীর মন্দির বানিয়ে পূজা এবং সতী উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে প্রকাশ্যে ।

রাজস্থানে বার বার এসব ঘটতে দেখে মনে হয় সেখানকার গণতান্ত্রিক নেতারাই সতীপূজার সমর্থক । বিগত ১৭৫ বছরে কত হাজার বিধবাকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে দেশের প্রশাসন তার হিসেবও দিতে পারবে না ।

রামমোহন উপলব্ধি করেছিলেন, একদিকে আইন অন্যদিকে আধুনিক যুক্তিবাদী জ্ঞান মানুষকে সংস্কার মুক্ত করতে পারে । রামমোহনের সমাজ সংস্কারের কাজ চলেছিল সঠিক পথেই । কিন্তু আধুনিক শিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল শহরাঞ্চলে । গ্রামাঞ্চলে শতকরা নব্বই ভাগ মানুষ ছিল অজ্ঞানতার অন্ধকারে। রামমোহনের অকাল মৃত্যুর ফলে সমাজ

সংস্কারের এই প্রধান ধারাটির গতি সাময়িক ভাবে বিভ্রান্ত হয়েছিল। হিন্দু কলেজের ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী ধর্মকে বাদ দিয়েই সমাজ সংস্কারের পথ খুলতে চেয়েছিল । কিন্তু ফল হয়েছিল বিপরীত। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী।

বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হবার পর রামমোহনের সমাজ বিপ্লবের ধারা নতুন পথ খুঁজে পেল।

একদিকে শিক্ষা সংস্কারের কাজ এবং অন্যদিকে সমাজ সংস্কারের কাজ দুদিকেই বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিলেন বিদ্যাসাগর। শাস্ত্রীয় সমর্থন নিয়ে বিধবা বিবাহ প্রবর্তণ আইন পাশ হবার পর, সমাজ সংস্কারের নতুন প্রবাহ সৃষ্টি হল।

সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী শিক্ষা বাধ্যতা মূলক হবাব ফলে এবং পাঠ্য বিষয়ে আধুনিক সাহিত্য,দর্শন,ইতিহাস,ভূগোল,বিজ্ঞান ও গণিত প্রচলিত হবার ফলে সংস্কৃত কলেজ থেকে আগের মত গোঁড়াপন্থী পন্ডিতের আবির্ভাব ঘটল না। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের জ্ঞান, বিজ্ঞান ও দর্শণের সমন্বয়ে সৃষ্টি হল আধুনিক দৃষ্টি সম্পন্ন পন্ডিত গোষ্ঠী।

বিদ্যাসাগর মাত্র ৩৮ বছব বয়সে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদ ছেড়ে দিয়েছিলেন। নতুবা শিক্ষা ক্ষেত্রে একটা বিপ্লব তিনি ঘটাতে পারতেন । অধ্যক্ষ থাকাকালেই ১৮৫৭-৫৮ সালের প্রথম সাত মাসে বিদ্যাসাগর চারটি বড় বড় জেলায় ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় এবং অনেকগুলো মডেল স্কুল স্থাপন করেছিলেন। হঠাৎ করে সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হয়ে যাওয়ায় শিক্ষা বিস্তারের প্রবল গতি বাধাপ্রাপ্ত হল। শিক্ষকদের বেতন এবং অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ে মত বিরোধ তীব্র হওয়ায় চিরকালের মত সবকারী চাকুরী ছেড়ে দিয়ে স্বাধীন লেখক জীবন ও সমাজ সংস্কারের নেতৃত্বের কাজে যোগ দিলেন।

বিদ্যাসাগর নিজেই বলেছেন--- "বিধবা বিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম"। আইন পাশ হবার পর বহু চেষ্টা ও অর্থ খরচ করে মাত্র ৬০টি বিধবার বিবাহ দিতে পেরেছেন। তার মধ্যেও বেশ কিছু প্রতারণার ঘটনাও ঘটেছে । অথচ ঐ সময় দেশে বহু লক্ষ বালবিধবা ছিল । ৬০টি বিধবা বিবাহে বিদ্যাসাগর খরচ করেছিলেন ৮৭হাজার টাকা । বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বিধবা বিবাহে বরপক্ষ বা কন্যাপক্ষের আত্মীয় স্বজন উপস্থিত থাকতে সাহস পায়নি। কন্যাদান করার জন্য কন্যার পিতা ,ভ্রাতা ,কাকা, বা কোন নিকট আত্মীয় এগিয়ে আসেনি । দূর থেকে নীরব সমর্থণ জানিয়েছেন অনেকে । অথচ এসব অনুষ্ঠানের জন্য বিদ্যাসাগর বিপুল পরিমাণ

টাকা ঋণ গ্রহণ করেছিলেন। বন্ধুরাও কথা দিয়ে কথা রাখেনি। সব ঋণ একা তিনি বইয়ের ব্যবসা থেকে পরিশোধ করেছেন। এত সবের পরও অসহায় দম্পতিদের মাসিক মাসোহারা দিয়েছেন।

বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়েছে দেড়শ বছর আগে । কিন্তু আজও কি হিন্দু সমাজ বিধবা বিবাহে উৎসাহ বোধ করে? আজও কি বিধবারা নিরাপদ জীবন যাপন করতে পারে? আজও কি এদেশে আধুনিক শিক্ষার প্রসার ঘটে নি?

এসব প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য বর্তমানেও প্রয়োজন রামমোহন বা বিদ্যাসাগরের মত সর্বত্যাগী নেতা । আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেও রয়েছে ত্রুটি যার জন্য চরিত্র গঠন, মনুষ্যত্ব বোধ এবং মানবিক মূল্যবোধ গড়ে উঠছে না।

বিদ্যাসাগর প্রাকাশ্যে সমাজ সংস্কারের কাজ শুরু করবার আগে ছদ্মনামে বাল্য বিবাহের দোষ,-- নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেণ। তাতে বাল্য বিবাহের সমস্যা বিভিন্ন দিক থেকে ব্যাখ্যা করেন। দুটি অবুঝ বালক-বালিকাকে অসময়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার কুফল অনেক । শারীরিক ও মানসিক গঠন পূর্ণ হবার আগেই দৈহিক মিলন দুজনকেই দুর্বল করে । দুর্বল সন্তানের জন্ম হয় এবং অকাল বৈধব্যের প্রধান কারণ হয়। বাল্য বিবাহ নারী শিক্ষারও প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায় । বাল্য বিবাহের ফলে দুটি প্রাণের মধ্যে প্রেম বা প্রণয় জন্ম নিতে পারে না । বালিকা বধু সারা জীবন পরিচারিকার দায়িত্ব পালনে বাধ্য হয়। শুধুমাত্র লোকাচারের ভয়ে সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর এরূপ বাল্য বিবাহেব বিরুদ্ধে সর্বতোভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলা সকলেরই নৈতিক কর্তব্য ।

বিদ্যাসাগরের এরূপ আবেদন মূলক প্রবন্ধটি সমাজে কোন সাড়া জাগাতে পারেনি । বন্ধু মহলেও বিশেষ সমর্থণ পাওয়া যায়নি । অধিকাংশই বলেছেন শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে বাল্য বিবাহ ক্রমশ বন্ধ হবে ।

আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখতে পাই বিদ্যাসাগরের প্রবন্ধটি প্রকাশিত (১৮৫০) হবার ১৫৫ বছর পরেও স্বাধীন ভারতে বাল্য বিবাহ প্রকাশ্যেই প্রচলিত রয়েছে । ২০০৫ সালে মধ্যপ্রদেশের একগ্রামে বাল্য বিবাহ বন্ধ করতে চেষ্টা করায় গ্রামবাসীরা মিলে সরকারী আধিকারিকের হাত কেটে দিয়েছে । দোষীরা শাস্তি পাবে কিনা ভবিষ্যতই তা বলতে পারে।

বিদ্যাসাগর কোন মহলের সমর্থন না পেয়ে বাল্য বিবাহ সম্পর্কে অনেকটা উদাসীন মনোভাব নিতে বাধ্য হয়েছিলেন ।

বহু বিবাহের ক্ষেত্রেও সাধারণ সমর্থন ছিল দুর্বল। হিন্দু কলেজের ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী সকলের জন্য সাধারণ বিবাহ আইন পাশ করার দাবী তুলেছিল , যাতে একই ব্যক্তি একটার বেশী বিয়ে করতে না পারে ।

সেকালের কলকাতায় অধিকাংশ পত্রিকাই বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার কাজের বিরোধী ছিল। অশালীন ভাষায় আক্রমণের নজিরও রয়েছে যথেষ্ট । আশ্চর্যের বিষয় হল সমাজ সংস্কারের বিরোধীতায় উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে নিম্ন বর্ণের হিন্দুরাও ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল।

এতে প্রমাণ হয় ভারতে ধর্মের নামে উন্মাদনা শ্রেণী শোষণের বাধা মানেনা। আজো হিন্দুত্বের নামে নীতিহীন,আদর্শহীন,যুক্তিহীন,মানবিকতা বিরোধী উন্মাদনায় হিন্দু সমাজের বিপুল অংশ ঐক্যবদ্ধ হয়।

মুসলমানদের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই । কোরাণ এবং শরিয়তের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে মৌলবাদীরা বিপুল সংখ্যক মুসলমানকে কিভাবে বিভ্রান্ত করে তা রামমোহন রায় ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন।

হিন্দু মুসলমান উভয় সমাজেই বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল । তাই ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী সকলের জন্য একই আইন দাবী করেছিল । বর্তমান যুগেও এদাবী উঠেছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ধর্মেব নামে পৃথক পৃথক আইন মেনে নিতে শিক্ষিত সমাজও রাজী নয়।

বিদ্যাসাগর বহু বিবাহ প্রথা নিবারণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। স্বাধীনতার পর হিন্দু আইন পাস করে বহু বিবাহ এবং বাল্য বিবাহ আইন হিন্দু সমাজে প্রয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু মুসলমান সমাজ ঐ রকম আইনকে ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ মনে করে । আজকের দিনে মুসলমান সমাজেও একজন বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব জরুরী মনে হয়।

বিদ্যাসাগর বহু বিবাহ বন্ধ করার জন্য কোন ধর্মীয় শ্লোক আবিষ্কার করতে পারেন নি । তাই কয়েকটি কৌশল অবলম্বন করে এই সামাজিক কুপ্রথা বন্ধ করতে চেষ্টা করেছিলেন।

প্রথমত: বহু বিবাহের মূল কারণ কৌলিন্য প্রথা বাতিল করার জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করেণ। তিনি ইতিহাস ব্যাখ্যা করে দেখান যে মুসলমান আগমনের আগে এই কৌলিন্য প্রথা ছিলনা। হিন্দুত্ব রক্ষার নামে কৌলিন্য প্রথা প্রথমে ব্রাহ্মণ সমাজে প্রচলিত হয়। পরে তা ক্রমশ সমাজের নিম্ন স্তরেও ছড়িয়ে পড়ে।

ইংরেজ সরকার বিদ্যাসাগরের অনুরোধে একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করে । এই কমিটিতে দুজন ইংরেজ, চারজন বাঙ্গালী জমিদার এবং বিদ্যাসাগরকে অন্তর্ভূক্ত করা হয় । ইংরেজ সদস্যরা সামাজিক সংস্কারে হস্তক্ষেপ করতে রাজী ছিল না । জমিদার সদস্যরা বহু বিবাহের পক্ষে মত দেন। একমাত্র বিদ্যাসাগর নানা যুক্তি দেখিয়ে বহু বিবাহ প্রথা বাতিলের পক্ষে মত দেন। এই কমিটির রিপোর্ট জমা পড়েছিল ১৮৬৭ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী । কিন্তু ঐ রিপোর্ট সমাজ সংস্কারের কাজে সহায়ক হয় নি।

এরপর বিদ্যাসাগর দাবী করেন, বহু বিবাহ বন্ধ করার আইন তৈরী করা সম্ভব না হলে সরকার থেকে একটি ঘোষণা দিয়ে ব্রাহ্মণদের প্রাচীন রীতি অনুযায়ী সর্বদ্বার বিবাহ প্রথা প্রচলনের নির্দেশ দেওয়া হোক । তাহলে বর্তমানে কুলীনদের ৩৬টি ভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহের বাধ্য বাধকতা থাকবেনা। ফলে বহু বিবাহ সমস্যার কিছু টা সুরাহা হবে । ইংরেজ সরকার এরূপ উদ্যোগ নিতেও রাজী হল না।

বিদ্যাসাগর শেষ চেষ্টা হিসেবে ১৮৭১ সালে----" বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার"----- এই শিরোনামে একটি প্রবন্ধ পুস্তক প্রচার করলেন। তাতে তিনি বললেন বিশ্বের সর্বত্র মেয়েরা পুরুষের অধীন। কিন্তু অন্য কোনও দেশে স্ত্রী জাতির ঈদৃশ দুরবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না । পুরুষের স্বার্থপরতা ,অবিবেচনা এবং বর্বরতা থেকে মুক্তির জন্য বহু বিবাহ রদ করা প্রয়োজন। বিদ্যাসাগর এই গ্রন্থে কুলীন ব্রাহ্মণদের এক দীর্ঘ তালিকা দিয়ে নারী জাতির যন্ত্রণার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। বিদ্যাসাগরের বহু বিবাহ রহিত করা সম্পর্কিত গ্রন্থের তীব্র সমালোচনা করেছিল- সেকালের বিখ্যাত সংবাদপত্র সোমপ্রকাশ - এবং বঙ্গদর্শণ।

বিদ্যাসাগর এসব সমালোচনার জবাবে দ্বিতীয় গ্রন্থটি প্রকাশ করেন । বহু বিবাহের পক্ষে ও বিপক্ষে বহু ছড়া, গান ও কবিতা রচিত হয়েছিল। গ্রামাঞ্চলে এসব ছড়া ও গান ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছিল।

হিন্দুধর্মে বহু বিবাহ অপত্তিকর এমন কোন শাস্ত্রীয় দৃষ্টান্ত বিদ্যাসাগর হাজির করতে পারেন নি । তিনি শুধু বহু বিবাহের কুফলগুলো বিচার করে এই প্রথা নিষিদ্ধ করার আন্দোলন করেছিলেন। বহু বিবাহের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা ছিল না। বিদ্যাসাগর নাম ধামসহ তালিকা দিয়ে দেখিয়েছেন--- বহু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একশ,দেড়শ,দুইশ,বালিকাকে স্ত্রীরূপে বরণ করেছেন। একজন বৃদ্ধের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বহু সংখ্যক বালিকা বিধবা হয়ে গেছে ।

বিদ্যাসাগরের মানবিক আবেদন এক্ষেত্রেও কার্যকর হয়নি ।সিপাহী বিদ্রোহের পর ইংরেজ সরকারও সমাজ সংস্কারের কাজে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল।

হিন্দু সমাজের জড়তা ,মুর্খতা ,গোঁড়ামী এবং ধর্ম শাস্ত্রের প্রতি অন্ধ বিশ্বাসকে আঘাত করে আধুনিক গতিশীল জীবন পথে এগিয়ে আনার লক্ষ্যেই বিদ্যাসাগর সমাজ সংস্কারের কাজ শুরু করেছিলেন। রামমোহন যেমন সহ্মীদাহ প্রথা নিবারণ করে চিরস্মরনীয় হয়েছেন, তেমনি বিদ্যাসাগরও বিধবা বিবাহ আইন প্রচলন করে চিরস্মরনীয় হয়েছেন।

সেইসঙ্গে বিদ্যাসাগর শিক্ষা সংস্কার এবং শিক্ষা বিস্তারের কাজে অসাধারণ ভূমিকা পালন করে বাংলায় নব জাগরণের সাগরের ঢেউ সৃষ্টি করেছেন।এই ঢেউ ক্রমশ সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে।

এই সময় খোদ ইংলেন্ডেও সামাজিক গোঁড়ামী এবং শ্রেণী বিদ্বেষ অসহনীয় ছিল। ১৮৬৬ সালে লর্ড রাসেলের উদারনৈতিক মন্ত্রীসভা শ্রমিকদের ভোটাধিকার দানের বিল পার্লামেন্টে পেশ করার পর নিজ দলের অধিকাংশ এম.পি বিলের বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে সরকারের পতন ঘটিয়েছিলেন। ভারতেও চলছিল সিপাহী বিদ্রোহের প্রতিক্রীয়া ।মূলত: ধর্মীয় সংস্কাবে আঘাত পড়ার ফলেই ভারতে সিপাহী বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল।বিদ্যাসাগরের ইংরেজ বন্ধুরা দ্বিধাগ্রস্থ এবং উদাসীন হয়ে পড়ায় বিদ্যাসাগবের সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টা থেমে যায়।

কিন্তু সমাজের অভ্যান্তরে সৃষ্টি হতে থাকে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ এবং অসন্তোষ । শিক্ষিত যুক্তিবাদী যুবকদের মধ্যে দেখা দেয় অধিকারবোধ এবং সামাজিক নেতৃত্ব দিতে আবির্ভূত হন বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ।

ইতিমধ্যে শিক্ষিত মনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এবং চিন্তার জাগরণ সৃষ্টি করে মধুসূদনের মেঘনাদ বাধ কাব্য এবং বঙ্কিমচন্দ্রের আধুনিক উপন্যাস ও প্রবন্ধ সাহিত্য। সমাজ সংস্কারের আন্দোলন ক্রমশ: সমাজ বিপ্লবে রূপান্তর লাভ করে। শুরু হয় স্বদেশী আন্দোলনের নতুন ধারা।

বাংলা গদ্য ও সাহিত্যে বিদ্যাসাগর

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এক হাজার বছরের । বাংলা ভাষা কবে কিভাবে রূপ নিয়েছিল তা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয় । কারণ এ যাবত কোন নিদর্শন আবিস্কৃত হয়নি।

গবেষকরা নানা বিষয়ে গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে বাঙ্গালী একটা মিশ্র জাতি । আর্যরা এদেশে আসার আগে দ্রাবিড় এহং অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর মানুষেরা এদেশে বাস করতো । পরবর্তীকালে আরো বহু বিদেশী জাতি ও উপজাতি গোষ্ঠীর মানুষেরা এদেশে এসে জনসমুদ্রে মিশে গেছে।

আর্যরা দীর্ঘকাল উত্তর ভারতের বিশাল অঞ্চল জুড়ে বসতি গড়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করেছে। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে ক্রমশ পূর্বভারতে এবং দক্ষিন ভারতে আধিপত্য বিস্তার করেছে।

বর্তমানে আমরা যে অঞ্চলকে বঙ্গদেশ বলে জানি আর্য আগমনেব সময় পর্যন্ত এসব অঞ্চল ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। বর্তমান পূর্ববাংলাকে বলা হত বঙ্গ পশ্চিম বঙ্গের নাম ছিল গৌড় বা বার,উত্তর বঙ্গ ,দক্ষিণ বঙ্গ ,আসাম সহ পূর্বভারতে অঙ্গ, বঙ্গ, সুক্ষ্ম , সমতট, বঙ্গাল, হরিকেল ইত্যাদি রাজ্যের কথা আর্য সাহিত্যে উল্লেখ করা হয়েছে । আর্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর এই অঞ্চলে আর্যদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবও স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং ক্রমশ অনার্য সংস্কৃতির সঙ্গে সমন্বয় সাধনের মধ্যে দিয়ে একটি নতুন জাতির উদ্ভব হয়। সেটাই হল বাঙ্গালী জাতি ।

আর্যদের মূল ভাষা ছিল বৈদিক ভাষা । সুদীর্ঘকাল এই ভাষার কোন লিখিত রূপ ছিল না । শুনে শুনে মুখস্থ করতে হতো বলে এর নাম হয়েছিল শ্রুতি । এই ভাষায় বেদ রচিত হয়েছিল বলে এই ভাষার নাম হয় বৈদিক ভাষা।

আড়াই হাজার বছর আগে বিখ্যাত পন্ডিত পাননি ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য কঠোর ব্যাকরণের নিয়ম বেঁধে দিয়ে ভাষার স্থায়ী সংস্কার করেছিলেন বলে নতুম ভাষাটির নাম হয় সংস্কৃত । তখন থেকে এ ভাষা হয় পন্ডিতের ভাষা এবং সাহিত্যের ভাষা । মুসলিম আগমনের আগে সারা ভারতেই সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক

চর্চা হতো । সাহিত্যের ভাষা এবং সাধারণের কথ্য ভাষায় সব সময় একটা পার্থক্য থাকে । সাধারণের ভাষাকে বলা হতো প্রাকৃত । বুদ্ধদেব ধর্ম প্রচারের জন্য প্রাকৃত ভাষাকে সামান্য সংস্কার করে লিখিত রূপ দেন। এই ভাষার নাম হয় পালি ভাষা।

মানুষের মুখের ভাষা সব সময় পরিবর্তণ হয়। তাছাড়া এদেশে বহু নতুন নতুন জাতির অগমনের ফলে ভাষায় ও তার প্রভাব পড়ে। দীর্ঘকাল মুসলিম শাসনে সরকারী ভাষা হিসেবে ফার্সী ভাষার প্রচলিত থাকায় দৈনন্দিন ব্যবহারে সাধারণ মানুষ বহু শব্দ আত্মস্থ করেছে। পর্তুগীজরাও প্রায় আড়ইশ বছর এদেশে ব্যবসা বানিজ্যে লিপ্ত ছিল। তাদের ভাষা থেকেও বহু শব্দ সাধারণের ভাষায় পরিণত হয়েছে। ইংরেজ আগমনের পর ইংরেজী ছাড়াও অন্যান্য বিদেশী ভাষা দেশীয় ভাষার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

কাজেই বাঙ্গালী জাতি যেমন একটি মিশ্র জাতি,বাঙ্গলা ভাষা ও তেমনি একটি মিশ্র ভাষা ।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন পৃথিবীর সমস্ত সভ্য জাতিই মিশ্র জাতি এবং সমস্ত সভ্য জাতির ভাষাই মিশ্র ভাষা । যে ভাষায় যত বেশী মিশ্রণ ঘটেছে সে ভাষা তত বেশী উন্নত হয়েছে। ইংরেজ জাতি বিশ্বের বিশাল অঞ্চল জুড়ে অসংখ্য জাতিব উপর আধিপত্য বিস্তাব করেছিল এবং প্রশাসনে প্রয়োজনের সব ভাষা থেকেই নতুন নতুন শব্দ গ্রহণ ও আত্মস্থ করে আন্তর্জাতিক ভাষায় পরিণত হয়েছে।

মিশ্র ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষা ও ইংরেজী ভাষার মতই নতুন নতুন শব্দ আত্মস্থ করে সমৃদ্ধ হয়েছে। কলকাতা ভারতের রাজধানী হবার ফলে ইংবেজী ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে। প্রায় ১৪০ বছর কলকাতা ছিল বৃটিশ ভারতের রাজধানী।

আধুনিক বাংলা গদ্য ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে বাংলা ভাষার গভীর আত্মীয়তারই ফসল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে প্রকৃত পক্ষে বাংলা গদ্যের অস্তিত্ব ছিল না । সরকারী দলিল পত্রে এবং ব্যবসায়ীদের হিসেবের খাতায় গদ্যের যে নিদর্শন পাওয়া যায় তা ছিল সংস্কৃত ও কিছু দেশীয় শব্দের জটিল এক দুর্বোধ্য ভাষা।

পন্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে নেপালের রাজ দরবার থেকে পরিত্যক্ত গ্রন্থের স্তুপের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন স্বরূপ চর্যাপদ গ্রন্থখানি আবিষ্কার করেণ। এই গ্রন্থের ভাষাও বর্তমাণে বাঙ্গালীদের কাছে দুর্বোধ্য। তারপরে দুইশ বছরের সাহিত্য চর্চার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নি।

চর্যাপদ গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল খ্রীষ্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে । ঐ সময় মুসলমান আক্রমন শুরু হয়ে যায় । বহু মন্দির মঠের সঙ্গে সে যুগের সাহিত্যও ধ্বংস হয়ে যায়। ধর্মীয় প্রচারের উদ্দেশ্যেই সে কালে সাহিত্য রচিত হতো । তাল পাতার উপর লিখিত পুঁথি সংখ্যায় খুবই কম লিখা হতো । শিষ্যরা শুনে শুনে মুখস্থ করতো।

মুসলিম শাসন স্থায়ী হবার পর সমন্বয় প্রক্রিয়া শুরু হয়। সাহিত্য চর্চাও নতুনভাবে প্রচলিত হয়। এই সময়ের সাহিত্য সৃষ্টিব সবই পদ্যে লেখা হয়েছে। বৈষ্ণব পদাবলী,শাক্ত পদাবলীর একটি ধারা,চৈতন্য জীবনচরিত, পদ্যে লিখিত আরেকটি ধারা সৃষ্টি করে । বৈষ্ণব কবিরা দর্শণ এবং কাহিনী প্রচারের জন্যও কাব্য গ্রন্থ রচনা করেণ। রামায়ন-মহাভারত-ও ভাগবতের অনুবাদ সাহিত্য পদ্যে রচিত আরেকটি ধারা সৃষ্টি কবে । সাহিত্য চর্চার আটশ বছরে কোন গদ্য সাহিত্যের নিদর্শণ নেই ।

১৮০০খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবাব পব ইংরেজ কর্মচারীদের শিক্ষার জন্য পাঠ্য বই রচনার উদ্দেশ্যে দেশীয় পন্ডিতদেব দ্বাবা গদ্য ভাষায গ্রন্থ রচনার সূত্রপাত হয়। একই সময়ে শ্রীবামপুরের খ্রীষ্টান পাদ্রী কেবী সাহেব ধর্ম প্রচাবের উদ্দেশ্যে এদেশেব বাজাদের ইতিহাস রচনা শুরু কবেন।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার বাংলা গদ্যে পাঠ্য পুস্তক রচনা কবেণ এবং রাম রাম বসু বাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র রচনা করেন। কিন্তু এসব গদ্য বচনা সংস্কৃত শব্দেব দ্বারা কান্টকাকীর্ণ ছিল। সাধারণ মানুষের পক্ষে দুর্বোধ্য ছিল।

সাধারণ মানুষকে সহজ ভাষায় শিক্ষাদানের জন্যই গদ্য ভাষার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল । রামমোহন সহজ ভাষায় সাধারণ মানুষের পক্ষে সহজ বোধ্য শব্দ প্রয়োগ করে যুক্তিগুলোকে সাজিয়ে বেদান্তসার গ্রন্থটি প্রকাশ করেন।

এই সময় কলকাতায় ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে সর্বত্র ছাপানো বই ছড়িয়ে দেওয়া সহজ হয়েছিল । রামমোহন প্রধানতঃ ধর্মীয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাই সাহিত্য গুণ সৃষ্টি করার দিকে দৃষ্টি দিতে পারেন নি। পয়ার ছন্দের কবিতার মত দাঁড়ী ব্যবহার করেছেন, কিন্তু ভাব প্রকাশের উপযোগী যতি চিহ্ন ব্যবহারের কথা ভাবেন নি। তবু রামমোহনের গদ্য হয়ে উঠেছিল সুশৃংখলভাবে যুক্তি প্রকাশের সহজ ভাষা । তাই গবেষকরা রাম মোহনকে বাংলা গদ্যের জনক আখ্যা দিয়েছেন।

কিন্তু বাংলা গদ্যে সাহিত্য গুণ সৃষ্টি করার প্রথম সার্থক শিল্পী হলেন বিদ্যাসাগর ।

বিদ্যাসাগরের গদ্য রচনার মূল লক্ষ্য ছিল শিক্ষা বিস্তার । শিশু সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন তিনি । গভীর চিন্তা ভাবনার ফসল হয়ে উঠেছিল একেকটি গ্রন্থ ।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায়— "বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাঙ্গলায় গদ্য সাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যে কলা নৈপুন্যের অবতারণা করেন। ভাষা যে কেবল ভাবের একটা আধার মাত্র নহে ,তাহার মধ্যে যেন -তেন প্রকারেণ কতকগুলো বক্তব্য বিষয় পুরিয়া দিলেই যে কর্তব্য সমাপণ হয়না বিদ্যাসাগর দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাই প্রমান করিয়াছিলেন।"

বিশ্ব কবি আরো বলেছেন----- আজিকার দিনে কাজটিকে তেমন বৃহৎ বলিয়া মনে হইবেনা ,কিন্তু সমাজ বন্ধন যেমন মনুষ্যত্ব বিকাশের পক্ষে অত্যাবশ্যক তেমনি ভাষাকে কলাবন্ধনের দ্বারা সুন্দররূপে সংযমিত না করিলে সে ভাষা হইতে কদাচ প্রকৃত সাহিত্যের উদ্ভব হইতে পারে না। বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার উচ্ছৃংখল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি ও কার্য কুশলতা দান করিয়াছিলেন।"

রবীন্দ্রনাথের এই মূল্যায়ন যে কত সঠিক তা আমরা বুঝতে পাবি যখন আমবা দেখি যে সংস্কৃত ব্যাকরণের কঠিন প্রাচীর ভেদ করে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত শিক্ষাকে সহজ ও আকর্ষণীয় করার জন্য উপক্রমনিকা,এবং ব্যাকরণ কৌমুদি রচনা কবেন।

সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্যের বিপুল জ্ঞান ভান্ডারের অধিকারী ছিলেন বলেই বিদ্যাসাগরের পক্ষে একাজ সহজ হয়েছিল। সেই সঙ্গে বাংলা গদ্য ও সাহিত্যের জন্য খুলে গিয়েছিল এক বিশাল রাজপথ, সে পথে বিচবণ করে আবিষ্কৃত হয়েছে গদ্য রচনার নতুন নতুন কৌশল ।

সংস্কৃত শব্দের অনাবশ্যক সমাসাড়ম্বরের বোঝা থেকে বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে মুক্ত করেছেন। ইংরেজী সাহিত্যের বিরাম চিহ্নগুলোকে ব্যবহার করে বাংলা গদ্যকে বিশ্বের দরবারে উপস্থিত করার মত যোগ্য করে তুলেছেন।

জীবন্ত ভাষা সব সময় পরিবর্তনশীল । ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস চর্চা না করলে বোঝা যায় না আমরা কোথা থেকে কোথায় এসেছি। বিদ্যাসাগরের গদ্য ভাষা সাধু ভাষা নামে পরিচিত হয়েছে। পরবর্তী একশ বছরে সাধু ভাষায় রচিত বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য বিশ্ব সাহিত্যের স্তরে উন্নীত হয়েছে । রবীন্দ্রনাথও সাধু ভাষায় অতি মূল্যবান প্রবন্ধগুলো রচনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সাধু ভাষায় উপন্যাস রচনা করে বাংলা সাহিত্যের গৌরব বহুগুণ বৃদ্ধি করেছেন।

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে বাংলায় চলিত ভাষায় সাহিত্য চর্চার জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। সাধু ভাষাকে ক্রমশঃ কোন ঠাসা করা হচ্ছে ।কিন্তু গদ্যে রচিত বিপুল সাহিত্যভান্ডারকে অগ্রাহ্য করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। কারণ আধুনিক সাহিত্যের মূল ভিত্তি তৈরী হয়েছে সাধু ভাষায় আর এর রূপকার হিসেবে রামমোহন, বিদ্যাসাগর,মধুসূদর্ন,বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে অমরত্ব লাভ করেছেন।

অনেকে অজ্ঞানতা বশত: গ্রামীণ পন্ডিতদের গদ্য ভাষাকে বিদ্যাসাগরী ভাষা বলে ঠাট্রা করেণ। কিন্তু তারা জানেন না যে, বিদ্যাসাগরের গদ্য ভাষা রবীন্দ্রনাথের কাল পর্যন্ত একই ধারায় এবং একই ঐতিহ্যে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। বিদ্যাসাগরের প্রথম দিকের কয়েকটি পাঠ্য গ্রন্থ বাদ দিলে বাকী সব গ্রন্থেই বিদ্যাসারের গদ্য রচনা ক্রমাগতই উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর রূপে বিকশিত হয়েছে।

বিদ্যাসারের পাঠ্য গ্রন্থগুলোর শত শত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিটি সংস্করণে প্রয়োজনীয় সংস্কারও করা হয়েছে ।

মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের গুরুত্ব বিদ্যাসাগরই প্রথম গভীরভাবে উপলব্ধি করেন এবং শিক্ষা বিস্তারের আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। শিশু শিক্ষা থেকে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত মাতৃভাষায় সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষায় রচিত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সঙ্গে ছাত্রদের পরিচিত করার জন্য স্তরে স্তরে সুবিন্যস্ত পাঠ্যপুস্তক নিজেই রচনা করেন।

বিদ্যাসাগর ব্যক্তিত্ব ও আদর্শ গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের জীবনচরিত রচনা করেছেন। সংস্কৃত থেকে কালিদাসের শকুন্তলা এবং রামায়ণ থেকে সীতার বনবাস গ্রন্থ দুটি রচনা করে সুস্থ ও সুন্দর সাহিত্য সৃষ্টির নজির স্থাপন করেছেন। শেকস পীয়ারের কমেডি অব এররস থেকে অনুবাদ করে ভ্রান্তি বিলাস নামে প্রায় একটি নতুন গ্রন্থই তিনি রচনা করেছেন।

সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিত্য থেকে আরো বহু গ্রন্থ অনুবাদ করে বাংলা গদ্যে অনুবাদ সাহিত্যের একটি শক্তিশালী ধারা সৃষ্টি করেছেন বিদ্যাসাগর।

বিদ্যাসাগরই প্রথম বাংলা গদ্যে কথ্য ভাষার ব্যবহার শুরু করেছিলেন । শিশু সাহিত্য রচনা করতে গিয়ে তিনি এরূপ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন,-যেমন— কখনও মিছা কথা কহিওনা । এখানে মিথ্যার পরিবর্তে মিছা শব্দটি শিশু সহজেই উপলব্ধি করতে পারে ।তেমনি কাহারও সহিত ঝগড়া করিওনা - এখানে কলহ শব্দের পরিবর্তে ঝগড়া শব্দটি ব্যবহার করেন। কারন ঝগড়া শব্দটির অর্থ শিশু সহজেই বুঝতে পারে।

শিক্ষা বিস্তারকে বিদ্যাসাগর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সেকালে শিক্ষার উপযোগী পাঠ্য বই ছিল না । শিক্ষকও ছিল না । তাই ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকের

প্রয়োজনীয় গ্রন্থ রচনার জন্যই সর্বক্ষণ চিন্তা ভাবনা করতে হয়েছে।

বিদ্যাসাগরের সাহিত্যে প্রতিভা মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টির কাজে নিয়োগ করার সময় ও সুযোগ ছিল না। কিন্তু বাংলা গদ্য সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের সৃষ্টির ক্ষমতা স্পষ্টভাবেই চিহ্নিত হয়ে আছে।
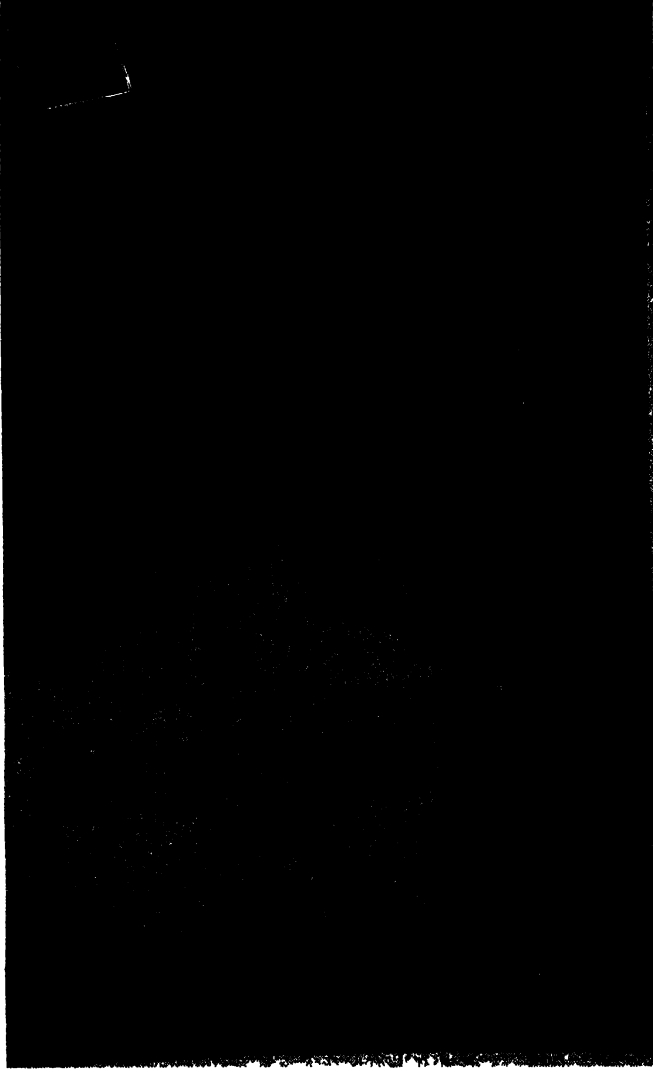
বিদ্যাসাগরের বর্ণমালা

চার হাজার বছর আগে আর্যরা ভারতে এসেছে। পাঁচশ বছর ধরে বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন শাখার ভিন্ন ভিন্ন দলে ভারতে প্রবেশ করেছে। বিভিন্ন আর্য অনার্য গোষ্ঠীর মধ্যে বহু সংঘাত- সংঘর্ষ এবং সমন্বয় ঘটেছে।

ভারতে সিন্ধু সভ্যতা অনার্যদের সভ্যতা। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চারটি প্রাচীন সভ্যতার একটি হল সিন্ধু সভ্যতা। তাদের লিখিত ভাষা ছিল। অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্যের আদান প্রদান ছিল। লিখিত ভাষার অনেক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু পাঠোদ্ধার করা আজো সম্ভব হয়নি।

আর্যদের লিখিত ভাষা ছিল না। প্রায় এক হাজার বছর ধরে আর্যরা মুখে মুখে শ্লোক তৈরী করে নানা বিষয়ে যে জ্ঞান সঞ্চয় করেছে,শ্রুতির সাহায্যে শিক্ষা দিয়ে তা সমাজের বিভিন্ন স্তরে ছড়িয়ে দিয়েছে। হিন্দুদের বেদ এই সময়ের রচনা।

গবেষকদেব ধারণা প্রায় তিন হাজার বছর আগে মধ্যপ্রাচ্য থেকে লিখিত ভাষার লিপি এঁদেশে এসেছে। তখনো খ্রীষ্টান বা ইসলাম ধর্মের জন্ম হয়নি। এদেশে বৌদ্ধ বা জৈন ধর্মেরও তখনো জন্ম হয়নি।

লিখিত ভাষার প্রাচীনতম লিপি আবিষ্কৃত হয়েছে সুমের এবং ইরাকে। মন্দিরের হিসেব পত্র রাখার জন্য এসব লিপি আবিষ্কার করা হয়েছিল। মাটির চাকতি তৈরী করে একেকটি দাঁড়ি চিহ্ন দিয়ে হিসেব রাখা হতো। আজো আমাদের দেশে নিরক্ষর মানুষেরা ছোট ছোট পাথরের টুকরো বা কাঠের বা বাঁশের কাঠি দিয়ে হিসেব রাখে।

তারপর এল ছবি এঁকে লেখার প্রচেষ্টা। চীনদেশে আজো এই চিত্রলিপি প্রচলিত রয়েছে। ক্রমে ছবির পরিবর্তে পশু-পাখীর শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চিহ্ন ব্যবহার করে লেখার কাজ চালু হলো।

শেষ পর্যন্ত মানুষের কণ্ঠ থেকে ধ্বনির সাহায্যে যে ভাষার উৎপত্তি তা প্রকাশ করার জন্য বিভিন্ন ধ্বনির সাংকেতিক চিহ্ন আবিষ্কৃত হল।

এই সাংকেতিক চিহ্ন থেকেই সৃষ্টি হল বর্ণমালা। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির মানুষের কণ্ঠ থেকে যে ধ্বনি উচ্চারিত হয়, তার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। তাই

বিভিন্ন ভাষার বর্ণমালার মধ্যেও পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে।

প্রাচীন মিশরের লিপি নাম ছিল দেবভাষা । গ্রীকরা তাদের লিপির নাম দিয়েছে পবিত্র ভাষা, গ্রীক ভাষায় হায়ারো গ্লিফিক। মিশর এবং গ্রীকের দেব দেবীর সঙ্গে ভারতের দেব দেবীর যথেষ্ট মিল রয়েছে।

মিশর এবং ইরাক থেকে সমুদ্র পথে বাণিজ্যের মাধ্যমে য়ে লিপি ভারতে এসেছে ,তাকে বলে ব্রাহ্মলিপি। ভারতে এই লিপির সাহায্যে দেবনাগরী লিপিব উদ্ভব ঘটেছে। এই লিপি লেখা হয় বাঁদিক থেকে ডানদিকে ।

আরেকটি লিপি এসেছিল স্থল পথে। সে লিপি উল্টো দিক থেকে লেখা হয় যেমন আরবী,ফারসী,উর্দু । ভারতে সিন্ধু ও কাশ্মীর অঞ্চলে এই লিপি প্রচলিত হয়। এর নাম হলো খরোষ্ঠী লিপি।

ভারতে ব্রাহ্মী লিপি থেকে সংস্কৃত দেবনাগরী লিপির উৎপত্তি হয়েছে। মুসলিম আগমনের আগে সারা ভারতেই সংস্কৃত ভাষার চর্চা হতো।

সংস্কৃত বর্ণমালা থেকেই বাংলা বর্ণমালার উৎপত্তি হয়েছে। সংস্কৃত পন্ডিতদের চেষ্টায় সংস্কৃত বর্ণমালা একটি উন্নত বিজ্ঞান সম্মত বর্ণমালার রূপ পেয়েছে। মধ্য প্রাচ্যের লিপি থেকেই ইউরোপীয় ভাষাগুলোর লিপি সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ইউরোপীয় বর্ণমালা সর্বাধিক বিজ্ঞান সম্মত রূপ পেয়েছে । কন্ঠ থেকে উচ্চারিত প্রতিটি ধ্বনির জন্য গ্রীকরা একটি সঠিক সাংকেতিক লিপি আবিষ্কার করেছে, যা অন্যান্য ভাষাগুলো এখনো সম্পূর্ণ করে উঠতে পাবেনি।

ভাষাগত শৃঙ্খলার দিক থেকে ভারতীয় বর্ণমালা অনেক বেশী সুশৃংখল । এতে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ আলাদা করা হয়েছে। ব্যঞ্জন ধ্বনিকে সুক্ষ্ম পর্যায়ক্রমে সাজানো হয়েছে। ক থেকে ম পর্যন্ত ২৫টি বর্ণকে স্পর্শ বর্ণ রূপে চিহ্নিত করে প্রথম দিকে স্থান দেওয়া হয়েছে। কারণ এই ২৫টি বর্ণ উচ্চারণ করতে জিহ্বা মুখের কোন না কোন অঞ্চল স্পর্শ করে । এছাড়া বাকী বর্ণগুলোকে অন্ত:স্থ বর্ণ এবং উষ্ণবর্ণে ভাগ করে দুটি স্তরে সাজানো হয়েছে।

ঋকবেদের সময় বর্ণমালার সংখ্যা ছিল ৬৪টি, ক্রমে কমতে কমতে ৫০টি বর্ণ ব্যবহার হতে থাকে । এর মধ্যে স্বরবর্ণ ছিল ১৬টি এবং ব্যঞ্জন বর্ণ ছিল ৩৪টি । রামমোহন কতকগুলো বর্ণকে বাংলা ভাষায় অপ্রয়োজনীয় বলে চিহ্নিত করেন। কিন্তু বর্ণমালার সংস্কার করার সময় ও সুযোগ রামমোহন পান নি।

বিদ্যাসাগর শিশু শিক্ষা নিয়ে পাঠ্য পুস্তক রচনা কালে এ বিষয়ে গভীর ভাবে

চিন্তা ভাবনা শুরু করেন। ১৮৫৫ সালে বাংলা বর্ণমালা গ্রন্থখানি প্রকাশ করার সময় ভূমিকায় বলেন---- বহুকাল অবধি, বর্ণমালা ষোল স্বর এবং চৌত্রিশ ব্যঞ্জন, এই পঞ্চাশ অক্ষরে পরিগণিত ছিল । কিন্তু বাঙ্গলা ভাষায় দীর্ঘ ঋ-কার দীর্ঘ ৯ কারের প্রয়োগ নাই । এই নিমিত্ত ঐ দুই বর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছে। আর সবিশেষ বিবেচনা করয়িা দেখিলে অনুস্বার ও বিসর্গ স্বরবর্ণ মধ্যে পরিগণিত হইতে পারেনা, এজন্য ঐ দুই বর্ণ ব্যঞ্জন বর্ণের মধ্যে পঠিত হইয়াছে। আর চন্দ্র বিন্দুকে ব্যঞ্জন বর্ণের স্থলে এক স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া গণনা করা গিয়াছে। ড, ঢ, য, এই তিন বর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ পদের মধ্যে বা অন্তে থাকিলে ড়,ঢ়,য় হয়। ইহারা অভিন্ন বর্ণ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে । কিন্তু যখন আকার ও উচ্চারণে উভয়ের পরস্পর ভেদ আছে, তখন উহারা স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া উল্লিখিত হওয়া উচিত, এই নিমিত্ত উহারাও স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। ক ও ষ মিলিয়া ক্ষ হয়, সুতরাং ইহা সংযুক্ত বর্ণ । এজন্য অসংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ গণনা স্থলে পরিত্যক্ত হইয়াছে ।

এভাবে বাংলা বর্ণমালা সংস্কৃতের কাঠামো থেকে পৃথক হয়ে বাংলা বর্ণমালা রূপে ব্যবহৃত হতে থাকে।

বহু সংস্কৃত পন্ডিত পৃথক বর্ণমালা গ্রন্থ প্রকাশ করে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে গেছেন। বিদ্যাসাগরের বর্ণমালা দেড়শ বছর ধরে বাংলার ঘরে ঘরে শিশু শিক্ষার প্রধান গ্রন্থ রূপে প্রচলিত এবং জনপ্রিয় হয়ে সসম্মানে বিরাজ করছে।

পরবর্তী সংস্করণে বিদ্যাসাগর বাংলা ত এর দুই প্রকার ব্যবহার মেনে নিয়ে খন্ড ৎ কে বর্ণ পরিচয়ের পরীক্ষায় স্থান দিয়েছেন।

এভাবে কিছু বর্জন কিছু সংযোজন এবং কিছু স্থানান্তর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার নিজস্ব বর্ণমালা তৈরী করেছিলেন । এর ফলে শিশুদের পক্ষে বর্ণমালা শিক্ষা সহজ হয়েছিল। দেড়শ বছরে বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যেরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সাধু ভাষার জায়গায় চলতি ভাষার ব্যবহার ব্যাপক হারে বেড়েছে । বানান সমস্যা দেখা দিয়েছে । তাই কিছু কিছু বর্ণের বর্জনের দাবী উঠেছে। যেমন - দুইটি ন, ণ, তিনটি স,শ,ষ, দুইটি ব দুটি জ,য অপ্রয়োজনীয় মনে করা হচ্ছে । একটি করে বর্ণেই কাজ চলে।

কিন্তুদীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত বর্ণগুলোর পরিবর্তন বা বর্জনের প্রস্তাব নানা রকম বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। যার মীমাংসা এখনো হয়নি।
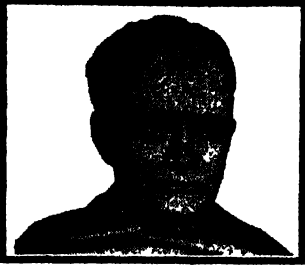
দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর

ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিপুল সংস্কৃত ভান্ডারের সমস্ত বিদ্যা অধিগত করেছিলেন বলে সারা ভারতে বিদ্যাসাগর নামে পরিচিত এবং প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ইউরোপীয় সব পন্ডিতই তাঁকে বিদ্যাসাগর নামেই উল্লেখ করেছেন এবং ঐ নামেই সম্বোধন করেছেন। এদেশের ইতিহাসেও তিনি বিদ্যাসাগর নামেই চিরস্থায়ী আসন লাভ করেছেন।

অন্যদিকে বাঙ্গালী সমাজে তিনি দয়ার সাগর রূপেও চিরস্থায়ী আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। জীবনেব সর্বস্ব পণ করে তিনি বাঙ্গালী জাতির উন্নয়নে এবং আর্তের সেবায় আত্ম নিয়োগ করেছিলেন।

বিদ্যাসাগর কত মানুষের হৃদয়ে দয়ারসাগর রূপে স্থান লাভ কবেছেন তার হিসেব করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। তবে তিনজন জীবনী কারই যেভাবে অসংখ্য দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন তাতেই বিদ্যাসাগরের হৃদয়ের বিশালত্ব ধবা পড়ে।

মাইকেল মধুসূদন বিদ্যাসাগরকে বলেছেন করুনার সিন্ধু এবং দীনের বন্ধু। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মধুসূদনের **বিদ্যাসাগর** কবিতাটি অমরত্ব লাভ করেছে।

রবীন্দ্র নাথ বলেছেন— "বিদ্যাসাগরের দয়ায় যে কেবল বাঙ্গালীসুলভ হৃদয়ের কোমলতা পাওয়া যায় তাহা নহে, তাহাতে বাঙ্গালী দুর্লভ চরিত্রের বলশালিতারও পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার দয়া কেবল একটা প্রবৃত্তির উত্তেজনা মাত্র নহে, তাহার মধ্যে একটা সচেষ্ট আত্মশক্তির অচল কর্তৃত্ব সর্বদা বিরাজ করিত বলিয়াই তাহা এমন মহিমাশালিনী। এ দয়া অন্যের কষ্ট লাঘবের চেষ্টায় আপনাকে কঠিন কষ্টে ফেলিতে মুহূর্তকালের জন্য কুণ্ঠিত হইত না।"

বিদ্যাসাগরের অসাধারণ কোমল হৃদয়ের সুযোগ নিয়ে বহু প্রতারক বিদ্যাসাগরকে নানাভাবে প্রতারিত করেছে। কেউ দরিদ্র ছাত্র বলে পরিচয় দিয়ে নিয়মিত আর্থিক সাহায্য নিয়েছে। পরে ঘটনাক্রমে বিদ্যাসাগর স্কুল পরিদর্শকের পদে নিযুক্ত হবার পর তদন্ত করে জানতে পারেন যে ছেলেটি মোটেই ছাত্র নয়। কোন কালেই সে ভর্তি হয়নি।

আবার কেউ নগদ টাকা এবং গয়নার লোভে বিধবা বিবাহ করে কিছুদিন

পরই বৌকে ত্যাগ করেছে। এসব ক্ষেত্রে বিধবাটিকে সারা জীবন মাসোহারা দেবার ব্যবস্থা করেছেন বিদ্যাসাগর ।

অন্য কেউ হয়তো অনাহারে আছে বলে অভিনয় করে বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নিয়ে মদ-গাঁজা খেয়েছে।

বিদ্যাসাগরকে বন্ধুরা যখন বলতেন যে, অলস ও অকর্মণ্য মানুষকে অর্থ সাহায্য দিয়ে সমাজের কোন কল্যাণ হবে না। বিদ্যাসাগর কোন প্রতিবাদ করতেন না । কিন্তু যখনই কোন ব্যক্তি এসে দুঃখের কথা বলতো তখন তিনি স্থির থাকতে পারতেন না । প্রতারিত হবার সম্ভাবনা থাকলেও সাহায্য করতে দ্বিধা করতেন না । কারো দুঃখের কথা শুনলেই তিনি কেঁদে ফেলতেন। ছোট বেলার চরম দারিদ্রের ছবি নিজের চোখের সামনে ভেসে উঠতো ।

রবীন্দ্রনাথ প্রতারকদের সম্পর্কে মন্তব্য কবতে গিয়ে বলেছেন---- "ক্ষুদ্র হৃদয়ের স্বভাব এই যে , সে যে পরিমানে উপকাব প্রাপ্ত হয সেই পরিমানে অকৃতজ্ঞ হয়ে উঠে।যাহা কিছু সহজেই পায তাহাই আপনার প্রাপ্য বলিয়া জানে। নিজের দিক হইতে কিছু দেয আছে তাহা সহজেই ভুলিয়া যায়।"

বিদ্যাসাগর মাতা ভগবতী দেবীর অতি কোমল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। ভগবতী দেবী কারো দুঃখ সহ্য করতে পারতেন না।

বিদ্যাসাগর চাকুরী পাবার পর পরিবারের জন্য ছয়খানা নতুন লেপ পাঠিয়েছিলেন। ভগবতী দেবী গ্রামে ঘুরে ঘুবে খবর নিয়ে জানলেন, গ্রামের অনেকেই চরম দারিদ্রের জন্য শীতে কষ্ট পাচ্ছে। তিনি তৎক্ষনাৎ ছয়খানা নতুন লেপ সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন যাদের তাদের ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। পরে ঈশ্বরচন্দ্রকে খবর পাঠালেন যে,----তোমার দেওয়া নতুন লেপ গ্রামের নিরীহ গরীবদের মধ্যে বিতরণ করেছি। আরো কিছু লেপ পাঠিয়ে দিও।

মায়ের এই আচরণে বিদ্যাসাগর বড়ই গৌরব বোধ করলেন। একখানা চিঠি দিয়ে মাকে জানালেন, গ্রামে এরকম বিপন্ন লোক আর কয়জন আছে এবং আর কতটা লেপ পাঠালে সবাইকে একটা করে লেপ দিয়ে তুমিও একখানা লেপ রাখতে পারবে জানাও। মায়ের আদেশ অনুযায়ী বিদ্যাসাগর নতুন লেপ তৈরী করিয়ে পাঠিয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগর প্রথমেই নিজ গ্রামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গ্রামের অধিকাংশ পরিবার এত দরিদ্র ছিল যে, বই খাতা কেনা বা বেতন দেওয়া দূরের কথা একবেলা খাবার ব্যবস্থাও ছিল না। বিদ্যাসাগর স্কুলে বিনা বেতনে পড়ার ব্যবস্থা

করলেন। প্রত্যেকটি গরীব ছাত্রের খাতাপত্র, বই, পোষাক. কলকাতা থেকে নিয়মিত পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। নিজের তৈরী উইলে এই ব্যবস্থা চালু রাখার সংস্থান করেছিলেন।

বিদ্যাসাগরের বাড়ীতে দরিদ্র ছাত্রদের একবেলা খাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ভগবতী দেবী নিজে এই কাজের তদারকী করতেন। কোন ক্ষুধার্ত মানুষ হাজির হলে তাদেরও খাবার ব্যবস্থা করা হতো । ক্রমে ক্রমে এই ব্যবস্থার কথা প্রচারিত হবার ফলে বীব সিংহ গ্রাম ছাড়াও আশে পাশের গ্রামের ক্ষুধার্ত অনাহার ক্লিষ্ট মানুষেবা ভিড় করতে থাকে। মায়ের কাছ থেকে এখবর পেয়ে বিদ্যাসাগর নিজ বাড়ীতে একটি স্থায়ী অন্নসত্রের ব্যবস্থা করেন। এখানে প্রতিদিন ৭০-৮০ জন ক্ষুধার্ত মানুষ খাবার পেত।

১৮৬৭ সালে অনাবৃষ্টির ফলে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। চর্তুদিকে হাহাকাব শুরু হয়ে যায়। বিদ্যাসাগর অস্থির হয়ে উঠলেন। সরকারী সাহায্য ছাড়া এই সমস্যার মোকাবিলা সম্ভব নয়। তিনি ছোট লাটকে দুর্ভিক্ষ এলাকায় অবিলম্বে অন্নসত্র খোলার জন্য অনুরোধ করলেন। বন্ধু বীডন সাহেবের উদ্যোগে অতিদ্রুত বিভিন্ন অঞ্চলে অন্নসত্র খোলাব জন্য অনুরোধ করলেন। বন্ধু বীডন সাহেবের উদ্যোগে অতিদ্রুত বিভিন্ন অঞ্চলে অন্নসত্র খোলা হল।

বিদ্যাসাগর নিজ দায়িত্বে বীরসিংহ গ্রামে অন্নসত্র খুললেন। প্রতিদিন বড় বড় গাছ কেটে লাকড়ীর ব্যবস্থা করা হতো । ১২ জন ব্রাহ্মণ রান্নার কজে নিযুক্ত হয়েছিল। খিচুড়ী রান্না করার জন্য বড় বড় পেতলের হাঁড়ি কেনা হল। বিদ্যাসাগর কলকাতা থেকে নির্দেশ পাঠালেন একটি লোকও যাতে অভুক্ত না থাকে, সেরূপ ব্যবস্থার জন্য যত্ন নিবে। বিদ্যাসাগরের ছোট ভাই শম্ভুচন্দ্র আত্মজীবনীতে আরো অনেক খবর বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন।

দুর্ভিক্ষের সময় বিভিন্ন অঞ্চলে কলেরাও দেখা দিত। সে কালে কলেরা রোগের উন্নত চিকিৎসা ছিল না । চিকিৎসকও ছিল নগণ্য সংখ্যায়। বিদ্যাসাগর নিজ গ্রামে একটি চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করলেন। অন্যান্য অঞ্চলে চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার জন্য সরকারের কাছে অনুরোধ জানালেন।

এই সময় থেকে অল্প খরচে চিকিৎসার জন্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিষয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন শুরু করেন। পরবর্তীকালে দেখা গেছে সাঁওতালদের চিকিৎসার দায়িত্ব বিদ্যাসাগর নিজেই পালন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথও গরীব মানুষের চিকিৎসার জন্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন।

দুর্ভিক্ষের সময় আরেকটি সমস্যাও দেখা দিয়েছিল। অনেকে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের ফেলে অন্যত্র পালিয়ে যেত । আবার কেউ মারা গেলে ছেলে মেয়েরা অনাথ হয়ে পড়তো । বিদ্যাসাগর এদেরও দায়িত্ব নিলেন।

অন্নসত্র দীর্ঘদিন চালু রাখতে হয়েছিল । ফলে প্রতিদিন খিচুরী খেতে অনেকে আপত্তি তুলেছিল। বিদ্যাসাগর প্রতি সপ্তাহে একদিন মাছ-ভাতের ব্যবস্থা করে দেন। সঙ্গে দধিও থাকতো ।

বিদ্যাসাগরের অন্নসত্রে কোন জাতিভেদ ছিল না। সব জাতের মানুষেরাই খাবাব পেত । পরিবেশনের কাজে যে সব মেয়েরা নিযুক্ত হতো বিদ্যাসাগর নিজে তাদের মাথায় তেল মেখে দিতেন। পরিচ্ছন্ন থাকতে উৎসাহ দিতেন। এতেই বোঝা যায় বিদ্যাসাগর দয়া দেখাবার চেষ্টা করেন নি। আন্তরিকভাবেই মানুষেব সেবা করাব মনোভাব থেকেই অন্নসত্র চালিয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগর খবর নিয়ে জানলেন যে, বহু ভদ্র পরিবার অন্নসত্রে আসতে লজ্জা পাচ্ছেন, অথচ ঘরে সপরিবারে উপোস করে দিন কাটাচ্ছেন । এই সব ভদ্র পরিবারের বাড়ীতে প্রতিদিন রাত্রি বেলায় গোপনে সিদে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। ভগবতী দেবীও কুড়িটি ভদ্র পরিবারে চাউল-ডাল লবণ প্রতিদিন নিয়মিত দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। যারা সিদে নিতে রাজী ছিল না, তাদেরকে নগদ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। ভদ্র পরিবারে গোপনে বিতরণ করার জন্য দুই হাজার টাকার বস্ত্র বিদ্যাসাগর কিনে পাঠিয়ে ছিলেন। বিদ্যাসাগর নিজে গিয়েও বহু পরিবারকে গোপনে সাহায্য করেছিলেন ।

বিদ্যাসাগরের বহু ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে নয়িমিত মাসোহারা দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। নিজের তৈরী উইলে ৪৫টি পরিবারকে নিয়মিত মাসোহার দেবার নির্দেশ ছিল। এছাড়াও বহু বিধবাকে নিয়মিত মাসিক বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থাও উইলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আত্মীয় এবং অনাত্মীয় বহু ছাত্রকে গ্রামের বাড়ীতে এবং কলকাতায় নিজ আশ্রয়ে রেখে লেখাপড়া শেখার সুযোগ করে দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। শিক্ষা শেষ হবার পর চাকুরীর ব্যবস্থাও করে দিতেন ছেলেদের ।

কোন ব্যক্তি সৎভাবে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার উদ্যোগ নিলে বিদ্যাসাগর সর্বতোভাবে তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করতেন।

বিদ্যাসাগর বহু মধ্যবিত্ত বিপন্ন পরিবারকেও সাহায্য করতেন। প্রয়োজনে ঋণের ব্যবস্থা করে। কিন্তু অনেকেই ঋণ পরিশোধ করেনি। বাধ্য হয়ে বিদ্যাসাগরকেই ঋণ

শোধ করতে হয়েছে।

জীবনীকাররা বলেছেন---- বিদ্যাসাগর কোন গরীব মানুষকে সাহায্য করে ঠকেন কি। কিন্তু বহু মধ্যবিত্ত মানুষ বিদ্যাসাগরকে ঠকিয়েছে। কথা দিয়ে কথা রাখেনি। বিপদ থেকে মুক্তির পর মুক্তিদাতাকেই ভুলে গেছে। এ ধরনের সুবিধাবাদী মধ্যবিত্তরা আজো সমাজের বিভিন্ন স্তরে ছড়িয়ে আছে।

বিভিন্ন কাজে বার বার ঋণ করে বিদ্যাসাগর যখন শিক্ষা বিস্তার , সমাজ সংস্কার, আর্তের সেবা, ও বিপন্নকে সাহায্য করার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই সুদূর ফ্রান্স থেকে মধুসূদনের কাছ থেকে কাতর আবেদন আসে সাহায্যের জন্য। মধুসূদন বিত্তবান ঘরের সন্তান । কিন্তু খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করার ফলে পিতার সাহায্য বন্ধ হয়ে যায়। তদুপরি বেহিসেবী খরচের ফলে হঠাৎ দেউলিয়া হয়ে যান।

সেদেশের নিয়ম অনুযায়ী মধুসূদন এক মাসের মধ্যে বাড়ী ভাড়া শোধ করতে না পারলে জেল হয়ে যাবে। মধুসূদন ঘনিষ্ট বন্ধুদের কাছে সাহায্য চেয়ে কোন সাড়া পেলেন না । শেষ চেষ্টা হিসেবে বিদ্যাসাগরের কাছে সাহায্যের আবেদন পাঠান। বিদেশে যাবার সময় বিষয় সম্পত্তির আয় থেকে নিয়মিত টাকা পাঠাবার জন্য মহাদেব নামে একজনের উপর দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন। সেই টাকা পাঠানো হঠাৎ বন্ধ হওয়ায় মধুসূদন বিপন্ন হয়ে পড়েন। বিদ্যাসাগর তখন কঠিন আর্থিক সংকটে ছিলেন। তবুও মধুসুদনের এই বিপদের দিনে বিদ্যাসাগর অন্যের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা করেণ। মধুসূদনের ইজ্জত রক্ষা হয়। বিদ্যসাগরের সাহায্যেই লন্ডন থেকে ব্যারিষ্টার হয়ে দেশে ফিরে আসেন। এখানেও বেহিসেবী খরচ করে চরম দুর্দশায় পড়েন। পিতার মৃত্যুর পরে সম্পত্তির অধিকারী হন। পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রী করে ঋণ শোধ করেন। কিন্তু নিজের জীবন ও পরিবার রক্ষার জন্য যত্নবান হলেন না। তাই অকালে ঝড়ে গেল একটি প্রতিভাবান জীবন।

বিদ্যাসাগর বন্ধু বান্ধবের বিপদে অকাতরে সাহায্য করতেন। ফেরৎ পাওয়ার প্রত্যাশা না করেই সাহায্য করতেন। নিজে কঠোর পরিশ্রম করে পাঠ্য পুস্তক রচনা করে এবং নিজেই বিক্রী করে ঋণ পরিশোধ ও সাহায্য দানের কাজ চালিয়ে যেতেন। কখনো কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করতেন না।

জীবনী কারদের হিসেব মত বিদ্যাসাগর ছাপাখানার আয় থেকে প্রায় দশ লক্ষ টাকা দান,বৃত্তি, মাসোহারা, বিধবা বিবাহ, শিক্ষা সংস্কার ইত্যাদি কাজে খরচ করেছেন। বর্তমানে মূল্যে এই টাকার দশ কোটি টাকারও বেশী । বহু বিপন্নকে ঋণ দিয়ে টাকা

ফেরৎ পান নি। এব জন্য কোন প্রকাব অনুশোচনাও প্রকাশ করেন নি।

স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে ঋণ করে ঘি খাওয়ার উপদেশ আমাদের দেশে পাওয়া যায়। কিন্তু ঋণ করেও দান করার মহত্ত্ব একমাত্র বিদ্যাসাগরের জীবনেই দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।
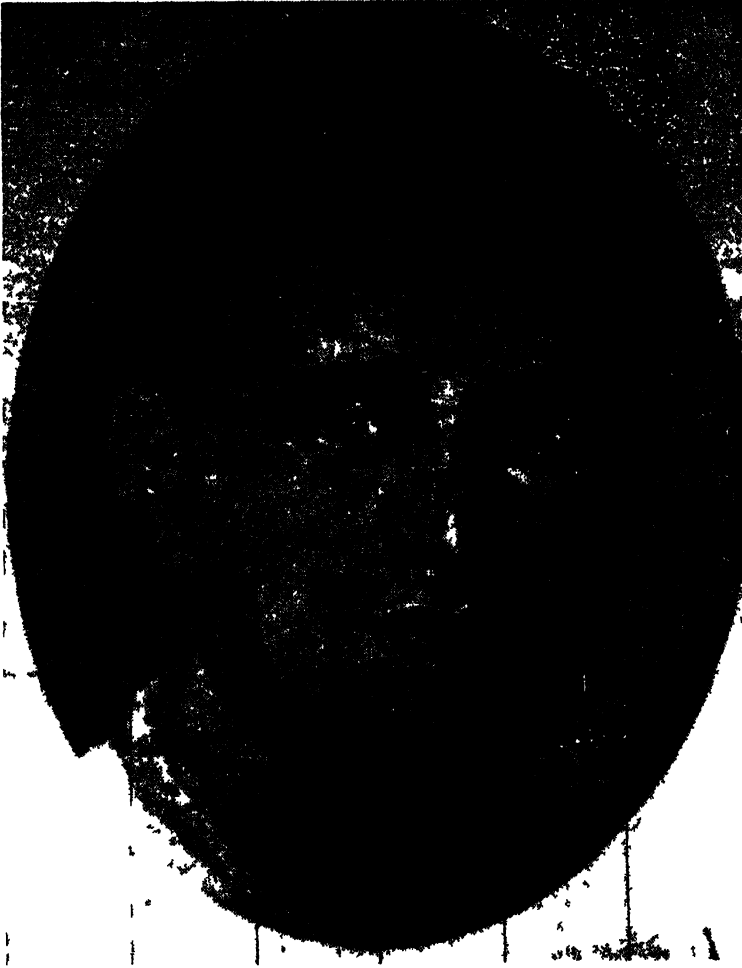
বিদ্যাসাগরের অবকাশ জীবন

বিদ্যাসাগর ছাত্র জীবন থেকেই কঠোর পরিশ্রম করতে অভ্যস্ত ছিলেন। কর্মজীবনেও ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত তিনি নানা কাজে কঠোর পরিশ্রম করতেন।

শ্রীরামপুরের পথে ঘোড়ার গাড়ী উল্টে গিয়ে লিভারে প্রচন্ড আঘাত পাওয়ার পর প্রায়ই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়তেন। ডাক্তার এসে বিশ্রামের জন্য পরামর্শ দিলেও গ্রাহ্য করতেন না। ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা কিছুকাল নির্জন যায়গায় গিয়ে বিশ্রাম নেবার জন্য চাপ সৃষ্টি করেণ।

বিদ্যাসাগরের মনে ভয় ছিল ছাপাখানার আয় বন্ধ হয়ে গেলে বা কমে গেলে বহু আসহায় পরিবার মাসোহারা থেকে বঞ্চিত হবে। শেষ পর্যন্ত একজন বিশ্বস্ত বন্ধুর হাতে ছাপাখানার দায়িত্ব দিয়ে কিছুকাল বিশ্রাম নেবেন স্থির করলেন।

বিশ্রামের জন্য নির্জন জায়গা খোঁজ করতে গিয়ে সাঁওতাল পবগনায় একটি জায়গা খুব পছন্দ হল। দরিদ্র নিরীহ মানুষের মধ্যে থেকে বিদ্যাসাগর খুব আনন্দ পেতেন। তাদের মধ্যে সরলতা,সততা এবং মানবিক মূল্যবোধের পরিচয় খুঁজে পেতেন।

জায়গাটি ছিল কলকাতা থেকে পাটনা যাবার পথে কারমাটার নামে একটি ছোট্ট স্টেশানের পাশে। বিদ্যাসাগর দুয়েকজন সঙ্গী নিয়ে সেখানে একটি বড় জমি কিনে নিয়ে বাগান বাড়ী তৈরী করলেন। চারদিক খোলা মেলা জায়গা। আর সব প্রতিবেশীরাই হল দরিদ্র, নিরক্ষর নিরীহ সাঁওতাল।

অল্প দিনের মধ্যেই সাঁওতালদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল। এমন মানুষ পেয়ে সাঁওতালরাও ভীষণ খুশী । বিদ্যাসাগরেরও মনে হল প্রকৃতির শান্ত পরিবেশে উপযুক্ত বিশ্রামের জায়গা বটে।

এই এলাকায় অল্প কয়েকটি বাঙ্গালী পরিবার খুঁজে পাওয়া গেল। বাংলা - বিহার উড়িষ্যা দীর্ঘকাল একই প্রশাসনের অধীনে থাকায় বাঙ্গালীরা বিহার ও উড়িষ্যার নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল। কলকাতা রাজধানী হওয়ায় বাঙ্গালীরাই লেখাপড়া শিখে সরকারী চাকুরী এবং ব্যবসা বানিজ্যে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। সেকালে শিক্ষক কেরানী ও রেলের কর্মচারীদের অধিকাংশই ছিল বাঙ্গালী । ডাক্তার এহং আইনজীবিদেরও অধিকাংশই ছিল বাঙ্গালী । বিদ্যাসাগর কারমাটারে প্রবাসী বাঙ্গালী পরিবারগুলোর

সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে জানতে পারলেন,এখানে মাছ পাওয়া যায় না । মাছ ছাড়া বাঙ্গালী পরিবারে খাদ্যের বড় কষ্ট হচ্ছে।

বিদ্যাসাগর খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন বাঙ্গালী বাবুরা মাছ কিনে টাকা দেয় না বলেই এখানে মাছ আসেনা। বিদ্যাসাগর নিজের টাকায় মাছ কিনে বাঙ্গালী বাবুদের বাড়ীতে পাঠাতে লাগলেন। নিয়মিত মাছ অসতে অরম্ভ করলো । জেলেরাও খুব খুশী হল। এভাবে বাঙ্গালী বাবুদের স্বভাবের কতটা পরিবর্তন হল তা অবশ্য বিদ্যাসাগরের জীবনী কারেরা উল্লেখ করেন নি।

বিদ্যাসাগর বিশ্রাম করতে এসে এখানে একটা বড় সংসার সৃষ্টি করলেন। সাঁওতালরা পয়সার অভাবে মিষ্টি খেতে পায় না । তাই বর্ধমান থেকে রসগোল্লা এবং সীতাভোগ এনে খাওয়াবার ব্যবস্থা করলেন। একদিন সাঁওতালরা খেজুর খাবার অবদার করলো। বিদ্যাসাগর দশ বস্তা খেজুর এনে তাদের মধ্যে বিতরণ করলেন।

সব সাঁওতালরা বিদ্যাসাগরকে নিজেদের আপনজন বলে মনে করতো । নিজেদের অভাব অভিযোগ, সুখ, দুঃখের খবর যেমন নিয়মিত দিত তেমনি সামাজিক কলহ বিবাদের মীমাংসার ভারও বিদ্যাসাগরের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতো। অসুখ বিসুখ হলে বিদ্যাসাগর নিজেই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতেন। পূজার সময় সবাইকে নতুন কাপড় দিতেন।

চন্ডীচরণ বন্দোপাধ্যায় এধরণের আরো অনেক দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। শিবনাথ শাস্ত্রী এ প্রসঙ্গে নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন। একবার তিনি কারমাটারে বিদ্যাসাগরের অতিথি হয়েছিলেন। তিনি দেখতে পান, এখানে বিশ্রাম করতে এসে বিদ্যাসাগর টেবিলে বসে কথামালা এবং বোধোদয়ের প্রুফ দেখছেন । নতুন সংস্করণের বই অন্য কাউকে দিয়ে প্রুফ দেখানো যেতে পারে। তাই তিনি প্রশ্ন করলেন আপনি নিজে প্রুফ দেখছেন কেন ? বিদ্যাসাগর জবাবে বলেন,জানিস ভাষাটা এমন জিনিষ যে কিছুতেই যেন স্পষ্ট হতে চায় না। সব সময় মনে হয় যেন আরো ভাল শব্দ পেলে আরো ভাল হতো । তাই আমি সব সময় কাটাকুটি করি।

আরেকটা দৃশ্য ছিল আরও চমৎকার । দুপুর বেলা পাঁচ ছয় জন সাঁওতাল অনেকগুলো ভুট্টা বিক্রী করতে এল । বিদ্যাসাগর নগদ দামে সব ভুট্টা গিলে নিলেন। নিজের হাতে তাকের উপর ভুট্টাগুলো সাজিয়ে রাখলেন।

রাতের বেলা আরেক দল ক্ষুধার্ত সাঁওতাল বিদ্যাসাগরের উঠানে এসে ভীড় করলো । সবাই বলল বিদ্যাসাগর আমাদের ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে। আমাদের খেতে দে। বিদ্যাসাগর ঘরে সাজিয়ে রাখা সব ভুট্টা তাদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন।

দিনের বেলায় ভুট্টা কিনে রাতের বেলায় ক্ষুধার্ত মানুষের মধ্যে বিতরণ করা এটাও ছিল বিদ্যাসাগরের পক্ষে অত্যন্ত আনন্দজনক একটি কাজ।

এর মধ্যেই ফাঁকে ফাঁকে বেরিয়ে পড়তেন অসুস্থ মানুষের চিকিৎসা করতে। হোমিওপ্যাথি ঔষধেও সাধারণ চিকিৎসা ভালই চলছে দেখে মনে মনে খুব তৃপ্তি পেতেন।

নির্জন স্থানে বিদ্যাসাগরের বিশ্রামের নমুনা দেখে শিবনাথ শাস্ত্রী অবাক হলেন। মনে মনে হয়তো ভাবলেন প্রকৃতির এই নির্জন পরিবেশে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিদ্যাসাগরের প্রাণ খোলা অন্তরঙ্গতার যে তৃপ্তি লুকিয়ে আছে সেখানেই বিদ্যাসাগরের মনের প্রকৃত বিশ্রাম।

শম্ভু চন্দ্রের লেখায়ও এরকম আরো অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে যার মধ্যে বিদ্যাসাগরের অবকাশ যাপনের বিচিত্র ঘটনাবলীর সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়।

কর্মের মধ্য দিয়ে যারা আদর্শ স্থাপন করেন তারা কর্মের মধ্যেই তৃপ্তি ও বিশ্রাম লাভ করেন। তাদের কর্মই তাদেরকে অমরত্ব দান করে।
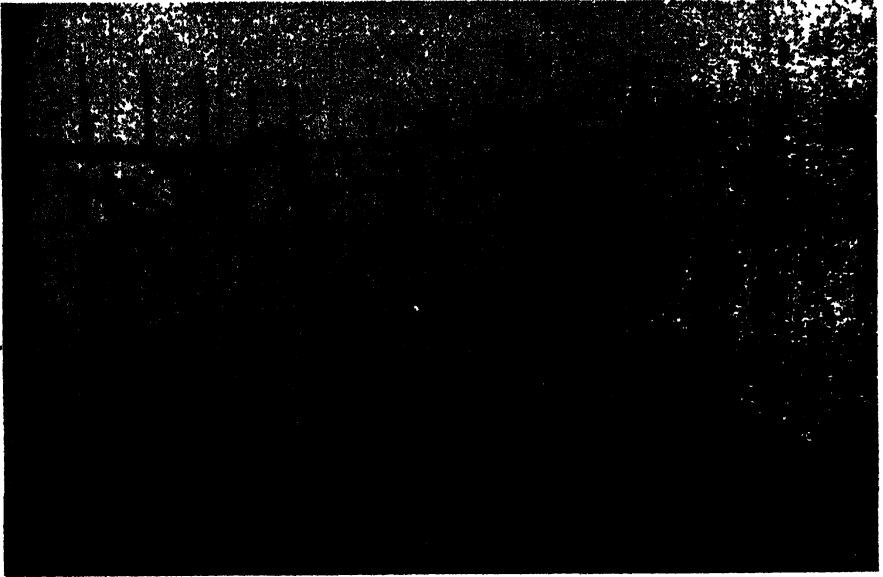
বিদ্যাসাগরের ধর্মচিন্তা

বিদ্যাসাগর সে কালের বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পন্ডিত বংশে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং হিন্দু শাস্ত্রের যাবতীয় পাঠ গ্রহণ করে বিদ্যাসাগর উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কখনো পূজা পার্বণ বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান নিয়ে মাথা ঘামাননি বা ধর্ম সম্পর্কে নিজের মতও কখনো স্পষ্ট করে প্রকাশ করেন নি।

ছোট ভাই শম্ভু চন্দ্রেব এক বিববণ থেকে জানা যায় যে, একদিন দুজন বিশিষ্ট ধর্মপ্রচারক কয়েকজন ভদ্রলোক সহ বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করে বলেন যে,---- বর্তমানে বঙ্গদেশে ধর্ম নিযে বড় হুলস্থুল পড়িয়াছে । যার যাহা খুশি তাহাই বলিতেছে । আপনি ভিন্ন এ বিষযে মীমাংসাব কোন সম্ভাবনা নাই।

বিদ্যাসাগর জবাব দিতে গিযে বলেন যে,---- "ধর্ম কি তাহা মানুষেব বর্তমান অবস্থায জ্ঞানের অতীত এবং জানিবারও কোন প্রয়োজন নাই।"

এই জবাব শোনার পর প্রশ্নকর্তারা আরো ব্যাখ্যা করে বলার জন্য অনুরোধ করেন। তখন বিদ্যাসাগর বলেন,-- "আমার বোধ হয় যে,পৃথিবীর প্রারম্ভ হইতেই এরূপ তর্ক চলিতেছে ও যাবৎ পৃথিবী থাকিবে,তাবৎ এই তর্ক থাকিবে কাস্মিনকালেও ইহার মীমাংসা হইবেনা। মীমাংসাই যখন অসম্ভব, তখন তা নিয়ে ব্যস্ত-বিব্রত হইয়া লাভ কি?"

তবুও জীবনের নানা ঘটনায় মানুষ বিব্রতহয়। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। স্যার জন লরেন্স নামে একটি জাহাজ পুরীতে যাত্রী নেওয়ার পথে সাতশ যাত্রী সহ ডুবে যায়। ভাবতের বিভিন্ন অঞ্চলের এই তীর্থ যাত্রীদের মৃত্যু খবর শুনে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন----- **"দুনিয়ার মালিক কি আমাদের চেয়েও নিষ্ঠুর যে, নানা দেশের নানা স্থানের অসংখ্য মানুষকে এক সঙ্গে ডুবাইয়া মারিলেন? এসব দেখলে কেউ মালিক আছেন বলে সহসা বিশ্বাস হয় না।"**

বিদ্যাসাগর সব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। কিন্তু ধর্মের নামে অনুষ্ঠিত যুক্তিহীন আচার এবং কুসংস্কারকে একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না ।

হিন্দুরা পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য কাশীবাসী হয়। তাদের সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের মনোভাব জানা যায় একটি ঘটনা থেকে। শিবনাথ শাস্ত্রীর পিতা ছিলেন বিদ্যাসাগরের

ঘনিষ্ঠ বন্ধু । কিছু কাল কাশীবাস করে কলকাতায় ফিরে আসার পর বিদ্যাসাগর বন্ধুকে প্রশ্ন করলেন, কি হে গাঁজা খেতে শুরু করেছ নাকি?

বন্ধুতো প্রশ্ন শুনে অবাক হয়ে জানতে চাইলেন, এটা কেমন কথা।

বিদ্যাসাগর জবাব দিলেন-"শুনেছি কাশীতে মরলে শিব হয়। তুমি কাশীবাস করে সেখানেই মরে শিব হবে। তারপর শিবের অনুচরদের সঙ্গে বসে গাঁজা খাবে। তারই প্রস্তুতি চলছে তো।"

পিতা ঠাকুরদাস কাশীবাসী হতে চাইলে বিদ্যাসাগর আপত্তি করলেন না। মাসে মাসে টাকা পাঠাবারও ব্যবস্থা করলেন। মাঝে মাঝে গিয়ে পিতাকে দেখেও আসতেন। কিন্তু কখনো কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন না। তীর্থ স্থানে ধর্মজীবী ভন্ডদের আড্ডার কথা অনেকের কাছেই শুনেছেন। তাই এগুলোকে পুন্যস্থান বলে তিনি মনে করতেন না।

কাশীর অর্থলোভী ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে শম্ভুচন্দ্র আরেকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। বিদ্যাসাগর একবার কাশীতে পিতৃদেবকে দেখতে গিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের দানের কথা তখন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। একদিন কয়েকজন বিখ্যাত ব্রাহ্মণ বিদ্যাসাগরকে পিতা ঠাকুরদাসের সামনেই বললেন ----- আপনার পিতা অতি পুণ্যবান। পিতার পুণ্যেই আপনি জগৎ বিখ্যাত হয়েছেন। এখানে ধর্ম কাজে আপনি পাঁচ-সাত হাজার টাকা দান করে সুখ্যাতি লাভ করুণ।

বিদ্যাসাগর বললেন, - আপনারা পিতার কাছ থেকে যা পেয়েছেন তা নিয়মিত পাবেন। এ বিষয়ে পিতার সঙ্গেই কথা বলুন।

জবাব শুনে ব্রাহ্মণরা উত্তেজিত হয়ে বললেন,----- কলকাতার ধনী ব্যাক্তিরা কাশীদর্শনে এলে মোটা অংকের টাকা দান করেন। আপনি নামজাদা দাতা, আপনাকেও দান করতে হবে।

বিদ্যাসাগর বিনীত ভাবে বললেন,---- আমি তীর্থ দর্শন করতে আসিনি, আমি পিতৃদর্শন করতে এসেছি। আমি যদি আপনাদের মত অর্থলোভী ব্রাহ্মণদের দান করে যাই, তবে কলকাতায় গিয়ে মুখ দেখাতে পারব না।"

ব্রাহ্মণরা ক্ষুব্দ হয়ে বিদায় নেন।

বিদ্যাসাগরের মা স্বামীর সঙ্গে কাশীবাসী হতে রাজী হন নি। কারণ বীরসিংহ গ্রামের বহু অসহায় মানুষ ভগবতী দেবীর সাহায্যে প্রতি পালিত হতো । তিনি তাদেরকে নিজের সন্তানের মত ভাল বাসতেন । তাদের ফেলে তিনি কাশীবাসী হয়ে পুণ্য সঞ্চয়ের

উৎসাহ বোধ করেন নি।

বিদ্যাসাগরের বাড়ীতে প্রতি বছর ধুমধাম করে পূজা করা হতো । গ্রামের গরীবদের বস্ত্রদান করা হতো। একদিন বিদ্যাসাগর মাকে প্রশ্ন করলেন ,-মা প্রতি বছর একবার এত টাকা খরচ করে পূজা করা ভাল, নাকি এই টাকা দিয়ে সারা বছর গরীবের সেবা করা ভাল।

ভগবতী দেবী উত্তর দিয়েছিলেন,-- গরীবের সেবা করলে দেবতার পূজা করার দরকার নেই।

বিদ্যাসাগর কাশীতে বহু দরিদ্র ব্রাহ্মণকে নিয়মিত সাহায্য করতেন। কাশীতে গেলে প্রতিদিন ভোর বেলায় একব্যাগ ভর্তি টাকা পয়সা সঙ্গে নিতেন। পথে পথে দরিদ্র মানুষের মধ্যে বিতরণ করতেন।

কাশীতে বিদ্যাসাগরের মা পরলোক প্রাপ্ত হওয়ায় ধনী ব্রাহ্মণরা অন্তেষ্টি ক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করেছিল। তখন দরিদ্র ব্রাহ্মণরা দল বেঁধে বিদ্যাসাগরের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল।

বিদ্যাসাগর আসলে কপটতাকে ঘৃণা করতেন। মানুষেব কল্যাণকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন।

একদিন বামকৃষ্ণদেব বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। বিদ্যাসাগর চেয়ার এগিয়ে দিলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ দেব মাটিতেই বসে পড়ে বললেন,হ্যাগো, এতদিন অনেক নালা নর্দমা পার হয়েছি । এবার সাগরে এলাম।

বিদ্যাসাগর হেসে বললেন------ এসেই যখন পড়েছেন খানিকটা নোনা জল নিয়ে যান।

রামকৃষ্ণ জবাব দিলেন----- না, গো, না, নোনা জল নেব কেন? এটা যে ক্ষীর সাগর, দধিসাগর ,দুধসাগর । তুমি তো অবিদ্যার সাগর নও, তুমি হলে বিদ্যার সাগর । আমি এখান থেকে মুক্তো নিয়ে যাব।

রামকৃষ্ণ জীবে দয়া এবং জীবের সেবাকেই পরম ধর্ম বলে বিশ্বাস করতেন। আর বিদ্যাসাগর জীবের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। উভয়ের মধ্যে আদর্শগত মিল রয়েছে। মানবধর্মই উভয়ের ধর্ম ।

ভারতীয় শাস্ত্র অনুযায়ী তাকেই নাস্তিক বলে, যিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না,বেদ মানেন না এবং পরকাল স্বীকার করেন না। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী বিদ্যাসাগরকে নাস্তিক বলা যায় কিনা তা নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে।

বিদ্যাসাগর নিজের জীবনকালে কারো কাছেই নিজের ধর্মমত সম্পর্কে একটি কথাও বলেন নি। কারো সঙ্গে এ বিষয়ে কোন আলোচনা করতেও রাজী হন নি। জীবন চরিত যারা রচনা করেছেন তাদের বর্ণনা অনুযায়ী বিভিন্ন কাহিনী থেকে বিদ্যাসাগরকে একজন সংশয়বাদী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বিদ্যাসাগরের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য---- পুরাতন প্রসঙ্গ--- নামক পুস্তকে বলেছেন---- বিদ্যাসাগর নাস্তিক ছিলেন একথা,বোধ হয় তোমরা জাননা। যাঁহারা জানিতেন,তাঁহারা কিন্তু সেই বিষয়ে লইয়া কখনও বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইতেন না।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য সাধক চরিতমালায় বলেছেন----- একসময় বেদান্তকে ভ্রান্ত দর্শন বলতেও কুণ্ঠিত হননি বিদ্যাসাগর।

এসব সাক্ষ্য থেকে বিদ্যাসাগরকে নাস্তিক বলেই মনে হয়। কিন্তু সামগ্রিক জীবন চরিত বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় তিনি সেকালের নবজাগবণেব দুটি মূল বেশিষ্ট্যকে আত্মস্থ কবেছিলেন। একটি হল মানবতদাবাদ , দ্বিতীয়টি হল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ।

মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতা এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াইটাকেই বিদ্যাসাগর জীবনের প্রধান লক্ষ্য হিসেবে স্থির করেছিলেন। তাই ধর্মীয় বিতর্ককে সর্বদা এড়িয়ে গিয়ে শিক্ষা বিস্তার এবং সমাজ সংস্কারের কার্যে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিয়েছেন। মধ্যযুগের সমাজ চিন্তা ছিল ঈশ্বর কেন্দ্রিক । অন্ধ ধর্মবিশ্বাস মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মানুষের মনের কোন স্বাধীনতা ছিল না। রামমোহন এবং বিদ্যাসাগর মানব জীবনের সব সমস্যা ও বিশ্বাসকে যুক্তির দ্বারা বিচার করার বিবেক বুদ্ধিকে জাগিয়ে দিয়েছেন। ধর্মকেও যুক্তির দ্বারা বিচার বিশ্লেষণ করার পরামর্শ দিয়েছেন।
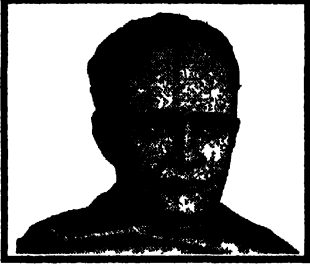
বিদ্যাসাগরের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট

বিদ্যাসাগরের জীবন ও চরিত্র নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে স্বাধীনতা লাভের পরে। উনবিংশ শতাব্দীর পুরোটাই নবজাগরণের জোয়ারে আপ্লুত হয়েছিল। রামমোহন- বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে বিবেকানন্দ পর্যন্ত সময়টা হল নব জাগরণের কাল।

তারপর শুরু হয় স্বদেশী আন্দোলন। বৃটিশ সবকাররে সাম্রাজ্যবাদী চেহারা যতই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ততই বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের ঢেউ নতুন নতুন ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। এই সময় নব জাগরণের মহানায়কদেব মূল্যায়ন করার অবকাশ দেশবাসীর সামনে ছিল না।

স্বাধীনতার পরে দেশের শিক্ষা বিস্তার এবং উচ্চ শিক্ষার উন্নয়নের বিষয়টি পর্যালোচনা কবতে গিয়ে বিগত শতাব্দীর মহানায়কদের ভূমিকা বিচার বিশ্লেষণ করার প্রযোজন দেখা দিয়েছে।

এই সময়ের পর্যালোচনা থেকেই বিদ্যাসাগরের চরিত্র বৈশিষ্ট্যগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কারের কাজটিও খুবই গুরুত্ব দিয়ে বিচার করার কাজ শুরু হয়েছে।

কবি শঙ্খ ঘোষ কিশোরদের জন্য প্রথম বইটি রচনা করেন। বিদ্যাসাগর---- গ্রন্থে তিনি দেখাতে চেয়েছেন বিদ্যাসাগর মানুষের মুক্ত মনের বিকাশেব লক্ষ্য নিয়ে সারা জীবন যে সাধনা করেছেন, স্বাধীন ভারতের সমাজে সে মুক্তমন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না । কে নেবে নতুন সমাজের দায়িত্বভার,যি নি প্রকৃত মুক্তির জন্য নেতৃত্ব দিতে পারবেন ।

এর পরই প্রথনাথ বিশীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় – বিদ্যাসাগর রচনা সম্ভার- এই গ্রন্থে বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব, মনুষ্যত্ব এবং সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধের পরিচয় স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়ে।

তারপরই প্রকাশিত হয় বিনয় ঘোষের---- বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ। এই গ্রন্থে প্রকাশ পায় বাঙ্গালী সমাজের উনবিংশ শতাব্দীর রূপ । ধর্মান্ধতা এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষেত্রেও তীব্র বিরোধীতা করা সেকালে ছিল একটা বড় কঠিন

কাজ । বিদ্যাসাগরের চরিত্রকে বুঝতে হলে সেকালের সামাজিক সীমাবদ্ধতা অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে।

পরবর্তী গ্রন্থ গুলোতে তথ্য ভিত্তিক বিচার বিশ্লেষণ শুরু হয় । দেবকুমার বসু সম্পাদিত--- বিদ্যাসাগর রচনাবলী এবং গোপাল হালদার সম্পাদিত---- বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ ---- বিদ্যাসাগর চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলোকে আরো জীবন্ত করে তুলেছে। আধুনিক যুগের প্রয়োজন মেটাবার উপযোগী বহু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

সংস্কৃত কলেজ এবং সরকারী দপ্তর থেকে পাঁচশ ইংরেজীতে লেখা চিঠি সংগ্রহ করে অরবিন্দ গুহ বিদ্যাসাগর চরিত্রের আধুনিক চিন্তা এবং ব্যক্তিগত মতামতের একটা পরিস্কার ছবি তুলেছেন----তাঁর সম্পাদিত --- আন পাবলিশড লেটারস অব বিদ্যাসাগর ---- গ্রন্থে । এসব তথ্যের ভিত্তিতে বিদ্যাসাগরের একটি জীবনী গ্রন্থ---- করুনাসাগর বিদ্যাসাগর - রচনা করেছেন অরবিন্দ গুহ- ইন্দ্রমিত্র ছদ্মনামে।

এরপর থেকে বহু বিদগ্ধ ব্যক্তি বিদ্যাসাগর চরিত্রের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থগুলোর নামাকরনের মধ্যেই লেখকের মূল দৃষ্টি কোন বিষয়টির উপর নিবদ্ধ তা ধরা পড়ে। যেমন- সৌম্যেন্দ্র নাথ সরকারের ----- বাঙ্গালী জীবনে বিদ্যাসাগর । অসিত কু মার বন্দ্যোপাধ্যায়ের- বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর। সুরেশ প্রসাদ নিয়োগীর - প্রকাশক বিদ্যাসাগর এবং সংস্কৃত কলেজ ও বিদ্যাসাগর, রাধা রমন মিত্রের -- কলকাতায় বিদ্যাসাগর । ইত্যাদি।

অতি বামপন্থীরা এই সময় বিদ্যাসাগব চরিত্রের মূল্যায়নে ব্যর্থ হয়েছিল। নবজাগরণে বিদ্যাসাগরের ভূমিকাকে গুরুত্বহীন প্রমান করার জন্য নানা ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল এবং কুযুক্তি পূর্ণ সমালোচনাও করেছিল। এসবই ঘটেছিল বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গীর চরম সংকীর্ণতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে।

উনবিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থার বাস্তব ভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক বিচারে একথা আজ স্বীকার করতেই হবে যে ------ সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার নিকৃষ্টতম অবস্থা ভেঙ্গে উজ্বল ভবিষ্যতের পথে জাতিকে এগিয়ে নেবার ক্ষেত্রে রামমোহন এবং বিদ্যাসাগর ছিলেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ সমাজ বিপ্লবী। রাজধানী কলকাতাকে কেন্দ্র বাঙ্গালীর সমাজ জীবনে যে বিপ্লব সৃষ্টি হয়েছিল তা ক্রমে ক্রমে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল।

রামমোহন এবং বিদ্যাসাগর উভয়ের চরিত্রেই প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল--- মানবতাবাদ । উভয়েরই আদর্শ ছিল---- অসাম্প্রদায়িক । উভয়েই ছিলেন---

জাতিভেদ,ধর্মান্ধতা এবং কুসংস্কারের বিরোধী । দুজনেই ছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মিলনের সেতু । তাদের মত উদার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন বিশাল ব্যক্তিত্বের মানুষ রবীন্দ্রনাথের পর আর কেউ এদেশে আবির্ভূত হন নি।

রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে মনুষ্যত্বকে তুলে ধরেছেন। কারণ মনুষ্যত্ব সর্বত্রব্যাপ্ত হয়। জীবনের সকল কাজে সকল মুহুর্তে তার প্রকাশ ঘটে। প্রতিভা বিদ্যুতের আলোর মত জীবনের বিশেষ বিশেষ কতকগুলো দিক বিশেষভাবে আলোকিত করে ।

বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রয়োজনীয় সব গুণেরই সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। সামাজিক মর্যাদাবোধ, নির্ভীকতা, বলিষ্ঠতা, সত্যচারিতা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা লোকসেবার মানসিকতা ,আত্মনির্ভরশীলতা এবং স্বদেশ প্রীতি ইত্যাদি সব গুণই বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রস্ফুটিত হয়েছিল।

স্বদেশী পোষাক এবং স্বদেশী খাদ্যের প্রতিও বিদ্যাসাগর গভীর আকর্ষণবোধ করতেন । চটি জুতা দেশীয় শ্রমিকরা তৈরী করতো বলে তিনি সারা জীবন চটিজুতা ব্যবহার করেছেন। তাই এর নাম হয়েছিল বিদ্যাসাগরী চটি।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদে কাজ করার সময় ছোট লাটের সঙ্গে দেখা করার জন্য দুদিন সাহেবী পোষাক পরতে বাধ্য হযেছিলেন। সেকালে সরকারী নির্দেশ ছিল উচ্চ পদস্থ ইংরেজ কর্মচারীদের সঙ্গে দেখা করতে হলে সাহেবী পোষাক পরতে হবে। বিদ্যাসাগর দ্বিতীয় দিনেই এই ব্যবস্থার পরিবর্তণ দাবী করে ছোট লাটকে বলেন, সাহেবী পোষাক পরতে হলে আমি আর এ অফিসে আসব না। দেশীয় পোষাক পরে আসতে অনুমতি দিলে তবেই তিনি আসবেন। ছোট লাট সেদিনই দেশীয় পোষাকে দেখা করার অনুমতি দিলেন।

বিদ্যাসাগরের চরিত্র বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,----- **অনুবীক্ষণ নামে এক প্রকার যন্ত্র আছে, তাহাতে ছোট জিনিষকে বড় করিয়া দেখায়, বড় জিনিষকে ছোট দেখাইবার নিমিত্ত উপায় পদার্থশাস্ত্রে নির্দিষ্ট থাকিলেও, ঐ উদ্দেশ্যে নির্মিত কোন যন্ত্র আমাদের মধ্যে সর্বদা ব্যবহৃত হয় না । কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবন চরিত বড় জিনিষকে ছোট দেখাইবার জন্য নির্মিত যন্ত্র স্বরূপ । আমাদের দেশের মধ্যে যাঁহারা খুব বড় বলিয়া আমাদের নিকট পরিচিত, ঐ গ্রন্থ একখানি সম্মুখে ধরিবামাত্র তাঁহারা সহসা অতি ক্ষুদ্র হইয়া পড়েন।**

আমরা চরিত্র গঠনের কথা বলি । কিন্তু মানুষের চরিত্র আপনা থেকেই গঠিত হয় না। উপযুক্ত শিক্ষা,আদর্শ, দৃষ্টান্ত এবং নিয়মিত চর্চা ও অভ্যাসের দ্বারা চরিত্র গঠন করতে হয়।

আমাদের আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় চরিত্র গঠনের জরুরী ব্যাপারটাই অবহেলিত । অথচ দেড়শ বছর আগে বিদ্যাসাগর সুদৃঢ় চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠনের উদ্দেশ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের জীবনী গ্রন্থ রচনা করে ,তা বাধ্যতা মূলক পাঠ্য বিষয় করেছিলেন। যে সব বিশ্ববিখ্যাত মনীষীরা বাল্যকাল থেকেই কঠোর পরিশ্রম এবং বহু বাধা অতিক্রম করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তাঁদের জীবনীগুলোকেই বিদ্যাসাগর শিক্ষার আদর্শ রূপে গণ্য করেছিলেন।

কঠোরতার সঙ্গে কোমলতা মিশ্রিত হলেই মানুষের চরিত্র সম্পূর্ণ হয়। বিদ্যাসাগর তেমনি একটি চরিত্র । মা যেমন সন্তানের দুঃখ দেখলেই অস্থির হয়ে উঠেন এবং দুঃখ দূর না হওয়া পর্যন্ত কেঁদে কেঁদে আকুল হন, বিদ্যাসাগরও তেমনি মানুষের দুঃখে কেঁদে ফেলেন এবং দুঃখ দূর না হওয়া পর্যন্ত অস্থিরতা বোধ করেন। আবার কোথাও অন্যায় দেখলে বজ্রের মতো কঠোর হন। এটাই বিদ্যাসাগর চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য।

বিদ্যাসাগরের অসাধারণত্ব হল তিনি নিজের দুঃখ কষ্টকে কখনোই ভ্রূক্ষেপ করতেন না। তাঁর জীবন চরিতের পাতায় পাতায় এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেখানে তিনি নিজের চরম দুর্দশাকে উপেক্ষা করেই পরের উপকার করেছেন।
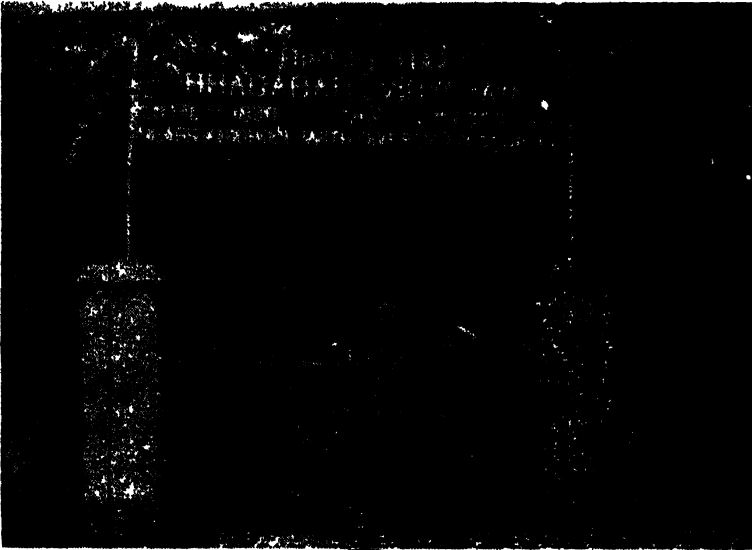
বিদ্যাসাগরের শেষ জীবন

কবি মধুসুদন জন্মভূমির প্রতি কবিতায় বলেছেন-------

জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে,
চির স্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন নদে?

জন্ম এবং মৃত্যু এ জীবনের খেলা । মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও মৃত্যুকে জয় করার নানা উপায়ের কথা মানুষ ভেবেছে এবং ভাবছে। বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত হয়েছেন যে মৃত্যুকে এড়াবার উপায় নেই । তবে জীবনকে দীর্ঘস্থায়ী করার উপায় আছে।

কবি,ভাবুক এবং দার্শনিকরা মানুষের কর্মের মাধ্যমে অমরত্ব লাভের উপায় নির্দেশ করেছেন। মধুসূদন উপরে উল্লেখিত কবিতায় বলেছেন-----

সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্বজন!

আমাদের বিদ্যাসাগর তেমনি একটি জীবন যাকে আমরা কোন দিন ভুলতে পারব না । তিনি আমাদের জীবনে চিরস্মরনীয় হয়ে থাকবেন।

বিদ্যাসাগর প্রায় সত্তর বছর বেঁচেছিলেন। শৈশব এবং কৈশোর জীবন কেটেছে চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে । যৌবনের কর্ম জীবনের দিনগুলো কেটেছে মানুষের দুঃখ দুর্দশা দূর করার সংগ্রামে ।

একা যুদ্ধ করে সমাজে কোন পরিবর্তন আনা যায় না। তাই বিদ্যাসাগর চেষ্টা করেছেন শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে একটা সংগ্রামী শ্রেণী সৃষ্টি করার লক্ষ্যে । এদেশে আধুনিক শিক্ষার তিনিই প্রথম রূপকার। শিক্ষা পদ্ধতি ও শিক্ষার পরিকাঠামো তৈরী করে, নতুন পাঠ্য পুস্তক সৃষ্টি করে এবং গদ্য ভাষাকে সাহিত্য সৃষ্টির উপযোগী করে তিনিই বাংলা গদ্য ভাষাকে গতিশীল করেছেন।

সমাজ সংস্কারের কাজে তিনি কিছু বিশিষ্ট বন্ধুকে সক্রিয় সহযোগী হিসেবে পেয়েছিলেন। সে কালের ছোট শহর কলকাতায় ছোট লাট, বড় লাট থেকে আরম্ভ

করে বহু উচ্চ পদস্থ ইংরেজ রাজ কর্মচারী এবং বহু ধনী ও জমিদার বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পন্ডিত এবং সংস্কৃত কলেজের ছাত্র, অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ হিসেবে কাজ করার ফলে ব্যাপক বন্ধুত্ব গড়ে উঠার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল।

ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা এবং পাঠ্য পুস্তক রচনা ও বিক্রী থেকে বিপুল অর্থ উপার্জন করে সমাজ সংস্কার এবং দরিদ্র ও অসহায় মানুষের সেবা করার বিরাট সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগর জীবিত কালেই জ্ঞান, বুদ্ধি, সুবিবেচনা এবং স্বাধীন ব্যাক্তিত্বের জন্য অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিলেন। আবার বহু বন্ধু এবং আত্মীয়ের কাছ থেকে প্রচন্ড আঘাতও পেয়েছেন।

বিধবা বিবাহ প্রচলন করতে গিয়ে বিপুল পরিমান ঋণ গ্রহণ করেছিলেন। প্রচন্ড পরিশ্রম করে এ ঋণ শোধ করেছিলেন। কিন্তু বিধবার লাঞ্ছনা দূর করার উপায় তিনি করে যেতে পারেন নি। আমাদের সমাজ বিধবা বিবাহকে এখনো স্বাভাবিকভাবে নিতে পারেনি।

বিধবাদের সংখ্যা বৃদ্ধির মূল কারণ বাল্যবিবাহ এবং বহু বিবাহ। এ দুটি সমস্যা সমাধানে ঘনিষ্ট বন্ধুদেরও সহযোগিতা পান নি।

এই সময় সিপাহী বিদ্রোহ ঘটে যাওয়ার ফলে ইংরেজ সরকারের উদার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিল।

এসব ঘটনায় বিদ্যাসাগর কিছুটা হতাশ হয়ে পড়েছিলেন।

তিনি সংসারে থেকেও সংসারী ছিলেন না। তিনি সকলের জন্যই কাজ করেছেন। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে তিনি সকলের জন্য হলেও তাঁর জন্য কেউ ছিল না।--- তিনি নিজের দুঃখ ভুলে যাবার জন্য অবিরাম নতুন নতুন কর্মের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখার চেষ্টা করতেন।

বিদ্যাসাগরের প্রতিটি কাজই ছিল সুপরিকল্পিত । শুধু নিজের জন্যই কোন পরিকল্পনা ছিল না।

বিদ্যাসাগরের মাতৃ ভক্তি ও পিতৃভক্তির কোন তুলনা নেই। জীবন চরিত গুলোতে বহু দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমানিত হয়েছে যে, বিদ্যাসাগর যে কোন নতুন কাজে উদ্যোগ নেবার আগে মাতা পিতার অনুমতি ও আশীর্বাদ নিয়েই কাজ শুরু করতেন। বিধবা বিবাহ প্রচলনের উদ্যোগ নেবার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি।

বিদ্যাসাগরের পারিবারিক জীবনও সুখের ছিল না। বিরাট যৌথ পরিবারের সব খরচই তিনি বহণ করতেন। মা ও বাবকে কিছু অর্থ পৃথক ভাবে দিতেন। তাদের সব ইচ্ছা পূরণ করার চেষ্টা করতেন। কোন বিষয়ে মতভেদ থাকলেও তা বুঝতে দিতেন না।

একবার বাড়ী গিয়ে জানতে পারলেন -- পিতা ঠাকুরদাস কাশী বাসী হবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মাতা ভগবতী দেবীর আচরণেও কিছু অশান্তির লক্ষণ ফুটে উঠলো ।বিদ্যাসাগর বাবাকে অনেক বোঝালেন। কিন্তু তিনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তণ করতে রাজী হলেন না। বিদ্যাসাগর কাশী যাবার সব ব্যবস্থা করে দিলেন এবং নিয়মিত প্রতি মাসে ৫০ টাকা পাঠাবারও ব্যবস্থা করলেন। মা ভগবতী দেবী গ্রাম ছেড়ে যেতে রাজী হলেন না । কারণ গ্রামের বহু দরিদ্র পরিবার ভগবতী দেবীর দয়ার দানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিল।

বিদ্যাসাগর নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই যৌথ পরিবারের বিরোধী হয়ে উঠেছিলেন। ভাইদের সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকা কালেই পরিবার পৃথক হওয়া উচিত, এরকম পরামর্শ দিতেন । কিন্তু মা-বাবার ইচ্ছে অনুযায়ী গ্রামে যৌথ পরিবার অক্ষুন্ন রাখেন।

বিদ্যাসাগর একমাত্র পুত্র নারায়ণের আচরণে ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে নিজের তৈরী উইলে পুত্রকে নিজের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছিলেন। কিন্তু অন্য কোন উত্তরাধিকারী নির্দেশ করে না যাওয়ায় আদালত নারায়ণকেই সম্পত্তির অধিকারী বলে রায় দিয়েছিল।

বিদ্যাসাগরের বিয়ে হয়েছিল ১৪ বছর বয়সে । প্রথম পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে উনত্রিশ বছর বয়সে। তারপর চার কন্যার জন্ম হয়। সকলেরই ভাল বিবাহ দেন।

বড় মেয়ের জামাই কাশীতে অসুস্থ ঠাকুরদাসকে দেখতে গিয়ে কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। ফলে দুই সন্তান সহ বড় মেয়ের দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেন। ছোট মেয়ের জামাইকে মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউটের প্রিন্সিপাল পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু কিছুকাল পর তার বিরুদ্ধে কিছু দুর্নীতির অভিযোগ উঠায় নিজের প্রিয় জামাইকে চাকুরী থেকে ছাঁটাই করেন। এর জন্য খুব মানসিক কষ্ট পান।

বিদ্যাসাগর সারা জীবনই প্রায় নিঃসঙ্গ জীবন কাটিয়েছেন। যৌথ পরিবার থেকে নিজের স্ত্রী পুত্রকে আলাদা করে কলকাতায় নিয়ে আসা সম্ভব ছিল না। কারণ তাতে মা-বাবা দুজনেই দুঃখ পেতেন।

বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহের জন্য প্রচুর টাকা খরচ করতেন এবং দীন দরিদ্রকে অকাতরে দান করতেন। কিন্তু পরিবারে অনেকেই তা সহ্য করতে পারতো না । এ সব

নিয়ে নানা রকম মন্তব্য শুনে বিদ্যাসাগর দুঃখ পেতেন। তবু পরিবারের সব দায়িত্ব তিনি নীরবে পালন করেছেন।

বীর সিংহ গ্রামে একটি বিধবা বিবাহকে কেন্দ্র করে পরিবারের লোকদের সঙ্গে তীব্র মতবিরোধ হয়। সেদিনই তিনি চিরকালের মত বীরসিংহ গ্রাম ত্যাগ করেন।

তার পরেও তিনি বাইশ বছর বেঁচেছিলেন। পরিবারের যাবতীয় খরচ,গ্রামের বিদ্যালয় ও চিকিৎসা কেন্দ্রের খরচ নিয়মিত চালিয়ে গেছেন। এবং নিজের তৈরী উইলে এসব খরচের সংস্থান রেখেছিলেন।

১৮৭০ সালে ভগবতী দেবী কাশীতে স্বামীকে দেখতে গিয়ে কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন।

মায়ের মৃত্যু খবর শুনে বিদ্যাসাগর শিশুর মত চীৎকার করে কান্নাকাটি করেন। শাস্ত্র সম্মতভাবে শ্রদ্ধাদি অনুষ্ঠান করেন।

১৮৭৬ সালে ঠাকুরদাস কাশীতে প্রাণ ত্যাগ করেন। এই খবরেও বিদ্যাসাগবেব আকুল কান্না সকলকে শোকাকুল করে তোলে ।

১৮৮৮ সালে বিদ্যাসাগরের স্ত্রী দীনময়ী দেবী অসুস্থ হয়ে প্রাণত্যাগ করেন।

এসব ঘটনায় বিদ্যাসাগর একে বারে ভেঙ্গে পরেন। লিভারেব অসুখ দিন দিন বাড়তে থাকে। ১৮৯১ সালের ২৯ শে জুলাই চিকিৎসকদেব সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে বিদ্যাসাগর ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর শবদেহ নিয়ে কলকাতায় বিশাল শোকমিছিল হয়েছিল । সারা দেশ শোকে আচ্ছন্ন হয়েছিল।

মরেও তিনি অমর হয়ে রইলেন দেশ বাসীর মনে। তিনি হয়ে রইলেন বাঙ্গালীর চিরস্মরণীয় আদর্শ । মনুষ্যত্ব অর্জন, চরিত্র গঠন, সামাজিক দায়িত্ব পালন, আর্তের সেবা, মানবিক মূল্যবোধ, দেশবাসীর প্রতি কর্তব্যবোধ বিদ্যাসাগরের জীবনের মূল আদর্শ । শিক্ষার মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে এই আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাঁর জীবনের স্বপ্ন ও সাধনা। এই সাধনাই বাঙ্গালীর জীবনে সঞ্চারিত করেছে জাতীয়তাবোধ এবং ভারতীয়ত্ব বোধ । ক্রমে ক্রমে তা ছড়িয়ে পড়েছে সারা ভারতবর্ষে।

নব জাগরণের কবি ও কথাশিল্পী

মধুসূদন ও বঙ্কিম চন্দ্র

ভূমিকা

নবজাগরণের কবি মধুসূদন এবং কথাশিল্পী ও সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা তথা ভারতের শিক্ষিত সমাজের প্রাণে যে স্বদেশ প্রেমের সঞ্চার করেছিলেন তা ভারতের ইতিহাসকেই নতুন পথে প্রবল বেগে পরিচালিত করেছিল।

নবযুগের কাব্যে, নাটকে, উপন্যাসে ও প্রবন্ধ সাহিত্যে নবজাগরণের ঢেউ সৃষ্টি করেছিলেন এই দুই মহানায়ক।

তাঁরা দুজনেই ছিলেন স্বল্পজীবী, এবং দুজনেই ছিলেন অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী। স্বদেশের মুক্তি আন্দোলনে উভয়েরই অবদান ছিল অবিস্মরণীয়।

তাঁদের জীবন ও কর্ম যে কোন মানুষকেই চিরকাল অনুপ্রাণিত করবে। তাই তাঁদের জীবন চরিত অবশ্য পাঠ্য হওয়া উচিত।

নতুন প্রজন্মের যুবক যুবতী ও ছাত্র-ছাত্রীরা এসব জীবন চরিত পাঠ করে উপকৃত হবে এই ভরসাতেই বহু চর্চিত জীবন কথা নতুন রূপে প্রকাশ করার প্রেরণা লাভ করেছি। তারা উপকৃত হলেই আমার শ্রম সার্থক হবে।

আগরতলা — দীনেশ চন্দ্র সাহা

৬ই জানুয়ারী ২০০৬ — গ্রন্থকার

সূচীপত্র

নবজাগরণের মহাকবি মাইকেল মধুসূদন

বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রথম এবং শেষ শ্রেষ্ঠ মহাকবি রূপে অমরত্ব লাভ করেছেন। মহাকাব্য রচনার জন্য যে গুরুগম্ভীর ভাষা, শব্দ, ছন্দ, ভাব, বিভিন্ন রস ও কল্পনার, রোমান্টিকতা প্রয়োজন তা বাংলা ভাষায় ছিল না। মহাকাব্য রচনার জন্য মধুসূদন এসবই সৃষ্টি করেছেন।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ইতিপূর্বে আটশ বছর ধরে শুধু পদ্য সাহিত্যই সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সবই ছিল গতানুগতিক পয়ার ছন্দে। পর পর দুই লাইনের মিল এই ছন্দের বৈশিষ্ট্য।

পদ্য রচনা হত বিভিন্ন ধর্মীয় তত্ত্ব প্রচারের জন্য। সঙ্গীতের মাধ্যমে ভক্তদের কাছে ধর্মীয় তত্ত্ব পৌছে দেওয়া হতো। চর্যাপদাবলী,বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী ও বিভিন্ন মঙ্গল কাব্য সবই সুর দিয়ে সঙ্গীতের রূপ দেওয়া হত।

মধুসূদনই প্রথম ঝড়ের বেগে অবির্ভূত হলেন সম্পূর্ণ নতুন ধরনের ভাব, ভাষা, শব্দ ও ছন্দ নিয়ে। মধুসূদন মাতৃ ভাষা ছাড়াও দশটি বিভিন্ন ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। সংস্কৃত, ইংরেজী, আরবী, ফার্সী, উর্দু, গ্রীক, ইতালী, জার্মাণ,স্পেন,ও ল্যাটিন, ইত্যাদি ভাষায় দক্ষতা থাকার ফলে বাংলা ভাষায় নতুন নতুন শব্দ ব্যবহার করে গুরু গম্ভীর ভাব ও আবেগ সৃষ্টি করলেন বাংলা কাব্যে, কবিতায় ও নাটকে।

ইউরোপের শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকারদের গ্রন্থাবলী গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করার ফলে ইউরোপীয় উন্নত সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে মধুসূদনের গভীর পরিচয় ঘটেছিল।

তাছাড়া পাশ্চাত্য জগতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক এবং বিজ্ঞানীদের গ্রন্থাবলীও

মধুসূদন বিশেষ মনোযোগ দিয়ে পাঠ করেছেন। ফলে ডারউইন, হাক্সলী, স্পেনসার, রুশো, ভলটেয়ার, এবং কুমতের দৃষ্টিভঙ্গী ও বিচার বিশ্লেষণের পদ্ধতি মধুসূদন আয়ত্ত করেছিলেন।

পাশ্চাত্য কবিদের মধ্যে মিলটন, বায়রন, শেলী, ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং হোমার ছিলেন মধুসূদনের আদর্শ এবং নাট্যকারদের মধ্যে শেক্সপিয়ার ছিলেন অত্যন্ত প্রিয়।

মধুসূদন কবিতা, কাব্য ও নাটকে পাশ্চাত্য আদর্শ অনুসরণ করেছেন। কিন্তু ভাবে ও বিষয়বস্তুতে ভারতীয় সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

নবজাগরণের মহানায়কেরা সকলেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে একটা যুক্তি সঙ্গত সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন এবং সকলেই এক্ষেত্রে সফল হয়েছেন।

কিন্তু স্বাধীনতালাভের পরে ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারা নবজাগরণের আদর্শ থেকে সরে গিয়ে ক্রমাগত পাশ্চাত্য সংস্কৃতির দিকে ঝুঁকে পড়েছে। এরফলে প্রথমেই ধ্বংস হচ্ছে ভারতীয় মূল্যবোধ। শিক্ষার মূল আদশ- চরিত্র গঠন- এখন আর গুরুত্ব পাচ্ছে না। এর পরিনতি সম্পর্কে শিক্ষাবিদরা রীতিমত চিন্তিত হয়েপড়েছেন।

নবযুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, যুক্তিবাদ এবং দৈব শক্তির পরিবর্তে মানবিক শক্তির প্রতিষ্ঠা। প্রাচীন যুগে মানুষ ছিল প্রকৃতির উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। তাই প্রকৃতিবাদী চিন্তার প্রকাশ ছিল সে যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। মধ্যযুগে মানুষ সম্পূর্ণ রূপে অতি প্রাকৃত দৈবশক্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। দেবতা নির্ভর ধর্ম বিশ্বাস ক্রমশ ধর্মান্ধতা এবং কুসংস্কারের যুক্তিহীন আচার সর্বস্বতায় সমাজকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। পৃথিবীর সব সভ্য সমাজের ইতিহাসে এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

ভারতে বার বার বিদেশী আক্রমণের ফলে অবস্থা খুব করুণ হয়ে উঠে। ধর্মীয় অন্ধ বিশ্বাস যুক্তি, বিচার এবং মনুষ্যত্ব বোধকে ধ্বংস করে ফেলে।

এইরকম পরিস্থিতিতে ইউরোপের বণিকদের রাজশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা

লাভ নতুন যুগের সূত্রপাত ঘটিয়েছে। ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে গেলেও **ফরাসীরা** ভারত ছেড়ে চলে যায় নি। চন্দননগর এবং পন্ডিচেরীতে নিজেদের **অবস্থান মজবুত** করে ভারতে বাণিজ্য সংযোগ রক্ষা করেছে। পর্তুগীজরাও ছোট্ট রাজ্য **গোয়াতে শক্ত** ঘাটি করে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক চালিয়ে গেছে। গোয়া-দমন-দিউ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চল হলেও সমুদ্রের তীরবর্তী বলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

কলকাতা ভারতের রাজদানী হবার ফলে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রভাবে কলকাতাকে কেন্দ্র করেই নবজাগরণের ঢেউ সৃষ্টি হয়েছিল এটা যেমন সত্য, তেমনি বাংলার মাটিতে যুগের প্রয়োজনে অসাধারণ প্রতিভাশালী মহান পুরুষদের আবির্ভাবের ফলেই নবজাগরণ এক জাতীয় আন্দোলনের রূপ নিয়েছিল এটাও তেমনি সত্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই, ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিযাম কলেজ এবং ১৮০১ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুবে মিশনারীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হবার ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনের এক বলিষ্ঠ পথ তৈরী হয়। প্রথমটিব লক্ষ্য ছিল ইংরেজ কর্মচাবীদের দেশীয় ভাষা, সংস্কৃতি ও ইতিহাসেব সঙ্গে পরিচিতি করা এবং দ্বিতীয়টির লক্ষ্য ছিল দেশীয় ভাষায় বাইবেল প্রচার করে খৃষ্ট ধর্মেব প্রতি আকৃষ্ট করা।

কার্ল মার্ক্সের বিচারে ভাবতে বৃটিশ শাসন শাপে বব হয়েছিল। এখানেই আমরা তার যর্থার্থ পরিচয় পাই। বৃটিশ স্বার্থে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভারতে নব যুগের ভাব-তরঙ্গ সৃষ্টি করেছিল। এটা তাদের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল ছিল না।

প্রজাদের খুশী করার জন্য ইংরেজ সরকার মুসলমানদের জন্য কলকাতা মাদ্রাসা, হিন্দুদের জন্য-সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করেছিল। আবার নতুন যুগের শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টির জন্য বিত্তবানদের দাবী মেনে নিয়ে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় অনুমোদন দিয়েছিল।

রামমোহন চেয়েছিলেন সর্বত্র আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠুক। রামমোহনের প্রধান কাজ ছিল যুক্তিবাদী চিন্তা ধারার বিস্তার ঘটানো। বিবেক

বুদ্ধিকে জাগ্রত করাই ছিল মূল লক্ষ্য। এটাই ছিল নবজাগরণের মূল ভিত্তি।

বিদ্যাসাগর ছিলেন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র আর মধুসূদন ছিলেন হিন্দু কলেজের ছাত্র। একই বিল্ডিং এর দুইদিকে দুই ধরনের শিক্ষা চালু করা হয়েছিল। রামমোহনের যখন মৃত্যু হয় তখন বিদ্যাসাগরের বয়স ছিল তের বছর এবং মধুসূদনের বয়স ছিল ৯ বছর। তখন কেউ ভাবতেই পারেনি যে একই বিল্ডিং এর দুই শিক্ষা কেন্দ্রে নবজাগরণের দুই মহানায়ক একই সঙ্গে বেড়ে উঠছে।

মধুসূদন ছিলেন সেকালের কলকাতার বিখ্যাত আইনজীবী এবং যশোর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামের সম্ভ্রান্ত জমিদার রাজনারাযণ দত্তের একমাত্র পুত্র। হিন্দু কলেজে অত্যন্ত বিলাসী এবং বেহিসেবী ছাত্ররূপে পরিচিত হয়েছিলেন মধুসূদন। ছাত্র হিসেবেও ছিলেন সকলের সেরা। প্রথম বছরেই শেক্সপীয়ারের কবিতা আবৃত্তি করে পুরস্কার লাভ করেন।

অন্যদিকে বিদ্যাসাগর ছিলেন সংস্কৃত কলেজের সেরা ছাত্র এবং বীরসিংহ গ্রামের এক অখ্যাত দরিদ্র ব্রাহ্মণের বড় সন্তান। তিনিও প্রথম বছরেই মেধা বৃত্তি লাভ কবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

বিদ্যাসাগরের মধ্যে ব্যক্তিগত উচ্চাকাংক্ষা ছিল না। তাঁর জীবনের লক্ষ্য ছিল সমাজ সেবা, শিক্ষা বিস্তার এবং মানুষের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করা।

কিন্তু মধুসূদনের মধ্যে ব্যক্তিগত উচ্চকাংক্ষা ছিল অত্যন্ত প্রবল। তিনি বন্ধুদের কাছে বলতেন, তিনি বিশ্ব বিখ্যাত কবি হবেন।

মাতৃভাষা বাংলার যে দৈন্য দশা তিনি দেখেছেন তাতে মাতৃভাষায সাহিত্য রচনার কথা তিনি ভারতেই পারেন নি। এর জন্য পরবর্তীকালে যে বিবেক যন্ত্রনা ভোগ করেছেন তা বঙ্গভাষা নামে একটি চতুর্দশপদী কবিতায় অমর করে গেছেন। কবিতাটি অনেকের জানা তবু নতুন প্রজন্মের বন্ধুদের জন্য কবিতাটি উদ্ধৃত করছি।

বঙ্গভাষা

হে বঙ্গ ভান্ডারে তব বিবিধ রতন,-
তা সবে, অবোধ আমি অবহেলা করি,
পরধন লোভে মত্ত করিনু ভ্রমন

পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষনে আচরি।
অনিদ্রায় নিরাহারে সঁপি কায়, মন
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি;
কেলিনু শৈবালে; ভুলি কমল কানন।
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে,
ওরে বাছা মাতৃ-কোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি অজ্ঞান তুই, যারে ফিরি ঘরে!
পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষা রূপে খনি পূর্ণ মণি জালে।

মাইকেল মধুসূদনের এই কবিতা মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করে যারা বিদেশী ভাষায় প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টা করে তাদের প্রতি এক সতর্ক বাণী।

এই চতুর্দশপদী কবিতার বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি লাইনে চৌদ্দটি অক্ষর থাকবে এবং চৌদ্দটি লাইনে বক্তব্য শেষ হবে। বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের এটাও একটা বড় অবদান। এ সব কবিতাই বাংলা কবিতাকে বিশ্ব সাহিত্যের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত ছিল।

হিন্দু কলেজে ৬ বছর পড়াশোনা করে মধুসূদন হঠাৎ একদিন অন্তর্ধান করলেন। একমাত্র পুত্রের নিখোঁজ হয়ে যাবার ঘটনায় পিতা-মাতা দু:খে ভেঙ্গে পড়লেন।

কিছুকাল আত্মগোপন করে থাকার পর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করে মধুসূদন জানালেন যে, তিনি খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছেন। এই খবর জানার পর মধুসূদনের পিতা-মাতা একমাত্র পুত্রের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করলেন।

সেকালে হিন্দু কলেজে শুধু হিন্দু ছেলেরাই ভর্তি হতে পারতো। পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ হবার পর সকলের জন্য দরজা খুলে যায়।

মধুসূদন পূর্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী বিশপস কলেজে ভর্তি হলেন। পিতা-মাতার উদার হস্তে অর্থ প্রদান বন্ধ হয়ে গেল। বিলাসী জীবন বিপন্ন হল।

মদুসূদনকে উচ্চ শিক্ষার জন্য লন্ডন পাঠানো হবে বলে প্রলোভন দেখানো

হয়েছিল। মধুসূদন বিশ্বাস করতেন একবার লন্ডন পৌঁছাতে পারলে ইংরেজী ভাষায় কবিতা লিখে বিশ্বখ্যাতি অর্জন করতে পারবেন। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হলো না।

আর্থিক অনটন প্রবল হয়ে উঠায় তিনি মাদ্রাজে গিয়ে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজের হাইস্কুল শাখায় ইংরেজী শিক্ষকের পদে চাকুরী নিলেন। সেখানে রেবেকা নামের এক বিদেশী মহিলাকে তিনি বিয়ে করলেন। মাদ্রাজে বসে--ক্যাপটিভ লেডী নামে একটি গ্রন্থ রচনা করে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকা বন্ধুদের কাছে বই পাঠালেন। বহু ইংরেজ বন্ধু এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছেও বই পাঠালেন। কিন্তু কারো কাছ থেকেই কোন প্রশংসা সূচক চিঠি পাওয়া গেল না।

মধুসূদন ভাবলেন এদেশে এরূপ লেখার সঠিক মূল্যায়ন হবে না। লন্ডনের বিদগ্ধ মহলে পৌঁছাতে পারলেই প্রকৃত মূল্যায়ন হবে।

মনের উদ্দাম আবেগে মধুসূদন অস্থির হয়ে উঠলেন। স্ত্রী রেবেকার সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে গেল। অচিরেই তিনি এমিলিয়া হেনরিয়েটা নামে এক ফরাসী মহিলাকে বিয়ে করলেন। এই মহিলা কবির বিশাল প্রতিভার জন্য গর্ববোধ করতেন। যে কোন দুঃখ বরণ করতে মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন। দু:সময়ে বহুদিন অনাহারে থেকেও স্বামীর সেবা-যত্ন করেছেন। শেষদিন পর্যন্ত স্বামীর কাছে থেকে চরম দুঃখ দুর্দশা মেনে নিয়েই অকাল মৃত্যু বরণ করেছিলেন।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে মধুসূদনের মা জাহ্নবী দেবীর মৃত্যু হয়। রামমোহন গোপনে এসে বাবার সঙ্গে দেখা করেন। সেকালে হিন্দু সমাজে ধর্মীয় গোঁড়ামী এত কঠিন ছিল যে প্রকশ্যে খৃষ্টান পুত্রের সঙ্গে হিন্দু পিতার সম্পর্ক রাখা সম্ভব ছিল না।

চার বছর পরে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে মধুসূদনের পিতা রাজনারায়ণ দত্তের মৃত্যু হয়। একমাত্র পুত্র যাতে তার সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করতে পারে সেরূপ ব্যবস্থা করে যান। কিন্তু গ্রামের জমিদারী নিয়ে পারিবারিক গোলযোগ দেখা দেয়।

মধুসূদন কলকাতায় এসে পুলিশ আদালতে হেড ক্লার্কের চাকুরী নিলেন। এক বছরের মধ্যেই অনুবাদকের পদে প্রমোশন পেলেন। সেকালের কলকাতায় তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ অনুবাদক।

এই সময় পাইক পাড়ার রাজ পরিবারের সঙ্গে মধুসূদনের পরিচয় হয়। রাজবাড়ীতে অভিনয়ের জন্য রত্নাবলী নাটকটি ইংরেজীতে অনুবাদ করে দেবার জন্য মধুসূদনকে অনুরোধ করা হয়। ইংরেজী নাটক দেখে ইংরেজ বন্ধুরাও খুব খুশী হন।

মধুসূদন বাংলা ও সংস্কৃত নাটকের দুরবস্থা লক্ষ্য করে এই সময় **শর্মিষ্ঠা** নাটক রচনা করেন। শেক্সপীয়ারের আদর্শে ভারতীয় কাহিনী এবং সামাজিক পরিবেশ বজায় রেখে শর্মিষ্ঠা নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। এই নাটক সারা কলকাতায় সাড়া জাগিয়ে দেয়। সৃষ্টি হয় বাংলা নাটকে নবজাগরণের ধারা।

বেলগাছিয়া থিয়েটারে শর্মিষ্ঠা নাটক আভিনয়ের পর নতুন ধরনের নাটক রচনার জন্য বন্ধুরা অনুরোধ করেন। কলকাতার সমাজ চিত্র ফুটিয়ে তোলার জন্য- **একেই কি বলে সভ্যতা?** এবং **বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ**- নামে দুখানা প্রহসন নাটক লিখেন। এ দুটি নাটক কলকাতার সমাজ জীবনে প্রচন্ড শিহরন সৃষ্টি করে। শিক্ষিত মানুষের বিবেক বুদ্ধিকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়।

এভাবেই বাংলা নাটকে নবজাগরণেব জোয়ার সৃষ্টি হল। পদ্মাবলী, কৃষ্ণকুমারী, মায়া কানন মধুসূদনের নাটক রচনার ধারায় একে একে প্রকাশিত ও অভিনীত হল।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে মধুসূদন পৈতৃক সম্পত্তির আংশিক অধিকার পেলেন। আর্থিক সংস্থান সৃষ্টি হবার ফলে স্বাধীন পেশা হিসেবে ব্যারিষ্টারী পড়ার কথা ভাবলেন। এই সময় পাদ্রী লং সাহেবের অনুরোধে নীলদর্পণ নাটকের ইংরেজী অনুবাদ করে প্রশংসা লাভ করেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রথম কাব্য গ্রন্থ- **তিলোত্তমা সম্ভব**- গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। বাংলা কাব্য ছন্দের প্রচন্ড শক্তি দেখে শিক্ষিত সমাজে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হল।

এক বছর পরেই প্রকাশিতহল মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য- **মেঘনা দ বধ**। তারপরের বছর প্রকাশিতহল **ব্রজাঙ্গনা কাব্য**। মধুসূদনের কবিখ্যাতি দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো।

মধুসূদনের মেঘনাদ বধ কাব্য- ভারতীয় চিন্তার জগতে এক-বিপ্লব ঘটিয়ে

দিয়েছে। শত শত বছর ধরে ভারতবাসীর মনে রামায়ণের রামচন্দ্র একজন অবতার রূপে পরম শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। আজো অযোধ্যার রাম মন্দিরকে ঘিরে রাজনীতির খেলা চলছে নানা কৌশলে। রাম চরিত্রের সঙ্গে হিন্দু সমাজের পরিবার জীবনের আদর্শও জড়িয়ে আছে।

মধুসূদন রাম চরিত্রের এই আদর্শকেই আঘাত করেছেন। মহাকাব্যের নায়ক করেছেন রাক্ষস রাজ রাবনকে। অন্যদিকে রামচন্দ্রের নানা কূটনীতি ও হীনতাকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন।

সংস্কৃত রামায়ণে রাবনের লংকাপুরীর যে বর্ণনা রয়েছে তাকে অনুসরণ করেই মধুসূদন দেখালেন যে, রাবন ছিলেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ অনার্য রাজা। বীরত্বে, ঐশ্বর্যে, মানসিকতায় রাবনের তুলনা নেই। রাবনের পুত্র ও ভাইয়েরা সকলেই ছিল মহাবীর এবং ধর্মপরায়ণ। দেবতার বরে তারাও ছিলেন বলীয়ন।

রাবনের প্রিয় ছোটবোন সূর্পনখা রাম লক্ষ্মণের কাছে প্রেম নিবেদন করার অপরাধে তলোয়ারের আঘাতে তার নাক কেটে দেওয়া বীরত্বের পরিচয় নয়। সে যুগে পুরুষের একাধিক স্ত্রী রাখার প্রচলিত রীতি ছিল।

এই অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবার জন্য রাবন যে পথ বেছে নিয়েছিলেন মধুসূদন তাও সমর্থন করেন নি। কিন্তু লংকারপুরী ধ্বংস করে রাবনকে যুদ্ধে পরাজিত করার জন্য, রামচন্দ্র যে পথ অনুসরণ করেছেন তাও সমর্থন করেন নি।

সীতাকে উদ্ধার করার জন্য সুগ্রীবের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করা প্রয়োজন এবং মহাবীর বালীকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে সুগ্রীবকে রাজা করা, অবতাররূপী রামচন্দ্রের পক্ষে কোন যুক্তিতেই সমর্থন যোগ্য নয়।

লংকাপুরীতে রাবনের ভাই বিভীষণের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে যেভাবে বিভীষনের সাহায্যে লংকার সমস্ত গোপন তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং রাবনকে পরাজিত করার অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করা হয়েছে তাও কিছুতেই সমর্থন যোগ্য নয়। **তাই মধুসূদন রামভক্ত বিভীষণকে বিশ্বাসঘাতক রূপে চিহ্নিত করেছেন।**

বিভীষণের বিশ্বাসঘাতকতা এবং মহাবীর লক্ষ্মণের কাপুরষতা নিকুম্বিলা

যজ্ঞাগারে পূজারত অবস্থায় নিরস্ত্র মেঘনাদকে অন্যায় যুদ্ধে বধ করার মধ্যে স্পষ্ট রূপে তুলে ধরেছেন মধুসূদন। এই দৃশ্যটিই মেঘনাদ বধ কাব্যের প্রাণ স্বরূপ। এখানেই মহাকাব্যিক আবেগে আপ্লুত হয়ে যায় পাঠকের মন।

মেঘানাদবধ কাব্যটি সম্পূর্ণ অমিত্রাক্ষর চন্দে রচিত হয়েছে। কাব্যের প্রয়োজনে শত শত নতুন শব্দ সৃষ্টি করেছেন মধুসূদন। অবশ্য কবি বলেছেন যে,- তিনি চিন্তাভাবনা করে নতুন কোন শব্দ সৃষ্টি করেন নি। কাব্যের আবেগে তৈরী হয়েছে নতুন নতুন শব্দ।

মহাকাব্যের আরেকটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান হল উপযুক্ত উপমা। মেঘনাদ বধ কাব্যে মধুসূদন অসংখ্য উপমা ব্যবহার করেছেন। সবই তৈরী হয়েছে রামায়ণ মহাভারতের বিভিন্ন ঘটনা থেকে।

ছোট বেলায় মধুসূদন মায়ের কাছে গভীর মনোযোগ দিয়ে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী শুনেছেন। বড় হয়ে গভীর আগ্রহে রামাযণ-মহাভারত এবং কালিদাসের রচনাবলী পাঠ করেছেন। ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ করেছেন।

তিলোত্তমা সম্ভব এবং মেঘনাদবধ দুইটি কাব্যই মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখেছেন। কাব্যের প্রয়োজনে গুরুগম্ভীর শব্দ প্রয়োগ এবং নতুন শব্দ সৃষ্টিতে অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। উপযুক্ত উপমা সৃষ্টিতেও অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

অন্যদুটি কাব্য বীরাঙ্গনা এবং ব্রজাঙ্গনায় মিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেও তিনি নিজের দক্ষতার প্রমান রেখেছেন।

মধুসূদন উচ্চাকাংক্ষা পূরণের আশায় খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ধর্মান্তরিত হবার পর খৃষ্টান পাদ্রীদের উদাসীনতায় মর্মাহত হয়েছিলেন। সেকালে হিন্দুধর্ম একবার ছেড়ে গেলে আর ফিরে আসার উপায় ছিল না। সুযোগ থাকলে মধুসূদন পরবর্তী সময় হয়তো আবার হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করতেন।

মধুসূদনের সমস্ত কবিতা, কাব্য, নাটক, সনেট প্রহসন বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাব মধুসূদন হিন্দু সভ্যতার প্রাচীন ঐতিহ্যকেই নব যুগের উপযুক্ত

করে জাতীয় জীবনে নবজাগরণের ঢেউ সৃষ্টি করেছেন।

মেঘনাদ বধ কাব্যে রাবনের বেদনাহত হৃদয়ের বিলাপের মধ্যেও সান্ত্বনার বাণী হিসেবে দেশ প্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। বীর পুত্র বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদে মর্মাহত রাবন অবিরাম অশ্রু বিসর্জন করেও বলেছেন---------

"যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ, কুমার
প্রিয়তম, বীরকুল সাধ এ শয়নে
সদা! রিপুদলবলে দলিয়া সমরে
জন্মভূমি রক্ষা হেতু কে ডরে মরিতে?

দেবরাজ ইন্দ্রকে যুদ্ধে পরাজিত করে মেঘনাদের নাম হয় ইন্দ্রজিৎ। মেঘের আড়ালে থেকে মেঘের মত গর্জন করে শত্রুশিবিরে ত্রাস সৃষ্টি করতেন বলে মেঘনাদ নাম প্রচলিত হয়েছিল। এই মহাবীর পিতার নির্দেশে নিকুম্বিলা যজ্ঞাগারে পূজা সমাপন কবে পরদিন লক্ষ্মণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাবেন এ খবর শুনে বামচন্দ্রের শিবিরে ত্রাস সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ এরকম যুদ্ধে দেবতার বরে বলিয়ান মেঘনাদকে পরাজিত করা অসম্ভব।

দেশদ্রোহী বিভীষণ রামচন্দ্রকে পরামর্শ দেন, নিরস্ত্র অবস্থায় মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে মেঘনাদকে বধ করতে হবে।

নিকুম্বিলা যজ্ঞাগারে যাবার একমাত্র গোপন পথটি রাবন, বিভীষণ এবং মেঘনাদ ছাড়া আর কারো জানা ছিল না। মন্দির পাহারায় নিযুক্ত ছিল শত শত মহাবীর রাক্ষস প্রহরী। লক্ষ্মণ বিভীষণের পরামর্শে মায়াদেবীর পূজা করে অদৃশ্য হয়ে মন্দিরে প্রবেশ করার শক্তি অর্জন করেন। বিভীষণ এখানে শুধু পরামর্শদাতা এবং পথ প্রদর্শকই ছিলেন না, বিশাল খড়গ হাতে নিয়ে মন্দিরের দ্বারে প্রহরীর ভূমিকাও নিয়েছিলেন।

শত শত বছর ধরে রামায়ণ ও মহাভারতকে কেন্দ্র করে ভারতীয় হিন্দু সমাজে যে বিশ্বাস ও সংস্কার প্রচলিত হয়েছে তাকে বাস্তবতার বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে যুক্তিবাদী সংস্কারে রূপান্তরিত করার এক মানসিক বিপ্লব ঘটিয়েছেন

মধুসূদন মেঘনাদ বধ কাব্যের মাধ্যমে।

শিক্ষিত সমাজ অন্ধ বিশ্বাস থেকে মুক্তির রাজ্যে প্রবেশ করেছে মেঘনাদ বধ কাব্য পাঠ করে। এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে বিবেকের জাগরণ।

রামমোহন রায় ধর্মীয় শাস্ত্র বিশ্লেষণ করে যুক্তিবাদী চিন্তার সূচনা করেছেন। বিদ্যাসাগর শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে যুক্তিবাদী বিবেক সৃষ্টি করেছেন। মধুসূদন ভারতীয় মহাকাব্যের বাস্তব চিত্র বিশ্লেষণ করে বিবেক বুদ্ধির নবজাগরণ ঘটিয়েছেন।

মেঘনাদ বধ কাব্য মধুসূদনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি এবং বাংলা মহাকাব্যের প্রথম ও শেষ সৃষ্টি। অকাল মৃত্যু না হলে মধুসূদন আরো কয়েকটি মহাকাব্য রচনা করে বাংলা সাহিত্যের গৌরব আরো বৃদ্ধি করতে পারতেন এতে কোন সন্দেহ নেই।

তবে এদেশের নবজাগরণে মেঘনাদ বধ কাব্যটি যে অতুলনীয় চিন্তাশক্তি ও বিচারবুদ্ধি সঞ্চারিত করেছে তাই কবি মধুসূদনকে অমরত্ব দানের পক্ষে যথেষ্ট।

বাংলা নাটকে এবং কবিতার রূপ, ভাব ও ছন্দে মধুসূদনের অবদান ও ভারতীয় নবজাগরণে বিপুল শক্তি ও আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন,- কাল সুপসন্ন, সুপবন বহিতেছে দেখিয়া পতাকা উড়াইয়া দাও, তাহাত নাম লেখ শ্রী মধুসূদন। রবীন্দ্র নাথ বলেছেন,- মেঘনাদ বধ-বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কাব্য। মেঘনাদ বধ কাব্যে মধুসূদন যুক্তিতর্কে ও জ্ঞানের বিচারে স্বাধীন চিন্তার বিকাশ ঘটিয়েছেন। এটা শুধু রাম-রাবনের কাহিনী নয়। এটা ছিল নতুন যুগের মানবতাবাদী আদর্শের প্রতিষ্ঠা।

আধুনিক বাংলা ছন্দের প্রবর্তক মধুসূদন

বাংলা পদ্য সাহিত্যের ইতিহাস দীর্ঘ। দশম শতাব্দীতে রচিত 'চর্যাপদ' আবিষ্কৃত হবার পর বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক যুগ শুরু হয়। তার আগে সাহিত্যের রূপ কেমন ছিল তা জানার উপায় নেই। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও রাষ্ট্র বিপর্যয়ের ফলে বাংলা সাহিত্যের অতীত ইতিহাস প্রায় অবলুপ্ত।

চর্যাপদের যুগ থেকে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, শাক্ত পদাবলী, বৈষ্ণব পদাবলী, চৈতন্য চরিত, মঙ্গলকাব্য, ইত্যাদি পদ্য সাহিত্যে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে।

মুসলমান আগমনের পূর্ববর্তী সাহিত্য মাগধী অপভ্রংশ ভাষার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ঐ সময় বাংলা-আসাম-উড়িষ্যার ভাষারূপ প্রায় একরকম ছিল।

মুসলমান আগমনের পর মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য নিজস্ব পৃথক ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। শাক্ত পদাবলী এবং বৈষ্ণব পদাবলী অতি উন্নত সাহিত্যে পরিনত হয়েছে।জীবনী কাব্য, অনুবাদ কাব্য, মঙ্গলকাব্য সৃষ্টিতে প্রতিভাশালী কবিদের আবির্ভাব ঘটেছে। চন্ডিদাস, রামপ্রসাদ, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, কৃত্তিবাস, মালাধর বসু, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী,দৌলত কাজী, সৈয়দ আলাওল, লালন ফকীর, ও কমলাকান্তের মত শক্তিমান কবিরা মধ্যযুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এ যুগের শেষ পর্বে ভারত চন্দ্র ও ঈশ্বর গুপ্ত আবির্ভূত হন। এই সময় সংস্কৃত ভাষা ছিল অভিজাত শ্রেণীর ভাষা। সাধারণ মানুষ যাতে সহজে সাহিত্যের ভাষা না বুঝতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে সংস্কৃত পন্ডিতরা সংস্কৃত ভাষাকে যতটা সম্ভব জটিল ও কঠিন করে তুলতেন।

গৌতম বুদ্ধ সংস্কৃত ভাষার বিকল্প হিসেবে জনগণের ভাষায় ধর্মচর্চা শুরু করেন।

বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ছিল খুবই বেশী। এ জন্যই বাংলা পদ্য সাহিত্য শুরু থেকেই সহজ সরল ভাষায় জনগণের বোধগম্য করে কবিরা রচনা করেছেন।

চর্যাপদ ধর্মতত্ত্বের কথা বললেও সামাজিক বৈচিত্র্যের চিত্রায়নে কবিরা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

সেই প্রাচীন যুগ থেকেই বাংলা সাহিত্যে পয়ার ছন্দে কবিতা রচনা শুরু হয়েছে। সাধারণ মানুষ যাতে কবিতার ভাব ও ভাষা সহজেই বুঝতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই কবিরা কবিতা বচনা করেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পয়ার ছন্দই ছিল বাংলা কবিতার প্রধান ছন্দ।

রামায়ণ এবং মহাভারতের মত মহাকাব্য বাংলায় রচিত হয়েছে পয়ার ছন্দে। সহজ - সরল ভাষায় ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে পয়ার ছন্দের তুলনা নেই।

বাংলা কবিতার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল, সুর সংযোগ করে সঙ্গীতের মাধ্যমে কবিতাকে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার করার উপযোগী করার চেষ্টা। এর ফলে বাংলা কবিতা সঙ্গীতের মতই তাল, লয়, ছন্দ অনুসরণ কবেছে।

বহু কবিতায় কবিরাই সুব এবং তাল নির্দেশ করেছেন। এমন কি কোন রাগ রাগিনীতে গাইতে হবে তারও উল্লেখ করেছেন।

এ জন্যই বাংলা কবিতায় মাত্রাজ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক হযেছে। যেমন কবিতাটি দাদরা তালের জন্য রচিত হলে ৩+৩ মাত্রায় পর্বভাগ করতে হবে অর্থাৎ চরণের পর্বগুলো ৬ মাত্রার হবে। এভাবে বিভিন্ন তালের মাত্রা বিভাগ অনুযায়ী কবিতার পর্বে মাত্রা বিভাগ হবে।

আরেক ধরনের ছন্দ বাংলার গ্রামে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল, যার আধুনিক নাম দেওয়া হয়েছে ছড়ার ছন্দ। দ্রুত লয়ে উচ্চারণ করতে হয় বলে এ ছন্দে সাধারনতঃ ৪ মাত্রার পর্ব বিভাগ করা হয়।

তাছাড়া গম্ভীর বিষয়ে বিলম্বিত লয়ে কবিতা রচনার জন্য নির্দিষ্ট মাত্রার পর্ব রচনা করতে হয়।

এভাবে দেখা যায় পয়ার ছন্দে দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, আট, দশ মাত্রার পর্ব সৃষ্টি করেন কবিরা। সংস্কৃত ভাষার গাম্ভীর্য বাংলা ভাষায় নেই। তাই সংস্কৃত

কবিতার ছন্দ বাংলা কবিতায় প্রচলিত হয় নি।

ইংরেজ শাসণ প্রতিষ্ঠিত হবার পর ইংরেজী শিক্ষিত যুবকরা ইউরোপের বিচিত্র ধারার ছন্দ ও ভাবের সঙ্গে পরিচিত হলেন। তাদের কাছে বাংলা পয়ার ছন্দ গতানুগতিক মনে হল। ইউরোপীয় কবিতার ছন্দ বাংলা ভাষায় প্রয়োগ করা সম্ভব নয় এরূপ একটি ধারণা সৃষ্টি হবার ফলে ইংরেজী ভাষায় কবিতা লিখে বিখ্যাত হবার স্বপ্ন অনেকের মনেই জেগেছিল।

মধুসূদনও ইংরেজী ভাষায় কবিতা লিখে বিশ্ব বিখ্যাত কবি হবার স্বপ্ন দেখেছিলেন। এবং অনেকগুলো ভাল ভাল কবিতা লিখেছিলেন। ক্যাপটিভ লেডী, ভিশানস অব দি পাস্ট, বইয়ের আকারে ছাপিয়ে খুব প্রশংসা পাবেন আশা করেছিলেন।তখন তিনি ২৫ বছরের যুবক। কিন্তু কোন প্রশংসাসূচক কোন চিঠি কারো কাছ থেকেই পেলেন না।

ঘনিষ্ট ইংরেজ বন্ধুরা পরামর্শ দিলেন মাতৃভাষায় কবিতা লিখে অনায়াসে শ্রেষ্ঠ কবির সম্মান ও মর্যাদা লাভ করা সহজ হবে। কবি প্রতিভাকে মাতৃভাষার গৌরব বৃদ্ধির কাজে লাগানো উচিত।

তখনি কবি মদুসূদন ইংরেজী ভাষার মোহ ত্যাগ করে বাংলা ভাষায় কবিতা রচনার সংকল্প গ্রহণ করেন। আত্ম বিলাপ কবিতায় তিনি বললেন,—

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়,
তাই ভাবি মনে!
জীবন প্রবাহ বহি কাল-সিন্ধু পানে যায়,
ফিরাব কেমনে?
দিন দিন আয়ুহীন, হীন বল দিন দিন,
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না? এ কি দায়!
কবি নিজেই প্রশ্ন করেন—
যশোলোভে আয়ু, কত যে ব্যয়িলি হায়,
কব তা কাহারে?

১৮৫৬ সালে কবি মধুসূদন মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় ফিরে এলেন

মাতৃভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির প্রবল কামনা নিয়ে। বন্ধুদের সাহায্যে পুলিশ আদালতে একটা চাকরী জুটে গেল। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পরেই পৈতৃক সম্পত্তির দাবীদাররা মামলা শুরু করায় মানসিক দিক দিয়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন।

এরকম মনের অবস্থায়ও মধুসূদন সাহিত্য চর্চায় বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে তৃপ্তি লাভ করতেন।

ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করা যায় এমন একটি ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে কাব্য রচনার কথা ভারতে থাকেন। এমন সময় পাইক পাড়ার রাজবাড়ীর বন্ধুদের তাগাদায় মধুসূদনকে ভাবতে হল আধুনিক নাটক সৃষ্টির কথা।

বাংলা সাহিত্যে তিনি আবির্ভূত হলেন একজন নাট্যকার হিসেবে। শর্মিষ্ঠা নাটক লিখে তিনি কলকাতার শিক্ষিত সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করলেন। ১৮৫৯ সালে শর্মিষ্ঠা নাটক প্রকাশিত এবং মঞ্চস্থ হল। কিন্তু কবির মন পড়েছিল কাব্য রচনায়।

১৮৬০ সালে একসঙ্গে দুটো প্রহসন (১) একেই কি বলে সভ্যতা এবং (২). বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ এবং পদ্মাবতী নাটক ও তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য প্রকাশ করলেন।

পরের বছর ১৮৬১ সালে প্রকাশিত হল, মেঘনাদ বধ এবং ব্রজাঙ্গণা কাব্য এবং কৃষ্ণকুমারী নাটক। ১৮৬২ সালে প্রকাশিত হল বীরাঙ্গনা কাব্য।

মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যেই মধুসূদন ঝড়ের বেগে সৃষ্টি করলেন ৪টি কাব্য, ৩টি নাটক ও ২টি প্রহসন। সবগুলো সৃষ্টিই বাংলা সাহিত্যে নতুন আবেগ, নতুন ভাব, নতুন দৃষ্টিভঙ্গী, নতুন প্রকাশভঙ্গী এনেছিল। বাঙ্গালীর বিবেক ও বুদ্ধি নবজাগরণের প্রবাহে আলোড়িত হল। রাজধানী কলকাতা থেকে ক্রমশ তা ছিড়িয়ে পড়তে থাকলো ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে। বাংলা সাহিত্য ভারতের প্রথম আধুনিক সাহিত্যের গৌরব অর্জন করল। আধুনিক ইংরেজী সাহিত্যের অনুকরণে মধুসূদন বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করলেন। কিন্তু বাংলা পয়ার ছন্দের মূল কাঠামো অক্ষুন্ন রাখলেন। যেমন—

প্রাচীন পয়ার ছন্দে আছে

১.মিষ্টান্ন রহিল কিছু / হাড়ির ভিতরে, ১৪অক্ষর

মাথা খাও ভুলিওনা/ খেও মনে করে। ১৪অক্ষর

২. মহাভারতের কথা/ অমৃত সমান, ১৪অক্ষর

কাশীরাম দাস কহে/শুনে পুণ্যবান।। ১৪অক্ষর

পয়ার ছন্দে প্রতি চরণে ১৪টি অক্ষর রয়েছে যতি ও ছেদ একই জায়গায় পড়ছে। দুই চরণের শেষে মিল রয়েছে।

মধুসূদন ১৪ অক্ষরের চরণ ঠিক রেখে যতি ও ছেদকে পৃথক করে দিলেন। তার ফলে অপূর্ব এক ভাবের ঢেউ সৃষ্টি হল। দুই চরণের শেষে মিল বর্জন করে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করলেন যেমন,—

একাকিনী শোকা কুলা/অশোক কাননে ১৪অক্ষর

কাঁদেন রাঘব বাঞ্ছা/ আঁধার কুটিরে ১৪অক্ষর

এখানে দ্বিতীয় চরণের পরে ছেদ না দিয়ে ভাবের গভীরতাকে টেনে আনা হল পরের চরণের প্রথম অংশে। এভাবেই সৃষ্টি হল মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ। ভাবে ও বৈচিত্র্যে অপরূপ এক নৃত্যের ছন্দে মন্দ্রিত হল বাংলাছন্দ।

কবিতার ক্ষেত্রে মধুসূদনের আরেকটি সৃষ্টি চতুর্দশ পদী কবিতা। প্রতি চরনে ১৪ অক্ষর এবং ১৪টি চরণে একটি ভাব ও বক্তব্য শেষ। কবিতাটিতে ৮+৬ দুটি অংশে ভাগ করা হয়। এই রকম কবিতাকে ইংরেজীতে বলে সনেট। বাংলা কবিতায় মধুসূদন সনেট সৃষ্টি করে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিলেন।

ফরাসী দেশের ভার্সাই নগরীতে বসে যখন অর্দ্ধাহারে দিন কাটাতে হচ্ছিল তখনই রচিত হয়েছিল সনেটগুলো। অন্তরের গভীর আবেগ থেকে উৎসারিত হয়েছিল মাতৃভূমির প্রতি গভীর মমতার এবং স্বদেশবাসীর প্রতি গভীর ভালবাসার স্মৃতি খন্ডগুলো। কবির মনে ভয় ছিল, তিনি আর দেশে ফিরে আসতে পারবেন না। তাই বাংলা সাহিত্যের জন্য সৃষ্টি করলেন শতাধিক সনেট যা বাংলা সাহিত্যে অমূল্য সম্পদ রূপে গণ্য হয়েছে।

ইতালীর কবি পেত্রার্ক সর্ব প্রথম বিশ্ব সাহিত্যে সনেট রচনা করেন। মধুসূদন এই কবির আদর্শকেই অনুসরণ করেছেন। পেত্রার্ক এর আদর্শ অনুযায়ী সনেটকে দুইভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম আট পঙক্তিকে বলা হয় অষ্টক এবং দ্বিতীয় অংশের ছয় পঙক্তিকে বলা হয় ষটক

শেক্সপীয়র কিছুটা পৃথক ধরনের সনেট লিখেছিলেন। ৪+৪+৪+২ তিনটি চার পঙক্তির স্তবক এবং শেষের ২ পঙক্তিতে সমাপ্তি।

মিলটনও কিছুটা পৃথক ধারা সৃষ্টি করেছেন। সর্বক্ষেত্রে পেত্রার্ক এর গঠনরীতি মানেন নি। মধুসূদন পেত্রার্ক এর গঠনরীতি অনুসরণ করেছেন কিন্তু ছন্দের ক্ষেত্রে শেক্সপীয়ারকে অনুসরণ করেছেন । বঙ্গভাষা কবিতাটি হল এর প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এ রকম আরো কয়েকটি কবিতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- কবি, বিজয়া দশমী, কোজগর লক্ষীপূজা, আশ্বিন মাস।

সনেটের মধ্যে কবি নিজের হৃদয়ের দ্বার খুলে দিয়ে প্রাণের গীতিকা গেয়ে যাবার স্বাধীনতা পান। তাই এগুলোকেও গীতি কবিতা বলা হয়।

বিদেশের মাটিতে বসে স্বদেশের জন্য যখন কবির প্রাণ কেঁদে কেঁদে আকুল হয়েছে তখনি কবির হৃদয় থেকে একের পর এক ঢেউয়ের মত চতুর্দশ পদী কবিতাগুলো বেরিয়ে এসেছে। এসব কবিতার মধ্যেই কবি মধুসূদনের প্রকৃত স্বদেশপ্রীতির পরিচয় ফুটে উঠেছে। কবি নিজের দেশকে, দেশের মানুষকে এবং দেশের প্রকৃতিকে কত গভীরভাবে ভালবাসতেন তারই খন্ড খন্ড চিত্র ফুটে উঠেছে সনেটগুলোতে।

যে সব কবিতায় দেশের কবিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন সেগুলোতে কবি হৃদয়ের আন্তরিকতা ভাবের উচ্ছ্বাসে, অলংকার সৌন্দর্যে সার্থক ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। যেমন--- কৃত্তিবাস, কাশীরামদাস, জয়দেব, কালিদাস ইত্যাদি কবিতায় কবি মধুসূদনের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অবারিত রূপ নিয়েছে।

আধুনিক বাংলা নাটকের প্রবর্তক মধুসূদন

মধুসূদনের সময় কলকাতায় পেশাদার নাট্যমঞ্চ ছিল না। বিত্তবান ব্যক্তিরা শৌখিন যাত্রাদল তৈরী করে যাত্রাভিনয় করতেন। গ্রামাঞ্চলে কবিগান, লীলাকীর্তন, যাত্রাগান ও চপযাত্রা অভিনয় ইত্যাদি প্রচলিত ছিল।

নবজাগরণের প্রভাবে ইংরেজ সাহেবদের অনুকরণে নাট্যমঞ্চ তৈরী করে নাটক করার উদ্যোগ যখন শুরু হয়, মধুসূদন তখন কাব্য ভাবনায় মশগুল। তিনি হতে চান শ্রেষ্ঠ কবি। নাটক নিয়ে ভাবনা চিন্তা মাথায় আসেনি।

তখনকার কলকাতায় ইংরেজ সাহেবরা নিজেদের বিনোদনের জন্য নাট্যাভিনয করতো। কিন্তু সেখানে নেটিভদের প্রবেশাধিকার ছিল না।

পাইক পাড়ার রাজ পরিবারের দুই ভ্রাতা প্রতাপচন্দ্র সিংহ এবং ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ পাশ্চাত্য ধারায় নাটক করার জন্য খুবই আগ্রহী হয়ে উঠেন। ছাতুবাবুর বাড়ীতে শকুন্তলা নাটকের অভিনয় দেখতে এসে স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর একটি স্থায়ী নাট্যমঞ্চ গড়ার প্রস্তাব দেন। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ তখনি তা অনুমোদন করেন।

বেলগাছিয়া বাগান বাড়ীতে তৈরী হল সুদৃশ্য নাট্য মঞ্চ। কিন্তু আধুনিক যুগের উপযোগী কোন নাটক খুঁজে পাওয়া গেল না। বাংলায় কোন নাটক না পেয়ে সংস্কৃত রত্নাবলী নাটকটি নিয়ে কাজ শুরু হল।

ইংরেজদের আসরে নেটিভরা উপেক্ষিত হলেও বাঙ্গালী বাবুদের আসরে ইংরেজ সাহেবদের আনন্ত্রণ করে আনা হতো। ইংরেজ উচ্চ পদস্থ অফিসাররা ভদ্রতার খাতিরে এসব অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন। তাদের খুশী করার জন্য সব রকম আয়োজন করা হতো। কিন্তু তারা দেশীয় ভাষায় নাটকের কথাবার্তা বুঝতে পারতেন না।

এজন্যই রত্নাবলী নাটকের ইংরেজী অনুবাদ করার জন্য মধুসূদনকে

অনুরোধ করা হল। মধুসূদন একজনকে বললেন, নাটকটা পড়ে যাও। তিনি শুনতে শুনতেই এক রাত্রের মধ্যেই পুরো নাটকটির অনুবাদ করে ফেললেন। বন্ধুরা একান্ড দেখে অবাক হলেন। আর ইংরেজ সাহেবরা মধুসূদনের অনুবাদের ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হলেন।

মধুসূদন বাল্যকাল থেকেই ইংরেজী মাধ্যমে পড়াশোনা করেছেন। তাই বাংলা ভাষায় ভাল করে লিখতে পারতেন না। অথচ দুই বছরের মধ্যেই বাংলা ভাষা আয়ত্ত করে বাংলা সাহিত্যে বিপ্লব ঘটালেন।

তখনকার দিনে নাট্যমঞ্চে পৃথক পৃথক দৃশ্য দেখাবার জন্য আলোর বৈচিত্র্য ছিল না। মঞ্চটি ঘুবিয়ে ঘুরিয়ে দৃশ্য পরিবর্তনের ব্যবস্থাও ছিল না। একটি বড় মঞ্চকে তিন ভাগ করে পর পর দৃশ্য পরিবর্তনের সময় দর্শকদের স্থান পরিবর্তন করে ঘুরে ঘুরে বসতে হতো।

এসব নাট্যানুষ্ঠানে প্রচুর টাকা খরচ হতো। মধুসূদন একদিন বন্ধু গৌরদাস বসাককে বললেন, অতি সাধারণ নাটকের জন্য এত টাকা খরচ করা অর্থহীন।

গৌর দাস বললেন, ভাল নাটক না পেলে কি করা যাবে। আমরা তো অনন্তকাল একজন ভাল নাট্যকারের জন্য অপেক্ষা করতে পাবি না!

মধুসূদন বললেন, তাহলে আমাকেই নাটক লিখতে হবে।

একথা শুনে বন্ধুবা হেসে উঠলেন। কারণ তখনো মধুসূদনের বাংলা জ্ঞান সম্পর্কে তাদের সন্দেহ ছিল।

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, অল্প দিনের মধ্যেই মধুসূদন শর্মিষ্ঠা নাটকের দুটি দৃশ্য লিখে বন্ধুদের সামনে হাজির করলেন। বন্ধুরা সব বিস্মিত হল। দুই রাজ ভ্রাতা দারুন উৎসাহিত হলেন। কবি মধুসূদন নাট্যকাররূপে আবির্ভূত হলেন।

এর আগে শ্যামবাজারে নবীনচন্দ্রবসুর বাড়ীতে-বিদ্যাসুন্দর, চড়কডাঙ্গার জয়রাম বসাকের বাড়ীতে-কুলীন কুলসর্বস্ব,- এবং ছাতুবাবুর বাড়ীতে-শকুন্তলা নাটক অভিনীত হয়েছিল। কালী প্রসন্ন সিংহের বাড়ীতে বেনী সংহার নাটক অভিনীত হয়েছিল। মধুসূদন অতি দ্রুত শর্মিষ্ঠা নাটক রচনা সম্পন্ন করলেন। মহা উৎসাহে বন্ধুরা এসে জড়ো হলেন নাটক মঞ্চস্থ করার আয়োজন করতে। রাজ ভ্রাতারা প্রচুর টাকা খরচ করে বিশাল মঞ্চের আয়োজন করলেন। শহরের

শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের অভিনয়ের জন্য আমন্ত্রণ করে আনলেন। বহু ইংরেজ সাহেব নিমন্ত্রিত হয়ে এলেন। শুরু হল বাংলা নাটকের নতুন যুগ।

শর্মিষ্ঠা নাটকের প্রথম দৃশ্যে দর্শকরা অবাক বিস্ময়ে দেখলেন স্বর্গের অপরূপ অমরাবতী নগরী মঞ্চে উপস্থিত হয়েছে। অপ্সরা, প্রহরী ও উজ্জ্বল সৈনিক বেশে ভীমকায় বীরগণ পায়চারী করছে। প্রকৃতির মধুরভাবে বনচর প্রাণীরা গর্জন করছে। এমন দৃশ্য এর আগে কোন রঙ্গমঞ্চে দর্শকরা দেখেন নি।

পরিচালনায় এবং দৃশ্য সজ্জায় অভিনবত্ব আধুনিকতার সূত্রপাত ঘটিয়েছে। চরিত্র চিত্রনে, কথোপকথনে, ভাষায়, সংগীতে এবং কাহিনী নির্মানে মনোমুগ্ধকর নতুনত্ব এসেছে।

শর্মিষ্ঠা নাটক মহাভারতের যযাতি উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত হয়েছে। কিন্তু মধুসূদন সম্পূর্ণ কাহিনী না নিয়ে নির্বাচিত নাটকীয় অংশটুকু নিয়েই নাটকটি রচনা করেছেন । শর্মিষ্ঠা, দেবযানী, শুক্রাচার্য এবং যযাতি এই চারটি হল শর্মিষ্ঠা নাটকের প্রধান চরিত্র।

মধুসূদন চরিত্র নির্মানে মহাভারতকে সম্পূর্ণ অনুসরণ না করে নিজস্ব চিন্তা ও কল্পনাশক্তি দিয়ে নব যুগের উপযোগী মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন।

শর্মিষ্ঠা চরিত্রই এই নাটকেব শ্রেষ্ঠ চরিত্র। তাই নাটকটির নাম দিয়েছেন শর্মিষ্ঠা। এই নাটক মধুসূদনের প্রথম সৃষ্টি। তাই এর প্রতি গভীর মমতা ও আবেগ জড়িয়ে ছিল। নিজের কন্যার নামও রেখেছিলেন শর্মিষ্ঠা

সংস্কৃত নাটকের ধারা মেনে চলেননি বলে প্রচীনপন্থী পন্ডিতরা মধুসূদনের সমালোচনা করেছেন। কিন্তু মধুসূদনের জনপ্রিয়তার ঢেউ এত বেশী ছিল যে, সমালোচনার ভাষা প্রশংসার উত্তাল তরঙ্গে ভেসে গেছে।

মধুসূদন উৎসাহ এবং প্রেরণা লাভ করার পর অবিলম্বে দ্বিতীয় নাটক রচনায় উদ্যোগী হলেন। প্রথম নাটক শর্মিষ্ঠা লিখেছিলেন ভারতের পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে এবার শুরু করলেন গ্রীক কাহিনীর ছায়া অবলম্বনে পদ্মাবতী নাটক।

গ্রীক পুরানে কলহ দেবী অন্যান্য দেবীদের মধ্যে ঝগড়া সৃষ্টি করার জন্য

একটি সোনার আপেল তৈরী করে- **সর্বাপেক্ষা সুন্দরীর জন্য**- একথাটি অপেলের উপর লিখে দেবীদের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দেন। জুপিটারের স্ত্রী জুনো, জ্ঞান ও বিদ্যার দেবী প্যালাস, প্রেমের দেবী ভেনাস, আপেলটি পাওয়ার জন্য উদগ্রীব হন। কে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী তা স্থির করার জন্য ট্রয়ের রাজপুত্র পারিসকে মধ্যস্থতা করতে অনুরোধ করা হয়।

দেবীরা প্রত্যেকেই আপেল পেলে উপযুক্ত পুরস্কার দেবার কথা ঘোষণা করেন। জুনো সাম্রাজ্য, প্যালাস- যুদ্ধে বিজয়লক্ষ্মী এবং ভেনাস সর্বাপেক্ষা সুন্দরীকে পুরস্কার দেবার প্রতিশ্রুতি দেন।

রাজপুত্র প্যারিস দেবী ভেনাসকে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী নির্বাচন করে সোনার আপেলটি প্রদান করেন। অপর দুই দেবী ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়ে ট্রয় নগরীর রাজপুত্র প্যারিসকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নেন। ফলে ট্রয় নগরী ধ্বংস হয়।

মধুসূদন গ্রীক কাহিনীর ছায়া অবলম্বনে পদ্মাবতী নাটকে কলহের দেবতা নারদকে এনেছেন। ভারতীয় পরিবেশে চরিত্র চিত্রণ করেছেন। গ্রীক কাহিনীর সঙ্গে শকুন্তলার কিছু কিছু ঘটনা মিশিয়ে পদ্মাবতী নাটক রচনা করেছেন।

বিদর্ভরাজ ইন্দ্রনীল একদিন শিকারে গিয়ে শ্রান্ত হয়ে একটি শিলাখন্ডে বিশ্রাম করছিলেন। এমন সময় মধুর বাদ্য সহ সুগন্ধী ছড়িয়ে দেবরাজ মহিষী শচী দেবী, প্রনয়ের দেবী রতি দেবী, যক্ষরাজ পত্নী মুরজা দেবী সেই বনে বিহার করতে এলেন। দেবর্ষি নারদ এই সময় একটি সোনার পদ্ম হাতে নিয়ে বনে প্রবেশ করে দেবীদের লক্ষ্য করে বললেন, আপনাদের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা সুন্দরী তিনি এই স্বর্ণপদ্মটি গ্রহণ করুন। একথা বলেই তিনি অদৃশ্য হলেন।

দেবীরা কলহে লিপ্ত হয়ে বিদর্ভরাজ ইন্দ্রনীলকে মধ্যস্থ মানলেন। রাজা রতিদেবীকে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী স্থির করে রতিদেবীর হাতে স্বর্ণপদ্মটি তুলে দিলেন।

শচীদেবী এবং মুরজা দেবী রাজার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। আর রতিদেবীর চেষ্টায় মহিস্মতি পুরীর রাজকন্যা অপরূপা সুন্দরী পদ্মাবতীর সঙ্গে বিদর্ভ রাজের বিয়ে হল।

শচীদেবী রাজা ইন্দ্রনীলকে শাস্তি দেবার জন্য কলি দেবতার সাহায্য নিলেন।

কলি দেবতার প্ররোচনায় পার্শ্ববর্তী রাজ্যের রাজারা বিদর্ভ রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। রাজা যুদ্ধ যাত্রা করলেন। এই সুযোগে কলি দেবতা পদ্মাবতীকে হরণ করে গভীর অরণ্যে লুকিয়ে রাখলেন।

রতিদেবী এখবর জেনে পদ্মাবতীকে উদ্ধার করে মহর্ষি অঙ্গি রার আশ্রমে নিয়ে এলেন। দেবী পার্বতীকে সব বিবরণ জানিয়ে শচীদেবীকে শান্ত করার প্রার্থনা জানালেন। দেবী পার্বতীর নির্দেশে শচীদেবী শান্ত হলেন।

বিদর্ভ রাজ ইন্দ্রনীল যুদ্ধে জয়ী হয়ে রাজপুরীতে এসে দেখেন পদ্মাবতী নেই। তিনি পদ্মাবতীর খোঁজে তীর্থদর্শনে বের হয়ে মহর্ষি অঙ্গিরার আশ্রমে এসে পদ্মাবতীর সঙ্গে মিলিত হলেন। দেবী পার্বতীর নির্দেশে দেবীরা রাগ বিদ্বেষ ভুলে রাজা-রানীকে আর্শীবাদ করলেন।

এই হল পদ্মাবতী নাটকের বিষয়বস্তু। মধুসূদনের বর্ণনার গুণে নাটকটি দর্শকদের মন জয় করল। এই নাটকে মধুসূদন মাঝে মাঝে আমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করে নাটকে অভিনবত্ব সৃষ্টি করলেন। নারী চরিত্র চিত্রনে মধুসূদন অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিলেন।

মধুসূদনের তৃতীয় নাটক কৃষ্ণ কুমারী। রাজপুত জাতির বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম এবং অতুলনীয় স্বদেশ প্রেমের ইতিহাস এই নাটকে তুলে ধরেছেন। এই নাটকে সংস্কৃতের কোন প্রভাব ছিল না। সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টি ভঙ্গীতে আধুনিক নাটক সৃষ্টির কৌশল এবং শিল্পকলা তখন মধুসূদন আয়ত্ত করে ফেলেছেন। কাব্য এবং নাটকের পার্থক্যও তিনি বুঝেছেন।

কৃষ্ণ কুমারী নাটকের মাধ্যমে মধুসূদন বাংলা নাটকে স্বাদেশ প্রেমের প্রথম উদ্দীপনা জাগিয়ে দিলেন। কবিতার ক্ষেত্রে একাজটি শুরু করেছিলেন- মধুসূদনের প্রিয় বন্ধু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

• কৃষ্ণকুমারী নাটকে ঐতিহাসিক ট্রেজেডিকে কবি রোমান্টিকতার রসে সিক্ত করেছেন। এক্ষেত্রে শেক্সপীয়ারের আদর্শকে অনুসরণ করেছেন।

রাজস্থানের ইতিহাসে উদয়পুরের কাহিনীতে মেবারের রানা ভীমসিংহ, মহারাণী অহল্যাবাই এবং রাজকন্যা কৃষ্ণকুমারীর যে বর্ণনা আছে মধুসূদন তা মোটামুটি অক্ষুন্ন রেখে কিঁছু কিছু কল্পিত চরিত্র সৃষ্টি করে নাটকীয়তা বৃদ্ধি করেছেন।

শক্তিশালী দুই রাজ্যের রাজা জগৎসিংহ এবং মানসিংহ মেবারের রাজকন্যা কৃষ্ণকুমারীকে বিবাহের প্রস্তাব দেন। রাজকন্যা না পেলে মেবার রাজ্য ধ্বংস করা হবে বলে দুজনেই ঘোষণা দেন।

এই চরম সংকটে যে কোন একজনকে রাজকন্যা দিয়েও যুদ্ধ এড়ানো যাবে না। তাই মন্ত্রীদের পরামর্শে রাজকন্যা কৃষ্ণকুমারীকে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করা হয়।

ইতিহাসের এই ঘটনাকে একটু পরিবর্তন করে সধুসূদন দেখিয়েছেন যে কৃষ্ণকুমারী স্বেচ্ছায় জীবন দান করে পিতা এবং পিতার রাজ্য রক্ষা করেছেন।

সেকালের দর্শকেরা দীর্ঘ সময় ধরে নাটক দেখতে উৎসাহ বোধ করতো। তাই নাটকে অনেক উপকাহিনী যোগ করে নাটক দীর্ঘ করা হতো।

কৃষ্ণকুমারী সব দিক থেকেই উৎকৃষ্ট নাটকের মর্যাদা লাভ করেছে। রানা ভীমসিংহের গভীরতম হৃদয়াবেগ ও ট্রেজেডির প্রকাশ এবং কৃষ্ণকুমারীর স্বদেশ প্রীতির ভাষারূপ এই নাটকের ঐতিহাসিক গৌরব বৃদ্ধি করেছে, এবং মধুসূদনের নাটকীয় প্রতিভা ও দক্ষতার পরিচয় বহন করছে।

শর্মিষ্ঠা নাটকের পরই মধুসূদন পাইক পাড়ার দুই রাজ ভ্রাতার অনুরোধে হাস্যরস মূলক দুটি প্রসহন (১) একেই কি বলে সভ্যতা এবং (২) বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ রচনা করেন।

প্রথমটিতে শহরের সমকালীন ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাত্রার আশ্চর্য চিত্র তুলে ধরে হাসকৌতুক সৃষ্টি করেছেন।

দ্বিতীয় প্রহসনটিতে গ্রাম জীবনে গোঁড়াপন্থী কপট ধার্মিক শোষক অত্যাচারী ইন্দ্রিয়াসক্ত নারীলুলোপদের কৌতুককর কাহিনী তুলে ধরে শাস্তিদানের উদ্যম সৃষ্টি করেছেন।

এ দুটি প্রহসন বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের প্রথম দুটি উল্লেখ যোগ্য প্রহসন রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

মধুসূদনের শেষ নাটক মায়া কাণন বিদেশ থেকে বারিষ্টার হয়ে ফিরে আসার পর লেখা হয়েছে। তখন কবির মন ছিল সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত অবস্থায়। কারণ

ব্যারিষ্টার হয়ে দেশে ফিরে প্রচুর অর্থ রোজগার করতে পারবেন বলে যে আশা পোষন করতেন, তা পূরণ হয় নি।

পুলিশ আদালতে চাকরী করার সময় তিনি আইনি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। দেশীয় আইন পরীক্ষায় পাশ করে অনায়াসে আইনজীবীর স্বাধীন ব্যবসা করা যেত। তাহলে আর্থিক এবং মানসিক বির্যয়ের মুখে পড়তে হতো না এবং বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভার অকাল মৃত্যু হতোনা।

মায়াকানন নাটকে গভীর কোন বিষয় নিয়ে রচনা করার মত মানসিব উৎসাহ ছিল না। অনন্ত প্রেমের, অনন্ত বিরহ বিষয়ক রূপকাশ্রিত নাটক তিনি রচনা করলেন মায়াকাননে।

মুসলিম ইতিহাস নিয়ে বিজিয়া নাটক লিখতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু মধুসূদন বন্ধুদের কাছ থেকে কোন উৎসাহ পান নি ।

গভীর হতাশায় মদ্যপানে ডুবে গিয়ে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভা অকালে শেষ হয়ে গেল।

আধুনিক বাংলা মহাকাব্যের স্রষ্টা মধুসূদন

মধুসূদনের প্রথম কাব্য তিলোত্তমা সম্ভব। ইংরেজ কবি মিল্টনের আদর্শ অনুসরণ করে তিনি এই কাব্যটি রচনা করেন। মহাভারতের আদি পর্বে বর্ণিত সুন্দ-উপসুন্দের কাহিনী অবলম্বনে এই কাব্যটি রচিত। চারটি সর্গে কাব্যটি বিভক্ত।

প্রথম তিনটি সর্গ কবির নিজস্ব কল্পনায় রচিত সুন্দ-উপসুন্দ বধের জন্য দেবতাদের প্রস্তুতি পর্ব। চতুর্থ সর্গে মহাভারতের কাহিনী অনুসরণ করা হয়েছে। কাব্যের চরিত্র চিত্রনে এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনায় সংস্কৃত কুমার সম্ভব কাব্যের প্রভাব রয়েছে। কাব্যের নামাকরনের মধ্যেও এই প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

স্বর্গচ্যুত দেবতারা দৈত্যদের হাত থেকে স্বর্গ রাজ্য উদ্ধারের যে পরিকল্পনা রচনা করেছেন তার নেতৃত্ব দিয়েছেন দেবরাজ ইন্দ্র। এখানে দেবতাদের প্রতি কবির সহানুভূতি লক্ষ্য করা যায়। দেবতাদের রক্ষা করতে ব্যর্থ হওয়ায় দেবরাজ মর্মাহত। কথোপকথনে ন্যায় নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন।

পৌরাণিক দেবদেবীদের মধ্যে মধুসূদন কিছু সংখ্যক লৌকিক অনার্য দেবতাকেও অর্ন্তভুক্ত করেছেন। তাদের মধ্যে ষষ্ঠী, শীতলা, মনসা, সুবচনী উল্লেখযোগ্য।

দেবতাদের নিষ্ঠুর চক্রান্তের ফলে তিলোত্তমার অপরূপ রূপে মোহগস্থ হয়ে দুই দৈত্যবীর ভয়ানক যুদ্ধে বিপর্যস্ত হয়। এই পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্য কামদেবকে নিয়োজিত করা হয়। বিন্ধ্যারণ্যে সুন্দ-উপসুন্দ ভ্রমন করার সময় দেবরাজ ইন্দ্র তিলোত্তমাকে নিয়ে সেই বনে হাজির হন। দেবতাদের নির্দেশে বিশ্বকর্মা সৃষ্টি করেন অপরূপা তিলোত্তমাকে।

পৌরাণিক কাহিনীতে দেবরাজ ইন্দ্র অত্যন্ত বিলাসী, ইন্দ্রিয় পরায়ণ ও ঈর্ষাপরায়ণ রূপে চিহ্নিত হয়েছেন। মধুসূদন তিলোত্তমা সম্ভবে ইন্দ্রকে কর্তব্য

পরায়ণ ও দায়িত্বশীল নেতারূপে চিত্রিত করেছেন। দেবতাদের পরামর্শ সভায় বায়ু এবং যম যখন প্রস্তাব দেন, আদেশ পেলে এক মুহূর্তেই এই জগৎ লন্ডভন্ড করে দৈত্য কুল ধ্বংস করতে পারি। তখন দেবরাজ ইন্দ্র জবাব দেন—

কেমনে যে রক্ষক, সে জন, হইবে ভক্ষক?

যথা ধর্ম জয় তথা।

তিলোত্তমার রূপমোহে দৈত্যদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার সুযোগে দেবতারা অনায়াসে স্বর্গপুরী উদ্ধার করে উৎসবে মত্ত হলেন।

তিলোত্তমা সম্ভব কাব্যে এই কাহিনী বর্ণনার গুণে বাংলা কাব্যের আধুনিক রূপ ফুটে উঠেছে। পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনেও যে আধুনিক কাব্য রচনা করা যায় সেই আত্মবিশ্বাসও সৃষ্টি হয়েছে।

এই কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ সার্থকভাবে প্রয়োগ করে কবি তৃপ্তিলাভ করেছিলেন। যিনি এই বিষয়ে বিশেষভাবে উৎসাহ যুগিয়েছিলেন সেই যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়কে কাব্যখানি উৎসর্গ করে **মধুসূদন লিখেছেন,—**

যে ছন্দোবন্ধে এই কাব্য প্রণীত হল, সে বিষয়ে আমার কোন কথা বলাই বাহুল্য, কেননা এরূপ পরীক্ষা বৃক্ষের সদ্য পরিচয় হয়না। তথাপি আমার বিলক্ষণ বিশ্বাস যে, এমন সময় অবশ্যই উপস্থিত হবে, যখন এদেশে জনগণ বাগদেবীর চরণ থেকে মিত্রাক্ষর স্বরূপ নিগড় ভগ্ন দেখে চরিতার্থ হবেন। কিন্তু হয়তো শুভকালে এ কাব্য রচয়িতা এমন ঘোরতর মহানিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকবেন যে, নিন্দা কিংবা ধন্যবাদ তার কানে প্রবেশ করবেনা।

মধুসূদনের পূর্ণ কবি প্রতিভার প্রকাশ ঘটেছে- **মেঘনাদ বধ কাব্যে**। বাংলা সাহিত্যে সুদীর্ঘকালের প্রচলিত পয়ার ছন্দ ভেঙ্গে নতুন অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য রচনা করে কবি যে শক্তিশালী প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তা বিস্ময়কর।

মাত্র দুই বছর আগেও যে কবি বাংলা ভাষায় কিছু লিখতে পারতেননা। তিনি কোন শক্তিবলে এত অল্প সময়ের মধ্যে বাংলা ভাষা আয়ত্ত করে সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য রচনা করতে সক্ষম হলেন তা আজো বিস্ময়ের উদ্রেগ করে।

সমকালের সংস্কৃত পন্ডিতরা বাংলা ভাষা ও ছন্দে এই বিশাল পরিবর্তন আনার জন্য তীব্রভাবে মধুসূদনের সমালোচনা ও নিন্দা করেছেন।

বাংলা সাহিত্যে মেঘনাদ বধ কাব্য প্রথম এবং শেষ মহাকাব্য রূপে স্বীকৃত হয়েছে এবং এটি একটি শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য রূপেও মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অনেকে বলেন, মহাকাব্যের যুগ শেষ হয়ে গেছে। শাস্ত্রীয় নিয়ম অনুযায়ী মহাকাব্যের উপযুক্ত বহুব্যাপ্ত ঘটনাবলী এবং মহাবীরদের আর দেখা যাবেনা।

কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে দুটি বিশ্বযুদ্ধ ঘটে গেছে যার ব্যাপ্তি সারা বিশ্ব জুড়ে। এদুটি যুদ্ধে অসংখ্য বীরত্বের কাহিনী ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়েছে, যা ভবিষ্যতে কোন এক সময়ে বিশ্বের কোন না কোন দেশে মহাকাব্যের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে। এর জন্য প্রয়োজন একজন মহাশক্তিশালী প্রতিভাধর কবির আবির্ভাব।

পৃথিবীতে এখনো পর্যন্ত চারটি প্রাচীন মহাকাব্যের অস্তিত্ব রয়েছে। ভারতে রামায়ণ ও মহাভারত এবং গ্রীক সাহিত্যে ইলিয়াড ও ওডেসি। বিশ্ব সাহিত্যে ওরকম মহাকাব্য হয়তো আর সৃষ্টি হবে না। কিন্তু আধুনিক সাহিত্যের পরিনতি কোন বিশাল সম্ভাবনার সৃষ্টি করে চলেছে তা এখনই বলা সম্ভব নয়।

মধুসূদন তিলোত্তমা সম্ভব কাব্যকেও মহাকাব্যের রূপ দিতে চেয়েছিলেন। মহাভারতের বিভিন্ন কাহিনী যুক্ত করে মহাকাব্যের রূপ দেবার পরিকল্পনাও করেছিলেন। কিন্তু ছন্দ সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্থ ছিলেন। বাঙ্গালী পাঠকের গ্রহণ যোগ্যতা সম্পর্কেও চিন্তা ছিল। তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য পাঠক মহলে গৃহীত হবার পর রামায়ণের কাহিনী নিয়ে মহাকাব্য রচনার সিদ্ধান্ত নেন।

মেঘনাদ বধ কাব্যের কাহিনী নির্বাচন, গঠন পদ্ধতি, চরিত্র বর্ণনা, ঘটনা বিন্যাস এবং নাম করণ ইত্যাদি পরিকল্পনায় হোমারের ইলিয়াড কাব্যের আদর্শকে অনুসরন করেছেন। প্রাচীর বেষ্টিত ট্রয় নগরীর সেনা সমাবেশের অনুযায়ী লংকাপুরীর সেনা সমাবেশ বর্ণনা করেছেন। কাব্যের ভাব ও বিস্তৃতি ঘটেছে কবির নিজস্ব কল্পনা অনুযায়ী। যুক্তি তর্ক হাজির করা হয়েছে, আধুনিক মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে।

হোমরের নায়ক হেক্টার ছিলেন ট্রয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর। হেক্টারের স্বদেশ প্রেম, পত্নী প্রেম, মানবতাবাদী আদর্শ, ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা, কর্তব্য পরায়ণতা, উদার

মানসিকতা মধুসূদনের প্রিয় নায়ক মেঘনাদের চরিত্রে উজ্জ্বল রূপে প্রতিফলিত হয়েছে।

রাবন এবং প্রমিলা চরিত্র নির্মানে মধুসূদন অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। রাম লক্ষণ চরিত্র সৃষ্টিতেও ভারতৗয় ঐতিহ্য রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। তবে দুর্বলতাগুলোর স্পষ্ট রূপ দিয়েছেন। অবতাররূপী রামকে দোষগুণ সম্পন্ন মানুষের পর্যায়ে স্থাপিত করেছেন।

মবাকাব্যের গাম্ভীর্য সৃষ্টির জন্য অজ্ঞাত, অপরিচিত এবং অপ্রচলিত বহু শব্দ ব্যবহার কবেছেন এবং বহু নতুন শব্দ সৃষ্টি করেছেন। বিভিন্ন কাহিনী যুক্ত করে মহাকাব্যিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন।

সাত কান্ড রামায়ণের একটি বিশেষ অংশকে মূল কাহিনী হিসেবে গ্রহণ করে রামায়ণে বর্ণিত মহাবীর মেঘনাদকে আদর্শ নায়ক রূপে গ্রহণ করেছেন।

রামায়ণে রাবন এবং রাক্ষসদের নরখাদক রূপে বর্নণা করা হয়েছে কিন্তু মধুসূদন তাদেরকে সভ্য মানষ রূপেই দেখিয়েছেন। সমাজ চেতনায়, ধর্মচর্চায় এবং যুদ্ধ বিদ্যায় ও যুদ্ধরীতিতে হিন্দু রীতির সঙ্গে রাক্ষসদের কোন পার্থক্য নেই।

বাল্মীকি বানর সৈন্যদের বনের বানর রূপেই বর্ণনা করেছেন। বানররাজ বালী এবং সুগ্রীবেরও লেজ রয়েছে। অথচ তারা মহাবীর, ধার্মিক এবং যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী।

মধুসূদন বানর বাহিনীকেও সভ্য অনার্য্য মানুষরূপেই দেখিয়েছেন। তাদের সাহায্য ছাড়া রামলক্ষ্মণের পক্ষে সীতা উদ্ধার অসম্ভব ছিল।

রামভক্ত বিভীষণকে দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক রূপেই চিহ্নিত করেছেন।

দেশ রক্ষার সংগ্রামে অসীম সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে রাবনের রাক্ষস বাহিনী এবং বীর সেনাপতিরা । দেশের জন্য জীবন দানকে গৌরবান্বিত করেছেন মধুসূদন।

সীতাহরণ করে রাবন যে অন্যায় করেছেন তার পরিনতিতে রাবন ও স্বর্ণলংকা ধ্বংস হয়েছে এ সিদ্ধান্ত মধুসূদন মেনে নিয়েছেন। কিন্তু অন্যায়, মিথ্যাচার, বিশ্বাস ঘাতকতা এবং কাপুরুষতাকে মধুসূদন কিছুতেই মেনে নিতে

পারেন নি।

সপ্ত কান্ড রামায়ণের একটি অংশকে নয়টি সর্গে বিভক্ত করেছেন মধুসূদন মেঘনাদ বধ কাব্যে। রামায়ণের কোন ঘটনাকে বিকৃত না করে আধুনিক ইতিহাসের আলোকে যুগের উপযোগী রূপান্তর ঘটিয়েছেন।

প্রায় দেড়শ বছর আগে বাঙ্গালী সমাজে রামায়ণ- মহাভারতের যে প্রভাব ছিল এবং ধর্মান্ধতায় আচ্ছন্ন ছিল অধিকাংশ মানুষ, সেকালে প্রচলিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ মতামত দিয়ে বিশ্বাস বিরোধী কাব্য রচনা ও চরিত্র চিত্রণ একটি দু:সাহসিক কাজ ছিল।

সাহিত্যের বিচারেও দেড়শ বছর আগেকার বাংলা সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতেই মধুসূদনের সৃষ্টিকে বিচার করতে হবে। সেদিক থেকে মধুসূদনের রচণাবলী শিক্ষিত মানুষের মনে একটা বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল। চিন্তাভাবনায় এনেছিল যুক্তিবাদী ও মানবিক বিচার বিশ্লেষণ।

মধুসূদন কত বড় প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, তা বুঝা যায় তাঁর কাব্য রচনার ধরণ দেখলে। তিনি একই সঙ্গেঁ হাস্যবসাত্মক প্রহসন-একেই কি বলে সভ্যতা এবং গভীর ভাব ও গাম্ভির্যপূর্ণ কাব্য-তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য রচনা করেন। এই সঙ্গেঁ দুটি বিপরিত ধর্মী গ্রন্থ রচনায় তিনি অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়ে ছিলেন।

এর পরেই তিনি দুটি বিপরীত ধর্মী কাব্য, মেঘনাদ বধ কাব্য এবং ব্রজাঙ্গনা কাব্যের সঙ্গে কৃষ্ণকুমারী নাটকটিও একই সময়ে একই সঙ্গে রচনা করে বিশাল প্রতিভার পরিচয় দেন।

মেঘনাদ বধ কাব্য মধুসূদনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য এবং বাংলা সাহিত্যের এক মাত্র মহাকাব্যরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে। অন্যদিকে কৃষ্ণকুমারী হল বাংলা সাহিত্যের প্রথম ট্রেজেডি নাটক এবং মধুসূদনের রচিত শ্রেষ্ঠ নাটক। ব্রজাঙ্গনা কাব্য হল বৈষ্ণব পদাবলীর আদর্শে রচিত বিরহিনী রাধার আকুল কামনার প্রতিধ্বনী।

বৈষ্ণব কবিরা প্রেম ও ভক্তি সহযোগে রাধা কৃষ্ণের প্রেম বর্ণনা করেছেন। তাঁদের চোখে কৃষ্ণ হলেন অবতার আর রাধার প্রেম হল অধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ।

কিন্তু মধুসূদনের রাধা ও কৃষ্ণ হলেন বৃন্দাবন নামক ভারতের একটি উপবনে প্রেম ও বিরহে লীলায়িত মানব-মানবী।

এরকম তিনটি বিষয়ের তিনটি ভাবের অবিরল বর্ণনায় মধুসূদনের দক্ষতা ও প্রতিভার যে প্রমান পাওয়া গেছে তার জন্য সেকালের সমস্ত গুণী ব্যক্তিরাই বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।

তিনটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টাকে বিচার করলেই এর গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাবে। একই সময়ে তিনটি লেখা শুরু তরে কবি লিখছেন----

১) উত্তরিলা দেবাকৃতি সৌমিত্রি কেশরী
কৃতান্ত আমিরে তোর, দুরন্ত রাবনি।
(মেঘনাদ বধ কাব্যে লক্ষ্মনের উক্তি)

২) যে ব্রজে শুনিতে আগে সঙ্গীতের ধ্বনী,
আকাশ সম্ভবে,
ভূতলে নন্দন বন, আছিল সে বৃন্দাবন,
সে ব্রজ পুরিছে আজ হাহাকার রবে।
(শ্রী কৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরায় চলে যাবার পর বিরহিনী রাধার উক্তি)

৩) রাজা- কি সর্বনাশ! তারপর?

মন্ত্রী - আজ্ঞা, রাজা মানসিংহ অসি স্পর্শকরে প্রতিজ্ঞা করেছেন, যে, হয় তিনি সুকুমারী রাজকুমারী কন্যাকে বিবাহ করবেন, নয় উদয়পুরকে ভস্মসাৎ করে মহারাজের রাজ্য ছারখার করবেন। রাজা জগৎ সিংহেরও এরূপ পণ।

রাজা- বটে? এ কলিকালে লোকে একেই কি বীরত্ব বলে থাকে?

(উদয়পুর রাজগৃহে কৃষ্ণ কুমারী নাটকের একটি দৃশ্যে রাজা ও মন্ত্রীর উক্তি)

এর পরেই মধুসূদন রচনা করেন, বীরাঙ্গনা- নামে পত্রকাব্য। এ ধরণের কাব্য শুধু বাংলা সাহিত্যে নয় ভারতীয় সাহিত্যেই প্রথম।

রামায়ণ-মহাভারতের- বীর পুরুষদের পত্নিরা স্বামী বিরহে- কাতর হয়ে অথবা যুদ্ধে কোন অমঙ্গল আশংকা করে পত্র কাব্যে মনের কথা প্রকাশ করেছেন।

নারী জীবনের চারটি প্রতীক তিনি তুলে ধরেছেন এই কাব্যে। কুমারী-সধবা-বিধবা এবং গণিকার প্রেম।

মধুসূদন বীরাঙ্গনা কাব্যে একুশটি সর্গের পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু এগারটি সর্গ সম্পূর্ণ করতে পেরেছেন। পাঁচটি সর্গ অসমাপ্ত অবস্থায় আছে। বাকীগুলো শুরু করতে পারেন নি।

কবিতার ভাষায় প্রেমিকার মনের কথা এক একটি সর্গে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকৃতি অনুযায়ী এগুলিকে চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

১. **প্রেমপত্র ঃ-** সোমের প্রতি তারা, লক্ষ্মণের প্রতি সূর্পনখা, পুরুরবার প্রতি উর্বশী, দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী।

২. **প্রেমের বন্ধন ছিন্ন করার জন্য পত্র-** শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী দেবী এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে।

৩. **স্বামীর অদর্শনে ব্যাকুলা বা স্বামীর অমঙ্গল চিন্তায় উৎকণ্ঠিতা নারীর পত্র-**দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা, অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদী, দুর্যোধনের প্রতি ভানুমতি, জয়দ্রথের প্রতি দু:শলা, তৃতীয় শ্রেনীর মধ্যে পড়ে।

৪. **স্বামীর প্রতি অনুযোগ বা অভিমান প্রকাশ করে পত্র-** দশরথের প্রতি কৈকেয়ী, নীল ধ্বজের প্রতি জনা। এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

এই এগারটি পত্র কাব্যে পৌরাণিকযুগের বিখ্যাত নারী চরিত্রের মনের কথা প্রকাশ করা হয়েছে। আধুনিক যুগেও নারীর অন্তরে এই চার শ্রেণীর মানসিক দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায়।

যে পাঁচটি সর্গ সম্পূর্ণ করতে পারেননি সেগুলো হল (১) ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি গান্ধারী, (২) অনিরুদ্ধের প্রতি উষা, (৩) যযাতির প্রতি শর্মিষ্ঠা, (৪) নারায়ণের প্রতি লক্ষ্মী, (৫) নলের প্রতি দময়ন্তি।

বীরাঙ্গনা কাব্যের ভাষা সমালোচকদের মতে মধুসূদনের রচিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের কাব্য গুলোর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। শব্দের জটিলতা এবং যতি ভঙ্গের ক্লিষ্টতা নেই বললেই চলে। যেমন- দুর্যোধনের প্রতি ভানুমতির পত্রের ভাষা------

এস তুমি প্রাণনাথ ! রণ পরিহরি;
পঞ্চখানি গ্রাম মাত্র মাগে পঞ্চরথী

কি অভাব তব কহ! তোষ পঞ্চজনে
তোষ অন্ধ বাপ, মায়, তোষ অভাগীরে;
রক্ষ কুরুকুল, ওহে কুরুকুলমনি!

পত্রকাব্যটি রচনা করে মধুসূদন প্রমাণ করলেন যে, অমিত্রাক্ষর ছন্দ বীররসের উপযোগী ছন্দ হলেও তা মধুর ও কোমল রসের কাব্য রচনা করার পক্ষেও উপযোগী। সব রকম ভাবের উত্থান পতনে অমিত্রাক্ষর গভীর তাৎপর্য সৃষ্টি করতে পারে।

এই কাব্য গ্রন্থটি রচনার পরই মধুসূদন ব্যারিষ্টারী পড়ার জন্য ইংলন্ডে চলে যান। সেখানে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে নিদারুন হতাশায় কাব্য রচনার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন।

ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে চরম দুর্দিনে শতাধিক সনেট রচনা করে মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি অবহেলার ফলে যে মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেছেন তার জন্য বার বার ক্ষমা প্রার্থণা করে মাতৃভাষার জন্য যেটুকু কবেছেন তার মধ্যেই যাতে অমরত্ব লাভ করতে পারেন সেই কামনা অত্যন্ত কাতব ভাবে জানিয়েছেন।

মধুসূদন ব্যারিষ্টার হয়ে দেশে ফিরে এসে প্রচুর অর্থ রোজগারের সুযোগ পাবেন বলে আশা করেছিলেন। কিন্তু সে আশা পূরণ না হওয়ায় তীব্র মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেন। ফলে নতুন কিছু সৃষ্টি করার উদ্যম নষ্ট হয়ে যায়। এই সময় মধুসূদন জীবনের শেষ নাটক মায়া কানন রচনা করেন এবং হেক্টর বধ নামে একটি কাব্য অর্ধ সমাপ্ত রেখেই এই পৃথিবী থেকে চির বিদায় নেন।

মধুসূদনের ব্যক্তিজীবন

বাংলার বীর প্রসবিনী যশোহর জেলার অর্ন্তগত সাগরদাড়ী গ্রামে ১৮২৪ সালের ২৫শে জানুয়ারী সেকালের অতি বিত্তবান ও সুসংস্কৃতি সম্পন্ন দত্ত পবিবারে মধুসূদনের জন্ম হয়।

ইতিহাস প্রসিদ্ধ প্রতাপাদিত্য এই জেলারই সন্তান। প্রচলিত প্রবাদ অনুযায়ী শৌর্যে, বীর্য্যে ও ঐশ্বর্যে গৌড় বাংলার যশ হরণ করেছিলেন বলে প্রতাপাদিত্যের এই রাজ্যের নাম হয়েছিল যশোর।

সাগরদাঁড়ী গ্রামটিও খুব সুন্দর ।এই গ্রামের তিন দিক ঘিবে আছে সুবিখ্যাত কপোতাক্ষ নদী।

দত্ত বংশের আদি গ্রাম ছিল খুলনা জেলার তালা গ্রামে। মধুসূদনের দাদু রামনিধি প্রথম মাতামহের সাগরদাঁড়ী গ্রামে বসতি স্থাপণ করেন। রামনিধির চারপুত্র, রাধামোহন, মদনমোহন, দেবী প্রসাদ, ও রাজনারায়ণ। সর্বকনিষ্ঠ রাজারায়ণ দত্ত হলেন মধুসূদনের পিতা।

তারা চারভাই ছিলেন বুদ্ধিমান, ধর্মপরায়ণ, উদার, দানশীল এবং অতিথি পরায়ণ। সকলেই ফার্সী ভাষায় শিক্ষিত ছিলেন। বড় দুই ভাই সবকাবের উচ্চপদে চাকরী করতেন। ছোট দুইভাই আইন ব্যবসায় নিযুক্ত হন।

তৃতীয় ভাই দেবী প্রাসাদ যশোহর জেলা আদালতে এবং সর্বকনিষ্ঠ রাজানারায়ণ কলকাতায় দেওয়ানী আদালতে আইনজীবী হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন।

দত্ত বংশের চার ভাইয়ের অনেক সদ্‌গুণের মধ্যে কয়েকটি বড় দোষও ছিল। ইন্দ্রিয় সংযম এবং মিতব্যয়িতাবোধ তাদের ছিল না। নেশাগ্রস্তের মত দুই হাতে তারা অপব্যয় করতেন ।

দত্ত বংশের অমিতব্যয়িতার একটি দৃষ্টান্ত প্রবাদের মত প্রচলিত রয়েছে। বড় ভাই রাধামোহন পুত্রের কল্যাণ কামনায় একবার একসঙ্গে ১০৮টি কালী পূজার আয়োজন করেন। এই উপলক্ষে একই সঙ্গেঁ ১০৮টি মহিষ, ১০৮টি মেষ,১০৮টি পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। ১০৮টি সোনার জবাফুল এই পূজায় দেবীর উদ্দেশ্যে অঞ্জলী দেওয়া হয়। মধুসূদনের পিতা রাজনারায়ণ দত্ত প্রচুর উপার্জন করতেন এবং দুইহাতে খরচ ও করতেন। কবিতা, সঙ্গীত ও অন্যান্য শিল্পকলায় অসাধারণ অনুরাগ ছিল। বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতার জন্য তিনি শিল্পীদের পুরস্কৃত করতেন। ভাইদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ বলে রাজনারায়ণ ছোট বেলা থেকেই অতিরিক্ত আদর যত্ন পেয়েছিলেন।

মধুসূদনের মা জাহ্নবী দেবী ছিলেন খুলনা জেলার বিখ্যাত জমিদার কন্যা। শিক্ষা দীক্ষায় সংস্কৃতিবান। সেকালে সমাজে বহু বিবাহ এবং বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল।

মধুসূদনের পিতা রাজনারায়ণ চারটি বিবাহ করেন। প্রথম দুই স্ত্রী অল্প বয়সে মারা যান। তৃতীয়া স্ত্রীব কোন সন্তান ছিল না। জাহ্নবীদেবীর একমাত্র সন্তান হলেন মধুসূদন।

মাতা-পিতার অতিরিক্ত আদরে মধুসূদনের চরিত্রে অমিতব্যয়িতার যে বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছিল তা জীবনের চরম দুর্দিনেও সংশোধন করতে পারেন নি। তাই তিনি শেষ জীবনে চরম দু:খ ও মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করে অকাল মৃত্যু বরণ করেছেন।

মধুসূদন ছিলেন হিন্দু কলেজের সেরা ছাত্র। ক্লাশের বন্ধুদের কোন অসুবিধা দেখলে তখনই প্রয়োজনীয় সাহায্য দিতেন। বন্ধু- ভূদেব মুখোপাধ্যায় কলেজের খরচ চালাতে অপারগ হওয়ায় কলেজের পড়া ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এই খবর শোনামাত্র বন্ধুর কাছে ছুটে গিয়ে তার সব খরচের ভার নিজে গ্রহণ করেন।

ছাত্র জীবনে হঠাৎ করে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করার ফলেই মধুসূদনের জীবনে বিপর্যয় নেমে এসেছিল। বিশ্ব বিখ্যাত কবি হবার আশায় ইংলন্ডে যাবার প্রলোভনে মোহগ্রস্ত হয়ে তিনি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন।

রাজনারায়ণ দত্তের অর্থের কোন অভাব ছিল না। তিনি নিজেই একমাত্র **পুত্রকে লন্ডন** পাঠিয়ে উচ্চ শিক্ষা দেবার পরিকল্পনা করেছিলেন। মধুসূদন **উত্তরাধিকার সূত্রে** যে সম্পদের অধিকারী হতেন তার উপর নির্ভর করে সারা জীবন **সাহিত্য চর্চা ক**রে অভিজাত জীবন যাপন করতে পারতেন। তাতে বাঙ্গালী জাতির ও বাংলা সাহিত্যের অনেক উপকার হতো।

মহাভারতের অনুবাদক কালী প্রসন্ন সিংহ লিখেছিলেন, মধুসূদনকে যত বেশীদিন বাঁচিয়ে রাখা যাবে তত বেশী অমূল্য রত্ন ভান্ডারে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হবে। অসাধারণ উচ্চাকাংক্ষা এবং অসাধারণ কবি প্রতিভা মধুসূদনকে নতুন নতুন সৃষ্টির কাজে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

মধুসূদনের পারিবারিক জীবন মোটেই সুখের ছিল না। দুবারে দুই বিদেশী মহিলাকেতিনি বিয়ে করেছিলেন। প্রথম স্ত্রী রেবেকা স্বামীর অমিতব্যয়ী জীবনকে মেনে নিতে পারেন নি। তাই এক পুত্র ও এক কন্যা নিযে তিনি বিবাহ বিচ্ছেদ করে সবে যান।

দ্বিতীয়া স্ত্রী হেনরিয়েটা ছিলেন অত্যন্ত ধর্মশীলা মহিলা এবং স্বামী পরায়ণা স্ত্রী। সপরিবারে বহুদিন উপবাসে দিন কাটাতে হয়েছে। অসুস্থ হয়ে সুচিকিৎসার সুযোগও তিনি পান নি। তবু স্বামীর বিরুদ্ধে কোন দিন কোন অভিযোগ তিনি করেন নি।

কলকাতায় পুলিশ আদালতে চাকরী করার সময় মধুসূদন আইন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। এখানে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করলেই আইনজীবী হিসেবে কাজ করতে পারতেন। তাহলে বিপুল ঋণের বোঝা মাথায় চাপতো না। পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য মামলাও করতে হতো না।

খৃষ্টান পুত্র হিন্দু পিতার সম্পত্তির মালিক হতে পারে না। এই দাবী জানিয়ে আত্মীয়রা মধুসূদনের সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তি দখল করে নিয়েছিল। বৃটিশ আইনে এরূপ দাবী টিকেনা। মধুসূদন কলকাতায় থাকলে আত্মীয়রা সম্পত্তি দখল করার সুযোগ পেত না।

লন্ডন যাবার আগে মধুসূদনের দখলে কিছু সম্পত্তি ছিল। সেগুলি এক কর্মচারীর কাছে গচ্ছিত রেখে ব্যারিষ্টারী পড়ার খরচের ব্যবস্থা করেছিলেন।

কিন্তু কর্মচারী ভদ্রলোক এক বছরের মধ্যেই বিশ্বাস ভঙ্গ করে খবচের টাকা চুক্তিমত পাঠানো বন্ধ করে দেয়। ফলে মধুসূদন বিদেশের মাটিতে সপরিবারে চরম আর্থিক বিপর্যয়ে পড়েন। বন্ধুদের কাছ থেকে ঋণ চেয়ে কোন সাড়া না পেয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি বিদ্যাসাগরের স্মরণাপন্ন হন।

বিদ্যাসাগর প্রয়োজনীয় ঋণের ব্যবস্থা করে টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। ফলে মধুসূদন ব্যারিষ্টারী পাশ করে দেশে ফিরে আসতে সক্ষম হন।

কিন্তু দেশে ফিরে ব্যারিষ্টারী করে বিপুল অর্থ উপার্জনের যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন তা সফল না হওয়ায় একেবারে ভেঙ্গে পড়েন। পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধার হবার পর একটু সংযত হয়ে চললে মধুসূদনের আর্থিক অসুবিধা হতো না।

গভীর হতাশায় জলের পরিবর্তে অনবরত মদ পান করতে থাকায় অতি দ্রুত মধুসূদনের জীবনীশক্তি নষ্ট হতে থাকে। নিজের প্রতিভাকে কাজে লাগাবার কোন উদ্যোগই তিনি নিতে পারলেন না।

উদারতা, দানশীলতা, সরলতা, প্রেমপ্রবণতা, পরদুঃখ কাতরতা ইত্যাদি গুণ মধুসূদন পিতা-মাতার কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি এসব গুণাবলী রক্ষা করেছিলেন। তিনি কখনোই কোন মানুষকে অবজ্ঞা করতেন না।

মধুসূদনের উদারতার দুটি উদাহরণ দিয়েই তাঁর জীবন কথা শেষ করব। একবার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু একজন মক্কেল নিয়ে মামলার পরামর্শ করতে আসেন। মধুসূদন প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা করার পর ভদ্রলোক ব্যারিষ্টারের পারিশ্রমিক দিলেন। কিন্তু মধুসূদন কিছুতেই টাকা নিলেন না। ভদ্রলোক চলে যাবার পর বন্ধুটিকে বললেন, তুমি সঙ্গে নিয়ে এসেছ তাই আমি পারিশ্রমিক রাখতে পারলাম না। কিন্তু আমার পকেট আজ শূণ্য কয়েকটা টাকা ধার না দিলে আজ রান্না হবে না।

আরেকদিন বহু চেষ্টা করে বিদ্যাসাগরের সাহায্যে কিছু ঋণ সংগ্রহ করে ঘরে এসে দেখেন এক দূর সম্পর্কিয় আত্মীয় কিছু টাকা পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন। মধুসূদন কোন চিন্তা ভাবনা না করেই ঋণ নেওয়া টাকার অর্ধেক

আত্মীয়টিকে দিয়েছিলেন। এরকম স্বভাবের জন্য বিদ্যাসাগর একদিন তিরস্কার করে বলেছিলেন, ঈশ্বর চন্দ্র কেন যদি স্বয়ং ঈশ্বর এসেও চেষ্টা করেন তবু তোমার অভাব দূর করা সম্ভব নয়।

১৮৭৩ সালের ২৯শে জুন এই মহান কবির মৃত্যু হয়। মধুসূদনের স্ত্রী হেনরিয়টা তিনদিন আগেই মারা যান। বন্ধুদের বলে যান যদি পারেন আমার স্বামীকে বাঁচান। আমি মরতে ভয় পাই না।

নবজাগরণের কথা শিল্পী বঙ্কিম চন্দ্র

বঙ্কিম চন্দ্রকে বলা হয় জাতীয়তাবাদের জনক। বন্দে মাতরম সংগীতের স্রষ্টা হিসেবে এদেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাসে তিনি অমরত্ব লাভ করেছেন। এই সংগীত লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে স্বদেশ প্রেম জাগিয়ে দিয়েছে। দেশোদ্ধারের মন্ত্ররূপে বন্দে মাতরম ধ্বনী উচ্চারণ করতে করতে লক্ষ লক্ষ মানুষগুলির মুখে এবং ফাসীর দড়িতে জীবন উৎসর্গ করেছে। কোটি কোটি মানুষ সামিল হয়েছে স্বদেশী আন্দোলনের মিছিলে মিটিং এ।

বঙ্কিমচন্দ্র নিজে এসব আন্দোলনের চিত্র দেখে যেতে পারেন নি। আনন্দ মঠ উপন্যাসে তিনি এই স্বপ্ন রচনা করেছিলেন ১৮৮২ সালে। তখনো জাতীয় কংগ্রেস দলের জন্ম হয় নি। ১৮৯৪ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর ১২ বছরের মধ্যেই বন্দে মাতরম ধ্বনী হয়ে উঠেছিল ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূলমন্ত্র।

নবজাগরণের মহানায়কদের মূল লক্ষ্য ছিল মানুষের মন থেকে সব রকম কুসংস্কার দূর করা, মনুষ্যত্ববোধ জাগরণের মধ্য দিয়ে জাতীয় সংস্কৃতির গৌরব বৃদ্ধি করা, ধর্মান্ধতার পরিবর্তেধর্মীয় সহিষ্ণুতা.মানসিক উদারতা, এবং ইতিহাস চেতনা জাগ্রত করা।

মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র কাব্য ও সাহিত্যের মাধ্যমে শিক্ষিত সমাজে মানসিক জাগরণ ঘটিয়েছেন। দেশের যৌবনকে উদ্দীপিত করেছেন দেশ প্রেমের উন্মাদানায়।

নবযুগের আহ্বান শিক্ষিত যুবকেরাই গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিল। নবযুগের কাব্য, উপন্যাস, প্রবন্ধ যৌবনের বিবেক বুদ্ধিকেআলোড়িত করেছিল। আবেগে ও উন্মাদনায়, আত্মশক্তিতে ও আত্মবিশ্বাসে, সংকল্পে ও স্বপ্নে প্রচন্ড শিহরণ সৃষ্টি করেছিল জাতীয় জীবনের সর্বব্যাপী চেতনায়।

এই চেতনা থেকেই জন্ম নিয়েছিল জাতীয়তাবাদ। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালী জাতীয়তাবাদকে উদ্বোধনের প্রথম লক্ষ্য হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। কারণ বাঙালীর অতীত ইতিহাস বিশ্লেষণ করে বঙ্কিমচন্দ্র উপলব্ধি করেছিলেন যে, বাঙালী জাতি ভীরু নয়। ইতিহাস চেতনার অভাবেই বাঙালী সমাজে ভীরুতা, ধর্মান্ধতা এবং কুসংস্কার সৃষ্টি হয়েছে। এই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারলেই বাঙালী জাতি ভারতীয় জাতিয়তাবাদের নেতৃত্ব দিতে পারবে।

বঙ্কিমচন্দ্র দীর্ঘজীবী ছিলেন না। মাত্র ৫৬ বছর বয়সেই তাঁর জীবন দীপ নিভে গিয়েছিল। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে সরকারী চাকুরী করার ফাঁকে ফাঁকে তিনি সাহিত্য সাধনা করেছেন। তাই সততা, দক্ষতা ও আদর্শ নিষ্ঠার সঙ্গে দুদিক রক্ষা করার জন্য তাঁকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনে বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের ফলে চিন্তা ভাবনায় বার বার বিবর্তন ঘটেছে। ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতা এবং পাশ্চাত্য দর্শন, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির উপর গভীর আকর্ষণ ও অনুরাগ ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেও।

মধুসূদনের মতই বঙ্কিমচন্দ্রও প্রথম উপন্যাসটি লিখেছিলেন ইংরেজীতে। Raj mohan's wife বঙ্কিম চন্দ্রের প্রথম উপন্যাস। সেটি জনপ্রিয় হয় নি।

বঙ্কিমচন্দ্র ছাত্র জীবন থেকেই সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। ১৮৬০ সালে বাইশ বছর বয়সে ইংরেজী উপন্যাসখানি রচিত হয়। ১৮৬৪ সালে তা প্রকাশিত হয়। পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশের সময়ই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, মাতৃভাষায় উপন্যাস না লিখলে বাঙালী জাতিকে সহজে জাগিয়ে তোলা যাবে না।

১৮৬৫ সালেই তিনি প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস "দুর্গেশনন্দিনী" প্রকাশ করে শিক্ষিত বাঙালী পাঠককে চমকে দেন। বাংলা ভাষায় এমন উৎকৃষ্ট উপন্যাস রচনা করা সম্ভব তখনকার শিক্ষিত বাঙালী সমাজে এমন আত্মবিশ্বাস ছিল না।

এই উপন্যাসের মাধ্যমেই বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা ভাষা, ভাব ও সাহিত্যে নবযুগের সূত্রপাত করেন। দুর্গেশনন্দিনী হল বাংলা সাহিত্যে প্রথম আধুনিক উপন্যাস।

বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যকাল থেকেই ইংরেজী মাধ্যমে পড়াশোনা করেছেন। হঠাৎ

করে বাংলা ভাষায় এমন শক্তিশালী সাহিত্য কিভাবে সৃষ্টি করলেন তা ভাবতেই অবাক লাগে।

বঙ্কিমের জন্মভূমি কাঁঠালপাড়া এবং পার্শ্ববর্তী গ্রাম ভাটপাড়ায় সেকালের বিখ্যাত সংস্কৃত পন্ডিতরা বসবাস করতেন। সংস্কৃত চর্চার মূল কেন্দ্র নবদ্বীপও খুব দূরে ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজী মাধ্যমে পড়াশোনা করলেও সংস্কৃত শিক্ষার সুব্যবস্থা নিজের বাড়ীতেই হয়েছিল। তাই ইংরেজী এবং সংস্কৃত দুটি শক্তিশালী ভাষা ও সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র গভীর জ্ঞান অর্জনের সুযোগ লাভ করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন মূলত ইতিহাসের ছাত্র। ইতিহাসের ঘটনা পুংখানুপুংখ ভাবে বিচার বিশ্লেষণ করার অসাধারণ ক্ষমতা দেখে প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজ অধ্যাপকরারও অবাক হয়েছিলেন।

বাঙালী জাতীর মধ্যে ইতিহাস চেতনার অভাব লক্ষ্য করে বঙ্কিমচন্দ্র বিভিন্নভাবে মনের ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। কারণ ইতিহাস চেতনা ছাড়া সমাজ চেতনা এবং জাতীয়তাবোধ গড়ে উঠে না।

আসলে ভারতের সব হিন্দু রাজ্যরাই ইতিহাস সম্পর্কে ছিলেন উদাসীন। মুসলমান শাসকরা ইতিহাসের নামে লিখেছেন নিজেদের গৌরবগাঁথা। ইংরেজরা দুদিক থেকে ইতিহাস চর্চা শুরু করেন। প্রথমতঃ দেশ শাসনের প্রয়োজনে জনগণের ঐতিহ্য এবং মানসিকতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া। দ্বিতীয়তঃ খৃষ্ট ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তুলনামূলক ইতিহাস বিচার করে খৃষ্ট ধর্মের শ্রেষ্টত্ব প্রমাণ করা।

বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে খৃষ্টান ধর্মের প্রতি কোন আকর্ষণ ছিলনা। ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি ছিল গভীর মমতাবোধ। সে গৌরব নিঃসন্দেহে প্রাচীন হিন্দু সভ্যতা। তাই প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার ইতিহাস আবিষ্কার করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। কিন্তু অতীতের বিলুপ্ত কাহিনী উদ্ধার করতে পারেন নি।

ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যের খন্ড খন্ড চিত্র আবিষ্কার করে বঙ্কিমচন্দ্র কল্পনার সাহায্যে ইতিহাসের যে ইমারত গড়েছেন তা প্রকৃত ইতিহাসের চেয়েও অনেক বেশী মূল্যবান হয়ে উঠেছে।

কারণ প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাসের যে খন্ড খন্ড চিত্র পাওয়া গেছে

সেখানে সমাজের কোন চিত্র ফুটে উঠেনি। বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কৃত সাহিত্য বিশ্লেষণ করে ইতিহাসের খণ্ডিত চিত্রকে পূর্ণতা দিয়েছেন সৃষ্টিশীল কল্পনার সাহায্যে।

এজন্যই বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাস সৃষ্টির দিকেই বেশী দৃষ্টি দিয়েছেন। বঙ্কিমের ঐতিহাসিক উপন্যাসে অতীতের সমাজ ও প্রকৃতি যেন কল কল ধ্বনিতে মুখরিত এবং জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

এসব ঐতিহাসিক উপন্যাস পাঠ করে আধুনিক শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে জেগে উঠেছে স্বদেশপ্রেম। অতীতের ইতিহাস গৌরবে, বীরত্বে, ঐতিহ্যে, সাহসিকতায় ও রোমান্টিকতায় সৃষ্টি করেছে নবজাগরণের অনুভূতি এবং মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংকল্প।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য ছিল আধুনিক ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত যুবসমাজকে মাতৃভাষায় আধুনিক বিদ্যাচর্চায় উদ্বুদ্ধ করা। দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে আধুনিক যুক্তিবাদী মানবধর্মে রূপান্তরিত করা এবং প্রাচীন শাস্ত্রীয় সংস্কার থেকে মুক্ত করা। কারণ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে ভারতীয় সব কিছুর উপর শ্রদ্ধাহীনতা দেখা দিলে মনুষ্যত্ববোধ এবং জাতীয় মূল্যবোধ হারিয়ে যাবে।

প্রাকৃতিক এবং ঐতিহাসিক কারণে পাশ্চাত্যের আদর্শ ভারতের জাতীয় আদর্শ হতে পাবে না। এই উপলব্ধি তখনকার আধুনিক শিক্ষিত অধিকাংশ যুবকেব মধ্যে ছিল না। ইংরেজী মাধ্যমে শিক্ষা এবং খৃষ্টান পাত্রীদের ব্যাপক প্রচারের ফলেই ভারতীয় সভ্যতার প্রতি বিরূপ মানসিকতার সৃষ্টি হয়েছিল। এব ফলে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে ব্যবধান বেড়ে যাচ্ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র মনুষ্যত্বকেই মানুষের ধর্ম বলে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য 'ধর্মতত্ত্ব' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি বলেছেন—

"অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত, এ জীবন লইয়া কি করিব? সারাজীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি। যথা সাধ্য পড়িয়াছি, অনেক লিখিয়াছি, অনেক লোকের সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছি। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শণ, দেশী বিদেশী শাস্ত্র পাঠ করিয়াছি। জীবনের

সার্থকতা সম্পাদনের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছি।"

"আমি কোন ধর্মকে ঈশ্বর প্রণীত বা ঈশ্বর প্রেরিত মনে করি না। ধর্মের নৈসর্গিক ভিত্তি আছে ইহা স্বীকার করি।"

"আমি এই ধর্ম ব্যাখ্যায়, যত পারি পরকালকে বাদ দিতেছি। এখন ইহকালের দুঃখকে সকলেই ভয় করে, ইহকালের সুখ সকলেই কামনা করে। ইহকালের সুখ-দুঃখের উপরেও ধর্ম সংস্থাপিত হইতে পারে।

যেদিন ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও শিল্প এবং ভারতবর্ষের নিষ্কাম ধর্ম একত্র হইবে, সেইদিন মনুষ্য দেবতা হইবে।"

ধর্মশিক্ষা করার প্রধান ধর্মগ্রন্থ যে, জীবন ও জগৎ তাও বঙ্কিমচন্দ্র ব্যাখ্যা করেছেন। —

"মনুষ্যের ধর্ম কি তাহা সন্ধান করিলেই পাওয়া যায়। যাহা থাকিলে মানুষ মানুষ, না থাকিলে মানুষ মানুষ নয়, তাহাই মানুষের ধর্ম - তাহার নাম মনুষ্যত্ব।

যে অবস্থায় মনুষ্যের সর্বাঙ্গীণ পরিনতি সম্পূর্ণ হয়, সেই অবস্থাকেই মনুষ্যত্ব বলিতেছি।"

ধর্মকে সাধারণের অনুপযোগী বলাও উচিত নহে। চেষ্টা করিলে অর্থাৎ অনুশীলনের দ্বারা সকলেই ধার্মিক হইতে পারে। আমার বিশ্বাস যে এক সময় সকল মনুষ্যই ধার্মিক হইবে।

ধর্ম সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের এই ব্যাখ্যা নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর জন্ম দিয়েছে। মনুষ্যত্বই ধর্ম এবং অনুশীলনের দ্বারা সকলেই তা অর্জন করতে পারে এ বিষয়ে নাস্তিকরাও একমত হবেন।

নতুন চিন্তা, নতুন বিচার বুদ্ধি, নতুন দৃষ্টিভঙ্গী এবং নতুন আদর্শের প্রতিষ্ঠাই নবজাগরণের মূল বৈশিষ্ট্য। বঙ্কিমচন্দ্র শুধু নতুন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত থাকেন নি, মানুষের প্রাণ শক্তিকেই তিনি জাগিয়ে দিয়েছেন, যে শক্তি দেশভক্তি রূপে উৎসারিত হয়ে দেশোদ্ধারের জন্য জীবন উৎসর্গ করার সংকল্প জাগিয়ে দিয়েছে।

রামমোহন, বিদ্যাসাগর এবং মধুসূদন পর্যন্ত অর্ধশতাব্দীর নবজাগরণের ঢেউ যখন প্রবল আকারে সমাজকে আলোড়িত করেছিল ঠিক তখনই বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব ঘটেছিল।

দীর্ঘকালের জড়তা কাটিয়ে নবচেতনার ধাক্কায় যুবশক্তি কিছুটা দিশাহারা অবস্থায় পড়েছিল। অনুকরণ প্রিয়তা অনেকটা বাহ্যিক সংস্কারের রূপ নিয়ে সামাজিক জীবনে নানা সংকট সৃষ্টি করেছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিশাল প্রতিভা জাতীয় ভাবনায় দেহ-মন ও প্রাণের সর্বাঙ্গীন বিকাশের এক বলিষ্ঠ আদর্শ স্থাপন করে জাতীয় সংকট থেকে মুক্তির পথ খুলে দিয়েছিল।

এসব ঘটনায় প্রমাণ হয়, পাশ্চাত্য জ্ঞান, বিজ্ঞানের শিক্ষাই নবজাগরণের নৈতিক শক্তি সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট ছিলনা। প্রয়োজন ছিল যুগসন্ধিক্ষণে জাতীয় চিন্তা ভাবনায় বিক্ষিপ্ত শক্তিকে সংহত রূপ দেবার মত প্রতিভাবান ব্যক্তির।

আমাদের সৌভাগ্য যে যুগপরিবর্তনের ধারায় জাতির সমষ্টিগত আত্মরক্ষার প্রয়োজনে একের পর এক প্রতিভাবান পুরুষেরা এদেশে আবির্ভূত হয়েছেন এবং স্বজাতি, স্বসমাজ ও স্বদেশকে সমন্বয় সাধনের পথে বলিষ্ঠ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের অনন্য ভূমিকা নবযুগের ইতিহাসে সর্বজন-স্বীকৃতি লাভ করেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র জাতির চিত্ত ও প্রাণশক্তিকে জাগিয়ে দেবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। জাতীয় সংস্কৃতির নতুন পথ সৃষ্টি করার সাধনাই তিনি করেছেন। রাষ্ট্র, সমাজ ও ধর্মের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেবার কথা কখনো ভাবেন নি।

আধুনিকযুগের উপযোগী জীবন দর্শণ সৃষ্টি করাই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের মূল লক্ষ্য। তিনিই সর্বপ্রথম পুরাতন চিন্তাকে নতুন পথে প্রবাহিত করার রাজপথ সৃষ্টি করেছেন। আধুনিক উপন্যাসের মধ্যে ভাবনা-চিন্তা, বিচার-বিশ্লেষণ, সিদ্ধান্ত গ্রহন এবং কর্মপন্থা স্থির করার পদ্ধতি বিস্তৃত ভাবে তুলে ধরেছেন। জাতি ও সমাজের ভবিষ্যত চিন্তাই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের মূল তপস্যা।

ভারতীয় ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজ জীবনে যে সব বিকৃতি, ঘটেছিল এবং যে

সব বিকৃত চিন্তায় সমাজের সর্বস্তরের মানুষ অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল, যাকে আমরা ধর্মান্ধতা এবং অন্ধ বিশ্বাস বলে চিহ্নিত করেছি, তার বিস্তারিত স্বরূপ বিশ্লেষণ করে বঙ্কিমচন্দ্র পাঠকদের সামনে অসংখ্য চরিত্র তুলে ধরেছেন তাঁর সব কয়টি উপন্যাসে।

সমাজের জীবন্ত রূপ অন্তদৃষ্টির মাধ্যমে পাঠকের মনকে তীব্রভাবে আলোড়িত করেছে। জাগিয়ে দিয়েছ সংশোধনের প্রচন্ড আকাংক্ষা। সৃষ্টি করেছে সমাজ পরিবর্তনের সংকল্পে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কর্মীদল।

সৃষ্টিকর্ম শুধুমাত্র কল্পনার দ্বারা সম্পন্ন করা যায় না। জীবনের বাস্তবতাকে উপলব্ধি করা এবং অন্যের মধ্যে সেই উপলব্ধি জাগিয়ে দেওয়া মহৎ সাহিত্য স্রষ্টার প্রধান কাজ। বর্তমানকে দেখা, অতীতকে বিশ্লেষণ করা এবং ভবিষ্যতের জন্য আদর্শ সৃষ্টি করা প্রতিভাবান ব্যক্তিদের দ্বারাই সম্ভব। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে সেরকম একটি প্রতিভা যিনি ভবিষ্যতের বাঙ্গালী সমাজকে গড়ে উঠার পথ দেখিয়েছেন। বাঙ্গালী জাতিকে পথ দেখাবার মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতকে

জাগিয়ে দেবার দায়িত্বভার সচেতন বাঙ্গালীদের হাতে তুলে দেওয়া। একদল বাঙ্গালী বিপ্লবী যুবদল সেই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন ইতিহাস তার সক্ষী।

বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন তত্ত্ব অনসরণ করেই ১৯০২ সালে বিপ্লবী অনুশীলন দলের জন্ম হয়েছিল। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনে বিপ্লবী অনুশীলন দল ও যুগান্তর পার্টি অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দে মাতরম সংগীত স্বদেশী আন্দোলনের মূল মন্ত্র হয়ে উঠেছিল।

আনন্দ মঠ, দেবী চৌধুরানী এবং সীতারাম এই তিনটি উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন যে, যে কোন নিরক্ষর মানুষও উপযুক্ত অনুশীলনের মাধ্যমে পূর্ণ মুষ্যত্বের অধিকারী হয়ে অসাধ্য সাধন করতে পারে।

নবজাগরণের মূল সাধনা সার্বজনীন মনষ্যত্বের সাধনা। এই তত্ত্বই মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর মূল ভিত্তি । বঙ্কিমচন্দ্র এই ভিত্তিকেই মজবুত করেছেন সুদক্ষ ও সচেতন কথাশিল্পীরূপে।

নব জাগরণের সব মহানায়কেরাই জীবিতকালে প্রগতি বিরোধী গোঁড়া পন্থীদের তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন আবার মৃত্যুর পরে প্রগতিবাদীদের সমালোচনার লক্ষ্য হয়েছেন।

বাঙ্গালী জাতির এই বিপরীত ধর্মী সমালোচনা প্রবনতার মধ্যে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধ সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, সংবাদপত্র প্রকাশ করেছেন, সমালোচনা ও আত্ম সমালোচনার বিভিন্ন পথ দেখিয়েছেন। ইতিহাস চেতনা এবং সমাজ চেতনার বিকাশ ঘটিয়ে জাতীয় বিবেক সৃষ্টি করেছেন।

দেশ ও জাতির ইতিহাস যারা জানে না, তারা জাতির জীবন ও সংস্কৃতি সম্পর্কেও সমান অজ্ঞ। বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্যের হিতবাদী দর্শন ও আদর্শের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। আবার প্রাচ্যের ধর্ম-দর্শন ও সংস্কৃতি সম্পর্কেও সমান শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। দুটি বিপরীত ধর্মী আদর্শের সমন্বয় সাধনে বঙ্কিমচন্দ্র অসাধারণ সৃষ্টিশীল প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। এর ফলে নব জাগরণের ঢেউ সর্বস্তরে বিস্তার লাভ করেছিল।

আধুনিক বাংলা উপন্যাসের জনক বঙ্কিমচন্দ্র

বাংলায় নবজাগরণের মধ্যস্তরে, রামমোহন, বিদ্যাসাগর এবং মধুসূদনের পরে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব ঘটেছে। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন মধুসূদনের চেয়ে ১৪ বছরের ছোট এবং বিদ্যাসাগরের চেয়ে ১৮ বছরের ছোট।

এই সময় বাংলায মধ্যযুগের অবসান ঘটে গেছে। রামমোহনের প্রবর্তিত যুক্তিবাদী চিন্তা ধারায় নবজাগবণের প্রবল স্রোতে মধ্যযুগের সমাজ ভেঙ্গে ভেঙ্গে নবযুগেব স্ফূরণ ঘটছে। সমাজ জীবনে চলছে দিশাহারা অস্থিরতা।

একদল যুবকের মধ্যে ছিল প্রবল পাশ্চাত্য অনুরাগ। তাদের দৃষ্টিতে পাশ্চাত্যের সব কিছু ভাল, এবং প্রাচ্যের সব কিছু খারাপ।

আরেক দলের মধ্যে ছিল পাশ্চাত্যের সব কিছুর প্রতি অন্ধ বিরোধীতা এবং প্রাচ্যেব সবকিছুর প্রতি অন্ধ অনুবাগ।

বঙ্কিমচন্দ্র এই দুই দৃষ্টিভঙ্গীব মধ্যে সমন্বয় ঘটাবার সংকল্প নিয়ে সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। যুক্তি-তর্ক, বিচার -বিশ্লেষণ, তথ্য তত্ত্ব সব কিছুই অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সাহিত্যে প্রয়োগ করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। সব কিছুরই মূল লক্ষ্য ছিল মানব কল্যাণ।

বঙ্কিমচন্দ্র দেশী-বিদেশী ইতিহাস এবং পাশ্চাত্যের হিতবাদী দর্শনে সুপন্ডিত ছিলেন। পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ কোঁৎ, মিল, বেন্থাম, হ্যামিলটন, রীড, স্টুয়ার্ট, স্পেনসার প্রভৃতির রচনাবলী বঙ্কিমচন্দ্র গভীর মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করেছেন। আবার ভারতীয় শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদদের রচনাবলীও অধ্যয়ন করেছেন।

ফলে, বঙ্কিচন্দ্র হয়ে উঠেছিলেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ পন্ডিত এবং চিন্তাবিদ। তাঁর সাহিত্য চর্চা ছিল সুপরিকল্পিত এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত। সে লক্ষ্য হল,সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণ সাধন। এ লক্ষ্যই হল নবজাগরণের

মূল স্রোত এবং আধুনিক যুগের মূল ভিত্তি। ব্যক্তির সর্বাঙ্গিন বিকাশই হল এ যুগের নতুন আদর্শ।

১৮৫৮ থেকে ১৮৬২ সাল পর্যন্ত মধুসূদন ঝড়ের বেগে বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হয়ে পাঁচ বছরের সাধনায় বাংলা-কাব্য, ছন্দ, ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীতে নব জাগরণের প্রবল স্রোত সৃষ্টি করেন। বাংলা নাটকে সৃষ্টি করেন নব যুগ। এর পরেই বারিষ্টারী পড়ার জন্য লন্ডন চলে যান।

এর পরেই ১৮৬৫ সালে বঙ্কিমচন্দ্র আবির্ভূত হন-দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাস নিয়ে। সাহিত্যের এই রোমান্টিক ধারা বাংলা সাহিত্যে ছিল সম্পূর্ণ নতুন এবং অভিনব।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে যুক্তিবাদী চিন্তাধারায় সমৃদ্ধ নবজাগরনের যে যুগের সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্রের সময় তা একটি পরিনত আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

অসংখ্য প্রতিভাশালী ব্যক্তির আবির্ভাবে এই যুগ সমৃদ্ধ হয়েছে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, গিরিশচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, রঙ্গলাল, ঈশ্বরগুপ্ত, ভূদেবচন্দ্র, প্যারীচাঁদ, হেমচন্দ্র, বিহারীলাল, কালীপ্রসন্ন সিংহ, দীনবন্ধু মিত্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, অমৃতলাল, নবীনচন্দ্র ইত্যাদি প্রতিভাবান ব্যক্তিদের আবির্ভাবে বাংলা সমাজ ও সাহিত্য নানাভাবে নানাদিকে সমৃদ্ধিলাভ করেছে।

তবে সৃষ্টিশীলতার দিক থেকে যারা অসাধারণ অবদান রেখেছেন তারাই মহানায়ক রূপে চিহ্নিত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঊনবিংশ শতাব্দীতে আর্বিভূত হলেও তিনি নবজাগরণের স্রোতে যোগ দিয়েছেন বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে। তিনি একাই বিংশ শতাব্দীর মহানায়করূপে বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ১৯১৩ সালের নোবেল প্রাইজ তারই আন্তজার্তিক স্বীকৃতি।

১৮১৫ সালে যে লক্ষ্য সামনে রেখে রামমোহন আত্মীয়সভা গঠন করেছিলেন ঠিক পঞ্চাশ বছর পরে ১৮৬৫ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী সে লক্ষ্যের পরিনতঃ প্রতীকরূপে প্রকাশিত হয়েছে। দুর্গেশনন্দিনী - ছিল বাংলা

সাহিত্যের প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস। এই গ্রন্থে তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাসের একটি আদর্শ স্থাপন করেন। ইতিহাস চেতনা ছিল মূল লক্ষ্য।

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে মূল ঐতিহাসিক চরিত্র ও ঘটনাবলী অক্ষুন্ন রেখে কল্পিত চরিত্র সৃষ্টি করে সমাজ চিত্র ও সামাজিক মানসিকতা ফুটিয়ে তোলাই ঐতিহাসিক উপন্যাসের মূল আদর্শ।

দুর্গেশ-নন্দিনী উপন্যাসে- মানসিংহ, জগৎ সিংহ, কুৎলু খাঁ, খাজা ইসা, উসমান এই কটি চরিত্র ঐতিহাসিক। আয়েষা, তিলোত্তমা, বিমলা ইত্যাদি চরিত্রগুলো সবই কাল্পনিক।

বঙ্কিমচন্দ্র মোট সাত খানা ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেছেন- ১) দুর্গেশ নন্দিনী, ২) মৃণালিনী, ৩) চন্দ্রশেখব ,৪) রাজ সিংহ, ৫) আনন্দ মঠ, ৬) দেবী চৌধুরানী, ৭) সীতারাম।

ইতিহাস ও কল্পনার মিশ্রণে অসাধারণ আবেগ সৃষ্টিকারী উপন্যাসগুলোর পক্ষে বিপক্ষে অনেক সমালোচনা হয়েছে। শেষ জীবনে বঙ্কিমচন্দ্র মাত্র তিন খানি উপন্যাসকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে গ্রহণ করেছেন। সেগুলো হল- ১) আনন্দ মঠ, ২) দেবী চৌধুরানী, ৩) সীতারাম। বাকী চারখানা উপন্যাসে ইতিহাস অপেক্ষা কল্পনার ভাগ বেশী বলে যে সমালোচনা হয়েছে তা তিনি মেনে নিয়েছেন।

কিন্তু বিশিষ্ট সমালোকদের মতে, আধুনিক বিচারে উপরোক্ত সাতখানি উপন্যাসই ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসেবে গণ্য হওয়া উচিত। কারণ উপন্যাস হল সাহিত্যের একটি বিশেষ অঙ্গ। ঐতিহাসিক উপন্যাস পাঠ করে পাঠক যে আনন্দ এবং ইতিহাস চেতনা লাভ করেন, তা প্রকৃত ইতিহাস পাঠ করে পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিক উপন্যাস পাঠ কবে লক্ষ লক্ষ পাঠক ইতিহাসের জ্ঞান অর্জন করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন আদর্শবাদী লেখক। যা সত্য তাই তিনি গ্রহণ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পরে বিংশ শতাব্দিতে ইতিহাসের বহু নতুন তথ্য গবেষকরা আবিষ্কার করেছেন। তার সঙ্গে মিলিয়ে পাঠকরা নতুন তথ্য গ্রহণ করতে পারেন।

দুর্গেশনন্দিনী- বাঙ্গালী পাঠকের মনকে চমকিত করেছিল। ঘটনার উপস্থাপনে, পরিবেশ সৃষ্টিতে, চরিত্র বর্ণনায় ও নির্মানে, ভাষার নবীনতা ও

রোমান্টিকতায় এক অভিনব আবেগ সৃষ্টি করে পাঠকের রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছিল- দুর্গেশনন্দিনী। সেকালের সমস্ত পত্রিকারয় পঞ্চমুখে প্রশংসা করে নানাভাবে প্রচার করা হয়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালেই দুর্গেশনন্দিনীর তেরটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল এবং দেশেব বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় উপন্যাস **কপালকুন্ডলা** এক বছর পর ১৮৬৬ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র একটি বিশেষ সামাজিক সমস্যার পরীক্ষা করতে চেষ্টা করেছেন।

যদি একটি শিশু জন্মের পরেই সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় সমুদ্রের উপকুলে বনের মধ্যে কোন কাপালিকের দ্বারা প্রতিপালিত হয়, তবে যৌবনকালে সমাজের কোন ব্যক্তিকে বিয়ে করে সামাজিক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারবে কিনা- এই প্রশ্নের সমাধানের লক্ষ্যে কপালকুন্ডলা রচনা করেছিলেন।

মেদিনীপুরের কাঁথি অঞ্চলে চাকুরী করাব সময় একজন কাপালিকের সঙ্গে পরিচয়ের পর এরকম চিন্তা বঙ্কিমচন্দ্রের মস্তিষ্কে ঘুরতে থাকে। তারই পরিনতিতে কপাল কুন্ডলা উপন্যাসের সৃষ্টি। অপূর্ব রোমান্টিকতায় ২৫০ বছর আগেকার গঙ্গাসাগর মেলাকে সামনে তুলে ধরে তিনি এই নতুন ধরনের উপন্যাসকে বাঙ্গালী পাঠকের হাতে তুলে দিয়েছেন। কপাল কুন্ডলা উপন্যাসটিও বহু ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশিত হয়েছে। অনেকের মতে উপন্যাসটি বর্ণনার গুণে একটি গদ্যকাব্য হয়ে উঠেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের তৃতীয় উপন্যাস **মৃণালিনী** প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ সালে। এই গ্রন্থে সর্বপ্রথম স্বাদেশিকতার আদর্শ প্রচার করা হয়।

বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বখতিয়ার খিলজি মাত্র ১৭ জন অশ্বারোহী সেনা নিয়ে বাংলা দখল করেছেন বলে ইতিহাসে যে বর্ণনা দেওয়া আছে, বঙ্কিমচন্দ্র এই কাহিনী বিশ্বাস করতে পারেন নি। বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণ সেনের মন্ত্রী ও সেনাপতি বিশ্বাস ঘাতকতা করে রাজা হবার লোভে মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল বলে বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাস করতেন। সেটাই এই উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন।

মৃণালিনী উপন্যাসটিও বর্ণনার গুণে গদ্যকাব্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন হয়ে উঠেছে। মৃণালিনী এবং গিরিজায়ার কণ্ঠে অনেকগুলো ছড়া ও বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গীত পাঠককে শুনিয়েছেন লেখক বঙ্কিমচন্দ্র।

চতুর্থ উপন্যাস **বিষবৃক্ষ** একটি উৎকৃষ্ট সামাজিক উপন্যাস । অনেক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছে বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকার করেছেন যে, বিষবৃক্ষ উপন্যাসে লেখকের পারিবারিক জীবনের অনেক ঘটনা স্থান পেয়েছে। সূর্যমূখী আসলে বঙ্কিমচন্দ্রের স্ত্রীর চরিত্রেরই ছায়া। কুন্দনন্দিনীর চরিত্রটি সৃষ্টি হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠা কন্যার ছায়া অবলম্বনে।

বিষবৃক্ষ- উপন্যাসটি দেশী বিদেশী বহু ভাষায় অনুদিত হয়েছে। রঙ্গমঞ্চেও বহুবার অভিনীত হয়েছে। ইংরেজী অনুবাদে গ্রন্থটির নাম হয়েছে The poison Tree.

বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন মানব জীবনের রহস্য আবিষ্কারে অবিরাম অনুসন্ধানী কথাশিল্পী । কল্পনা-শক্তির বিশালতায় সামান্য কাহিনী ও অসামান্য হয়ে উঠেছে বঙ্কিমচন্দ্রের কথা সাহিত্যে। **ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয়, রাধারানী ও রজনী** এই চারখানি উপন্যাসকে আধুনিক বড় গল্পও বলা যায়। এই গ্রন্থগুলোতে বঙ্কিমচন্দ্রের কবি মন যেন কিছুকাল বিশ্রাম নিয়েছে। আনন্দ ঘন পারিবারিক সমস্যাকে হালকা চালে রহস্যঘন বস সৃষ্টির মাধ্যমে মিলনান্তক সমাধান দিয়েছেন চারটি গল্পে।

চন্দ্রশেখর- উপন্যাসে ইংরেদের সঙ্গে নবাব মীরকাশিমের যুদ্ধের ঘটনা গল্পের সজীবতার জন্যই টেনে এনেছেন, ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার উদ্দেশ্যে নয়। এই উপন্যাসে প্রতাপকে একটি আদর্শ চরিত্র হিসেবে গড়ে তুলেছেন। রামানন্দ স্বামী, চন্দ্রশেখর, রামচরণ, শৈবালিনী গল্পের প্রয়োজনে সৃষ্ট বিশেষ বিশেষ চরিত্র। আধ্যাত্মিক যোগবলের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্বাস এই উপন্যাসে প্রথম প্রকাশ পায়। প্রতাপের চরিত্রের মধ্যে ফুটে উঠেছে এক বলিষ্ঠ স্বদেশ প্রেমিক ।

কৃষ্ণকান্তের উইল- বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসগুলোর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট এই গল্পের ভ্রমর হল শ্রেষ্ঠ আদর্শ।

যৌথ পরিবার ভেঙ্গে যাচ্ছে। ভাইদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটছে।

অনেক ক্ষেত্রে ভাইয়ে ভাইয়ে শত্রুতা সৃষ্টি হচ্ছে। এটা সেকালের সাধারণ চিত্র।

কৃষ্ণকান্তের উইলে বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের পরিবারের সমস্যা ফুটে উঠেছে। পিতা যাদব চন্দ্রের একটি উইলকে কেন্দ্র করে ভাইদের মধ্যে বিরোধ এমন পর্যায়ে উঠেছিল যে বঙ্কিমচন্দ্র পৈতৃক নিবাস কাঁঠালপাড়া ত্যাগ করে চুচুঁড়ায় গিয়ে বসবাস শুরু করেন।

তবে উপন্যাসে সমাজের বাস্তব চিত্রই তুলে ধরেছেন। সব যৌথ পরিবারেই তখন ভাঙ্গন শুরু হয়েছিল। এই উপন্যাসের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ১) সহজ ও সংযত ভাষায় ঘটনার বিন্যাস এবং ২) বাঙ্গালী সমাজের মধ্যবিত্ত জীবনধারার জীবন্ত চিত্র পাঠকের অভিজ্ঞতার সঙ্গেঁ সামঞ্জস্যপূর্ণ করে গড়ে তোলা হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র জীবনের শেষ পর্বে এসে উদ্দেশ্য মূলকভাবে সুপরিকল্পিত কাহিনী নিয়ে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা শুরু করেন।

এই পর্বে **রাজসিংহ, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী,** ও **সীতারাম** এই চার খানি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন।

রাজসিংহ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৮২ সালে। তখন পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল মাত্র ৮৩। তারপর প্রতি সংস্করণে পৃষ্ঠা সংখ্যা বাড়তে থাকে। ১৮৯৩ সালে চতুর্থ সংস্করণে পৃষ্ঠাসংখ্যা হয় ৪৩৪। ইতিহাসের ঘটনাবলী বিস্তারিত বিশ্লেষণ করার পর একটি পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক উপন্যাস রূপে রাজসিংহকে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করেন।

অন্যান্য উপন্যাসের ক্ষেত্রেও বঙ্কিমচন্দ্র বিভিন্ন সংস্করণে ঘটনা ও চরিত্রে রূপান্তর ঘটিয়েছেন। লেখকের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গীরও কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে।

রাজপুত জাতির বীরত্ব ও গৌরব গাঁথা তুলে ধরাই ছিল রাজসিংহ উপন্যাসের মূল লক্ষ্য। বঙ্কিমচন্দ্র মুসলিম ইতিহাসের সঙ্গে অন্যান্য তথ্য বিশ্লেষণ করে উপলব্ধি করেন যে মুসলিম ঐতিহাসিকগণ হিন্দু রাজাদের গৌরব গাঁথা এবং বীরত্বের কাহিনী অনেক ক্ষেত্রে লুকিয়েছেন। অথচ মোগল শাসকদের বিরুদ্ধে রাজপুত এবং মারাঠাদের অনেক বীরত্বপূর্ণ সংঘর্ষের ঘটনা বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা গেছে।

ইতিহাসের হারিয়ে যাওয়া ঘটনাবলীকে উপন্যাস লেখক অনায়াসে কল্পনার সাহায্যে জীবন্ত রূপ দিতে পারেন। বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসেক উপন্যাস রচনায় এই স্বাধীনতা কাজে লাগিয়েছেন। জনগণের মধ্যে ইতিহাস চেতনা এবং জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করাই ছিল মূল লক্ষ্য।

রাজসিংহের সঙ্গে মোগল বাদশাহের যে যুদ্ধ হয়েছিল তার সবটুকু ইতিহাস উপন্যাসের অর্ন্তভূক্ত করার ফলেই গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করতে হয়েছে। তা না হলে কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যেত এবং রাজপুত বীরদের বীরত্ব ও নীতিবোধের পরিচয় স্পষ্ট হত না।

বঙ্কিমচন্দ্র রাজসিংহকে প্রথম সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। কারণ এই সময়ের ইতিহাস স্পষ্টরূপে জানা গেছে এবং যুদ্ধের ফলাফল ও ঘটনাবলী ইতিহাসকে অনুসরণ করেই রচিত হয়েছে। ঐতিহাসিক চরিত্রগুলো অক্ষুন্ন রেখেই কাহিনী সৃষ্টি হয়েছে। একটি যুগের অবসান হয়ে আরেকটি যুগের দিকে ইতিহাসের গতি এগিয়ে চলেছে, রাজসিংহ উপন্যাসে তা সুনিপুনভাবে দেখানো হয়েছে।

এর পরেই প্রকাশিত হয়েছে যুগান্তকারী উপন্যাস আনন্দ মঠ। আমাদের জাতীয় জীবন গঠনে আনন্দ মঠ কি পরিমান প্রভাব ফেলেছে তা এখনো সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়ে উঠেনি।

শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকদের মধ্যে স্বদেশপ্রেমের সঙ্গে সঙ্গে মহান ত্যাগের ব্রত এবং সেবা ধর্মের গভীর আবেগ সৃষ্টি করেছে আনন্দমঠ।

শুধু তাই নয়, এই উপন্যাসেই বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্ট ভাবে দেখিয়েছেন যে রাষ্ট্র শক্তির পরিবর্তন ঘটাতে হলে কঠোর অনুশীলনের দ্বারা মনুষ্যত্বেবে পুরপূর্ণ বিকাশ ঘটিয়ে শাসক শ্রেনীর সমকক্ষ হতে হবে এবং আধুনিক অস্ত্র নির্মান করে আধুনিক যুদ্ধ কৌশল আয়ত্ত করতে হবে।

আনন্দমঠ প্রকাশিত হবার পর জনগণের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে বৃটিশ সরকার আনন্দ মঠ গ্রন্থ খানি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে সাহস পায় নি।

একজন উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারী হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রকে অনেক ক্ষেত্রে

সংযম রক্ষা করে চলতে হয়েছে। বঙ্গদর্শন পত্রিকায় ছদ্মনামে বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতে হয়েছে। সিপাহী বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ এবং ঝাঁসীর রানী লক্ষীবাঈ সম্পর্কে গ্রন্থ রচনার পরিকল্পনা স্থগিত রাখতে হয়েছে।

১১৭৬ বঙ্গাব্দের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে আনন্দ মঠ রচিত হয়েছে। তখনো ইংরেজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নি। কিন্তু দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের জন্য ইংরেজ এবং মুসলিম শাসকরা কোন ভূমিকাই পালন করেনি।

ছিয়াত্তোরের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ঘটনাকে আনন্দমঠের মূল কাহিনীরূপে স্থাপন করা হয়েছে। সেই দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ চিত্র উপন্যাসের পাতায় যারা পড়েছেন তাদের মন বিক্ষোভে, বিদ্রোহে তরঙ্গায়িত হয়েছে। যাদের ঘরে লক্ষ লক্ষ টাকা ছিল তারাও অনাহারে মরেছে। ক্ষুধার্ত মানুষ কুকুর, বিড়াল, ইঁদুর এমন কি মানুষের মাংস খেয়েও বাঁচার চেষ্টা করেছে। বহু নিরীহ সৎ মানুষ চুরি ডাকাতি করে জীবন রক্ষা করেছে। ডাকাতদল অর্থ বা অলংকার নিতে আগ্রহী ছিল না। তাদের দাবী ছিল খাদ্য।

আনন্দমঠে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীরা যেভাবে দেশ ও জাতিকে উদ্ধার করার জন্য বিদ্রোহের পতাকা হাতে নিয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাদের শক্তি, সাহস ও প্রেরণার মূল মন্ত্র ছিল-বন্দে মাতরম।

এই মন্ত্রের জন্যই আনন্দমঠ নিষিদ্ধ হয়েছিল এবং দেশে বিদেশে বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ উঠেছিল। আজো এ বিষয়ে সমালোচকের অভাব নেই।

অথচ বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর ১২/১৩ বছরের মধ্যেই দেশের শতকরা আশীজন মানুষ এই মন্ত্রের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশোদ্ধারের সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল। হাসি মুখে মৃত্যু বরণ করেছিল শত শত স্বাধীনতা সংগ্রামী।

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশ প্রীতির মধ্যে কোন সংকীর্ণতা ছিল না। একদিকে আনন্দমঠ যেমন প্রবল স্বদেশ প্রীতি জাগিয়ে জাতীয়তাবোধের উদ্বোধন ঘটিয়েছে, অন্যদিকে তেমনি সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পরিনাম দেখিয়ে আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে লেখক বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, বিশ্ব কল্যাণ কামনা থেকে বিচ্ছিন্ন হলে এবং দেশবাসীর সার্বিক সমর্থন না পেলে কোন বিদ্রোহ-বিপ্লব সফল হতে পারে না।

আনন্দমঠের দু'বছর পর **দেবী চৌধরাণী** প্রকাশিত হয়। দেবী চৌধরাণীতে বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন কিভাবে কঠোর অনুশীলনের দ্বারা অতি নিরীহ ও নিরক্ষর একজন মানুষের মধ্যেও মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটানো যায়।

রংপুর জেলার ইতিহাস থেকে জানা যায় দেবী চৌধুরাণী, ভবাণী পাঠক, গুডলেড সাহেব, লেফটেন্যান্ট ব্রেনান সাহেব এরা ছিলেন ঐতিহাসিক ব্যক্তি। দেবী চৌধরাণীর নৌকাবাস, বরকন্দাজ বাহিনীর কথা ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে। আধুনিক বিচারে ইতিহাসের উপাদান এবং লেখকের কল্পনায় তৈরী মিশ্র কাহিনীকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলেই গণ্য করতে হবে।

গ্রাম্য বধু প্রফুল্লকে ব্যাকরণ, দর্শণ, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিয়ে দেবী চৌধরাণীতে রূপান্তরিত করা এবং ইংরেজ বাহিনীর বিরুদ্ধে দুঃসাহসী অভিযানে নিযুক্ত করে বুদ্ধি ও কৌশলের দ্বারা জয়ী করা লেখকের একটি সুপরিকল্পিত আদর্শ প্রতিষ্ঠারই সার্থক প্রয়াস।

দুর্দশাগ্রস্থ কৃষকের দুর্দশা মোচনের জন্য প্রয়োজনে বল প্রয়োগ করে সম্পদ সংগ্রহ করা এবং দুস্থ মানুষের মধ্যে সেই সম্পদ বন্টন করার নীতি লেখক অনুমোদন করেছেন।

কিন্তু নারীর পক্ষে এরূপ কাজে নেতৃত্ব দেওয়া উচিত কিনা এ বিষয়ে নানা প্রশ্ন এবং দ্বন্দ্ব দেখা দেওয়ায় তিনি প্রফুল্লকে পরিবাব জীবনে ফিরিয়ে নিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত আজো সমালোচনার বিষয় হয়ে আছে।

কথাশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ উপন্যাস **সীতারাম**। বাংলার ইতিহাসে সীতারাম একজন জমিদার। সাহসে, বুদ্ধিতে, এবং স্বজাতি ও স্বদেশের প্রতি কর্তব্যবোধে একজন আদর্শ চরিত্র হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র সীতারামের কাহিনীকে বেছে নিয়েছেন।

অতীতের ইতিহাস থেকে লেখক প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, বাঙ্গালী জাতি হিসেবে ভীরু নয়। মনুষ্যত্বের অভাবেই এই জাতির অধঃপতন ঘটেছে। মনুষ্যত্ব অর্জণের মাধ্যমেই এই জাতি আবার সাহসে, বীরত্বে ও গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বলিষ্ঠ জাতি গঠনের ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে পারবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত যে, বাস্তব তা বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনে ও স্বদেশী আন্দোলনে প্রমাণিত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র মোট ১৪ খানা উপন্যাস রচনা করেছেন। প্রতিটি গ্রন্থে তিনি বহুমুখী জীবন জিজ্ঞাসার কালজয়ী শিল্পরূপ দিয়েছেন। রসসৃষ্টিতেও অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

১৮৬৫ থেকে ১৮৮৭ সাল পর্যন্ত ২২ বছর ধরে তিনি অতি দক্ষতার সঙ্গে সরকারী কর্তব্য পালন করেও কঠোর পরিশ্রম করে প্রয়োজনীয় গ্রন্থ পাঠ এবং সুপরিকল্পিত গ্রন্থ রচনার কাজ চালিয়ে গেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছিল সুদূর অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সমাজ জীবনের দিকে। ইহকাল, পরকাল, লোকজীবন, নগরজীবন, যৌথ পরিবার, ব্যক্তি ও সমাজ ইত্যাদি বিচিত্র ধারায় জীবন রহস্য বর্ণনা করে পাঠকের মনকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করেছেন প্রতিটি উপন্যাসে।

বঙ্কিমচন্দ্র কাহিনী বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে পাঠকের সঙ্গেও কথা বলেছেন, উপদেশ দিয়েছেন। যেমন কপালকুন্ডলা উপন্যাসে পরহিতব্রতী নবকুমার পরের উপকার করতে গিয়ে নির্জন সমূদ্র তীরে যখন নির্বাসিত হয়েছেন, তখন পাঠকের মনে হতে পারে যে এ সংসারে পরের উপকার করলে বিপদে পড়তে হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র তখন পাঠককে উপদেশ দিচ্ছেন —"তুমি অধম বলিয়া আমি উত্তম হইবনা কেন?" বঙ্কিমচন্দ্র একদিকে যেমন সুদক্ষ কথাশিল্পী এবং সৌন্দর্য স্রষ্টা, অন্যদিকে তেমনি ছিলেন সমাজ সংগঠক। অসংযত প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে তিনি শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন। সামাজিক শৃঙ্খলা এবং সমৃদ্ধির জন্য সংযম, ত্যাগ, ও সেবার মনোভাব একান্ত প্রয়োজন বলে তিনি বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে দেখিয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন বাস্তববাদী কথা শিল্পী। বাংলা কথাসাহিত্যকে বিশ্বমানে উন্নীত করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছেন। বিরূপ সমালোচনাকে অগ্রাহ্য করেছেন। **নবীন লেখকদের উদ্দেশ্যে দুটি বিশেষ উপদেশ তিনি দিয়েছেন। (১) সাহিত্য চর্চার মূল লক্ষ্য হতে হবে সৌন্দর্য সৃষ্টি ও আনন্দ দান এবং (২) দ্বিতীয় লক্ষ্য হবে মানুষের মঙ্গল সাধন এবং পরোপকারের প্রবৃত্তি জাগিয়ে দেওয়া।**

আধুনিক বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য সম্রাট রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। একদিকে আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের সম্রাট, অন্যদিকে আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যেরও সম্রাট।

চৌদ্দটি উপন্যাস লিখে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে অমরত্ব লাভ করেছেন। একই সঙ্গে বাঙ্গালী জাতি গঠনের লক্ষ্যে প্রবন্ধ রচনা করে ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী রূপে ঋষির আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

জাতির প্রতি কর্তব্যবোধ এবং মানবতাবাদী আদর্শ প্রতিষ্ঠার আকাংক্ষা বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য চর্চার মূল প্রেরণা।

কথা সাহিত্যের মাধ্যমে প্রাণের জাগরণ ঘটিয়েছেন, এবং প্রবন্ধ সাহিত্যের মাধ্যমে চরিত্র গঠন এবং কর্মপ্রেরণা যুগিয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ সাহিত্য তিনটি ধারায় প্রবাহিত। —

(১) লোক রহস্য মূলক লঘু রচনা

(২) বিজ্ঞান রহস্য মূলক গম্ভীর রচনা।

(৩) ইতিহাস চেতনা ও ধর্ম চেতনা মূলক গম্ভীর রচনা।

এই তিনটি ক্ষেত্রেই তিনি অতুলনীয় দক্ষতা এবং জ্ঞানের গভীরতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনটি ক্ষেত্রেই তিনি নতুন আদর্শ স্থাপন করেছেন। শুধু বিষয় বৈচিত্র্যে নয়, ভাষায় বর্ণনায়, প্রকাশ ভঙ্গীতেও সৃষ্টি হয়েছে নতুনত্ব এবং অভিনবত্ব।

গুরুগম্ভীর বিষয়কে হাস্য রসের মাধ্যমে লঘু আলোচনায় সহজ বোধ্য করে তোলা এবং ব্যক্তি ও সমাজের দোষ ত্রুটি এবং অন্যায় আচার আচরণ ও চিন্তা-ভাবনাকে সংশোধন করা হাস্য রসাত্মক রচনার মূল উদ্দেশ্য।

এই ধারায় রচিত হয়েছে তিনটি গ্রন্থ , (১) **লোকরহস্য**, (২) **কমলাকান্ত**, (৩) **মুচিরামগুড়ের জীবন চরিত**। তিনটি গ্রন্থেরই ভাব এবং প্রকাশ ভঙ্গী এক। তিনটি গ্রন্থই লেখকের অনন্য সৃষ্টি এবং বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

লোক শিক্ষার প্রয়োজনে বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদর্শণ - নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা হয়ে উঠে বাংলা সাহিত্যের দিক দর্শন। এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে সেকালের শ্রেষ্ঠ লেখক গোষ্ঠী। কিন্তু পত্রিকার অধিকাংশ লেখাই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের রচনা। উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী বলেই অনেক লেখাই বেনামীতে প্রকাশ করা হয়েছে। বঙ্গ দর্শণ বাঙ্গালীর চিন্তা জগতে বিপ্লব সৃষ্টি করেছে।

সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, দর্শণ, ইতিহাস, ইত্যাদি বিষয়ে লঘু এবং গুরু দুই ধরনের লেখাই প্রকাশ করা হয়েছে। দুই ধরনের পাঠকদের আকর্ষণ করার জন্যই এই কৌশল নেওয়া হয়েছিল। নতুন লেখকদের শিক্ষা দেবার জন্য এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যও গঠন মূলক সমালোচনার দায়িত্ব নিয়ে ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র।

লোক রহস্য গ্রন্থে মোট ১৫ টি প্রবন্ধ রয়েছে। তার প্রত্যেকটিতে রয়েছে হাস্যকৌতুকের ভাষায় গুরুগম্ভীর বিষয়ের আলোচনা- যেমন—

বাবু প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র সেকালের ইংরেজী শিক্ষিত বাবুদের পরিচয় দিয়েছেন এবং নির্মম ভাষায় সমালোচনা করেছেন।

বাবুদের পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেন, — বাবুরা হলেন বিচিত্র বুদ্ধি, আহার নিদ্রা কুশলী, চশমালঙ্কৃত, বহুভাষী, সন্দেশ প্রিয়, চিত্র বসনাবৃত, রঞ্জিত কুন্তল, বাক্যে অজেয় , পরভাষা পারদর্শী, মাতৃভাষা বিরোধী, বেত্রহস্ত, মহাপাদুক।

বাঙ্গালী বাবুদের দশটি অবতার প্রকাশ করে বিবেকের কষাঘাত সৃষ্টি করেছেন। দশটি অবতার হল কেরানী, মাষ্টার, ব্রাহ্ম, মুৎসুদ্দি, ডাক্তার, উকীল, হাকিম, জমিদার, সংবাদপত্র সম্পাদক, এবং নিষ্কর্মা।

বাবুদের ক্ষমতা সম্পর্কে বলেছেন — "যাহার বল হস্তে একগুণ, মুখে দশগুণ, পৃষ্ঠে শতগুণ এবং কার্য কালে অদৃশ্য তিনিই বাবু। তিনি আরো বলেছেন —তাঁহাদিগের মনে মনে বিশ্বাস জন্মিবে যে, আমরা তাম্বুল সম্বল করিয়া উপাধান অবলম্বন করিয়া দ্বৈভাষিক কথা কহিয়া এবং তামাকু সেবন করিয়া

ভারতবর্ষের পুনরুদ্ধার করিব।"

গর্দভ প্রবন্ধে বিচারক, শিক্ষক, গায়ক, সম্রাট, ইত্যাদি অহংকারীর দেহে গর্দভ মুন্ডের সঞ্চালন লক্ষ্য করে বলেছেন —

বিধাতা তোমার তেজ দেন নাই , এজন্য তুমি শান্ত, বেগ দেন নাই এজন্য সুধীর, বুদ্ধি দেন নাই এজন্য তুমি বিদ্বান এবং মোট না বহিলে খাইতে পাওনা, এজন্য তুমি পরোপকারী।

এভাবে প্রতিটি প্রবন্ধে ইংরেজী শিক্ষিত অহংকারীদের বিবেক বুদ্ধিকে আঘাত করেছেন লেখক বঙ্কিমচন্দ্র।

লোকরহস্যের পরই কমলাকান্তের দপ্তর প্রকাশিত হয়।এই গ্রন্থের তিনটি অংশ (১) কমলা কান্তের দপ্তর, (২) কমলাকান্তের পত্র, (৩) কমলা কান্তের জোবান বন্দী। মোট ২০টি প্রবন্ধে ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীতে কিছুটা পরিবর্তন ঘটিয়ে পাঠকের মনে কৌতুহল জাগিয়ে দিয়েছেন লেখক।

নেশা খোর কমলাকান্ত নেশার ঘোরে কঠিন সব বিষয়ে কঠোর মন্তব্য করেছেন অসংকোচে। স্বাভাবিক অবস্থায় যে সব কথা বলা যায় না পাগলের মুখে সে সব কথা অনায়াসে বলা যায়, এখানেও ভাষায় এবং বর্ণনায় প্রাধান্য পেয়েছে হাস্যরস।

সরস রঁসিকতায় এবং দেশপ্রেমের আবেগে কমলা কান্ত একটি কালজয়ী চরিত্র হয়ে উঠেছে। বঙ্গদর্শণ পত্রিকার গৌরব এবং জনপ্রিয়তাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

কমলাকান্তের পরিচয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, অনেকে কমলাকান্তকে পাগল বলিত। সে কখন কি করিত , কি বলিত , তাহার স্থিরতা ছিল না। কিছু ইংরেজী, কিছু সংস্কৃত জানিত। কমলা কান্ত কখনো দার পরিগ্রহ করেন নাই। স্বয়ং যেখানে হয়, দুটি অন্ন এবং আধভরি আফিম পাইলেই হইত। যেখানে সেখানে পড়িয়া থাকিত।

সমালোচকদের ভাষায় বাংলা সাহিত্যে কমলাকান্ত অমর এবং একজন খাঁটি বাঙ্গালী। যখন আসেন, তখন, ভয়াবহ আলোর ঝাঁটায় বাঙ্গালীর মনের এবং অভ্যাসের গ্লানি ঝেঁটিয়ে সাফ করে দিয়ে যান ।

প্রথম প্রবন্ধ একা। এখানে কমলাকান্ত বলেছেন, — কেহ একা

থাকিওনা। যদি কেহ তোমার প্রনয়ভাগী না হইল, তবে তোমার মনুষ্য জন্ম বৃথা। ....

পুষ্প আপনার জন্য ফোটেনা, পরের জন্য তোমার হৃদয় কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও। মনুষ্য জাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে তবে আমি অন্য সুখ চাই না। সমাজ ছাড়া সুখ নেই, এটাই মূলবক্তব্য।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ - মনুষ্য ফল। এখানে কমলাকান্ত বলেছেন- আমাব বোধ হয় মনুষ্য সফল ফল বিশেষ, সংসার বৃক্ষে ঝুলিয়া রহিয়াছে, পাকিলেই পড়িযা যাইবে।... কতক ঝড়ে পড়িয়া যায়। কোনটি লোকে খায়, কোনটিকে পাখীতে ঠোকরায়।

— কোনটি সুপক্ক হইয়া দেব সেবায় বা ব্রাহ্মণ সেবায় লাগে, তাহাদিগেব মনুষ্য জন্ম সার্থক। কতকগুলি তিক্ত, কটু বা কষায়, কিন্তু তাহাতে অমূল্য ঔষধ প্রস্তুত হয়। কতক গুলি বিষময়, যে খায় , সেই মরে। কতকগুলি মাকাল জাতীয় কেবল দেখিতে সুন্দর।

আমি বলি, বমনী মন্ডলী এ সংসারের নারিকেল। নাবিকেলের চাবটি সামগ্রী জল, শাস, মালা এবং ছোবড়া। নারিকেলের জলের সঙ্গে স্ত্রী লোকের স্নেহের সাদৃশ্য আছে। নাবিকেলেব শাস - স্ত্রী লোকের বুদ্ধি, ডাবের অবস্থায কোমল, ঝুনোব বেলায় কঠিন। নারিকেলের মালা - স্ত্রী লোকের বিদ্যা। কখন আধখানা বই পুরা দেখিতে পাইলাম না। নারিকেলের ছোবড়া স্ত্রীলোকের রূপ। স্ত্রীলোকের রূপের কাছিতেও অনেক জাহাজ বঁধা গিয়েছে। তোমরা যেমন নারিকেলের কাছিতে জগন্নাথের রথ টান, স্ত্রীলোকের রূপের কাছিতে কত ভাবী ভারী মনোরথ টানে।

অধ্যাপক ব্রাহ্মণগণ, ধুতুরা ফল। বড় বড় লম্বা লম্বা সমাসে বড় বড় বচনে তাঁহাদিগের অতি সুদীর্ঘ কুসুমসকল প্রস্ফোটিত হয়, ফলের বেলা কণ্ঠকময় ধুতুরা।

এভাবেই লেখক বঙ্কিমচন্দ্র উদর দর্শণ, পতঙ্গ, আমার মন, চন্দ্রলোক, বসন্তের কোকিল, স্ত্রীলোরে রূপ, ফুলের বিবাহ, বড় বাজার, আমার দুর্গোৎসব, একটি গীত, বিড়াল, ঢেকি ইত্যাদি প্রবন্ধে বাঙ্গালী সমাজের বিভিন্ন চরিত্র,

বিভিন্ন মানসিকতা সরস রসিকতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। শেষ পর্যন্ত উপসংহারে পরোপকারের ভাবনা জাগিয়ে দিয়েছেন।

বিড়াল প্রবন্ধে কমলাকান্ত, প্রসন্ন গোয়ালিনীর রেখে যাওয়া দুধ চুপি চুপি বিড়াল এসে খেয়ে ফেলায় - রেগে গিয়ে বলছেন,-"চিরাগত প্রথা আছে যে, বিড়ালে দুধ খাইয়া গেলে তাহাকে তাড়াইয়া মারিতে যাইতে হয়। অনেক অনুসন্ধানে একটি ভগ্ন যষ্টি আবিষ্কৃত করিয়া সগর্বে মার্জজারী প্রতি ধাবমান হইলাম।

মার্জ্জারী কমলাকান্তকে চিনিত; সে যষ্টি দেখিয়া বিন্দুমাত্র ভীত হইল না। বুঝিলাম যে, বিড়াল বলিতেছে, মারপিট কেন?......একটু বিচার করিয়া দেখ দেখি? এ সংসারে ক্ষীর, সর, দুগ্ধ, দধি, মাছ, মাংস সকলই তোমরা খাইবে, আমরা কিছুই পাইব না কেন? .... দেখ, আমি চোর বটে, কিন্তু আমি কি সাধ করিয়া চোব হইযাছি? খাইতে পাইলে কে চোর হয়?................চোরের দন্ড হয়, চুরির মূল যে কৃপণ, তাহার দন্ড হয় না কেন?

.................চোরকে ফাঁসি দাও, তাহাতে আমার আপত্তি নাই, কিন্তু তাহার সঙ্গে একটি নিয়ম কর, যে বিচারক চোরকে সাজা দেবেন, তিনি আগে তিন দিবস উপবাস্ করিবেন। তাহাতে যদি তাঁহার চুরি করিয়া খাইবার ইচ্ছা না করে, তবে তিনি স্বচ্ছন্দে চোরকে ফাঁসি দিবেন।

এখানে বিড়াল হল সমাজের দরিদ্রতম মানুষের প্রতিনিধি। এভাবেই বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিটি প্রবন্ধে হালকা চালে কৌতুকী রসিকতায় অতি গুরু গম্ভীর তত্ত্বকথা পাঠককে শুনিয়েছেন।

বড় বাজার প্রবন্ধে বলেছেন,— এই বিশ্ব সংসার একটি বৃহৎ বাজার। সকলেই সেখানে আপন আপন দোকান সাজাইয়া বসিয়া আছে। সকলেরই উদ্দেশ্য মূল্য প্রাপ্তি। কেহ মরিবার জন্য বিষ চাহিলেও তাহা পয়সা দিয়া কিনিতে হয়।

কমলাকান্তের পত্রগুলোও একই উদ্দেশ্যে রচিত। পাঁচটি পত্র প্রবন্ধে গুরুতর বিষয় লঘুচালে রচনা করেছেন। (১) কি লিখিবে ? (২) পলিটিকস্, (৩) বাঙ্গালীর মনুষত্ব (৪) বুড়ো বয়সের কথা, (৫) কমলাকান্তের বিদায় এই পাঁচটি প্রবন্ধে কমলাকান্তের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র পত্রাকারে বঙ্গদর্শণের সম্পাদকের

কাছে লেখা গুলো পাঠিয়েছেন।

বঙ্গদর্শণ ছিল সেকালের শ্রেষ্ঠ সাময়িক পত্রিকা। কিন্তু কয়জন সে পত্রিকা পড়তেন? এই পত্রিকা সম্পর্কে সাধারণ শিক্ষিত মানুষের ধারণা কিরূপ ছিল তা উল্লেখ করে কি লিখিব- পত্রে কমলাকান্ত বলছেন,— একজন বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, বঙ্গদর্শণটা কি, তাহা বলিতে পারেন? তিনি অনেকক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, বোধ হয় বঙ্গদেশ দর্শণ করাই বঙ্গদর্শণ। আমি তাহার পান্ডিত্যের অনেক প্রশংসা করিলাম।

পলিটিকস্ সম্পর্কে শিক্ষিত মানুষের মানসিকতা পলিটিকস প্রবন্ধে প্রকাশ করেছেন। কমলাকান্তকে পলিটিকস সম্পর্কে কিছু লিখতে বলায় তিনি ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে লিখেছেন, — কমলাকান্ত ক্ষুদ্রজীবি ব্রাহ্মণ, তাহাকে পলিটিকস লিখিবার *আদেশ দিয়াছেন কেন? আমি রাজা*, না খোশামুদে, না জোয়াচোর, না ভিক্ষুক, না সম্পাদক, যে আমাকে পলিটিকস লিখিতে বলেন?

বাঙ্গালীর মনুষ্যত্ব সম্পর্কে পত্রে লিখেছেন,— শোনা আছে, মনুষ্যের পদবৃদ্ধি হইলেই সে বিজ্ঞ বলিয়া গণ্য হয়। এই দ্বিপদ মনুষ্য হইতে চতুষ্পদ পশু পক্ষান্তরে যে সকল মনুষ্যের পদ বৃদ্ধি হইয়াছে তাহারা অধিক বিজ্ঞ বলিয়া গণ্য। ছয়খানি পা হইলে বিশেষ বিজ্ঞ হইবে। এই বিজ্ঞ পতঙ্গের উপদেশ অবহেলা করি কি প্রকারে?

কমলাকান্তের জোবানবন্দীতে এদেশের বিচার ব্যবস্থার নানা ত্রুটি এবং প্রহসনের চিত্র তুলে ধরেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। কমলাকান্তকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় তুলে দিয়ে হলফ করতে বলা হচ্ছে—আমি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া ....। কমলাকান্ত - বললেন,- আমি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনেছি একথাটা বলতে হবে? বিচারক বললেন - ক্ষতি কি? হলফের ফরম এই। কমলাকান্ত জবাব দিলেন - হুজুর সুবিচারক বটে। কিন্তু গোড়াতেই একটা মিথ্যা বলিয়া আরম্ভ করিব, সেটা কি ভালো? কমলাকান্তের জোবানবন্দী বহুবার মঞ্চ সফল নাটক হিসেবে অভিনীত হয়েছে।

মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত একই শ্রেণীর হাস্যরসাত্মক প্রবন্ধ কাহিনী। সেকালে অল্প শিক্ষিত ব্যক্তিরাও মিষ্টি কথায় খোসামুদ করে সরকারী চাকুরী ও

ব্যবসা বাণিজ্যে সুযোগ সুবিধা লাভ করতো আবার কলকাতা শহরে অসংযত জীবন যাপন ও বাটপারি করে সর্বশান্ত হতো। তারই কাহিনী হল মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত।

নাম করণেই বোঝা যায় বঙ্কিমচন্দ্র এই শ্রেণীর লোকদের মোটেই শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন না।

দ্বিতীয় পর্বে বঙ্কিমচন্দ্র গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে বিষয় বস্তুর বিশ্লেষণ করে নানা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

বিজ্ঞান রহস্য গ্রন্থে আধুনিক বিজ্ঞানের গুরুত্ব এবং নতুন নতুন আবিষ্কারের বিষয়কে সকলের গ্রহণযোগ্য ভাষায় বিশ্লেষণ করে বর্ণনা করেছেন। তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র না হয়েও বিজ্ঞান বিষয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করেছেন।

বাঙ্গালী সমাজকে সকল বিষয়ে শিক্ষিত করে তোলাই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের মূল লক্ষ্য। ফলে বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রেও অসাধারণ জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন।

বিবিধ প্রবন্ধ গ্রন্থের প্রথম খন্ডে ১৬টি এবং দ্বিতীয়খন্ডে ২১টি প্রবন্ধে নানা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শণ, রাজনীতি ও শাসণব্যবস্থা, কৃষকের অবস্থা, লোক শিক্ষা সবই এসব বিবিধ প্রবন্ধে স্থান পেয়েছে।

বাঙ্গালীর উৎপত্তি, বাঙ্গালীর ইতিহাস, বাংলার কলঙ্ক, বাঙ্গলা শাসনের ফল ইত্যাদি গবেষণা মূলক প্রবন্ধে অতি মূল্যবাণ তথ্য ও ঐতিহাসিক উপাদান তিনি হাজির করেছেন। এর জন্য দীর্ঘকাল কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। বাঙ্গলার ভাষা, বাঙ্গালীর বাহুবল, ভারতের রাজনীতি, ভারত কলঙ্ক ইত্যাদি প্রবন্ধ জাতির শিক্ষা, ইতিহাস চেতনা এবং নবজাগরণের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

এই পর্বে রচিত বঙ্কিমচন্দ্রের-সাম্য-গ্রন্থখানি বঙ্কিমের সাম্য চিন্তার এক ঐতিহাসিক দলিল। গ্রন্থটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। শিক্ষিত যুবকদের মনে গভীর আবেগ এবং উন্মাদনাও সৃষ্টি করেছিল। পাশ্চাতের সাম্যবাদী

চিন্তানায়কদের দর্শণ চিন্তার দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্রের মন দারুনভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় শেষ জীবনে বঙ্কিমচন্দ্র নিজের মত পরিবর্তণ করেছিলেন এবং সাম্য গ্রন্থটির প্রচার বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

এই মত পরিবর্তণের কারণ হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, ভারতের মানুষ দেশাচার এবং লোকাচারের দ্বারা পরিচালিত হয়। আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের দ্বারা নতুন দেশাচার সৃষ্টি করতে না পারলে দেশীয় লোকের মানসিকতায় কোন পরিবর্তন আনা যাবে না।

ভারতীয় দেশাচার যেহেতু ধর্মের দ্বারা বিশেষভাবে, প্রভাবিত সেহেতু বিকৃত ধর্মের পরিবর্তে বিশুদ্ধ ধর্মের প্রচার ও শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন।

এই উদ্দেশ্যে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য চর্চার তৃতীয় পর্বে-ধর্মতত্ত্ব-বিষয়ে গ্রন্থ রচনার গভীর মনোযোগ দেন। ধর্মতত্ত্ব গ্রন্থে তিনি অনুশীলন তত্ত্বেরও বিচার বিশ্লেষণ করেন।

মহাভারতের কৃষ্ণ চরিত্রকে একজন মনুষ্যত্বের অধিকারী আদর্শ ব্যক্তি হিসেবে উপস্থিত করেন। গীতায় কৃষ্ণেব বাণীকে ধর্মেব আদর্শরূপে স্থাপন করেন।

মনুষ্যত্ব কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বললেন,— মনুষ্যত্বই মানুষের ধর্ম। মানুষের দুটি প্রধান অঙ্গ— একটি শরীর, অন্যটি মন। শরীর এবং মন অনুশীলনের দ্বারা সর্বোৎকৃষ্ট স্তরে উন্নীত করা সম্ভব। এই উন্নত ও পরিনত অবস্থাই মনুষ্যত্ব।

কৃষ্ণকে মনুষ্যত্বের আদর্শ বলেছেন। কারণ তিনি বাহুবলে দুষ্টের দমন ও বুদ্ধি বলে ভারতবর্ষকে একীভূত করেছেন আবার জ্ঞান বলে নিষ্কাম ধর্মের প্রচার করেছেন। এই নিষ্কাম ধর্মই লোকহিতের প্রধান শক্তি। বেদ ধর্ম নহে, ধর্ম লোকহিতে, এই নতুন আদর্শ বঙ্কিমচন্দ্রকে শেষ জীবনে বিশেষভাবে আলোড়িত করেছে। অনেকে বলেন, বঙ্কিমচন্দ্র শেষ জীবনে ধর্মের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। কিন্তু সামগ্রিক বিচারে এই অভিযোগ টিকেনা।

বঙ্কিমচন্দ্র জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অনুশীলন তত্ত্ব প্রচার করেছেন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী সামাজিক কল্যাণের প্রয়োজনে পুরাতন ব্যবস্থা ভেঙ্গে নতুন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সশস্ত্র বিপ্লবও তিনি সমর্থণ করেছেন। আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী

ও সীতারাম উপন্যাসে এই তত্ত্ব প্রচার করেছেন। ধর্মতত্ত্বেও তিনি অনুশীলন তত্ত্বকে খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন - অনুশীলনের জন্য তিনটি সামগ্রী প্রয়োজন — (১) সময় (২) শক্তি (৩) অনুশীলনের উপাদান। অর্থাৎ অনুশীলনের জন্য সময় দিতে হবে। ইচ্ছামাত্রই শক্তি অর্জন করা যায় না, আবার উপযুক্ত শক্তি ছাড়া মানুষের হিত সাধনের কর্তব্য পালন করা যায় না।

এবার বাঙ্গলার নব্য লেখকদের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের উপদেশ বর্ণনা করে আমাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করব। **বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—**

(১) যশের জন্য লিখিবেন না। লেখা ভাল হইলে যশ আপনি আসিবে।

(২) টাকার জন্য লিখিবেন না। পাঠকের রুচি ও শিক্ষা বিবেচনা করিয়া লোক রঞ্জণ করিতে গেলে রচনা বিকৃত ও অনিষ্টকর হয়।

(৩) যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্য জাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্যই লিখিবেন।

(৪) যে বিষয়ে যাহার অধিকার নাই, সে বিষয়ে তাহার হস্তক্ষেপ অকর্তব্য।

(৫) বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা করিবেন না। বিদ্যা থাকিলে তাহা আপনিই প্রকাশ পায়, চেষ্টা করিতে হয় না।

(৬) অলংকার প্রয়োগ বা রসিকতার চেষ্টা করিবেন না।

(৭) সকল অলংকারের শ্রেষ্ঠ অলংকার সরলতা। যিনি সোজা কথায় আপনার মনের ভাব সহজে পাঠককে বুঝাইতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক।

(৮) গুরুগম্ভীর রচনা লেখার আগে প্রচুর পড়াশোনা করিতে হইবে। যথা সম্ভব সঠিক তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে। লেখা শেষ হইবার পর কিছুকাল ফেলিয়া রাখিয়া আবার ভাল করিয়া পড়িয়া প্রয়োজনীয় সংশোধন করিয়া ছাপাখানায় পাঠাইতে হইবে।

এভাবে বঙ্কিমচন্দ্র সৃষ্টি ও সমালোচনার কাজে সব্যসাচীর মত দায়িত্ব পালন করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিজীবন

বাংলা সাহিত্যের সম্রাট এবং বন্দে মাতরম মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ২৬শে জুন পশ্চিম বাংলার কাঁঠালপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাদের পূর্বনিবাস ছিল হুগলী জেলার দেশমুখো গ্রামে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রপিতামহ রামহরি চট্টোপাধ্যায় মাতামহের সম্পত্তির অধিকারী হয়ে চব্বিশ পরগনার কাঁঠাল পাড়ায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন ইংরেজ সরকারের একজন ডেপুটি কালেক্টর। যাদবচন্দ্রের চার পুত্রের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন তৃতীয়। অন্য তিনজন হলেন, - শ্যামাচরণ, সঞ্জীবচন্দ্র এবং পূর্ণচন্দ্র।

ছয়বৎসর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র কাঁঠালপাড়া ছেড়ে পিতার কর্মস্থল মেদিনীপুরে চলে যান। সেখানে একটি ইংরেজী মাধ্যম স্কুলে ভর্তি হন। বাড়ীতে বাংলা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র একদিনেই বাংলা বর্ণমালা আয়ত্ত করে ফেলেছিলেন।

এই ঘটনায় বঙ্কিমচন্দ্রের অসাধারণ স্মৃতিশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষায় অসাধারণ মেধার পরিচয় পেয়ে প্রধান শিক্ষক টীড সাহেব ডাবল প্রমোশন দেবার সিদ্ধান্ত নেন, কিন্তু পিতা যাদবচন্দ্রের আপত্তিতে তা কার্যকর হয়নি।

১৮৪৯ সালে বঙ্কিমচন্দ্র কাঁঠালপাড়ায় ফিরে আসেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ১১ বছর। সেকালের রীতি অনুযায়ী পার্শ্ববর্তী গ্রামের ৫ বছর বয়সী এক নাবালিকা কন্যার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বিবাহ হয়।

কাঁঠাল পাড়া গ্রামে বিখ্যাত সংস্কৃত পন্ডিতদের কাছে বঙ্কিমচন্দ্রের সংস্কৃত শিক্ষা শুরু হয়। এবং হুগলী কলেজে ইংরেজী মাধ্যম শিক্ষা ও চলতে থাকে।

তখনকার দিনে কলেজে দুটি বিভাগ আবার স্কুল বিভাগে সিনিয়র এবং জুনিয়ার বিভাগ,দুটি ভাগ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজের জুনিয়র বিভাগে ভর্তি হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সাত বছর হুগলী কলেজে পড়াশোনা করেন। প্রতি বৎসরেই বিশেষ কৃতিত্বের জন্য পুরস্কার লাভ করেন। ১৮৫৩ সালের জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে মাসিক ৮ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। এ বছরেই সংবাদ প্রভাকরে কবিতা প্রতিযোগিতায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে কুড়ি টাকা পুরস্কার পান। সেকালে কুড়ি টাকা খুব মূল্যবান ছিল।

পরের বছরও কলেজের পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করে মাসিক আট টাকা বৃত্তি পান। তারপবের বছর সব বিষয়ে শীর্ষ স্থান অধিকার করে মাসিক ২০টাকা বৃত্তি লাভ করেন।

১৮৫৬ সালে বঙ্কিমচন্দ্র 'ল' পড়ার জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। এই সময় তিনি গল্প লিখে পত্রিকায় প্রকাশ করতে থাকেন।

১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র 'ল' পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ন হন। পরের বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি.এ পরীক্ষায় ১৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র দুইজন পাশ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম এবং যদুনাথ বসু দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। একটি বিষয়ে প্রশ্নপত্র অত্যাধিক কঠিন হওয়ায় ৭ নম্বব গ্রেস দিয়ে বিশ্ববিদ্যানয় একটি নজির সৃষ্টি করে, যা পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে অনুসরণ করা হয়। প্রথমদিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থাই ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ২০ বছর বয়সে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের পদে চাকুরী গ্রহণ করেন। দীর্ঘ ৩৩ বছর যাবত সততা ও দক্ষতার সঙ্গে চাকুরী করেন। পনের ষোলটি জেলা ও মহকুমায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দায়িত্বে কাজ করেন। কিন্তু এই সুদীর্ঘকালের চাকুরী জীবনে কোন প্রমোশনের ব্যবস্থা ছিল না। ভারতীয় কর্মচারীদের প্রতি এই প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতা চাপিয়ে দেবার বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ সর্বস্তরেই ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র বন্ধুদের কাছে দুঃখ করে বলেছেন, এত দীর্ঘকাল সরকারী চাকুরীতে আবদ্ধ থাকা ভুল হয়েছিল। তা না হলে আরো বলিষ্ঠভাবে সাহিত্য

চর্চা করা যেত।

১৮৫৬ সালের শেষের দিকে বঙ্কিমচন্দ্রের ১ম পত্নী মাত্র ১৫ বছর বয়সে মারা যান। ১৮৬০ সালে হালিসহরের বিখ্যাত চৌধুরী বংশের কন্যা রাজলক্ষ্মী দেবীকে বিবাহ করে সারাজীবন সুখী-দাম্পত্য জীবন কাটিয়ে ১৮৯৪ সালের এপ্রিল মাসে মাত্র ৫৬ বছরে মারা যান। তাদের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তিন কন্যা জন্মেছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুতে সারা দেশে শোক দিবস পালন করা হয়েছিল। বাংলার পক্ষে এই মৃত্যু ছিল ইন্দ্রপতনের মত ঘটনা।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত ১৪টি উপন্যাস

প্রবন্ধাবলী	প্রকাশ কাল
১. দুর্গেশ নন্দিনী	১৮৬৫
২. কপাল কুণ্ডলা	১৮৬৬
৩. মৃণালিনী	১৮৬৯
৪. বিষবৃক্ষ	১৮৭৩
৫. ইন্দিরা	১৮৭৩
৬. যুগলাঙ্গুরীয়	১৮৭৪
৭. চন্দ্রশেখর	১৮৭৪
৮. রাধারানী	১৮৭৭
৯. রজনী	১৮৭৭
১০. কৃষ্ণকান্তের উইল	১৮৭৮
১১. রাজ সিংহ	১৮৮২
১২. আনন্দ মঠ	১৮৮২
১৩. দেবী চৌধুরানী	১৮৮৪
১৪. সীতারাম	১৮৮৭

নবজাগরণের দুই সাধক

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ

মানব ধর্মের পূজারীদের উদ্দেশ্যে।

দীনেশ চন্দ্র সাহা
গ্রন্থকার

ভূমিকা

নবজাগরণের দুই মহান সাধক শ্রী রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ ভারতীয় ধর্ম চিন্তায় যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন তার গুরুত্ব অপরিসীম।

ধর্মের নামে, শাস্ত্রের নামে যে ধর্মান্ধতা এবং কুসংস্কার ভারতীয় সমাজে প্রচলিত হয়েছিল এবং সামাজিক অগ্রগতির পক্ষে প্রধান বাঁধা হয়ে উঠেছিল। তার থেকে মুক্তির নতুন পথ দেখিয়েছেন এই দুই মহান সাধক।

বিশুদ্ধ ধর্মে সব মানুষেরই সমান অধিকার আছে এবং পৃথিবীর কোন ধর্মই ছোট বা বড় নয। সব ধর্মেরই মূল কথা মানুষের কল্যাণ। এসব নতুন কথা, নতুন সঞ্জীবনী সুধারূপে সমগ্র সমাজে নবজাগরণের ঢেউ সৃষ্টি করেছে।

প্রতিটি মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর আছেন। কাজেই প্রত্যেক মানুষের সেবা করাই মানুষের ধর্ম। এই ধর্মে জাতিভেদ নেই, বর্ণ বৈষম্য নেই। নি:স্বার্থ ভালবাসাই এই ধর্মের একমাত্র লক্ষ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জীবন ও কর্ম তাঁদের বাণী ও উপদেশ নতুন প্রজন্মের পাঠকদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়াই বর্তমান গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য। সাধারণ পাঠকেবা উপকৃত হলেই লেখকের শ্রম সার্থক হবে।

আগরতলা
২৬শে জানুয়ারী ২০০৬

দীনেশ চন্দ্র সাহা
গ্রন্থাগার

সূচীপত্র

নবজাগরণের সামাজিক পরিবেশ

পৃথিবীর সব দেশের সব জাতির সমাজ গঠনের অন্যতম প্রধাণ ভিত্তি হল ধর্ম। আবার সব ধর্মেরই মূল লক্ষ্য হল মানব কল্যাণ মানুষ অমৃতের সন্তান, এবং মানুষই জীব জগতের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এই বাক্যগুলো যদি কোন ধর্মের মূলকথা হয়, তবে সেই ধর্মকে সনাতন ধর্ম বলা যায়। বৈদিক যুগে এদেশের ধর্মীয় চিন্তা ভাবনায় এই দৃষ্টিভঙ্গী ছিল ধর্মের মূল ভিত্তি । তাই এসব ধারণাকে বলা হতো এদেশেব সনাতন ধর্ম। ধর্মের এই আদর্শ চিবকাল মানব সমাজে স্বীকৃতি লাভ কববে।

প্রাচীন ভাবতে হিন্দু নামে কোন ধর্ম ছিল না। বৈদিক ধর্মকে বলা যায় ভাবতীয ধর্ম। মুসলমানরা এদেশে এসে সিন্ধুনদীর তীরে প্রথম ভাবতীয ঐতিহ্য ও সৌন্দর্যের সঙ্গে পরিচিত হয়। তারাই সিন্ধু তীববর্তী এই দেশের নাম দেয় হিন্দুস্থান।

এই সময় থেকেই হিন্দুস্থানেব অধিবাসীদের ধর্মেব নাম হয় হিন্দুধর্ম। এই ধর্মেব উপবই ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল ভিত্তি স্থাপিত হযেছে।

মুসলমান আক্রমণের আগে ভারতে বহু উপজাতি গোষ্ঠীর আক্রমণ, লুণ্ঠন, ধ্বংস, সংঘাত ও সমন্বয় ঘটেছে। শেষ পর্যন্ত সব গোষ্ঠীই ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতিব মধ্যে মিশে গিয়ে একাকার হয়ে গেছে।

সমন্বয় কখনো এক তরফা হয় না। বিভিন্ন গোষ্ঠীর নিজস্ব বিশ্বাস, আচাব, আচরণ, সামাজিক রীতিনীতি থাকে। ভাবতীয় সংস্কৃতি, সকলের পক্ষে কল্যাণকর ধারণা, রীতি-নীতি ও ধর্মীয় আচারকে মেনে নিয়েই ঐক্যের পথ রচনা করেছে।

তাই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠাকে বলা হয় ভারতীয় সভ্যতার মূল বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু মুসলমানরা, বিশ্বাস করতো ইসলাম হল পৃথিবীর শেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। তাই সারা বিশ্বে ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য এবং ইসলামিক রাষ্ট্র গঠনের

জন্য সংগ্রামে তারা অবতীর্ণ হয়েছিল।

মধ্য প্রাচ্যের বৌদ্ধরা সকলেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। তখনই প্রমানিত হয়েছিল যে অহিংসানীতি সামাজিক শান্তি ও সমৃদ্ধির শ্রেষ্ঠ আদর্শ হলেও রাষ্ট্র ও সমাজ রক্ষার ক্ষেত্রে মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। রাষ্ট্রীয় অহিংসা নীতির জন্যই ভারত বারবার বিদেশী শক্তির কাছে পরাজিত হয়েছে। মুসলমানরা সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে বৌদ্ধধর্মকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিল। ইউরোপের অর্দ্ধেকটা ইসলামী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিল। শেষ পর্যন্ত ইউরোপের খৃষ্টানরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে সুদীর্ঘকাল ধর্মযুদ্ধ চালিয়ে ইউরোপকে ইসলামী শাসন থেকে মুক্ত করেছিল।

চীন দেশে শক্তিশালী সম্রাট এবং ঐক্যবদ্ধ সমাজের জাতীয় প্রতিরোধ থাকায় ইসলামের প্রবেশ বা প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় নি। কিন্তু ভারতবর্ষে অসংখ্য হিন্দু রাজা পরস্পর বিভক্ত থাকায় ইসলামী শাসনের প্রতিষ্ঠা খুব সহজ হয়েছে। তবে এদেশে হিন্দু ধর্মকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি।

প্রথম দিকে অস্ত্রের জোরে লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করা সম্ভব হলেও ক্রমে ক্রমে হিন্দুরাজারা ধর্ম রক্ষার জন্যই ঐক্যবদ্ধ হতে থাকায় মুসলিম শাসকরা সমন্বয়ের পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে।

ইউরোপের মত ধর্মযুদ্ধ শুরু হলে ভারতের মাটিতে আরেকটা মহাভারত তৈরী হতো। হিন্দু রাজারা ঐক্যবদ্ধ হলে সেরকম ঘটনার সম্ভাবনা ছিল। সেকালে যুদ্ধে রাজার নির্দেশে প্রতিটি সক্ষম পুরুষকেই যুদ্ধে যেতে হতো। ভারতীয় রাজাদের সৈন্য সংখ্যার তুলনায় মুসলিম সেনারা ছিল অতি নগন্য শক্তি। ভয়াবহ রক্তপাত হলেও ভারতে হিন্দু রাজারা ঐক্যবদ্ধ থাকলে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হতনা। একইভাবে ভারতে হিন্দু এবং মুসলিম শাসকরা ঐক্যবদ্ধ থাকলে ইংরেজরাও শাসক হতে পারতো না।

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য অনুযায়ী সমন্বয় প্রচেষ্টা শুরু হয়ে যাওয়ায় সংঘাতের পরিবর্তে সহযোগিতার পথ খুলে গেল। হিন্দু রাজাদের অধিকাংশই মুসলিম শাসকদের সহযোগী শক্তিতে পরিনত হল।

মোগল ও পাঠানের মধ্যে বিভিন্ন যুদ্ধে উভয় পক্ষে হিন্দুরাজারা যোগ

দিত। তখন আঞ্চলিক স্বার্থ এবং ব্যক্তি স্বার্থই প্রাধান্য লাভ করতো ।

রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সমন্বয় ঘটলেও সামাজিক ক্ষেত্রে সমন্বয় প্রচেষ্টা সফল হয় নি। দুই ধর্মেব, দুই সমাজ পৃথক অস্তিত্ব নিয়েই টিকে রয়েছে।

অভিজাত মুসলমানরা নিজেদেরকে ভারতীয় বলে পরিচয় দিত না। তারা নবাব বাদশার জাত বলে অহংকার বোধ করতো। ধর্মান্তরিত দেশীয় মুসলমানদের তারা অবজ্ঞার চোখেই দেখতো। ফলে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ধর্মান্তরিত হয়েও সামাজিক মর্যাদা পায়নি। কাজেই সমাজের নিম্নস্তরে পেশাগত সমন্বয়ের মাধ্যমে একটা সামাজিক ঐক্য এদেশে গড়ে উঠেছিল। যেমন- হিন্দু তাঁতীরা ধর্মান্তরিত হবার পরও তাঁত শিল্পের কাজ ছাড়েনি। হিন্দু তাঁতীদের সঙ্গে মুসলিম তাঁতীদের ভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্ক গড়তেও কোন বাধা সৃষ্টি হয়নি।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, গ্রামাঞ্চলে হিন্দুকৃষক ও মুসলিম কৃষকেরা প্রায় একই রকম সামাজিক রীতিনীতি অনুসরণ করে। কিন্তু হিন্দু পুরোহিত এবং মুসলিম মৌলবীরা ধর্মীয় বাধা আরোপ করে পার্থক্য সৃষ্টি করে। ক্রমে ক্রমে উভয় সমাজের স্বার্থান্বেষীরা ধর্মীয় শাস্ত্রের বিকৃতি ঘটিয়ে অশাস্ত্রীয় এবং যুক্তিহীন বিধি নিষেধ ও কঠোর নিয়মের বন্ধনে সমাজকে আবদ্ধ রাখার চেষ্টা করেছে। এভাবেই জন্ম নিয়েছে ধর্মের নামে অন্ধ বিশ্বাস এবং কুসংস্কার।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, শাসক শ্রেণীর অভিজাত মুসলমানরা বিবাহের আসর থেকে হিন্দু সুন্দরী মেয়েদের তুলে নিয়ে যেত। গ্রামে গ্রামে মহিলা গোয়েন্দা পাঠিয়ে সুন্দরী হিন্দু মেয়েদের সন্ধান নিয়ে জোর করে বাড়ী থেকে তুলে নিয়ে যেত হিন্দু মেয়েদের।

এসব কারণেই রক্ষনশীল হিন্দু ব্রাহ্মণরা নারী সংক্রান্ত কঠোর নীতিগুলো ধর্মের নামে প্রচলন করেছিল। বাল্য বিবাহ, বহুবিবাহ, সতীদাহ প্রথা, নারীকে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা, ইত্যাদি বিধিগুলো এই সময় থেকেই হিন্দু সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছিল।

ভারতে মুসলিম শাসনের সময় থেকেই ইতিহাসের মধ্যযুগ শুরু হয়েছে। প্রায় আটশ বছর ধরে মধ্যযুগীয় মুসলিম শাসনে হিন্দুসমাজ যেমন ধর্মান্ধতায় আক্রান্ত হয়েছে তেমনি মুসলমান সমাজেও শরিয়তী শাসন কঠোরভাবে মেনে

চলতে বাধ্য করা হয়েছে।

তাই মধ্যযুগ হয়ে উঠেছিল ভারতের ইতিহাসে অন্ধকার যুগ। ইংরেজ আগমনের পর এদেশের রাষ্ট্রীয় চিন্তায় এবং সমাজ চেতনায় নতুন ভাবধারা সৃষ্টি হল। তাই এই সময় থেকে ভারতের ইতিহাসের আধুনিক যুগের সূত্রপাত হয়েছে বলে গণ্য করা হয়।

ইংরেজরা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা এবং বিস্তারের জন্য বহু যুদ্ধ করেছে। ভারতীয় সেনারাই ছিল ইংরেজ বাহিনীর প্রধান শক্তি। কিন্তু কোন যুদ্ধে সাধারণ মানুষের উপর নির্বিচারে লুণ্ঠন এবং ধ্বংসকার্যের ঘটনা ঘটেনি। ভারতের ইতিহাসে এটাও একটা নতুন অভিজ্ঞতা।

মধ্যযুগে যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে লুণ্ঠন এবং গ্রাম নগর ধ্বংস করার বহু ঘটনা ঘটেছে। আধুনিক যুগের যুদ্ধে মূল লক্ষ্য ছিল শাসক শ্রেনীর হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া। ইংরেজরা প্রতিটি যুদ্ধে হিন্দু এবং মুসলিম উভয় সমাজেব সাহায্যই পেয়েছে। সেনাপতি মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতাব সঙ্গে মহাজন জগৎ শেঠেব বিশ্বাস ঘাতকতাও ইতিহাসের কলঙ্করূপে চিহ্নিত হয়ে আছে।

ভারতে সামরিক বাহিনীতে যোগ দেবাব মত লোকের অভাব ছিল না। কিন্তু ইংবেজদের টাকার অভাব ছিল। সেই অভাব পূবণ করেছিল জগৎশেঠ, উমিচাঁদের মত শেঠ মহাজনরা।

মুসলমান নবাবের পরাজয়ের ফলে ভারতেব স্বাধীনতা সূর্য অস্ত গেল- এমন ভাবনা বা অনুভূতি সে যুগের কোন স্তরের কোন মানুষের মধ্যেই ছিল না। এক রাজা যায় অন্য রাজা আসে এটাই ছিল সাধারণ অভিজ্ঞতা।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের আগে ভারতবর্ষ একটা দেশ এবং এই দেশেব সব মানুষই ভারতবাসী, সকলের স্বার্থ-সংস্কৃতি ও সভ্যতা এক, এমন কোন অনুভূতির অস্তিত্বই ছিল না।

এই অনুভূতি জাগিয়ে তোলার যে প্রচেষ্টা রামমোহনের সময় থেকে শুরু হয়েছে তাকেই বলা হয় ভারতের নবজাগরণ। একশ বছর ধরে চলেছে এই নবজাগরণের আন্দোলন। কিন্তু কোথাও মুসলিম সমাজে দেখা দেয়নি কোন আলোড়ন।

ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের ক্ষোভ ছিল, তারা নবাবের জাত, আর নবাবের ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে ইংরেজ সরকার। তাই প্রায় একশ বছর ধরে চলেছিল ইংরেজদের বিরুদ্ধে বয়কট। ইংরেজী শিক্ষা এবং ইংরেজদের চাকুরী বয়কট করে মুসলিম সমাজ দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

একশ বছর ধরে এই বয়কট চলার ফলে সরকারী চাকুরী, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-আইন আদালত ও যোগাযোগ দপ্তর সহ সর্বত্র হিন্দুদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেশের জমিদার শ্রেণীর মধ্যেও হিন্দুরা প্রাধান্য অর্জন করেছে।

সিপাহী বিদ্রোহের পর মুসলমান সমাজে নতুন চিন্তা শুরু হয়। ইংরেজ সরকারও হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে রাখার নীতি শুরু করে। কারণ সিপাহী বিদ্রোহের অভিজ্ঞতা থেকেই বৃটিশ কর্তৃপক্ষ বুঝতে পেরেছিল যে, হিন্দু-মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হলে ভারতে বৃটিশ শাসন একদিনও টিকতে পারবে না।

অন্যদিকে মুসলমানরাও ভাবতে শুরু কবেছিল যে হিন্দুরাই হল মুসলমানদের অগ্রগতির পথে প্রধান বাধা। কারণ প্রতিটি ক্ষেত্রেই হিন্দুদের সঙ্গে তাদের প্রতিযোগিতা করেই এগুতে হচ্ছিল।

শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যেও হিন্দু বিদ্বেষ ক্রমে ক্রমে ছড়িয়ে পড়েছিল।

ফলে ভারতে নব জাগরণের তাৎপর্য মুসলমানরা উপলব্ধি করতে পারে নি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামেও কোন ভূমিকা নিতে পারেনি মুসলমান সমাজ।

নবজাগরণের অগ্রদূত রামমোহন রায় প্রতিটি লেখায় এবং বক্তৃতায় স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, আমরা এমন সমাজ গঠন করতে চাই যেখানে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, জৈন ও শিখ যার যার ধর্ম স্বাধীনভাবে চর্চা করতে পারবে এবং সাধারণ মানুষের কল্যাণ মূলক কাজে সকলে ঐক্যবদ্ধ থাকবে। রামমোহন ছিলেন ধর্মান্তরের সম্পূর্ণ বিরোধী।

রামমোহনের এই আদর্শকে যারা সাম্প্রদায়িক বলে সমালোচনা করেছেন বা করেন, তারা প্রকৃতপক্ষে নবজাগরণেরই বিরোধী। নবজাগরণের শতাব্দীব্যাপী আন্দোলন যে ভারতবাসীর বিবেক বুদ্ধিকে জাগিয়ে দিয়ে স্বাধীন জাতীয়তাবাদী আদর্শের উদ্বোধন ঘটিয়েছে, এই সত্যটুকু সমালোচকরা স্বীকার করতে চান না।

ভারতে নবজাগরণ আন্দোলনের শেষ প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী আলোচনা করলেই আমরা এই আন্দোলনের গভীর তাৎপর্য ও গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবো।

বিবেকানন্দকে মানব সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব। তিনি শাস্ত্রকে বাদ দিয়েই সহজ সাধনার মাধ্যমে জীবন ধর্ম পালনের পথ দেখিয়েছেন। জাতি-বর্ণ ও ধর্মের শত্রুতামূলক বিরোধ তিনি মুছে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন। ধর্মকে তিনি সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে তুলে ধরেছেন।

তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভারতের নবজাগরণের একজন মহান নায়ক রূপেই শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। ধর্মীয় ভাবনার দিক দিয়ে তিনি মধ্যযুগীয় হলেও সামাজিক চেতনার দিক দিয়ে নতুন যুগের নতুন আদর্শ তিনি স্থাপন করেছেন। মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরকে খুঁজে পাবার পথ তিনি দেখিয়েছেন। এটাই ছিল নতুন ধর্মীয় আদর্শ।

রামকৃষ্ণদেব এবং বিবেকানন্দ দুজনেই অকাল মৃত্যু বরণ করেছেন। দুজনেই ছিলেন একে অন্যের পরিপূরক। রামকৃষ্ণদেবের আদর্শকেই জীবন্ত রূপ দিয়েছেন বিবেকানন্দ।

বিবেকানন্দের আধুনিক শিক্ষিত মন ভারত ভ্রমনের মাধ্যমে প্রকৃত ভারতবর্ষকে আবিষ্কার করে, ভারতের বিবেককে জাগ্রত ও ঐক্যবদ্ধ করার মন্ত্র সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। এই মন্ত্রই ভারতের যুবকদের মধ্যে স্বদেশপ্রেমের উদ্দীপনা জাগিয়ে দিয়েছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে নবজাগরণের সূত্রপাতের সময় রামমোহন ছিলেন একা। বাঙ্গালী জাতি তখন বহুযুগের অভ্যস্ত নানা সংস্কারে অন্ধ বিশ্বাস স্থাপণ করে নিয়তির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল।

রামমোহন এই মোহগ্রস্ত ঘুমন্ত জাতিকে জাগিয়ে তোলার মূল মন্ত্রটি আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন ধর্মীয় মোহ ধর্মীয় সত্য দ্বারাই ভাঙ্গতে হবে। সেজন্যই কঠোর পরিশ্রম করে মূল ধর্মগ্রন্থগুলো অধ্যয়ন করেছিলেন।

শুধু হিন্দুধর্ম নয়, ইসলাম,খৃষ্টান,বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ ধর্মের মূল গ্রন্থগুলো সংগ্রহ করে আদি ধর্মের মানব কল্যাণমূলক অধ্যায়গুলো বিশেষভাবে বিচার

বিশ্লেষণ করে গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং সংবাদপত্র মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করেছেন। এজন্য বিভিন্ন ভাষা তাঁকে শিখতে হয়েছে।

নিজ মতের পক্ষে একটি সচেতন গোষ্ঠী তৈরী করার জন্য আত্মীয়সভা-নামে একটি সংস্থা গঠন করে নিয়মিত আলোচনার ব্যবস্থা করেছেন। বিভিন্ন প্রাচীন পন্থী পন্ডিতদের সঙ্গে তর্কসভায় মিলিত হয়ে ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করেছেন।

সেকালে প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের চর্চা ও অধ্যয়ন প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মধ্যযুগে সব ধর্মই স্বার্থান্বেষী পুরোহিত, মোল্লা-মৌলবী এবং পাদ্রীদের দ্বারা বিকৃত রূপ ধারণ করেছিল। সমাজে বিকৃত ধর্মনীতির প্রতি অন্ধ বিশ্বাস বদ্ধ মূল হয়ে পড়েছিল।

শুধু পান্ডিত্য দিয়ে এই অবস্থার মোকাবিলা করা সম্ভব ছিল না। অন্তরের প্রেরণা, গভীর আত্মবিশ্বাস সম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গী এবং মানবতা বোধ এই পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য প্রয়োজন ছিল। রামমোহনের মধ্যে এসব গুণের সমাবেশ ঘটায় তিনি যুগ পরিবর্তনের মহানায়করূপে নিজের দায়িত্ব পালন করতে পেরেছিলেন।

রামমোহন মোহগ্রস্ত বাঙ্গালী মনকে প্রচন্ডভাবে নাড়া দিয়ে ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিয়েছিলেন। এসব কাজের জন্য তিনি মাত্র পনের বছর সময় পেয়েছিলেন। সতীদাহ প্রথা নিবারণ আইন পাস করার পর রক্ষণশীল গোঁড়াপন্থীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে ইংলন্ডে গিয়ে কর্তব্য কাজ সম্পন্ন করার পর ক্লান্ত-অবসাদ এবং আর্থিক অনটনে অকাল মৃত্যু বরণ করেন।

নবজাগরণের দ্বিতীয় পর্বের দায়িত্ব পালন করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ধর্মীয় লড়াই বাদ দিয়ে শিক্ষা বিস্তার এবং সমাজ সংস্কারের কাজকেই তিনি বেশী গুরুত্ব দিলেন। এর ফলে গড়ে উঠে এক আধুনিক শিক্ষিত সমাজ যারা যুক্তিবাদী চিন্তা ধারায় সমৃদ্ধ হয়ে আত্মশক্তি সম্পন্ন হয়ে উঠে এবং নবজাগরণের ধারাকে শক্তিশালী করে তোলে।

এই সময় ডিরোজিওর শিষ্যরাও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নতুন পথে সামিল হয়।

এর পরেই যুগের উপযোগী মানসিকতা গড়ে তোলার কাজে অবতীর্ণ

হন কবি মধুসূদন এবং কথা শিল্পী বাঙ্কিমচন্দ্র।

মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য বাংলা কাব্য ধারায় নব যুগের সূচনা করে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী শিক্ষিত মানুষের মনে প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই নবজাগরণের ধারা প্রধানত নগর জীবনেই সীমাবদ্ধ থাকে। বাংলার বাইরে বিশাল ভারতবর্ষ তখনো ছিল ধর্মান্ধতায় মোহাচ্ছন্ন। বাংলার নবজাগরণের ধারাই ধীরে ধীরে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে।

ভারতবর্ষকে জাগিয়ে দেবার মহান কাজটি করেছেন বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। আর বিবেকানন্দকে জাগিয়ে দিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। এটাই ছিল নবজাগরণের শেষ অধ্যায়। এর পরই শুরু হয় বিপ্লবী আন্দোলন এবং স্বদেশী আন্দোলন।

নবজাগরণের ছয় মহানায়ক ছয়টি ধারায় নবযুগের প্রবল স্রোত সৃষ্টি করেছিলেন। প্রত্যেকেই ছিলেন একে অন্যের পরিপূরক। প্রত্যেকেই সৃষ্টি করেছেন অসংখ্য অনুগামী, যাদের আন্তরিক চেষ্টায় শিক্ষিত সমাজের সর্বস্তরে জেগে উঠেছিল। নবজাগরণের ঢেউ।

রামমোহন যুক্তি ও বিবেকের নৈতিক ধারা সৃষ্টি করেছেন। বিদ্যাসাগর পরোপকারের মাধ্যমে মানবিক কর্তব্য বোধ জাগিয়ে দেবার ধারা সৃষ্টি করেছেন। মধুসূদন নতুন যুগের কাব্য ধারায় প্রাণের স্পন্দন সৃষ্টি করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের মাধ্যমে ইতিহাস চেতনার নতুন ধারা সৃষ্টি করে জাতীয়তাবাদী ঐক্যের পথ খুলে দিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দ নতুন যুগের উপযোগী ধর্মীয় চেতনার বিকাশ ঘটিয়ে মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মানুষের সেবাই ঈশ্বরকে পাওয়ার প্রধান পথ বলে ঘোষণা করেছেন। এভাবেই নবজাগরণ সৃষ্টি করেছে একটি নতুন যুগ, যার মূল লক্ষ্য হল মানব ধর্মের প্রতিষ্ঠা করা।

শ্রী রামকৃষ্ণের আত্ম প্রকাশ

ইংরেজ আগমনকে কেন্দ্র করে বাংলার সমাজ জীবনে যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল, পুরাতন সমাজ কাঠামো ভেঙ্গে নতুন কিছু গড়ে তোলার চেষ্টা শুরু হয়েছিল, সেই যুগসন্ধিক্ষণেই নতুন যুগের সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের আবর্ভাব ঘটেছিল।

ইতিমধ্যে রামমোহন রায় সর্বধর্ম সমন্বয়ের আদর্শ প্রচার করে ভারত এবং ইউবোপ-আমেরিকার সুধী সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। নবজাগবণেব পতাকা বহণ করার জন্য ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কলকাতার সম্ভ্রান্ত বংশের যুবকেরা ব্রাহ্ম সমাজে সমবেত হয়েছিলেন।

হিন্দু কলেজকে কেন্দ্র করে অধ্যাপক ডিরোজিওর নেতৃত্বে ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী হিন্দুধর্মের প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সংস্কার আন্দোলন শুরু করেছিল। শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে খৃষ্ঠান ধর্ম গ্রহনের প্রবনতা দেখা দিয়েছিল।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে ধর্মীয় গোঁড়ামির পবিবর্তে উদার মানবকি দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার জন্য নতুন শিক্ষানীতি এবং নতুন পাঠ্যক্রম ও নতুন শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলন করলেন।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সভাত্য ও সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব বাঙ্গালী সমাজে প্রবল অস্থিরতা সৃষ্টি করেছিল এই সময়।

বামমোহনের অকাল মৃত্যুতে ব্রাহ্ম সমাজের হাল ধরার জন্য যোগ্য ব্যক্তিরা এগিয়ে এলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী ব্রাহ্ম সমাজের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হলেন। বিপিন বিহারী পালও এই আন্দোলনে যোগ দিলেন। এরা সকলেই ছিলেন সেকালের কলকাতার সেরা বক্তা।

কলকাতার শিক্ষিত সমাজে ব্রাহ্ম সমাজের ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল। কেশব চন্দ্র সেন লন্ডনে গিয়ে অসংখ্য আলোচনা সভায় ইংরেজীতে বক্তৃতা

দিয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছিলেন। ভারতেও তিনি খুব জনপ্রিয় হয়েছিলেন। কিন্তু ধর্মীয় নীতি নিয়ে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের তীব্র মত ভেদ দেখা দেওয়ায় ব্রাহ্ম সমাজ ভেঙ্গে যায়। কেশবচন্দ্র ভারতীয় ব্রাহ্ম সমাজ নামে নতুন ব্রাহ্ম সমাজ গঠন করেন। দেবেন্দ্র নাথ ব্রাহ্ম সমাজের নাম দেন- আদি ব্রাহ্ম সমাজ। কেশব চন্দ্রের ভারতীয় ব্রাহ্ম সমাজও আবার ভেঙ্গে যায়। ব্রাহ্ম সমাজ বাল্য বিবাহের বিরোধী ছিল। কিন্তু কেশবচন্দ্র নিজের বালিকা কন্যাকে কোচবিহারের রাজার সঙ্গে বিবাহ দেবার সুযোগ নষ্ট করতে রাজী না হয়ে নিজ কন্যার বাল্য বিবাহ দেবার সিদ্ধান্ত নেন। ফলে কিছু সংখ্যক অনুগামী আলাদা হয়ে- সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ নামে নতুন সংস্থা গঠন করেন।

এভাবে ধর্মীয় সংস্কারের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী উৎসটি যখন ভেঙ্গে যাচ্ছিল ঠিক তখনই দক্ষিনেশ্বরের পাগলা ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশ করেন।

তিনি প্রথমেই কেশবচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ভাগিনা হৃদয়রামকে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে কেশবচন্দ্রের বাড়ীতে উপস্থিত হলেন।

কেশবচন্দ্র প্রথম দর্শনে দেখলেন, একজন সাধারণ ব্রাহ্মণ খালিপায়ে, খালিগায়ে, পরনের লালপেড়ে ধুতির একটি অংশ কাঁধে ফেলে কেশবচন্দ্রকে প্রণাম করে বললেন,- হ্যাঁগো --- তোমরা নাকি ঈশ্বর নিয়ে প্রতিদিন আলোচনা করছো, আমার যে ঐসব আলোচনা শুনতে বড় ইচ্ছে করছে। তাই চলে এলাম।

কেশবচন্দ্র নিজের বৈঠক খানায় রামকৃষ্ণদেব এবং হৃদয়রামকে বসালেন। মুহূর্তের মধ্যেই রামকৃষ্ণদেব সমাধিস্থ হলেন। কিছুক্ষণ পরে ধ্যান ভঙ্গ হল-, এবার কেশবচন্দ্রের সঙ্গে নানা বিষয়ে অনর্গল আলোচনা চালিয়ে গেলেন। কেশবচন্দ্র অবাক হলেন।

ধর্মীয় দর্শনের যে সব কঠিন বিষয়ে তর্কের শেষ নেই, সে সব বিষয় রামকৃষ্ণদেব অতি সহজ সরল গ্রাম্য ভাষায় ব্যাখ্যা করে, দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন। এরপর থেকে কেশবচন্দ্র নিয়মিত দক্ষিনেশ্বরে যাতায়াত শুরু করলেন। পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে রামকৃষ্ণ দেবের ধর্মমত প্রচার করতে শুরু করলেন। পত্রিকায় এসব বিবরণ পড়ে স্কটিশচার্চ কলেজের পাদ্রী হেস্টি সাহেব ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে যুক্ত হলেন। তিনিও দক্ষিনেশ্বরে গিয়ে রামকৃষ্ণের সঙ্গে আলোচনা করে মুগ্ধ

হলেন। ক্লাশে ছাত্রদের উপদেশ দিলেন- দক্ষিনেশ্বরে গিয়ে এক ব্রাহ্মণ সাধককে দেখে এসো। তাহলে দর্শন শাস্ত্র সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে ও বুঝতে পারবে।

রামকৃষ্ণ নামটি মৃত্যুর পরে প্রচলিত হয়। জীবিতকালে পাগলা ঠাকুর বা পাগলা বামুন নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন। দক্ষিনেশ্বরে সাধনাকালে তোতাপুরী নামে বিখ্যাত তান্ত্রিক সাধক দীর্ঘদিন রামকৃষ্ণের সঙ্গে থেকে ভারতীয় দর্শন এবং তন্ত্রসাধনার নানা দিক নিয়ে নিয়মিত আলোচনা করতেন। দক্ষিনেশ্বর ত্যাগ করার সময় তিনি রামকৃষ্ণকে পরমহংস রূপে ঘোষণা করেন।

তখনো কলকাতার মানুষ রামকৃষ্ণের নাম শুনেনি। শহবের এক প্রান্তে এক অখ্যাত পল্লীতে কৈবর্তবংশীয় রাজ পরিবারের প্রতিষ্ঠিত কালীমন্দিরের প্রতি সাধারণ মানুষের আকর্ষণও তেমন ছিল না।

ব্রাহ্ম সমাজের বিখ্যাত নেতাদেপ প্রচারেব ফলেই পাগলা ঠাকুরকে একবার দেখার জন্য সাধারণ মানুষও পাগল হয়ে উঠেছিল। প্রতিদিনই দক্ষিনেশ্বরে ভীড় বাড়তে থাকে।

সেকালে গোঁড়া ব্রাহ্মণ পন্ডিতরা ব্রাহ্মদের বিধর্মী বলে গণ্য করতেন। রামকৃষ্ণ দেবের সঙ্গে ব্রাহ্মদের মেলামেশা তাবা পছন্দ করতেন না। কিন্তু রামকৃষ্ণ দেব ঐসব পন্ডিতদের মতামত গ্রাহ্য করতেন না।

রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে ব্রাহ্ম সমাজের আন্দোলনে সৃষ্টি হল একটি নতুন অধ্যায় এবং রামকৃষ্ণদেবের জীবনে শুরু হল প্রকাশ্য প্রচারের প্রথম অধ্যায়। এর আগে তিনি ছিলেন দক্ষিনেশ্বরের নির্জন পরিবেশে, শহরবাসীর দৃষ্টির আড়ালে।

রামকৃষ্ণ দেব ব্রাহ্ম সমাজের বিরোধ মিটিয়ে দিলেন। আবার সব ব্রাহ্মরা ঐক্যবদ্ধ হলেন। ক্রমে ক্রমে হিন্দু ধর্মের সঙ্গে বিরোধও দুর হয়ে গেল। রামকৃষ্ণদেব ব্রাহ্ম সমাজে পরমহংস রূপে পরিচিত ও প্রচাবিত হলেন। ব্রাহ্ম সমাজের বিভিন্ন উপাসনা সভায় রামকৃষ্ণদেব যোগ দিতে লাগলেন। মাঝে মাঝে ভাবে তন্ময় হয়ে বাহ্য জ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন। জ্ঞান ফিরে এলে মধুর কণ্ঠে গান শুনিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করতেন।

অনেকেই রামকৃষ্ণ দেবের এই অবস্থাকে মস্তিষ্কের বিকারগ্রস্ত অবস্থা বলে

মনে করতেন। কিন্তু জ্ঞান ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক অবস্থায় নানা জটিল বিষয়ের সহজ সমাধান করে দিতেন। ফলে ভক্তদের মধ্যে একটা সংশয় মিশ্রিত শ্রদ্ধার ভাব ফুটে উঠতো। ক্রমে ক্রমে সংশয় কেটে যেতে থাকে।

তন্ত্রসাধক তোতাপুরীর আগে দক্ষিনেশ্বরে একদিন নৌকা যোগে হাজির হয়েছিলেন যোগেশ্বরী নামে এক ভৈরবী ব্রাহ্মণী। তিনিও দীর্ঘদিন দক্ষিনেশ্বরে থেকে রামকৃষ্ণকে তন্ত্র সাধনায় উৎসাহ যুগিয়েছিলেন।

রামকৃষ্ণদেব তন্ত্রসাধনার নিয়ম কানুন কিছুই জানতেন না। ভৈরবী ব্রাহ্মণী শাস্ত্রীয় রীতি অনুযায়ী প্রাণীর মাথার কঙ্কাল সংগ্রহ করে পঞ্চবটীর বেলতলায় বেদী নির্মান করে পঞ্চপ্রাণীর মাথার কঙ্কাল বেদীর গুহায় স্থাপন করেন। তিনটি নর মুন্ড দিয়ে বেদীর উপর আসন পেতে রামকৃষ্ণকে বসিয়ে দেন। কঠিন শব সাধনায় নিমগ্ন হয়ে মনের ভয়, ভীতি ও সংশয় দূর করেন।

গভীর ভাবে তন্ময় হয়ে রামকৃষ্ণ ভৈরবীকে প্রশ্ন করেন- মাঝে মাঝে আমার এমন ভাব কেন হয় যাতে ব্যহ্যজ্ঞান থাকেনা? আমি কি সত্যিই পাগল?

ভৈরবী ব্রাহ্মণী জবাব দেন -- হ্যাঁ তুমি সত্যিই ভাবের পাগল। এমন পাগল না হলে গভীর জ্ঞান লাভ করা যায় না। ভাবের সাগরে ডুব দিয়েই নতুন ভাবের অধিকারী হওয়া যায়। এমন একাগ্রতা সবাব থাকে না।

ভৈরবী ব্রাহ্মণী আসার আগে রামকৃষ্ণ নিজের ভাবনা অনুযায়ী নানা ধরনের সাধনা করেছেন। হনুমানের ভক্তি কেমন তা উপলব্ধি করার জন্য নিজে হনুমান সেজে ধুতি দিয়ে লেজ তৈরী করে কোমরে বেঁধেছেন। গাছে গাছে ঘুরে ঘুরে হনুমানের মনটা বুঝতে চেষ্টা করেছেন।

এসব ঘটনা দেখে দক্ষিনেশ্বরে অনেকেই ভাবতো রামকৃষ্ণ আসলে একজন পাগল। পাগলের ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল।

ধর্মীয় ভাবের দিক থেকে রামকৃষ্ণদেব মধ্যযুগীয় মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু চিন্তা ও উপদেশের মধ্যে সম্পূর্ণ আধুনিক মনের বিচার বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণদেবের বাল্য জীবন সম্পর্কে কিছুটা পরিচয় ঘটলে সংশয় কেটে যেতে পারে।

হুগলী, মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া এই তিনটি জেলার সংগম স্থল কামারপুকুর নামে সমৃদ্ধ গ্রামে ১৮৩৬ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী রামকৃষ্ণের জন্ম হয়। বর্ধমান শহর থেকে ৩২ মাইল দূরে পুরী যাবার রাস্তায় অবস্থিত এই কামারপুকুর গ্রাম। পুরীগামী যাত্রীদের বিশ্রামের জন্য এই গ্রামে একটি পান্থনিবাস রয়েছে।

বহু সাধু-সন্ন্যাসী এই পান্থ নিবাসে বিশ্রাম নিয়ে পুরীর পথে যাত্রা শুরু করতেন। । চৈতন্যদেবের সময় থেকে এই গ্রামে প্রেম ধর্মের প্রভাব প্রচলিত রয়েছে। কামারপুকুর থেকে দুই মাইল দূরে দেরে নামক গ্রামে ছিল রামকৃষ্ণের পূর্ব পুরুষদের স্থায়ী বাস ভূমি। দেড়শ বিঘা জমি নিয়ে ছিল তাদের বাড়ী।

সেই গ্রামের জমিদার রামানন্দ রায় ছিলেন অত্যন্ত অত্যাচারী। রামকৃষ্ণের পিতা ক্ষুদিরাম ছিলেন অত্যন্ত সৎ ও নির্ভিক প্রকৃতির মানুষ। গ্রামের জমিদার একটি মিথ্যা মামলায় জমিদারেব পক্ষে সাক্ষী দেবার জন্য ক্ষুদিরামকে বিশেষভাবে অনুবোধ করেন। ক্ষুদিরাম মিথ্যা সাক্ষী দিতে রাজী না হওয়ায়, অত্যাচারী জমিদার মিথ্যা মামলায় অভিযুক্ত করে চট্টোপাধ্যায় পরিবারের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কবে সপরিবারে গ্রাম ত্যাগ করতে বাধ্য করেন।

ক্ষুদিরামের তিন ভাই তাদের শ্বশুর বাড়ীতে আশ্রয় নেন। কামারপুকুরের জমিদার সুখলাল গোস্বামী ছিলেন ক্ষুদিরামের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনি বন্ধুকে ভাল একখন্ড জমি দান করে কামারপুকুরে স্থায়ীভাবে বসবাস করার ব্যবস্থা করেন।

চট্টোপাধ্যায় পরিবারের গৃহ দেবতা ছিলেন রামচন্দ্র। এজন্যই এই পরিবারের সকলের নামের সঙ্গেই রাম শব্দটি যুক্ত থাকে ।

মানিকরাম চট্টোপাধ্যায়ের চারপুত্রের নাম ছিল- ক্ষুদিরাম, রামশীলা, নিধিরাম, এবং রামকানাই । ক্ষুদিরামের তিন পুত্রের নাম ছিল- রামকুমার, রামেশ্বর এবং রামকৃষ্ণ।

ক্ষুদিরাম গয়ায় পিতৃপুরুষের পিন্ডদান করতে গিয়ে স্বপ্নে দেখেন, গদাধর নিজেই বলছেন যে, তিনি ক্ষুদিরামের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করবেন।

একই সময়ে ক্ষুদিরামের দ্বিতীয় স্ত্রী চন্দ্রাদেবীও গ্রামের শিব মন্দিরে গিয়ে দেখলেন যে, একটি আলোর রশ্মি দেবমূর্তি থেকে ছুটে এসে চন্দ্রাদেবীকে গ্রাস করেছে।

এই অলৌকিক ঘটনার এক বছর পরই ১৮৩৬ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী তাদের একটি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। নবজাতকের বংশগত নাম হয় রামকৃষ্ণ, এবং স্বপ্ন অনুযায়ী ডাক নাম হয় গদাধর। ডাক নামেই তিনি পরিচিত হন। মৃত্যুর পরে রামকৃষ্ণ নামটি বিশেষভাবে পরিচিতি লাভ করে।

পাঁচ বছর বয়সে গ্রামের পাঠশালায় গদাধরকে ভর্তি করে দেওয়া হয়। বর্ণ পরিচয়ের পর পড়াশোনায় গদাধরের কোন উৎসাহ দেখা গেল না। কিন্তু কোন কিছু একবার শুনলেই মুখস্থ হয়ে যেত। গ্রামের কীর্তন ও যাত্রা দলের আসরে মধুর কণ্ঠে গান গেয়ে গদাধর সবাইকে মুগ্ধ করে দিতেন। মূর্তি তৈরীর কাজ দেখে দেখে নিখুঁত মাটির মূর্তি তৈরী করতে শিখলেন। গ্রামের পান্থশালায় সাধু সন্ন্যাসীদের কাছে নানা রকম ধর্মীয় কাহিনী গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনতেন।

এই বাল্য বয়সেই মাঝে মাঝে কোন বিষয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু করলে গদাধর হঠাৎ করে সমাধিস্থ হয়ে বাহ্য জ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন। মস্তিষ্কের কোন ত্রুটির জন্য এরকম ঘটনা ঘটছে মনে করে মা-বাবা- ও অন্যান্যরা পাগলের চিকিৎসক ডেকে ভালভাবে চিকিৎসা করার ব্যবস্থা নেওয়া দরকার বলে সিদ্ধান্ত করলেন। কয়েক জন বিশিষ্ট পাগলের ডাক্তার ডেকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হল। কিন্তু সুফল কিছুই পাওয়া গেল না।

গদাধরের বয়স যখন সাত বছর তখনই দুর্গা পূজা উপলক্ষে পিতা ক্ষুদিরাম সেলিমপুর গ্রামে বোনের বাড়ীতে গিয়েছিলেন উৎসবে যোগ দিতে। ভাগিনা রামচাঁদ খুব খুশী হয়ে আদর যত্ন করেন। কিন্তু দশমীর দিন রাত্রিবেলায় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে ক্ষুদিরাম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এই আকস্মিকঘটনায় পরিবারে চরম বিপর্যয় নেমে আসে।

এই অল্প বয়সে গদাধর পিতৃহারা হলেন। দাদা রামকুমারের উপর পরিবারের সব দায়িত্ব এসে পড়ল। তিনি অর্থ উপার্জনের আশায় কলকাতায় এসে আত্মীয় বন্ধুদের পরামর্শে ঝামাপুকুর পল্লীতে একটা সংস্কৃত শিক্ষার টোল খুলে বসলেন। প্রথম দিকে প্রচুর ছাত্র হলেও ক্রমে ক্রমে ইংরেজী শিক্ষার আগ্রহ বেড়ে যাওয়ায় টোলের ছাত্র সংখ্যা কমে গেল। বাধ্য হয়ে বড়লোকের বাড়ীতে পূজা-পার্বন ও যজমানির কাজও পাশাপাশি শুরু করেন।

একবার বাড়ীতে এসে রামকুমার জানতে পারলেন যে, গদাধর পড়াশোনায় মনোযোগী নয়। যাত্রা ও কীর্তন নিয়েই সর্বদা ব্যস্ত থাকে। মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি গদাধরকে কলকাতায় সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। টোল পরিচালনায় সাহায্য করা, মাঝে মাঝে যজমানি করা এবং দাদার কাছে লেখাপড়া করা এই ছিল গদাধরের কাজ। এই সময় গদাধররের বয়স ছিল ১৭ বছর।

গদাধর দাদাকে বললেন,--- বই পড়েই কি শুধু শিক্ষা হয়? কানে শুনে, চোখে দেখে অনেক কিছুই শেখা যায়।

তাছাড়া, লেখা পড়া শিখে লোকের বাড়ীতে পূজা-পার্বন ও শ্রাদ্ধ করে চাল কলা রোজগার করার কাজ ভাল লাগে না।

এসব ঘটনা থেকে বোঝা যায় ছোটবেলা থেকেই গদাধর বই পড়ার চেয়ে কানে শুনে, চোখে দেখে, অনেক কিছুই শিখেছিলেন এবং পুরোহিতের কাজকে একেবারেই পছন্দ করতেন না।

আরেকটি ঘটনায় জানা যায় তিনি ছোটবেলা থেকেই জাতপাতের বাধা মানতেন না। নয় বছর বয়সে গদাধরের উপনয়নের কাজের সময় তিনি জেদ ধরেন যে, গ্রামের নি:সন্তান কামার কন্যা যিনি ছোটবেলা থেকে গধাধরকে নিজের সন্তানের মত স্নেহ ও যত্ন করতেন তাঁর হাত থেকেই তিনি উপনয়নের প্রথম ভিক্ষা গ্রহণ করবেন। কামার কন্যা ছিলেন মাতা চন্দ্রাদেবীব বান্ধবী।

রামকুমার এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণরা কিছুতেই এ প্রস্তাবে রাজী হলেন না। গদাধর বললেন,-- তাহলে উপনয়ন হবে না। তিনি একটি ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে রইলেন। শেষ পর্যন্ত গদাধরের দাবী মেনে নিয়ে.ই উপনয়নের কাজ করতে হয়েছিল।

সেকালে উপনয়নের সময় নিজের মাতা অথবা কোন ব্রাহ্মণীর কাছ থেকেই প্রথম ভিক্ষা গ্রহণ করতে হতো। গদাধর কিশোর বয়সেই সেই নিয়ম ভেঙ্গে দিলেন।

বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গদাধরের মনে নানা ভাবের উদয় হতে লাগল। মানুষের মন থেকে শোক-দুঃখ মোচনের উপায় তিনি খুঁজতে লাগলেন। মাঝে মাঝে গদাধর সন্ন্যাস গ্রহণের কথা ভাবতেন সঙ্গে সঙ্গে মা-ভাই-বোনদের ছবি

চোখের সামনে ভেসে উঠতো। তখন তিনি ভাবতে থাকেন- আপনার জন্য সংসার ত্যাগ করা -সে তো স্বার্থপরতা। যাতে সকলের উপকার হয় তেমন কিছু করতে হবে।

এই সময় রানী রাসমনি দক্ষিনেশ্বরে কালীমূর্তী প্রতিষ্ঠার সংকল্প নিয়ে মন্দির নির্মাণ শুরু করেন। সাত লক্ষ টাকা খরচ করে মন্দির নির্মাণ সম্পন্ন হল। কালীমূর্তিও নির্মিত হয়ে এল কিন্তু কোন সুযোগ্য ব্রাহ্মণ কালীপূজা করতে রাজী হলেন না।

প্রতিষ্ঠা দিবসে কাশী, নবদ্বীপ ও অন্যান্য বহু জায়গা থেকে বহু ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হয়ে অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন। প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে রেশমী কাপড়, উত্তরীয় এবং স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে সম্মানিত করা হল। কিন্তু নিয়মিত পূজক না পাওয়ায় কালী মূর্তিটি বাক্সবন্দী করে রাখা হল।

বহু চেষ্টার পর রামকুমার কালী পূজাব দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। কিন্তু এক বছরের মধ্যেই রামকুমার হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মারা যান। অনেক অনুরোধের পর রামকৃষ্ণ পূজার দায়িত্ব নিলেন কিন্তু কিছুতেই তিনি পূজায় মন বসাতে পারেন নি। তাই ভাগিনা হৃদযরামকে পূজার দায়িত্ব দিযে তিনি ভাবের জগতে ফিরে গেলেন।

সহসাই গদাধব প্রায় বদ্ধ পাগলের মত আচরণ করতে থাকেন। তাই বাড়ীতে মায়ের কাছে পাঠানো হল। পাগলের চিকিৎসক, ওঝা এবং কবিরাজের চিকিৎসায় তিনি সুস্থ হয়ে আবার দক্ষিনেশ্বরে ফিরে এলেন।

১৮৫৩ সালে মন্দিব প্রতিষ্ঠিত হবার সময থেকে ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ২২ বছরকাল গদাধর দক্ষিনেশ্বরে বিভিন্ন ভাবের সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। এই সময় ভৈরবী ব্রাহ্মণী এবং তন্ত্র সাধক তোতাপুরীর কাছ থেকে নানা ধরনের ধর্মীয় শাস্ত্র আলোচনার মাধ্যমে বেদ-বেদান্ত ও তন্ত্র সাধনার বিভিন্ন তত্ত্ব আয়ত্ত করেন। এই সময় দক্ষিনেশ্বরে সকলেই গদাধরকে পাগল মনে করে পাগলা ঠাকুর বলেই ডাকতো। কিন্তু রানী রাসমনির ছোট-জামাতা মথুরা বাবু এই পাগলামীকে অলৌকিক শক্তির একটি রূপ বলেই গণ্য করতেন।

গদাধরও মাঝে মাঝে নিজের আচরণ সম্পর্কে নিজেকেই প্রশ্ন করতেন-

আমি কি সত্যিই পাগল? আবার ভক্তদের সঙ্গে আলোচনার সময় বলতেন- পাগল নয় কে? কেউ কামের জন্য পাগল, কে উ নামের জন্য পাগল, কেউ পদের জন্য পাগল আবার কেউ পদের জন্য পাগল আবার কেউ ধনের জন্য পাগল। কিছু লোক ঈশ্বরের জন্য পাগল হলে ক্ষতি কি?

ঈশ্বরের জন্য পাগল হও। কোশাকুশি ছুঁড়ে ফেলে দাও।---- এই উক্তির মধ্যে আমরা নতুন যুগের রামকষ্ণকে খুঁজে পাই। অন্ধ আচার অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিয়ে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরকে খুঁজে বের কর। এটাই হল নতুন যুগের নবজাগরণের আসল কথা।

রামকৃষ্ণ দেব নতুন যুগের বাণী প্রচারের জন্য উপযুক্ত নায়কের খুঁজেই ব্রাহ্ম সমাজে যাতাগাত শুরু করেছিলেন। সেখানেই আবিষ্কার করেন যুবক কেশব চন্দ্র সেন এবং নরেন্দ্রনাথ দত্তকে। এরা ছাড়াও আরো অনেকেই ব্রাহ্ম সমাজের মাধ্যমে দক্ষিনেশ্বরে এসেছেন। অনেকে সংসার ত্যাগ করে মানব কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করেছেন। রামকৃষ্ণের বাণীকে তারাই জনপ্রিয় করেছেন।

রামকৃষ্ণেব অকাল মৃত্যুর পর ভক্তরা তাঁর জীবন চবিত রচনা করতে গিয়ে অনেক অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করেছেন। আধুনিক সমালোকচকরা মনে করেন, ভক্তদের অনেক কল্পনা ও ভাবনা অলৌকিক রূপ নিয়ে জীবনীগ্রন্থে স্থান পেযেছে। ভক্তরাই তাঁকে অবতার রূপে কল্পনা করেছেন।

কিন্তু রামকৃষ্ণ বা বিবেকানন্দ অবতারবাদে বিশ্বাস করতেন না। রামকৃষ্ণদেব নিজেই বলেছেন---- শুনেছি শাস্ত্রে দশ অবতারের কথা লেখা আছে। এখন আবাব নতুন নতুন অবতার সৃষ্টি হচ্ছেন, কেমন করে?

রামকৃষ্ণদেব ধর্মের শাস্ত্রীয় জটিলতা ভেঙ্গে দিয়ে সহজ সরল লোকজীবনকে ঐশ্বরিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। এটাই ছিল রামকৃষ্ণদেবের প্রধান অবদান। এটাই ছিল নবযুগের আহ্বান। এযুগে প্রতিটি মানুষই ভগবান। মানুষের মধ্যে ভগবানকে জাগিয়ে দেওয়াই ধর্মের প্রধান কাজ। রামকৃষ্ণদেবের এই শিক্ষাই আধুনিকযুগে নতুন ধর্মীয় চেতনার নবজাগরণ সৃষ্টি করেছে। শিবরূপে জীবসেবা নতুন ধর্মের আদর্শ হয়ে উঠেছে।

শ্রী রামকৃষ্ণ ও ব্রাহ্মসমাজ

১৮২৮ খৃষ্টাব্দে নব যুগের উদ্বোধক রামমোহন রায় যুক্তবাদী মানবধর্ম প্রচারের মঞ্চ হিসেবে ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। মাত্র দুই বছরে শিক্ষিত সমাজে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে ১৮৩০ সালে রামমোহন সতীদাহ নিবারণ আইনের পক্ষে প্রিভি কাউন্সিলে সাওয়াল করার জন্য ইংলন্ডে যাত্রা করেন।

রামমোহনের এই যাত্রাই যে জীবনের শেষ যাত্রা তখন তা কেউ কল্পনাও করেন নি। বিরোধীরা ভেবেছিলেন দেশে ফিরে এলে সমুদ্র যাত্রার অপরাধে রাম মোহনকে সমাজচ্যুত করা হবে। অন্যদিকে বন্ধুরা ভেবেছিলেন রামমোহন দেশে ফিরে এলে একটা নতুন জাগরণের শিহরণ সৃষ্টি হবে। এই সময় ফরাসী বিপ্লবের ঢেউ এসে শিক্ষিত সমাজকে আলোড়িত করেছিল।

রামমোহনের চিন্তায় ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে কোন বিরোধ ছিল না। এ দুটি বিষয়ের চর্চা প্রতিটি মানুষের কর্তব্য বলে তিনি বিবেচনা করতেন।

বিশ্বজনীন ধর্ম প্রচার যেমন রামমোহনের মূল আদর্শ ছিল, ঠিক তেমনি বিশ্ব জনীন ন্যায় বিচার মূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থাও তাঁর কাম্য ছিল। ১৮২০ সালে - বেদান্ত বিদ্যালয়- প্রতিষ্ঠা এবং ১৮২১ সালে স্পেনে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার খবরে খুশী হয়ে টাউন হলে ভোজ সভার আয়োজন করা রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গীর স্পষ্ট নিদর্শন।

আধুনিক ভারতের ধর্মীয় আদর্শ, রাষ্ট্রনীতি এবং সামাজিক সংস্কৃতির যে ধারা রামমোহন সৃষ্টি করেছিলেন তা আজো প্রবাহমান রয়েছে।

রামমোহনের বন্ধু প্রিন্সদ্বারকানাথের ঠাকুর পরিবার যবন সংসর্গের জন্য সমাজচ্যুত হয়েছিল। বৃটিশ শাসনে এই পরিবার হয়ে গেল বাঙ্গালী সংস্কৃতির মূল কেন্দ্র।

রামমোহনের অকাল মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম সমাজের দায়িত্ব নিলেন। কিন্তু তিনি রামমোহনের বিশ্বজনীন ধর্ম চিন্তার পরিবর্তে ভারতীয় বেদান্ত ধর্মের প্রাধান্য দিলেন! ফলে ব্রাহ্ম সমাজে দেখা দিল মতভেদ। ডিরোজিওর যুক্তিবাদ হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তুলেছিল। কিন্তু ডিরোজিওর অকাল মৃত্যুতে নেতৃত্বহীন ছাত্র ও যুবকেরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সত্যবাদিতা এবং স্পষ্ট বাদিতার আদর্শ তারা অনুসরণ করেছিল। এই গোষ্ঠীর অনেকেই ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দিয়েছিল।

কেশব চন্দ্র সেন, রাজনারায়ন বসু, অক্ষয় কুমার দত্তের মত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দেবার ফলে এই সময় ব্রাহ্ম সমাজ খুব শক্তিশালী হয়ে উঠে।

দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র সেনকে আচার্য পদে নিযুক্ত করলেন। একজন বৈদ্য বংশীয় ব্যক্তিকে আচার্য পদে নিয়োগ করা সে যুগে একটা বড় ধরনের পদক্ষেপ। ব্রাহ্মণরাই চিরকাল পুরোহিতের কাজ করেছেন।

ব্রাহ্ম সমাজের নেতা রামমোহন সতীদাহ প্রথা নিবারণ করেন। বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ প্রবর্তন করেন। কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে ১৮৬৪ সালে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত হয়। কয়েকজন ব্রাহ্মণ সন্তান উপবীত ত্যাগ করেন। এসব ঘটনায় ব্রাহ্মণ সমাজে আলোড়ন উঠে। দেবেন্দ্রনাথ পরিস্থিতি বুঝে কেশবচন্দ্রের পরিবর্তে একজন ব্রাহ্মণ আচার্য নিযুক্ত করেন।

ফলে কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে একদল তরুন আলাদা হয়ে ভারতীয় ব্রাহ্ম সমাজ নামে নতুন সংগঠন গঠন করেন। এই সময় ভারতীয় শিক্ষিত যুবকেরা ইংরেজদের মত সমান সুযোগ ও সমান মর্যাদার দাবীতে আন্দোলন শুরু করেছিল।

রাজ নারায়ন বসু— "একাল ও সেকাল" নামে একটি গ্রন্থ রচনা করে দেখালেন যে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে বিদেশী খৃষ্টান আচার ও প্রথা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। ফলে হিন্দু সমাজ শিক্ষিত ও অশিক্ষিত দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। কেশব চন্দ্র ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শ প্রচারের জন্য সমগ্র ভারত পরিক্রমা শুরু করেন। তিনি ছিলেন সেকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বক্তা। বাংলা,হিন্দি ও ইংরেজী তিন ভাষাতেই তিনি ছিলেন সুবক্তা।

ভারতীয় ব্রাহ্ম সমাজ জাতিভেদ প্রথা বাতিল করে ছিল। ১৮৭২ সালের

বিবাহ আইনে অসবর্ণ বিবাহ আইনের স্বীকৃতি পেল।

কেশবচন্দ্রের প্রচারের প্রভাবে বোম্বাই ও মহারাষ্ট্রে - প্রার্থনা সমাজ - নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। এর প্রভাবে পাঞ্জাবেও সমাজ সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়েছিল।

গুজরাটের এক ব্রাহ্মণ দয়ানন্দ প্রতিষ্ঠা করেন-"আর্যসমাজ"। রামমোহন এবং ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শের সঙ্গে আর্য সমাজের মিল ছিল না। তবুও বাংলার নব জাগরণের আন্দোলন ধীরে ধীরে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। এটা কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়।

এই সময় দক্ষিণেশ্বরের পাগলা ঠাকুর প্রকাশ্য প্রচারে এলেন। নানা দিকে নানা মতের আবির্ভাব দেখে অনেকেই যখন বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। ঠিক তখনই তিনি নতুন শ্লোগান নিয়ে আসরে অবতীর্ন হলেন।

তিনি বললেন— **যত মত তত পথ**। সব পথেরই গন্তব্য স্থল এক। সব ধর্মপথেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়।

কেশবচন্দ্র এই মতে আকৃষ্ট হলেন। এবং ব্যাপক ভাবে প্রচার শুরু করলেন। আদি ব্রাহ্ম সমাজের সদস্য নরেন্দ্রনাথ দত্ত এই নতুন মতের সমর্থনে এগিয়ে এলেন। অরো অনেকেই রামকষ্ণের মত ও পথকে বোঝার জন্য দক্ষিনেশ্বরে ভীড় করতে লাগলেন।

এভাবেই গড়ে উঠলো রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়, এখানেই মিলিত হল- আদি ব্রাহ্ম সমাজ- ভারতীয় ব্রাহ্ম সমাজ এবং সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অধিকাংশ সদস্য। শিক্ষিত যুবসম্প্রদায়কে রামকৃষ্ণ শোনালেন আবো অনেক নতুন কথা- **যেমন, তিনি বলতেন, যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি - দেখতে দেখতে, শুনতে শুনতে কত কিছু শেখা হয়ে যায়।**

প্রচলিত শিক্ষার সংকীর্ণ গন্ডী সম্পর্কে রামকৃষ্ণদেব বাল্য কালেই সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। তাই তিনি দাদাকে বলেছিলেন - চাল, কলা রোজগারের বিদ্যা শিখতে চাই না। এমন বিদ্যা শিখতে চাই যার দ্বারা জ্ঞানের পথ খুলে যায়।

এই বিদ্যা তিনি শিখেছিলেন জীবন থেকে। যার সাহায্যে জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম ও দয়াব ভান্ডাব সৃষ্টি হয়েছিল রামকৃষ্ণের হৃদয়ে ও মস্তিষ্কে। তিনি বলতেন,

বিদ্যা মানুষের অন্তরে চেতনা সৃষ্টি করে, হৃদয়ের অনুভূতি এবং সত্য উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। এ বিদ্যা জীবন থেকেই শিখতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন গভীর ভাবদৃষ্টি।

শাস্ত্রের দুই রকম অর্থ থাকে। একটি হল শব্দার্থ অন্যটি হল মর্মার্থ। মর্মার্থটুকু গ্রহণ করার শক্তি অর্জন করতে হয়। বিদ্যার সার্থকতা তখনই যখন জ্ঞান অনুযায়ী জীবন উন্নত ও বিকশিত হয়।

রামকৃষ্ণ ছিলেন একজন আদর্শ লোকশিক্ষক। অনেকে তাকে নানাভাবে পরীক্ষা করেছে। কঠিন কঠিন প্রশ্ন করেছে। কিন্তু সব প্রশ্নেরই যখন অতি সরল উত্তর তিনি দিয়েছেন, তখন সকলেই অবাক হয়েছে।

দেশের বিখ্যাত ব্যক্তিরা রামকৃষ্ণের সঙ্গে আলোচনা করে মুগ্ধ হতেন। যতই শুনতেন ততই বেড়ে যেত শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস।

রামকৃষ্ণ দেব নিজেই ছিলেন নিজের শিক্ষক। তাঁর মন এবং স্মৃতি শক্তির ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। নিজের মনের ভাব অন্যের মনে প্রবাহিত করার দক্ষতাও ছিল অসাধারণ।

যার যেমন চাহিদা তেমনি শিক্ষাই তিনি দিতে পারতেন। দর্শনের তত্ত্ব দিয়ে দর্শনের ছাত্রকে শিক্ষা দিতেন, সংসারী মানুষকে শিখিয়ে দিতেন সুস্থ জীবন গঠনের পদ্ধতি। নাট্যকারকে শিখিয়ে দিতেন অভিনয়ের নানা কৌশল।

কৈশোরে তিনি যাত্রাদলের অভিনয়ে আসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। রামায়ণ, মহাভারতের বিভিন্ন বিষয়ে কীর্তন ও যাত্রা করার সময় তিনি গভীরভাবে বিভোর হয়ে যেতেন।

রামকৃষ্ণদেব বলতেন, প্রতিটি মানুষের অন্তরে লুকিয়ে আছে অসীম ক্ষমতা, মনের খনিতে আছে অমূল্য রত্ন ভান্ডার। মনের চৈতন্য শক্তিকে জাগিয়ে দিতে পারলেই মানুষের প্রকৃত শক্তির বিকাশ ঘটে।

মানুষ নিজের শক্তি সম্পর্কে সচেতন নয়। নিজের অজ্ঞতার জন্যই অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবে থাকে মানুষের মন। নিজের দু:খ-দুর্দশা থেকে মুক্তির জন্য সচেষ্ট হবার সাহস হারিয়ে ফেলে। ভাগ্য বা অদৃষ্টের উপর নির্ভরশীল হয়ে সান্ত্বনা লাভ করে।

জীবের মধ্যেই শিব বাস করেন। এটা হলো রামকৃষ্ণ দেবের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। মানুষের মধ্যে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ নেই।

প্রত্যেকের মনের শক্তিকে জাগিয়ে তোলার জন্য তিনি বার বার অভ্যাসের দ্বারা মনকে নিয়ন্ত্রনে রাখার উপদেশ দিয়েছেন। মন স্থির থাকলে যে কোন কাজেই সাফল্য লাভ করা যায়। মনের একাগ্রতায় বিবেক বুদ্ধি স্থির হয়, জ্ঞান লাভ সহজ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ কারো বিশ্বাসে আঘাত না দিয়েই মনের মধ্যে মহৎ ভাব জাগিয়ে দেবার চেষ্টা করতেন। জাগ্রত মন নিজেই খুঁজে নিতে পারে নিজের পথ। তিনি বলতেন মন্দ লোককেও মন্দ না বলে ক্রমাগত ভাল বলতে থাকলে ভাল হয়ে যায়।

মানুষের শিক্ষার শেষ নেই। জ্ঞানেরও সীমা নেই । সারা জীবন শিখেও শিক্ষার শেষ হয় না। নতুন নতুন জ্ঞানের সন্ধান করাই মানুষের কর্তব্য । রামকৃষ্ণদেব এরূপ শিক্ষাই দিতেন। শ্রী রামকৃষ্ণ বলতেন- যার মধ্যে কোন না কোন গুণের প্রকাশ ঘটে, লোকে তাকেই শ্রদ্ধা করে, বিশ্বাস করে। সাধক- সমাজ সেবী, বিদ্যান-চরিত্রবান ইত্যাদি সকল শ্রেনীর মানুষেব মধ্যেই কল্যাণময় শক্তির অভির্ভাব ঘটে। এ জন্যই তিনি সমাজের সব বিশিষ্ট লোকদের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করতেন।

বিভিন্ন মত এবং পথের মিলনকেই বলা যায় সমন্বয়। বামমোহন তাত্বিক ব্যখ্যার মাধ্যমে সর্বধর্মের সমন্বয় প্রক্রিয়ার পথ দেখিয়েছেন।

রামকৃষ্ণদেব সহজ সরল জীবনের ভাষায় সর্বধর্মের সমন্বয় প্রচেষ্টাকে জনপ্রিয় করেছেন। এটাই ছিল ধর্মীয় নবজাগরণের ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণের সবচেয়ে বড় অবদান। সব মতের বিরোধহীন ভাবাদর্শ শাস্ত্রীয় বাঁধনের বেড়া ভেঙ্গে দিয়েছে।

একদিন এক ভক্ত এসে বললেন, একজন খৃষ্টান সাহেব হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছে। তিনি দেখা করতে এসেছেন।

একথা শুনে রামকৃষ্ণদেব মোটেই খুশী হলেন না। বিরক্ত হয়ে জবাব দিলেন, খৃষ্টান ধর্ম ছেড়ে হিন্দুধর্ম কেন? খৃষ্টান ধর্মে কি ঈশ্বর নেই? প্রত্যেকে যার যার ধর্মে থেকেই মানব সেবায় ঐক্যবদ্ধ হতে পারে।

মানব কল্যাণে নিয়োজিত সব ধর্ম, সব ভাব এক রকম। এই ভাবাদর্শই তিনি প্রচার করেছেন। মুখে ও অন্তরে তিনি ছিলেন এক । কোথাও কোন ছল-চাতুরী ছিল না।

এজন্যই সব ধর্মের বুদ্ধিজীবীরা রামকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হয়ে অভিভূত হয়েছেন। বহু মুসলমান এবং খৃষ্টান রামকৃষ্ণের উপদেশ ও বাণী শোনার জন্য দক্ষিনেশ্বরে এসেছেন।

ধর্ম সম্পর্কে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দার্শনিকরা নানা রকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কেউ বলেছেন মানবজীবনে ইহকাল আর পরকালের কল্যাণ সাধনের পদ্ধতিই হল ধর্ম। আবার কেউ বলেছেন নিজ নিজ ধর্মের নির্দেশ পালন করাই হল ধর্ম। যুগে যুগে ধর্মের পরিবর্তন হয়েছে। সমাজের পরিবর্তন ঘটেছে। ঈশ্বরের পবিত্র আদর্শ ও নির্দেশ পালন করে মানুষ নিজে পবিত্র হবে, দেবত্ব অর্জন করে সমাজের কল্যাণ করবে এটাই মূলত: সব ধর্মেরই আদর্শ।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ বিশেষ প্রাকৃতিক পরিবেশে এবং জীবন সংগ্রামে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম ও আচার অনুষ্ঠান প্রচলিত হয়েছে। উপাসনা পদ্ধতির পার্থক্যের জন্য বিরোধও সৃষ্টি হয়েছে।

ধর্মীয় গোঁড়ামী থেকেই বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় বিরোধ, বিদ্বেষের রূপ নেয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গা বেঁধে যায়। এসব গোঁড়ামীর ফলেই হিন্দু ধর্মেও নানা সম্প্রদায় এবং নানা দেবতার সৃষ্টি হয়েছে।

রামকৃষ্ণদেব বলেছেন.--- বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় বিদ্বেষ এবং সংকীর্ণতা মানুষের পক্ষে দেবত্ব অর্জনের পথে প্রধান বাধা। এই বাধা দূর করার জন্য চাই নতুন ভাব, নতুন দৃষ্টিভঙ্গী, উদার মানসিকতা, এবং আন্তরিক ভালবাসা।

শ্রী রামকৃষ্ণ ধর্মের এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছেন-- যার নাম মানব ধর্ম। এই ধর্ম প্রচারের জন্য তিনি একদল যুবক সংগ্রহ করেছেন। অতি যত্নে তাদের শিক্ষিত করে তুলেছেন নতুন মানব ধর্মের আদর্শে। এই দলের নেতা নির্বাচিত করেছেন- নরেন্দ্রনাথ দত্তকে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ধর্মীয় ভেদাভেদ দূর করে সর্বজন গ্রাহ্য ধর্মমত সৃষ্টির নানা উপায় খুঁজে দেখা.হয়েছে । কিন্তু কার্যকর দার্শনিক ভিত্তি ও পদ্ধতি

তৈরী না হওয়ায় সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

প্রত্যেক ধর্মের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে। যেমন---- (১) দার্শনিক চিন্তা, (২) প্রাচীন ঐতিহ্য, (৩) আচার অনুষ্ঠান, (৪) ধর্মীয় তত্ত্ব, (৫) সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী, (৬) গোষ্ঠীগত চেতনা ইত্যাদি।

প্রত্যেক ধর্মের বাণী ও উপদেশের মধ্যে মানবিক উদারতা লক্ষ্য করা যায়। তবুও নিজ নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমানের প্রবনতা থেকে সংঘাত সৃষ্টি হয়। ধর্মে ধর্মে বিরোধের মূলে আছে অজ্ঞতা, অন্ধবিশ্বাস এবং কুসংস্কার । রামকৃষ্ণ দেব বলেন,-- বস্তু এক নাম আলাদা। আমার ধর্ম ঠিক অন্য সব মিথ্যা এই গোঁড়ামি দূর হলেই আর কোন বিরোধ থাকবে না।

কাজটা কঠিন হলেও লক্ষ্যটা সঠিক। সব ধর্মের মানুষকে একটা জায়গায় মেলাতে হবে। প্রত্যেক ধর্মের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেই মিলনের সূত্র আবিষ্কার করে গেছেন। সর্ব ধর্মের উপাসনা মঞ্চও প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। কিন্তু উপাসনা কেন্দ্রের ধারাবাহিকতা না থাকায় উত্তরাধিকার সূত্রে ঐতিহ্য গড়ে উঠেনি।

সব মানুষেরই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ঐতিহ্যের উপর গভীর মমতা• বোধ জন্মে। তাকে উপযুক্ত মর্যাদা দিয়েই নতুন পথ সৃষ্টি হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, বাপের সব সন্তান একরকম হয় না। কিন্তু প্রত্যেকটি সন্তানের শক্তি ও মানসিকতার উন্নতি ও সমন্বয় ঘটাতে হয়। এখানেই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের কথাটা আসে।

প্রকৃতপক্ষে মানুষের ধর্ম একটাই। নানা রূপে প্রকাশিত নানা ধর্মের বিরোধটা বাহ্যিক । অন্তরে ঐক্যের বীজ লুকিয়ে আছে।

এক্ষেত্রে শ্রী রামকৃষ্ণের উপদেশ হল--- নিজের ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা রাখ। অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ কর। সব মানুষকে ভালবাসতে চেষ্টা কর।

রামমোহন মূর্তি পূজার বিরোধী ছিলেন। কারণ ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে কেন্দ্র করে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। ফলে সংকীর্ণতা দেখা দেয়।

কিন্তু রামকৃষ্ণদেব এক্ষেত্রেও সমন্বয়ের কথা বলেছেন, ঈশ্বর সাকারও হতে পারে আবার নিরাকারও হতে পারে। কেউ যদি মূর্তি গড়ে আনন্দ পায় তাতে আপত্তি কি? আবার বহু হিন্দু পরি বারে মূর্তি ছাড়াই পূজা হয়। তাতেও

শাস্ত্রীয় কোন বাধা নেই। যার যার পথে নিষ্ঠা ও সততা রক্ষা করে চলতে হবে। কুপথ বিপথ ত্যাগ করতে হবে। সেটাই হবে বাঁচার পথ।

শ্রী রামকৃষ্ণ একটা সহজ দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন, ----- রাখালেরা যখন বিভিন্ন পথ দিয়ে মাঠে গরু চড়াতে আসে তখন সব গরু একসঙ্গে মিশে যায়। আবার সন্ধ্যায় বাড়ী ফেরার সময় সব গরু যার যার নিজের পথেই বাড়ী ফিরে যায়।

সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের জন্যও এরকম একটা মিলনের কেন্দ্র থাকা দরকার। সব ধর্মের মানুষেরা একসঙ্গে মিলে মিশে সারাদিন আত্মীয়তা গড়ে তুলবে আবার সন্ধ্যায় বাড়ী গিয়ে যার যার ধর্মাচরণ করবে।

রামকৃষ্ণের পরামর্শে কেশব চন্দ্র ১৮৮০ সালের ২৫শে জানুযারী নব বিধান গঠন করেন। পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্মের মূলকথা একসঙ্গে গেঁথে সব ধর্মের মানুষকে ঐক্যের পথে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

শ্রী রামকৃষ্ণ ৩৮ বছর বয়সে সাধন কর্মের সমাপ্তি ঘটান। ৩৯ বছর বয়সে কেশবচন্দ্রের মাধ্যমে প্রকাশ্য প্রচারে আসেন। তরপর মাত্র ১১ বছর তিনি জীবিত ছিলেন। কঠিন ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৮৮৬ সালের ১৫ ই আগষ্ট দেহত্যাগ করেন।

মাত্র সাত বছর বয়সে রামকৃষ্ণ পিতৃহারা হন। নয় বছর বয়সে উপনয়ন হয়। সতের বছর বয়সে ১৮৫৩ সালে দাদা রামকুমারের সঙ্গে কলকাতায় আসেন। দক্ষিনেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠার পর দাদার সঙ্গে দক্ষিনেশ্বরে বসবাস শুরু করেন। এখানেই তিনি ৫১ বছর বয়সে পদার্পণ করে দেহত্যাগ করেন।

রামকৃষ্ণদেব যে বছর কলকাতায় আসেন সে বছরই কামারপুকুর গ্রামের পার্শ্ববর্তী গ্রাম জয় রাম বাটীর এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে সারদা দেবীর জন্ম হয়। পাঁচ বছর বয়সে ২৩ বছর বয়স্ক গদাধরের সঙ্গে সারদা দেবীর বিবাহ হয়। মায়ের অনুরোধে গদাধর বিবাহ করতে রাজী হন। বিবাহের রাত্রে নানা রকম গল্প বলে বালিকা বধুর সঙ্গে রাত কাটিয়ে ছিলেন।

বিবাহের আট বছর পর গদাধর একবার মাত্র শ্বশুর বাড়ী বেড়াতে গিয়েছিলেন। গানে-গল্পে সবাইকে মুগ্ধ করে নিজ বাড়ীতে ফিরে আসেন। ১৮৭২

সালে সারদাদেবী প্রথম দক্ষিনেশ্বরে আসেন। ১৮৭৩ সালে শ্রীরামকৃষ্ণ ষোড়শী পূজার অনুষ্ঠান করে সাধনার জীবনে অবসান ঘটান। সারদা দেবী কামারপুকুরে ফিরে যান। ১৮৭৩ সালে রামকৃষ্ণদেবের মাতা চন্দ্রাদেবী দক্ষিনেশ্বরে দেহত্যাগ করেন। এই খবর শুনে সারদা দেবী আবার দক্ষিনেশ্বরে ফিরে আসেন।

১৮৮১ সালে নরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রথমবার দক্ষিনেশ্বরে আসেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ১৮ বছর। মৃত্যুর আগে রামকৃষ্ণদেব সমস্ত দায়িত্ব ভার নরেন্দ্রনাথের হাতে অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হন।

মাত্র ১১ বছরের প্রচার জীবনে রামকৃষ্ণ দেব দেশের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ আলোচনার সুযোগ পেয়েছেন। অনেকের সঙ্গে তিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে দেখা করেছেন এই সময়।

ব্রাহ্ম সমাজে ভাঙ্গণ, যুব সমাজে অস্থিরতা, সংস্কার আন্দোলনে প্রাচীন ও নবীনের মধ্যে সংঘাত ইত্যাদি সব বিষয়েই তিনি কৌতুহলী হয়ে উঠেন।

ধর্ম ও সমাজ রক্ষার জন্য রামকৃষ্ণদেব ব্যাকুল হয়ে উঠেন। তিনি বুঝতে পারেন, যে একদল ত্যাগী পুরুষ ছাড়া একাজ সম্ভব নয়। তাই তিনি বাছাই করা যুবকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে অতি যত্নে তাদের মন ও বিবেককে ত্যাগের ব্রত গ্রহণের জন্য আগ্রহী করে তোলেন।

নরেন্দ্রনাথ দত্তের মধ্যে তখনো দ্বির্ধা ছিল। পরিবারের বড় সন্তান হয়ে পিতার অকাল মৃত্যুর পর মা ও ছোট ভাই বোনদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন না করে সমাজ সেবার কাজে যোগ দেওয়া একটা কঠিন সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছিল। রামকৃষ্ণদেব তিরস্কার করে বলেন,— তোর মন এত ছোট কেন রে? তোর একটা পরিবারের কথা ভাবছিস আর এত বড় ভারতবর্ষ তোর দিকে তা[illegible] আছে-- তাদের কথা ভাবছিস না?

একথার পরে নরেনদ্রনাথ দত্ত স্থির সিদ্ধান্তে আসেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নিশ্চিন্ত হন। নরেন্দ্রনাথ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শুরু হয় ভারতীয় ধর্মীয় চিন্তায় নবজাগরণ সৃষ্টির সাধনা ও সংগ্রাম। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দই ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের শেষ প্রতিনিধি।

স্বামী বিবেকানন্দ

বহু রূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুজিছ ঈশ্বর
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

স্বামী বিবেকানন্দ

দত্ত বাড়ীর নরেন্দ্র নাথ

স্বামী বিবেকানন্দের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বুঝতে হলে নরেন্দ্রনাথ দত্তের বংশ পরিচয়, শিক্ষা ও মানসিকতা সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা একান্ত প্রয়োজন। কারণ নরেন্দ্রনাথ দত্তই সন্ন্যাস গ্রহণ করে স্বামী বিবেকানন্দ হয়েছিলেন।

উত্তর কলকাতার সিমুলিয়া পাড়ার বিখ্যাত দত্ত বংশে ১৮৬৩ সালের ১২ই জানুয়ারী ভোর বেলায় নরেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন সে যুগের একজন বিখ্যাত আইনজীবী। মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী ছিলেন এক সম্ভ্রান্ত বংশের বিদূষী মহিলা ।

এই দত্ত বংশের আদি বাড়ী ছিল বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমার দরিয়াটিলা গ্রামে। তিনশ বছর আগে এই গ্রামের দত্ত পরিবারের কর্তা ছিলেন নবাব বাহাদুরের দেওয়ান। গ্রামের প্রবেশ পথে তিনি নিজের ৯ পুত্রের নামে পর পর ৯টি পুকুর খনন করিয়েছিলেন। এছাড়াও গ্রামের ভিতরে গ্রামবাসীদের জন্য একটি পুকুর খনন করে বড় পাকা ঘাট তৈরী করে দেন।

এই বংশেরই রামনিধি দত্ত নিজ পুত্র রামজীবন দত্ত ও পৌত্র রামসুন্দর দত্তকে নিয়ে তিনশ বছর আগে কলকাতায় গোবিন্দপুরে বসবাস শুরু করেন। ইংরেজ বণিক কোম্পানী ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ তৈরী করার সময় এই এলাকার লোকদের উত্তর কলকাতায় বসতি নির্মানের সুযোগ দেয়।

তখন কলকাতা ছিল গন্ড গ্রাম। ইংরেজ কোম্পানী কলকাতা, গোবিন্দপুর এবং সুতানুটি এই তিনটি গ্রাম কিনে নিয়েছিল ষোল হাজার টাকায়। একমাত্র গঙ্গার ধারে ধারে ব্যবসায়ীদের দোকান পাট গড়ে উঠেছিল। বাকী সব জায়গা ছিল ঘন জঙ্গলে আচ্ছন্ন।

জঙ্গল কেটে যার যেমন দরকার জায়গা দখল করে বাড়ী ঘর তৈরী করে স্থায়ী বসতি গড়ার জন্য ইংরেজ কোম্পানী উৎসাহ দিত। ইংরেজদের সঙ্গে বিভিন্ন

স্বার্থে জড়িত ব্যক্তিরাই প্রথম যুগে জঙ্গল কেটে স্থায়ী বসতি গড়ে তুলেছিল। রামনিধি দত্ত পুত্র রামজীবন এবং পৌত্র রামসুন্দরকে নিয়ে সিমুলিয়া অঞ্চলে বাড়ী নির্মান করে স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করেন।

রামসুন্দর দত্ত একজন জমিদারের দেওয়ান নিযুক্ত হন। তাঁর পুত্র রামমোহন দত্ত ইংরেজ সরকারের সুপ্রিম কোর্টে ফার্সী আইনজীবী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি বিপুল অর্থ রোজগার করেন এবং অত্যন্ত অভিজাত জীবন যাপন করেন।

এই বংশেরই বিশ্বনাথ দত্ত আইনজীবী হিসেবে বিখ্যাত হয়েছিলেন। অনেক সম্পত্তিরও মালিক হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি যৌথ পরিবারের ঐতিহ্য রক্ষা করার জন্য নিজের নামে সম্পত্তি না রেখে ভাই ও অন্যান্যদের নাম সম্পত্তি ক্রয় করেন।

বিশ্বনাথ দত্তের আকস্মিক মৃত্যুর ফলে যৌথ পরিবার ভেঙ্গে যায় এবং বিশ্বনাথ দত্তের পরিবার সমস্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হন। ভুবনেশ্বরী দেবীর নামে কিছু সম্পত্তি ছিল তাও জোর করে অন্যেরা দখল করে নেয়।

বিশ্বনাথ দত্তের পরিবারে শুরু হয় বিপর্যয়। যৌথ পরিবারে অশান্তি সৃষ্টি হয়েছিল অনেক বছর আগেই। বিশ্বানাথ যখন কিশোর বয়সে পদার্পন করেন তখনই পারিবারিক অশান্তির কারনে পিতা দুর্গাপ্রসাদ দত্ত সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে যান। কাকার অবহেলায় ও মায়ের স্নেহে বিশ্বনাথদত্ত বড় হন।

ষোল বছর বয়সে বিশ্বনাথ দত্তের বিবাহ হয়েছিল নন্দলাল বসুর একমাত্র কন্যা ভুবনেশ্বরী দেবীর সঙ্গে। তিনি পিতার সম্পত্তির অধিকারিনী হন। ফলে বিশ্বনাথ দত্তের পরিবার রক্ষা পায়।

যৌথ পরিবারের বিড়ম্বনা আমরা বিদ্যাসাগরের পরিবারেও দেখেছি। কিন্তু বিদ্যাসাগরের উদার মন সব কিছুকেই মেনে নিয়েছিল। পরিবারের দায়িত্ব এবং মাতা-পিতার দায়িত্ব তিনি একাই পালন করেছিলেন। পরিবারে অশান্তির কারণেই বিদ্যাসাগরের পিতা ঠাকুরদাস কাশীবাসী হয়েছিলেন।

বিশ্বনাথ দত্তের চার পুত্র এবং ছয় কন্যা জন্মেছিল। প্রথম পুত্র ৮ মাস বয়সে মারা যায়। দ্বিতীয় কন্যা আড়াই বছর বয়সে মারা যায়। তারপর তিন

কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। কন্যা সন্তানটিও শৈশবে মারা যায়। ষষ্ঠ সন্তান হলেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তারপর দুই কন্যা ও দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে।

নরেন্দ্রনাথ ছিলেন ভাইদের মধ্যে বড়। মহেন্দ্রনাথ মধ্যম এবং ভূপেন্দ্রনাথ ছিলেন সবার ছোট। মহন্দ্রেনাথ এবং ভূপেন্দ্রনাথ মাতামহীর সাহায্যে ও উৎসাহে বিদেশে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পান। আমেরিকায় এবং লন্ডনে পড়াশোনা করেন। জার্মানীতে গিয়ে ভূপেন্দ্রনাথ বিপ্লবী দলে যুক্ত হয়ে পড়েন। মহেন্দ্রনাথও ছয় বছর বিদেশে থেকে বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর দেশে ফিরেছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে এবং সাহিত্য চর্চায় যুক্ত থেকে দুই ভাই অবিবাহিত জীবন কাটিয়ে দেন।

নরেন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরেব প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন থেকে প্রথম বিভাগে এন্ট্রাস পাশ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে পডাব সময় ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে কিছুকাল পডাশোনা স্থগিত রাখতে বাধ্য হন।

পরে জেনারেল এসেম্বলীতে বর্তমান স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে উচ্চ শিক্ষা সম্পন্ন কবেন। এখানেই অধ্যাপক হেস্টির কাছে দক্ষিনেশ্বরের রামকৃষ্ণদেবের কথা প্রথম শুনেন। অধ্যাপকের উপদেশ অনুযায়ী দক্ষিনেশ্বরে গিয়ে রামকৃষ্ণ দেবের সঙ্গে দেখা কবেন। এরপর থেকে মাঝে মাঝে যাতায়াত শুরু করেন।

১৮৮৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে নরেন্দ্রনাথের পিতা বিশ্বানাথ দত্ত মারা যান। পবিবারে সৃষ্টি হয় চরম সংকট। যে কোন উপায়ে অর্থ উপার্জনের জরুরী প্রয়োজন দেখা দেয়। বিশ্বনাথ দত্ত হায়দরাবাদের নিজামের পক্ষে একটি মামলা পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে যখন সেখানে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তখনই হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হযে মারা গেলেন।

পরিবারের দায়িত্ব পালনের জন্য নরেন্দ্রনাথ বিভিন্ন পরিচিত মহলে ধর্না দিয়ে কারো কাছ থেকেই সক্রিয় সহযোগিতা পান নি।

একদিন কাজের খোঁজে বিভিন্ন অফিসে ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েন। সারাদিন উপবাসে থেকে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন, রাস্তার কল থেকে জলপান করে তিনি দক্ষিনেশ্বরে হাজির হন। রামকৃষ্ণদেব নরেন্দ্রনাথের মনের অবস্থা বুঝে মা কালীর কাছে একটা উপায় করার জন্য প্রার্থনা করতে বলেন।

নরেন্দ্রনাথ নিয়মিত ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত করতেন। তিনি ছিলেন দেবেন্দ্রনাথের আদি ব্রাহ্ম সমাজের সদস্য। ব্রাহ্ম সমাজ পরিচালিত সিটি কলেজেরই স্কুলে একটি শূন্য পদে নিযুক্তির আবেদন নিয়ে তিনি উক্ত সিটি কলেজিয়েট স্কুলের দায়িত্বে প্রতিষ্ঠিত শিবনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। শিবনাথ শাস্ত্রী তখন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ নামে পৃথক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাই নরেন্দ্রনাথের আবেদন তিনি এড়িয়ে গেলেন।

এসব ঘটনায় নরেন্দ্রনাথ মানসিক কষ্ট পাচ্ছিলেন। সান্ত্বনা দিবারও কেউ ছিল ন। সাহায্য করার জন্যও কেউ এগিয়ে এলোনা। অথচ কলকাতায় দত্ত বংশেব আত্মীয় স্বজনের সংখ্যা ছিল প্রচুর। সকলেই ছিল প্রতিষ্ঠিত ।

দত্ত বংশের ইতিহাস থেকে জানা যায়, নবাবের দরবার এবং ইংরেজ কোম্পানীর দরবারে এই বংশের অনেকেই উচ্চ পদে কাজ করেছেন। অভিজাত জীবন যাপন করেছেন। সংঙ্গীতে, সাহিত্যে এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেকেই খ্যাতি লাভ করেছেন। বিশ্বনাথ দত্ত মৃত্যুর আগে কলকাতার এক বিখ্যাত ব্যারিষ্টারের একমাত্র সন্তান সুন্দরী কনভেন্ট শিক্ষিতা কন্যার সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের বিবাহ পাকা করেছিলেন। কিন্তু আকস্মিক মৃত্যুর কারণে সব কিছু বদলে যায়।

অবশ্য এর ফলে ভারতবাসীরই লাভ হয়েছে নরেন্দ্রনাথ সংসারের আকর্ষণ থেকে মুক্ত হয়ে দেশবাসীর সেবায় জীবন উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

পরিবারের এই বিপর্যয়ের দিনে নরেন্দ্রনাথের এই সিদ্ধান্ত মাতা ভুবনেশ্বরী দেবীকে মোটেই বিচলিত করে নি। অপর দুই পুত্রও ক্রমশ: বিপ্লবী আন্দোলনের দিকে ঝুঁকে পড়ছে জেনেও তিনি কোন প্রকার ক্ষোভ প্রকাশ করেন নি। বিবেকানন্দের অকাল মৃত্যুর পরেও তিনি ৯ বছর জীবিত ছিলেন। সে কালের বিপ্লবী দলের মুখপত্র যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদকের কাজ করার সময় ভুপেন্দ্রনাথের যখন এক বছরের জেল হয়েছিল তখনও তিনি চোখের জল ফেলেন নি।

আত্মীয়রা সান্ত্বনা দিতে এলে তিনি বলতেন, ভূপেনের কাজ তো মোটে শুরু হয়েছে। আমি আমার ছেলের জন্য গর্বিত। ভুবনেশ্বরী দেবীর এই মনোভাব থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় তিনিও এই সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে চেয়েছেন।

সংকীর্ণ স্বার্থপর সমাজের পরিবর্তন ঘটাতে গেলে কিছু সাহসী যুবকের যে চরম ত্যাগ স্বীকার করতে হবে এই সত্যটুকু তিনি উপলব্ধি করেছিলেন।

নরেন্দ্রনাথেব পিতা বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন উদার এবং উদাসীন প্রকৃতির লোক। তাঁর অনেক মুসলমান বন্ধু ছিল। মহরম উপলক্ষে হিন্দু মুসলমানের মিলিত উৎসবে তিনি উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিতেন। মুসলমানবা ঢাক বাজিয়ে হিন্দুপল্লীতে চাঁদা নিতে আসতো। বিশ্বানাথ দত্ত উদ্যোগী হয়ে চাঁদা আদায়ের ব্যবস্থা করে দিতেন।

এরূপ একটি উদার, — অভিজাত, সম্ভ্রান্ত এবং বনেদি পরিবারের সন্তান ছিলেন নবেন্দ্রনাথ দত্ত। দেশের প্রতি কর্তব্যবোধ, স্বদেশবাসীর প্রতি গভীর মমতাবোধ , মানবজাতি ও মানব সভ্যতার প্রতি গৌরববোধ নবেন্দ্রনাথের মনে জাগিয়ে দিয়েছিল স্বদেশ প্রেমের অগ্নিশিখা। দেশের যুব শক্তির মধ্যে তিনিই জাগিয়ে দিয়েছিলেন মানবিক দায়িত্ববোধ।
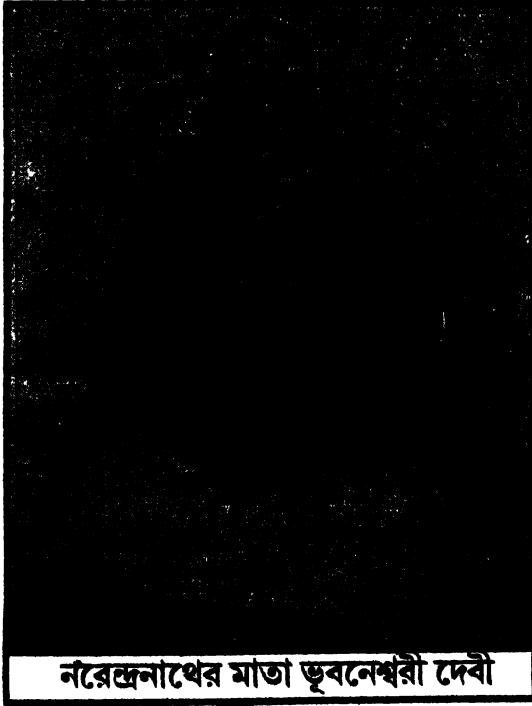
নরেন্দ্রনাথের মাতা ভূবনেশ্বরী দেবী

দক্ষিনেশ্বরে নরেন্দ্রনাথ

নরেন্দ্রনাথেব প্রতিভা ছিল বহুমুখী। সংগীতে, বিতর্কে, বক্তৃতায়, খেলাধুলায়, শরীরচর্চায় তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

সেকালে উত্তর কলকাতায় বিশিষ্ট কায়স্থরা ছিলেন সংখ্যা গরিষ্ঠ । বিশেযত: দত্ত পরিবার বসতি স্থাপন করেছিল শহরের গোড়াপত্তনের সময় থেকে। কাজেই বনেদি পরিবার হিসেবে এই পরিবারের সন্তানরা সর্বত্র সমাদর পেত।

ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের প্রভাবে নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে যুক্ত হন। সেকালের কলকাতার শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান পুরুষেরাই ব্রাহ্ম সমাজের নেতৃত্বে ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, ও শিবনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে নরেন্দ্রের খুব ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল।

নরেন্দ্রনাথের সুমিষ্ট কণ্ঠ ছিল বলে ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনায় গান ও আবৃত্তির জন্য নরেন্দ্রনাথকে অগ্রাধিকার দেওয়া হত।

কিণ্তু কেশবচন্দ্র সেন আলাদা হয়ে গিয়ে ভারতীয় ব্রাহ্ম সমাজ গঠন করার পর নরেন্দ্রনাথ বিচলিত হলেন। কিছু দিন পরে শিবনাথ শাস্ত্রীর নেতৃত্বে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ নামে আরেকটি সংগঠন গড়ে উঠায় নরেন্দ্রনাথ বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন।

দেবেন্দ্র নাথেব আদি ব্রাহ্ম সমাজ, কেশবচন্দ্রের ভারতীয় ব্রাহ্ম সমাজ এবং শিবনাথ শাস্ত্রীর সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ যে সব বিষয়ে বিতর্ক শুরু করলো তার মধ্যে মৌলিক তত্ত্বগত কোন পার্থক্য খুঁজে পেলেন না নরেন্দ্রনাথ। তাই তিনি নতুন পথের সন্ধান করতে থাকেন। এই সময় নরেন্দ্রনাথেব বয়স ছিল মাত্র ১৮ বছর ।

নরেন্দ্রনাথ খবর পেলেন প্রতিবেশী সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়ীতে রামকৃষ্ণদেব আসছেন। এই উপলক্ষে একটি উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে।

নরেন্দ্রনাথকে এই উৎসবে গান গাইবার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়েছে। সময়টা ছিল ১৮৮১ সালের নভেম্বর মাস। নরেন্দ্রনাথের গান শুনে রামকৃষ্ণদেব খুশী হলেন। বাড়ীর খবরাখবর নিয়ে দক্ষিনেশ্বরে যাবার আমন্ত্রণ জানালেন। এই সময় নরেন্দ্রনাথের পরীক্ষা চলতে থাকায় দক্ষিনেশ্বরে যাওয়া সম্ভব হয় নি।

একদিন নরেন্দ্রনাথ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করে জানতে চাইলেন তিনি ঈশ্বরকে দেখেছেন কিনা। দেবেন্দ্রনাথ নানা তত্ত্বকথায় ঈশ্বরের শক্তি ও মহিমার কথা বোঝাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ খুশী হতে পারলেন না।

এমন সময় নরেন্দ্রনাথের এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় দক্ষিনেশ্বর থেকে এসে নরেন্দ্রনাথকে বললেন, ঈশ্বর সম্পর্কে যদি সত্যি কথা জানতে চাস তবে দক্ষিনেশ্বরে চল। রামকৃষ্ণদেব ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন। নরেন্দ্রনাথ রাজী হয়ে গেলেন।

রামকৃষ্ণদেব নরেন্দ্রনাথকে দেখে কিছুক্ষণ আলোচনার পরই বুঝতে পারলেন। এই যুবকের মধ্যে অসীম শক্তি লুকিয়ে আছে, তাকে জগতের কাজে লাগাতে হবে।

নরেন্দ্রনাথকে একটি গান গাইতে অনুরোধ করলেন রামকৃষ্ণদেব। মধুর কণ্ঠে নরেন্দ্রনাথ একটি গান শোনালেন। উপস্থিত সকলেই গানের প্রশংসা করলেন। রামকৃষ্ণদেব চোখ বন্ধ করে ভাবে অবিষ্ট হলেন। ভাবের আবেশ কেটে যাবার পর তিনি নরেন্দ্রনাথকে ডেকে খুব কাছে নিয়ে বসালেন।

কিছুক্ষণ নানা বিষয়ে আলোচনার পর নরেন্দ্রনাথ হঠাৎ প্রশ্ন করলেন,---আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন? উত্তর এল, --- হ্যাঁ দেখেছি বৈকি? নরেন্দ্রনাথ আবার প্রশ্ন করলেন আপনি কি ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারেন?

আবার উত্তর এল, হ্যাঁ পারি।

নরেন্দ্রনাথ প্রশ্ন করলেন,---- কিভাবে প্রমাণ করতে পারেন?

রামকৃষ্ণদেব হেসে বললেন, এই তো, আমার পাশেই ঈশ্বরকে দেখতে পাচ্ছি। একথা বলেই রামকৃষ্ণ দেব নরেন্দ্রনাথের পিঠে হাত দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হল। নরেন্দ্রনাথ পরবর্তী কালে স্বীকার করেছেন, জীবনে এই প্রথম একজন ব্যক্তিকে দেখলাম, যিনি জোরের সঙ্গে

বললেন, যে তিনি স্বচক্ষে ঈশ্বরকে দেখতে পান। এজন্যই সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়েছিল।

রামকৃষ্ণদেব আরো বলেন, --- ধর্ম, ঈশ্বর সবই গভীর অনুভূতির ব্যাপার। আমরা প্রিয়জনকে কাছে পাবার জন্য যে ভাবে ব্যাকুল হই, কেঁদে বুক ভাসাই তেমন আবেগ সৃষ্টি হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় । পরবর্তী কালে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, এই ঈশ্বর প্রতিটি মানুষের মধ্যেই আছেন।

নরেন্দ্রনাথেব প্রথম আগমনেই গুরুশিষ্যের অনুভূর্তি দুজনকেই প্লাবিত করেছিল। নরেন্দ্র নাথ বুঝেছিলেন-- সঠিক গুরু পেয়েছি। রামকৃষ্ণদেবও ভাবলেন, সব চেয়ে যোগ্য মানুষটিকেই এতদিনে খুঁজে পেয়েছি।

এর পর থেকে নরেন্দ্রনাথ নিয়মিত ভাবেই দক্ষিনেশ্ববে আসতে থাকেন। প্রতিবারেই নতুন অনুভূতি নিয়ে যান। দিন দিন আকর্ষণ বাড়তে থাকে। কোন কারনে অনেক দিন ধরে নবেন্দ্রনাথের দেখা না পেলে বামকৃষ্ণ দেবও ব্যকুল হয়ে উঠতেন।

নবেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণ দেবের ঘনিষ্ঠ অনুরাগী হযে উঠলেও ব্রাহ্ম সমাজেব সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন নি। ভগিনী নিবেদিতার কাছে একসময় বলেছিলেন যে ---- বেদান্তের শিক্ষা আমি ব্রাহ্ম সমাজ থেকেই পেয়েছি। ওরা আমার নাম কেটে বাদ না দিলে আমি তাদের সঙ্গে থাকব।৺

ক্রমে ক্রমে নরেন্দ্রনাথের প্রতি রামকৃষ্ণদেবের স্নেহ এত গভীর হযেছিল যে, কয়েকদিন না দেখলেই কালী মূর্তির সামনে কেঁদে কেঁদে বলতেন, মা, আমার নরেনকে দক্ষিনেশ্বরে টেনে নিয়ে আয়, মা।

মাঝে মাঝে নরেনের খোঁজে তিনি ব্রাহ্ম সমাজেব উপাসনা সভায় উপস্থিত হতেন নরেনের অভাবে তিনি কি পরিমানে অস্থির হয়ে পড়তেন বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায়।

নরেন্দ্রনাথের প্রতি রামকৃষ্ণদেবের আকর্ষণের প্রধান কারন ছিল, তিনি গভীরভাবে লক্ষ্য করেছেন যে, নরেন্দ্রনাথ ছিলেন সকল প্রকার সাংসারিক সংকীর্ণতার উর্ধ্বে। তাছাড়া নরেন্দ্রনাথ ছিলেন আসাধারণ তেজস্বী, প্রতিভাবান, সাহসী এবং সংকল্পে অটল এক শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ।

একদিন নরেন্দ্রনাথ সংসারের চিন্তায়, পরিবারের ভরন পোষনের একটা উপায় বের করার জন্য ভীষণ অস্থির হয়ে উঠলেন। শেষে ভাবলেন রামকৃষ্ণদেব হয়তো একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন। দুজনের মধ্যে এমন ভাব হয়েছিল যে, যে কোন ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে কথা বলা যায়।

নরেন্দ্রনাথ শ্রী রামকৃষ্ণকে বললেন, আপনার মা তো আপনার কথা শুনেন। আমার দুঃখ যাতে দূর হয়, একটা রেজগারের উপায় যাতে হয়, তা বলে দেখুন না।

রামকৃষ্ণ বললেন, আমি কেন? তুই নিজেই মাকে গিয়ে বল না। দেখবি একটা উপায় তিনি করে দেবেন। আমি একবার বলেছিলুম। কিন্তু তুই তো আমার মাকে মানিস না, তাই তিনি শুনেও শুনেন না।

সেদিন গভীর রাতে রামকৃষ্ণ দেব নরেন্দ্রনাথকে ঠেলে মায়েব মন্দিরে কালী মূর্তির সামনে নিয়ে দাঁড করিয়ে দিলেন, পিঠে হাত রেখে বললেন, তুই যা খুশী মায়ের কাছ থেকে চেয়ে নে। একথা বলেই তিনি মন্দির থেকে বেবিয়ে এলেন।

রাতের মিট মিট আলোয় কালী মূর্তির মোহময় পরিবেশে নরেন্দ্রনাথের মনে এক অদ্ভুত শিহবণ দেখা দিল। তিনি নিজেব জন্য কিছুই চাইতে পারলেন না। দ্রুত মন্দির থেকে বেরিয়ে এলেন। শ্রী রামকৃষ্ণ কাছে এসে বললেন, কি হলো, মাকে তোর কথা বলেছিস?

নরেন্দ্রনাথ জবাব দিলেন, আমি নিজের জন্য কিছু চাইতে পরলাম না।

রামকৃষ্ণদেব আবারও ঠেলা দিয়ে নরেন্দ্রনাথকে মন্দিবে ঢুকিয়ে দিলেন। বললেন, মা তোকে ভালবাসেন। যা চাইবি, তাই পাবি। দ্বিতীয়বারও নরেন্দ্রনাথ কালীমূর্তীর সামনে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থেকে ফিরে এলেন। কিছুই চাইতে পারলেন না।

রামকৃষ্ণদেব আবারও ঠেলে দিলেন মন্দিবেব মধ্যে। ভরসা দিয়ে বললেন, ভয় কি? তোর যা খুশী চেয়ে নে। একবার পরীক্ষা করে দেখ।

নরেন্দ্রনাথ তৃতীয়বারেও মন্ত্র মুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে এলেন। বিজের জন্য কিছু চাইতে যেন সংকোচ বোধ হল।

ক্লান্ত- অবসন্ন নরেন্দ্রনাথ বারান্দায় ঘুমিয়ে পড়লেন। রামকৃষ্ণ দেব পাশে বসে মাথাটা কোলে তুলে নিলেন। শিশুর মত ঘুম পারিয়ে দিলেন।

এতদিন নরেন্দ্রনাথ মূর্তি পূজার বিরোধী ছিলেন। রামকৃষ্ণ বলতেন, মূর্তি ছাড়াও পূজা করা যায়। এটা তো যার যার মনের ব্যাপার।

এতকাল বেদান্ত বলেছে ব্রহ্মা সত্য-জগৎ মিথ্যা। এই মায়াময় জগতের মোহ কাটিয়ে মুক্তির জন্য সাধনা করতে হয়।

রামকৃষ্ণদেব বললেন, --- আমি সব ধর্মের কথা শুনেছি। আমার মনে হয়েছে ব্রহ্মাও সত্য ও জগৎও সত্য। জগৎ মিথ্যা হলে আমিও মিথ্যা। আসলে ব্রহ্মাও যা, জগৎ ও তা । ব্রহ্মা এবং জগৎ একই শক্তির আধার।

নরেন্দ্রনাথের কাছে একথা নতুন মনে হয়েছে। এবার যেন একটা সঠিক ব্যাখ্যা খুঁজে পেলেন।

রামকৃষ্ণদেব নরেন্দ্রনাথের শরীরটা দেখিয়ে বললেন, আমার তো মনে হয় --- এটাও আমি আবার ওটাও আমি। এভাবে যদি আমরা পরস্পরের ভেদাভেদ ভুলে যেতে পারি, তাহলে আমি, তুমি, আমার সকলের স্বার্থ এক হয়ে যাবে। একথা সব মানুষকে বুঝিয়ে বলার জন্যই মা তোকে এখানে ডেকে এনেছেন। একাজ তোকেই করতে হবে।

নরেন্দ্রনাথ দক্ষিনেশ্বরের পাগলা ঠাকুরের কাছে আত্ম সমর্পন করলেন। শুরু হলো জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

নরেন্দ্রনাথ হলেন বিবেকানন্দ

দক্ষিনেশ্বরে এসে গদাধরের সাধক জীবনের সূত্রপাত হয় ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে। তখন গদাধরের বয়স ছিল ১৯ বছর।

এই সময় বহু সাধু সন্ন্যাসী দক্ষিনেশ্বরে এসে বিশ্রাম নিতেন। সব সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরাই এখানে আসতেন। গদাধর সকলের সঙ্গেই মিশে যেতেন। অল্প সময়ের মধ্যেই ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠতো। নানা বিষয়ে আলোচনা হতো।

জৈন, বৌদ্ধ, শিখ, মুসলমান ফকীর, খৃষ্টান পাদ্রী সকলের সঙ্গেই তিনি অবাধে মেলা মেশা করতেন। শুধুমাত্র আলোচনা থেকে গভীর অনুভূতি আসে না। তাই তিনি সব কিছুতে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের জন্য সচেষ্ট হলেন।

কিছুকাল মসলমান সেজে মুসলমান সমাজে মেলামেশা করতে থাকলেন। তাদের অন্তরের কথা বুঝবাব চেষ্টা করলেন। মোল্লা, মৌলবী, ফকীরদের সঙ্গে ইসলাম ধর্ম বিষয়ে আলোচনা করতেন।

আবার কিছুকাল খৃষ্টান সেজে খৃষ্টান সমাজে ঘুরাফেরা করতেন। পাদ্রীদের সঙ্গে বাইবেল সম্পর্কে আলোচনা করতেন। অন্য ধর্ম সম্পর্কে তাদের মনোভাব বুঝতে চেষ্টা করতেন।

হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন শাস্ত্র সম্পর্কে সাধু সন্ন্যাসীদের ব্যাখ্যা শুনতেন। অনেক সময় মনে হতো, তারা অন্তরে বাইরে এক নয়। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংশয় অনেকের মনে লুকিয়ে থাকতো।

এভাবে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় মনোভাব বুঝে নিয়ে গদাধর গভীর ভাবে নিমগ্ন হতেন। কালী মূর্তির সামনে বসে কেঁদে কেঁদে বুক ভাসাতেন। মনের সংশয় দূর করে দিয়ে আসল, সত্য উপলব্ধির শক্তি দান করার জন্য প্রার্থনা করতেন।

ভাবে আকুল গদাধরের আচরণ সকলেই মস্তিষ্কের দোষ বলে ধরে

নিয়েছিল। শুধু রানী রাসমনি এবং জামাতা মথুরা বাবু এসবের মধ্যে একটা ঐশ্বরিক আকৃতি আছে বলে বিশ্বাস করতেন।

সন্ত তোতাপুরী এবং তান্ত্রিক ভৈরবী ব্রাহ্মণীর সঙ্গে দীর্ঘদিন ধর্মীয় আলোচনা এবং বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের চর্চা করার পর গদাধরের চিন্তাধারায় একটা স্থিতিশীলতা এসেছে মনে হলো।

আচার সর্বস্ব প্রাচীন ধর্মীয় রীতিনীতিকে অস্বীকার না করেই তিনি নতুন ভাবে সব কিছু বিচার বিবেচনা করতে শুরু করলেন।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্ধ থেকে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ১৯ বছর যাবত বিভিন্ন ধর্ম ও ধর্ম সম্প্রদায়ের রীতিনীতি ও দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের পর তিনি ৩৮ বছর বয়সে সাধক জীবনের সমাপ্তি ঘটালেন।

১৮৫৯ সালে মাকে খুশী করার জন্য জয়রামবাটীর মুখোজ্জে বংশের ৫ বছর বয়সী শিশুকন্যা সারদামনিকে বিবাহ করেছিলেন। তখন গদাধরের বয়স হয়েছিল ২৩ বছর। বিবাহের পর একবার মাত্র শ্বশুর বাড়ী গিয়েছিলেন। কয়েকঘন্টা গান-বাজনা গল্প করে ফিরে এসেছিলেন।

১৮৭৩ সালে সাধক জীবনের সমাপ্তি উপলক্ষে ষোড়শী পূজার আয়োজন করে সারদা দেবীকে মাতৃরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন সারদা দেবী ২১ বছরে পদার্পন করেছিলেন। এই অনুষ্ঠানের পর সারদাদেবী কামারপুকুরে ফিরে যান। পরে রামকৃষ্ণ দেব অসুস্থ হবার পর সেবা যত্ন করার জন্য দক্ষিনেশ্বরে আসেন।

১৮৭৫ সালের মার্চ মাসে রামকৃষ্ণদেব কেশব চন্দ্রের সঙ্গে দেখা করেন। তখন তিনি পাগল ঠাকুর এবং পাগলা বামুন নামেই পরিচিত ছিলেন।

ব্রাহ্ম সমাজের ব্যাপক প্রচারের ফলে পাগলা ঠাকুরের পরিচিতি সারা কলকাতায় ছড়িয়ে পড়ে। শিক্ষিত সমাজের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। কারণ প্রতিদিনই পত্রিকায় বিভিন্ন বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে আলোচনার বিবরণ প্রকাশিত হতো। কবি, সহিত্যিক, গায়ক, ডাক্তার, আইনজীবী, কেরানী, অফিসার, ব্যবসায়ী ইত্যাদি সব শ্রেণীর মানুষেরা পাগলা ঠাকুরের উপদেশ শুনে মুগ্ধ হতেন। কঠিন, কঠিন প্রশ্নের সহজ সরল জবাব এবং বাস্তব জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দেবার ক্ষমতাই সব স্তরের বুদ্ধিজীবী মানুষকে মুগ্ধ করতো ।

১৮৮১ সালে সতের বছরের যুবক নরেন্দ্রনাথ প্রতিবেশীর বাড়ীতে এক উৎসবে প্রথম রামকৃষ্ণ দেবের সঙ্গে পরিচিত হন। কিন্তু তেমন আকর্ষণ বোধ করেন নি। দক্ষিনেশ্বরে যাবার জন্য আমন্ত্রণ পেয়েও খুব আগ্রহী হয়ে উঠেন নি।

পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে বিহ্বল ও বিপর্যস্ত মন যখন একটু সান্ত্বনা লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলো তখনি নরেন্দ্রনাথ দক্ষিনেশ্বরে যাতায়াত শুরু করেন। পাগলা ঠাকুরের আন্তরিক স্নেহ অনুভব করার পর আকর্ষণ বেড়ে যেতে থাকে।

পাগলা ঠাকুর প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়েছিলেন নরেন্দ্রনাথকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করতে। ব্রাহ্ম সমাজ থেকে একদল সুশিক্ষিত যুবক তিনি ইতিমধ্যেই সংগ্রহ করে ফেলেছিলেন। তাদের নেতৃত্ব দেবার জন্য সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি মনে হয়েছিল নরেন্দ্রনাথকে। তাই তিনি নরেন্দ্রনাথকে কাছে পেতে ব্যাকুল হয়েছিলেন।

নানাভাবের আদান প্রদানের পর নরেন্দ্রনাথ পাগলা ঠাকুরের কাছে ধরা দিলেন। ঘন ঘন দক্ষিনেশ্বরে আসতে লাগলেন।

হঠাৎ কবে পাগলা ঠাকুরের ক্যানসার রোগ ধরা পড়ল। বড় বড় ডাক্তারবা চিকিৎসা শুরু করলেন। কিন্তু তখনকার দিনে ক্যানসার চিকিৎসার সুযোগ প্রায় ছিলই না।

রামকৃষ্ণদেব নরেন্দ্রনাথের উপর সমস্ত দায়িত্ব তুলে দিতে অস্থির হয়ে উঠলেন। একদিন তিনি নরেন্দ্রনাথেব হাতে একটা লিখিত কাগজ তুলে দিলেন। নরেন্দ্রনাথ পাগলা ঠাকুরের কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করে সব দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। শ্রী রামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নরেন্দ্রনাথ সহ দশজন যুবক সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। নরেন্দ্রনাথের নাম বদল করে রাখা হল বিবিদিষানন্দ। বিদেশ যাত্রার সময় নাম গ্রহন করেন বিবেকানন্দ।

বিবেকানন্দের ভারত পরিক্রমা

১৮৮৬ সালের ১৬ই আগষ্ট শ্রী রামকৃষ্ণ দেহত্যাগ করেন। চিকিৎসার জন্য তাঁকে প্রথমে শ্যামাপুকুরে আনা হয়েছিল। পরে কাশীপুরে একটি ভাড়া বাড়ীতে রেখে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

কাশীপুরে নরেন্দ্রনাথ সহ দশজন যুবক সর্বদাই শ্রী রামকৃষ্ণের সেবা যত্নে নিযুক্ত ছিলেন। রোগ যন্ত্রণা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রামকৃষ্ণদেবের মানসিক অস্থিরতা বেড়ে গেল। মৃত্যুভয়ে নয়। বরং তিনি যে আদর্শেব কথা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান তার দায়িত্ব ভাব কিভাবে নরেন্দ্রনাথের হাতে তুলে দেবেন সে চিন্তাই ছিল অস্থিরতার কারণ।

নরেন্দ্রনাথও ছিলেন নিজের পরিবারের চিন্তায় চরম অস্থিরতার মধ্যে। মা-ভাই-বোনেব আট জনের পরিবার তখন অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। একদিকে ভরণ পোষনের সমস্যা অন্যদিকে সম্পত্তি নিয়ে চলছিল মামলা মোকর্দমা।

শ্রী রামকৃষ্ণের অবস্থা ক্রমেই জটিল হয়ে উঠার খবর পেয়ে ভক্তরা দলে দলে এসে ভীড় করেছিল একবার শেষ দেখা দেখার জন্য। একটু স্পর্শ, একটু আশীবাদের জন্য সবাই ছিল ব্যাকুল।

এরকম অবস্থায় রামকৃষ্ণদেব নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কথা বলার সুযোগ ও পাচ্ছিলেন না। ডাক্তার কথা বলতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু তিনি ভক্তদের দাবী উপেক্ষা করতে পারছিলেন না। অনর্গল কথা বলে নানা উপদেশ ও আশীবাদ বর্ষণ করে ক্রমেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন।

একদিন নিজের হাতে স্পষ্টভাবে একটা কাগজে লিখলেন- নরেন্দ্রনাথ লোকশিক্ষা ও লোক সেবার দায়িত্ব পালন করবে। কাগজটা নরেন্দ্রনাথেব হাতে তুলেদিলেন। অন্য সবাইকে নির্দেশ দিলেন- তোমরা সবাই নরেন্দ্রনাথের আদেশ

অনুসারে চলবে। গুরুর আদেশ পেয়ে নরেন্দ্রনাথ মনস্থির করে ফেললেন। দশজন যুবকই ত্যাগ এবং সেবার জীবন যাপন করার সংকল্প গ্রহন করেন।

শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের মহাপ্রায়নের পর সমাধি উৎসব সমাপ্ত করে নরেন্দ্রনাথ সঙ্গীদের নিয়ে একটি নির্জন বাড়ীতে সন্ন্যাস জীবনের মানসিক প্রস্তুতি নেবার সিদ্ধান্ত করলেন। একজন ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের অর্থ সাহায্যে বরানগরে একটি পরিত্যক্ত নির্জন বাড়ী ভাড়া নেওয়া হল। লোকে এটাকে ভুতের বাড়ী বলতো।

এই নির্জন বাড়ীতে দশ বন্ধু মিলে শাস্ত্র আলোচনা ও ভজন কীর্তন করে সংসার ত্যাগের মানসিক প্রস্তুতি নিলেন। কিন্তু চোখ বন্ধ করে ধ্যান করতে বসলেই অনাহার ক্লিষ্ট মা- ভাই-বোনদের ছবি নরেন্দ্রনাথের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। অনান্য বন্ধুদের মনেও এরকম চাঞ্চল্য দেখা গেল।

একটা ভাল দিন দেখে শাস্ত্রীয় বিধি অনুযায়ী অনুষ্ঠান করে শেষ পর্যন্ত সকলেই সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। সাংসারিক নাম বদল কবে সকলেই নতুন নাম গ্রহণ করলেন। বরানগরের ভুতুরে বাড়ীতেই শ্রী রামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠা করা হল।

এই যুবকদের মধ্যে ছয়জন ছিলেন রামকৃষ্ণদেবের অতি ঘনিষ্ঠ অনুরাগী। তারা হলেন- নরেন্দ্রনাথ, যোগীন্দ্রনাথ, রাখাল, বাবুরাম, নিরঞ্জণ ঘোষ ও পূর্ণ। এছাড়াও তারকঘোযাল, হরিনাথ চট্টোপাধ্যায়, শরৎ চক্রবর্তী, শশী চক্রবর্তী, গদাধর ঘটক, কাশী প্রশাদ চন্দ্র, সার?া প্রসন্ন মিত্র এরা সকলেই ছিলেন নরেন্দ্রনাথেব প্রায় সমবয়সী, সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগী।

সন্ন্যাস গ্রহনেব পর নরেন্দ্রনাথ দত্ত হলেন বিবিদিষানন্দ। ভারত পরিক্রমার পব বিদেশ যাত্রার সময় নাম গ্রহণ করেন স্বামী বিবেকানন্দ। এই নামেই তিনি দেশে বিদেশে পরিচিতি ও খ্যাতি লাভ করেছেন।

গুরুভাইরা সন্ন্যাস গ্রহণের পরই একে একে তীর্থ ভ্রমনে বেরিয়ে পড়তে লাগলেন। বিবেকানন্দ অপেক্ষা করলেন মা-ভাই-বোনদের মোটা ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা হয়েছে কিনা খবরটা জানার জন্য। একদিন স্বামী ত্রিগুনাতীতানন্দ হেঁটে বৃন্দাবন রওনা হয়ে গেলেন। এর পরই স্বামী অখন্ডানন্দ স্বামী অভেদানন্দ স্বামী সারদানন্দ, ও স্বামী প্রেমানন্দ তীর্থ দর্শনে বেরিয়ে পডলেন। তাদের পরিবারিক

নাম ছিল যথাক্রমে সারদা প্রসন্ন মিত্র, গঙ্গাধর ঘটক, শরৎ চক্রবর্তী এবং বাবুরাম।

তারক ঘোষালের নাম হয়েছিল- স্বামী শিবানন্দ, হরিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নাম স্বামী তুরীয়ানন্দ। শশী চক্রবর্তীর নাম হয়েছিল - স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ এবং রাখালের নাম হয়েছিল- স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

প্রথম দুই বছর সকলেই প্রধান প্রধান তীর্থস্থানগুলো ভ্রমন করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দও তীর্থস্থান ভ্রমন করে মঠে ফিরে এসেছেন।

মঠের জীবনেই সকলের মধ্যে ত্যাগ ও সেবার মানসিকতা গড়ে উঠে। প্রতিদিন খাবার সংস্থান ছিল না। বাইরে যাবার মত ভাল গেরুয়া পোষাক কয়েকটা মাত্র ছিল। যিনি যখন বাইরে যেতেন তাঁকেই এই কয়েকটা পোষাক অদল-বদল করে পরতে হতো। কীর্তন, গানে, আলোচনায় মশগুল হয়ে সবাই ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা ভুলে যেতেন।

একদিন বিবেকানন্দ স্থির করলেন, তিনি প্রকৃত ভারতবর্ষের পরিচয় লাভের জন্য একাকী ভারত ভ্রমনে বের হবেন। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সমস্ত শহরে ও গ্রামে ঘুরে ঘুরে ভারতবাসীর জীবন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করবেন। অন্যান্য সঙ্গীদের নির্দেশ দিলেন,---- তোমরা কেউ আমাকে অনুসরণ করবে না। তোমরা যার যার ইচ্ছে মত স্বাধীন ভাবে পরিক্রমা করবে।

বিবেকানন্দ আরো স্থির করলেন, তিনি কারো কাছে ভিক্ষে চাইবেন না। কেউ যদি অযাচিত ভাবে কিছু দেয় তবে তা সাদরে গ্রহণ করবেন।

১৮৮৮ খৃষ্ঠাব্দে বিবেকানন্দ দীর্ঘদিনের জন্য মঠ ছেড়ে রওনা হলেন ভারত পরিক্রমায়। প্রথমেই গেলেন ভারতের শ্রেষ্ঠ তীর্থ কাশীধামে। বেদান্ত চর্চার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র কাশীধামে কয়েকদিন অবস্থান করে তিনি অযোধ্যায় গেলেন। অযোধ্যার রামচন্দ্রের ভক্তদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করে লক্ষ্ণৌ চলে গেলেন। এখানকার ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধগুলো দেখে রওনা হলেন আগ্রার উদ্দেশ্যে। এখানে যমুনা নদীর তীরে তাজমহলের অপূর্ব কারুকার্য দেখে মুগ্ধ হলেন। এখানেই তিনি উপলব্ধি করলেন যে, ভারতীয় সংস্কৃতি চরম উৎকর্ষতা লাভ করেছে হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয়ের মাধ্যমে। এই সৃষ্টি কারো একার নয়। এর গৌরব সমস্ত ভারতবাসীর ।

আগ্রা থেকে পায়ে হেঁটে রওনা দিলেন বৃন্দাবনের দিকে। বৃন্দাবনে শ্রী কৃষ্ণের স্মৃতিবিজড়িত বিভিন্ন লীলা কেন্দ্রগুলো দেখে আবার রওনা হলেন হরিদ্বারের পথে।

হরিদ্বার যাবার পথে হাতরাশ স্টেশনের মাষ্টার ঈশ্বরগুপ্তের সঙ্গে বিবেকানন্দের পরিচয় হয়। কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনার পরই ঈশ্বরগুপ্তের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহনের জন্য তিনি অনুরোধ করেন। বিবেকানন্দ রাজী হয়ে গেলেন। সারাদিন নানা বিষয়ে দুজনের মধ্যে আলোচনার পর ঈশ্বরগুপ্তি বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহনের আবেদন জানালেন। প্রথমে রাজী না হেলেও শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরগুপ্তকে শিষ্যত্ব প্রদান করেন। ইনিই হলেন বিবেকানন্দের প্রথম শিষ্য। স্বামীজী তাঁর নতুন নাম দিলেন সদানন্দ। তিনিও বিবেকানন্দের সঙ্গী হলেন।

হরিদ্বার ঘুরে তাঁরা পৌঁছে গেলেন হৃষিকেশে । এখানে সাধুদের জন্য তৈরী একটি কুটিরে আশ্রয় নিয়ে কয়েকদিন সাধু সঙ্গ করলেন। এখানে শিষ্য সদানন্দ খুব অসুস্থ হয়ে পড়ায় কেদার-বদ্রীনাথ যাত্রা বাতিল করে বরানগর মধ্যে ফিরে আসেন। এই যাত্রায় ভারত ভ্রমণে প্রায় এক বছর কেটে যায়।

তারপর ১৮৮৯ সালের শেষদিকে বিবেকানন্দ আবার দীর্ঘকালের জন্য ভারত পরিক্রমা শুরু করেন। প্রথমে বৈদ্যনাথ পৌঁছে খবর পান যে গুরুভাই স্বামী যোগানন্দ এলাহাবাদে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। তখনই তিনি এলাহাবাদে ছুটে যান গুরুভাইয়ের শুশ্রূষা এবং এর চিকিৎসার সুব্যবস্থা করার জন্য।

এলাহাবাদে কিছুদিন থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করার পর বিবেকানন্দ পওহরিবাবা নামে একজন বিখ্যাত সাধকের কথা জানতে পারেন। তাঁর কাছ থেকে যোগ বল শিক্ষার জন্য গাজীপুরে গিয়ে মিলিত হন। কিন্তু চার মাস অপেক্ষা করার পরও পওহরিবাবা যোগ বল শিক্ষা বিষয়ে কোন আগ্রহ দেখালেন না।

গাজীপুর ত্যাগ করে স্বামীজী আবার কাশীধামে এলেন। এখানে এসে খবর পেলেন, নব প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মঠের দুই প্রধান সহায়ক ভক্ত বলরাম বসু এবং সুরেশ চন্দ্র মিত্র খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। স্বামীজী কালবিলম্ব না করে কলকাতায় ফিরে এলেন।

অল্প দিনের মধ্যেই দুজন সহায়ক ভক্তের মৃত্যুতে রামকৃষ্ণ মঠের অবস্থা খুবই করুণ হয়ে উঠলো। স্বামীজী নতুন করে সংকল্প গ্রহণ করলেন, গঙ্গার তীরেই কোথাও সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে রামকৃষ্ণ সংঘের মঠ। এই সংকল্প পূরণ করতে বেশী সময় লাগলো না। গুরুভাইদের স্থায়ী আস্তানা গড়ে দিয়ে ১৮৯০ সালের জুলাই মাসে আবার তিনি রওনা হলেন ভারত পরিক্রমায়। এবারের লক্ষ্য হল- হিমালয় ভ্রমন।

প্রথমে বৈদ্যনাথ হয়ে নৈনীতাল এবং আল মোড়ায় এসে বিশ্রাম নিলেন। এখানে এসে জানতে পারলেন স্বামী সারদানন্দ একটি আশ্রমে সাধনা করছেন। দুজনের মধ্যে যোগাযোগ হল। এমন সময় একটা দু:সংবাদ এল যে, বিবেকানন্দের একবোন আত্ম হত্যা করেছেন। এই খবরে মর্মান্তিক আঘাত পেলেন বিবেকানন্দ।

এই সময় বদ্রিকা আশ্রম অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ চলছিল। তাই সেদিকের পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়। বিবেকানন্দ ও অখন্ডানন্দ ভিন্ন পথে কর্ণ প্রয়াগ হয়ে রুদ্র প্রয়াগে চলে আসেন। পথে ভয়ানক ঠান্ডায় দুজনেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। শ্রীনগরে এসে একমাস বিশ্রাম নেবার সিদ্ধান্ত নিলেন।

স্বামীজীর পর্বতের গুহায় আশ্রয় নিয়ে মৌন উপবাস ও নির্জন সাধনার ইচ্ছা এখানে এসে পূরণ হয়। শ্রীনগর থেকে দেরাদূনে এসে স্বামী তুরীয়ানন্দের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। স্বামীজী এখানে তিন সপ্তাহ অবস্থান করে হিমালয়ের সৌন্দর্য উপভোগ করেন।

হিমালয়ের পাদদেশে হৃষিকেশে শীতকালে সব সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা এসে সমবেত হন। স্বামী বিবেকানন্দ ধর্ম প্রসঙ্গে আলোচনার উদ্দেশ্যে স্বামী অখন্ডানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী স্বারদানন্দ, ও স্বামী ব্রহ্মানন্দকে নিয়ে হৃষিকেশে কিছুকাল অবস্থান করেন। এখান থেকে চলে আসেন মীরাটে।

এভাবে পাঁচ মাস ভ্রমনের পর স্বামীজী আবার একাকী ভ্রমনের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। গুরুভাইদের সঙ্গে পরামর্শ করে ১৮৯১ খ্রী: স্বামীজী এককভাবে ভারত পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়লেন।

এবার স্বামীজীর জীবনে শুরু হল নতুন অভিজ্ঞতা। ছোট ছোট হাটে বাজারে অখ্যাত ও অবহেলিত মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্টতা হতে লাগল।

স্বামীজীর সম্বল ছিল, একখানি গেরুয়া কাপড়, একটা লাঠি, কয়েকটা বই এবং একটা কমন্ডলু।

আলোয়ার শহরে এক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হল। তিনি একটি পাকা বাড়ীর দুতলায় স্বামীজীর থাকার ব্যবস্থা করলেন। শহরে ছড়িয়ে পড়ল স্বামীজীর আগমনের খবর। হিন্দি ও উর্দু ভাষায় বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র নিয়ে তিনি আলোচনা করে সবাইকে মুগ্ধ করলেন। সন্ধ্যায় আয়োজন করা হতো- ভজন ও কীর্তন।

আলোয়ার মহারাজা মঙ্গল সিং একদিন খবর পেলেন মহাপন্ডিত এক সন্ন্যাসী দেওয়ানের বাড়ীতে অতিথি হয়েছেন। স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করার জন্য মহারাজা ছুটে এলেন দেওয়ানেব বাড়ীতে। স্বামীজীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে মহারাজা মুগ্ধ হলেন। চমৎকৃত হলেন, স্বামীজীর যুক্তি, বুদ্ধি ও বিচার বিশ্লেষণের ক্ষমতা দেখে।

আলোয়ারে দুই মাস অবস্থান করে স্বামীজী জয়পুরে হাজির হন। এখানে মহারাজার প্রধান সেনাপতি হবি সিং-এব সঙ্গে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়। জয়পুরে দুই মাস অবস্থান করে বহু পন্ডিত ব্যক্তির সঙ্গে শাস্ত্রীয় আলোচনা করে সকলের মন জয় করেন।

জয়পুর থেকে খেতড়ির রাজা অজিত সিং এর বাড়ীতে অতিথি হন। আলোচনায় মুগ্ধ হয়ে রাজা শিষ্যত্ব গ্রহণ কবেন। খেতড়ির রাজা অপুত্রক অবস্থা থেকে মুক্তির অভিলাষ জানান স্বামীজীর কাছে। স্বামীজী আর্শীবাদ করেন যাতে সুপুত্র লাভ করেন। এক বছর পরই খেতড়ির রাজাব ঘরে পুত্র সন্তান জন্মেছিল।

খেতড়ি থেকে আমেদাবাদ হয়ে স্বামীজী লিমতির রাজ পরিবারে অতিথি হয়ে আসেন। রাজ প্রসাদে আবস্থান করলেও তিনি অতি সাধারণ জীবন যাত্রা অনুসরণ করতেন।

জুনাগড়েব প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানগুলো স্বামীজী পরিদর্শন করেন। এখানকার পর্বতে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রাচীন মন্দিরগুলো দেখে মুগ্ধ হন।

জুনাগড় থেকে ভুজরাজ্য হয়ে সোমনাথ মন্দিরে হাজির হন। এখান থেকে পোরবন্দর হয়ে দ্বারকায় উপস্থিত হন। এখানে শ্রী কৃষ্ণের নানা কাহিনী শুনে

ভারতের অতীত গৌরব উপলব্ধি করেন।

১৮৯২ খ্রী: বোম্বাই ও পুনা ভ্রমন করেন। এখানে বাল গঙ্গাধর তিলকের সঙ্গে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়।

বোম্বাই থেকে বেলগাঁও হয়ে মহীশূর, ব্যাঙ্গালোর ভ্রমন করেন। এই সময় মহীশূরের দেওয়ানের কাছে পাশ্চাত্য ভ্রমনের ইচ্ছা ও প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ করেন। দেওয়ান খুব উৎসাহিত হয়ে অর্থ সাহায্য করতে চাইলেন। স্বামীজী বললেন, প্রয়োজনের সময় সাহায্য নেব।

এরপর তিনি ত্রিচুর এবং ত্রিবান্দ্রমে ভ্রমন করেন। ত্রিবান্দ্রমে অধ্যাপক সুন্দর রামের বাড়ীতে ৯দিন অবস্থান করেন। বহু শিক্ষিত ব্যক্তি এখানে স্বামীজীর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করেন।

ত্রিবান্দ্রম থেকে পায়ে হেঁটে কন্যাকুমারীতে উপস্থিত হন। দীর্ঘ তিন বছরে ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমন করে স্বামীজী বহু দেশীয় রাজা শিক্ষক; শিক্ষিকা, কর্মচারী, ব্যবসায়ী, কৃষক, শ্রমিক, মুচি, মেথরের সঙ্গেঁ ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন।

ভারতের বাস্তব সমাজচিত্র স্বামীজীকে বিচলিত করেছিল। স্বপ্নের ভারত এবং বাস্তবের ভারতের মধ্যে বিরাট পার্তক্য উপলব্ধি করলেন।

শত শত বছর ধরে সামাজিক অবহেলায় ভারতের লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রায় পশুর জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। কোটি কোটি মানুষ প্রতিদিন অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটায়। অজ্ঞতা, ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার মানুষের জীবনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। হিংসা, বিদ্বেষ, সংকীর্ণতা এবং ধর্মের নামে প্রচিলিত মিথ্যা সংস্কার মানুষের মজ্জাগত হয়ে গেছে।

বিবেকানন্দ উপলব্ধি করলেন ধর্মকে কেন্দ্র করেই জাতির জীবনে জাগরন ঘটাতে হবে। মানুষের আত্মশক্তি জাগত হলে বাকী সবই হবে। শিক্ষা, সমাজ সংস্কার, আর্থিক উন্নতি সবই নির্ভর করছে আত্ম-উপলব্ধির উপর । গুরু রামকৃষ্ণদেব সেই উপদেশ দিয়ে গেছেন। জীবে দয়া নয়, জীবকে শিব জ্ঞানে সেবা করতে হবে। তাহলেই মানবাত্মা জেগে উঠবে।

স্বামীজী কন্যাকুমারী থেকে রামেশ্বরম মাদুরাই ও পন্ডিচেরী হয়ে মাদ্রাজে

উপস্থিত হন। এখানে অল্প দিনের মধ্যেই শিক্ষিত সমাজে বিবেকানন্দের কথা ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিদিন দর্শনার্থীর ভীড় বাড়তে থাকে।

১৮৮০ সাল থেকে দীর্ঘ তিন বছরের ভারত পরিক্রমার অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ স্বামীজীর বক্তব্যে প্রকাশ পেতে থাকে নতুন ভাবনা, নতুন সংকল্পের কথা।

দক্ষিন ভারতের মানুষই প্রথম আবিষ্কার করে নতুন যুগের, নতুন ভারত গড়ার স্বপ্নে ব্যাকুল বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দকে।

প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ঐতিহ্য বিবেকানন্দের বিবেক বুদ্ধিকে যেমন আলোড়িত করেছিল, তেমনি মধ্যযুগের ভারতীয় সমাজ সংস্কৃতি ও সভ্যতার অধ: পতন বীর সন্ন্যাসীর হৃদয় ও প্রনকে বিদ্রোহী করে তুলেছিল।

ভারতেব অগনিত দরিদ্র, অবহেলিত, নিরক্ষর ও অস্পৃশ্য মানুষের চবম দু:খ দুর্দশার প্রতিকার কিভাবে সম্ভব তা বিবেকানন্দের চিন্তা ভাবনাকে বিশেষ ভাবে বিচলিত করেছিল।

একদিকে ভাবতের অতীত গৌরবকে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠত করা, অন্যদিকে বর্তমান ভাবতেব দু:খ দুর্দশা কবা, স্বমী বিবেকান্দের প্রধান দুর্দশা দূর করা, স্বামী বিবেকানন্দের প্রধান কর্তব্য হয়ে উঠলো।

স্বামী বিবেকানন্দ মন্দির, বেলুড় মঠ

বিবেকানন্দের বিদেশ যাত্রা

দক্ষিণভারত পরিক্রমার সময় বিভিন্ন মহল থেকে স্বামীজী জানতে পারেন যে, আমেরিকার শিকাগো শহরে বিশ্বধর্ম মহাসভা অনুষ্ঠিত হবে। ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে এই মহাসভায় যোগ দেবার জন্য অনেকেই স্বামীজীকে অনুরোধ করতে থাকেন।

কিন্তু বিদেশের এক ধর্ম মহাসভায় বিনা নিমন্ত্রনে যাওয়া ঠিক হবে কিনা এ বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্থ স্বামীজী মন স্থির করতে পারছিলেন না। অথচ তিনি অনুভব করেছিলেন যে, পাশ্চাত্য জগতে ভারতের গৌরব প্রতিষ্ঠা করার পক্ষে এটা হচ্ছে একটা সুবর্ণ সুযোগ ।

এই সময় একদিন স্বামীজী স্বপ্নে দেখেন যে , শ্রীরামকৃষ্ণদেব দুহাত তুলে আশির্বাদ করে বললেন ,- তোকে বিশ্বধর্ম মহাসভায় যেতেই হবে। বিশ্বসভায় ভারতের অতীত গৌরব প্রতিষ্ঠিত করে ভারতবাসীর কল্যাণে সেবাব্রত পালনের এই সুযোগ নষ্ট করা চলবেনা।

এই ঘটনার পরই বিবেকানন্দ বিদেশ যাত্রার জন্য মন স্থির করে ফেললেন। এখবর শুনে মাদ্রাজের ভক্তরা চাঁদা সংগ্রহের কাজে দলে দলে, নেমে গেলেন। বহু দেশীয় রাজা অর্থ সাহায্য নিয়ে এগিয়ে এলেন।

স্বামীজীর বিদেশ যাত্রার প্রস্তুতি যখন পুরোদমে চলছে, ঠিক তখনই খেতড়ির রাজা অজিত সিং নবজাত পুত্রকে আশীর্বাদ করার জন্য স্বামীজীর কাছে আবেদন জানালেন। হাতে সময় বেশী নেই, তবু স্বামীজী প্রিয় শিষ্যের আবেদন নাকচ করতে, পারলেন না। খেতড়ির রাজপুত্রকে আর্শীবাদ করার জন্য রাজ প্রসাদে হাজির হলেন।

খেতড়ির রাজা দেওয়ানের উপর দায়িত্ব দিলেন , স্বামীজীর বিদেশ যাত্রার সব ব্যবস্থা যেন সুষ্টুভাবে করা হয়। বিদেশী আবহাওয়ার উপযুক্ত দামী আলখাল্লা ও একসেট দামী পোষাক তৈরী করে দিলেন।

সেকালে হিন্দুদের পক্ষে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ ছিল। সমুদ্রযাত্রা করলে হিন্দু সমাজ শাস্তি মূলক ব্যবস্থা হিসাবে সমাজচ্যুত করতো। অথচ প্রাচীনকালে ভারতীয় হিন্দুরা সমূদ্রপথে মিশর ও গ্রীসের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য করতো। এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে সমূদ্র পথেই বাণিজ্য প্রচলিত ছিল।

মধ্যযুগে সমূদ্রপথে জলদস্যুদের উপদ্রব খুব বেড়ে গিয়েছিল। তার ফলেই হয়তো সমূদ্র পথে বাণিজ্য বন্ধ হয়েছিল। পরে ক্রমশ ধর্মীয় সংস্কারের বাধা সৃষ্টি করা হয়। এর ফলে ভারতীয় হিন্দুরা বিশ্বসভ্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

রামমোহন প্রথম ধর্মীয় নির্দেশ অগ্রাহ্য করে সমূদ্র যাত্রা করেছিলেন। কলকাতায় গোড়াপন্থীরা তখন তীব্র নিন্দা ও সমালোচনা করেছিল। পরে কেশবচন্দ্র সেনও সমূদ্রযাত্রা করার কাবনে নিন্দিত হযেছেন। ঐ সময় গোড়াপন্থীবা ব্রাহ্মধর্মকে বিধর্মী বলে গণ্য করতো। কাজেই ব্রাহ্ম সমাজের নেতা কেশবচন্দ্রকে সমাজচ্যুত করার সুযোগ ছিলনা।

সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ সমাজের গন্ডীর বাইরে ছিলেন। তবু তীব্র নিন্দা ও সমালোচনার আঘাত সইতে হয়েছে। সে যুগের বেশীর ভাগ সংবাদপত্র বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে শ্লেষাত্মক সংবাদ পরিবেশন করেছিল।

বিবেকানন্দ একজন কায়স্থ সন্তান, এই পরিচয় জানার পর গোঁড়াপন্থী ব্রাহ্মণরা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। হিন্দু ধর্মের পক্ষে একমাত্র ব্রাহ্মণরাই শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা দিতে পারে। একজন কায়স্থ সন্তানের এই অধিকার নেই।

বিবেকানন্দ এসব নিন্দা সমালোচনাকে গ্রাহ্য না করেই সমুদ্র যাত্রা করলেন। তিন বছর পর দেশে ফিরে এসে নিন্দুকদের উপযুক্ত জবাব দিয়ে জব্দ করেছিলেন।

১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন। সুদীর্ঘকাল যাবত এই মহাদেশটি মহাসমুদ্রের দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়েছিল।

১৮৯৩ সালে কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের ৪০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে শিকাগো শহরে এক বিশাল মেলা ও উৎসবের আয়োজন করা হয়। চার্লস ক্যারল বনি নামে একজন বিশিষ্ট আইনজীবী এই পরিকল্পনা তৈরী করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র বিশ্বের যাবতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সমাবেশ

ঘটানো। এই উপলক্ষে শিকাগো শহরে একটি বিশ্বধর্ম মহা সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। বিশ্বের দশটি প্রধান ধর্মের প্রতিনিধিদের এখানে আমন্ত্রণ করা হয়।

১৮৯৩ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর থেকে ২৭শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই বিশ্ব ধর্ম মহাসভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

ভারতবর্ষ থেকে এই ধর্ম মহাসভায় আমন্ত্রিত হয়েছিলেন, বোম্বাইয়ের প্রার্থণা সমাজের প্রতিনিধি বি.বি নাগরকর, কলকাতার মহাবোধি সোসাইটির বৌদ্ধ প্রতিনিধি অনাগরিক ধর্মপাল, ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিনিধি প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার, জৈন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বীর চাঁদ এ গান্ধী, অ্যানি বেসান্ত এবং এলাহাবাদের জ্ঞানেন্দ্র চক্রবর্তী এবং মুনিলাল দ্বিবেদী।

হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধি হিসেবে কেউ অমন্ত্রিত ছিলেন না। কাজেই বিবেকানন্দ এই ধর্মসভায় হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আরো বেশী উৎসাহী এবং আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। কাবণ তিনি বিশ্বাস করতেন, বিশ্বসভায় ভাবতের গৌরব প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে ভারতে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে তাব প্রচন্ড প্রভাব পডবে এবং ভারতীয় সমাজে একটি মহাজাগবণের প্রবল ঢেউ সৃষ্টি কবা সম্ভব হবে। বিশ্বধর্ম মহাসভায় যোগদানের নিয়ম কানুন, সময়সূচী এবং আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছুই জানা ছিল না। অতি কষ্টে জাহাজ থেকে নেমে বিবেকানন্দ নিজেকে বড নিঃসঙ্গ বোধ করলেন।

শিকাগো শহরে গেরুয়া পোযাক পবা কোন সন্ন্যাসী এর আগে শহরবাসী কখনো দেখেনি। জাহাজ ঘাটার পাশাপাশি অঞ্চল ছিল একটা জার্মান কলোনী। বিশ্ব ধর্মসভার কোন খবরই তাদের জানা ছিল না।

বিবেকানন্দেব হাতে নিমন্ত্রন পত্র নেই, ধর্মসভার ঠিকানা জানা নেই, উদ্যোক্তাদেব কারো নামও জানা নেই। স্বামীজী ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়লেন। এতদূর এসেও কোন উদ্দেশ্যই সফল হবার আশা দেখলেন না।

সেকালে আমেরিকায় তীব্র বর্ণ বিদ্বেষ প্রচলিত ছিল। এশিয়া আফ্রিকার কোন মানুষকেই হোটেল বা রেষ্টুরেন্টে বসতে দিত না, খাবার বিক্রী করতোনা। স্বামীজীর পোষাক দেখে অনেকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপও করেছে। ক্ষুধা তৃষ্ণায় স্বামীজী কাতর হয়ে পড়লেন। আমেরিকা সম্পর্কে যে উচ্চ ধারণা ছিল তাতেও ধাক্কা

লাগলো।

শিকাগো শহরে শুধুমাত্র প্রথম শ্রেনীর হোটেলে বিদেশীদের থাকতে দেয়। কিন্তু এসব হোটেলে থাকা খাওয়ার মূল্য খুবই বেশী। স্বামীজী খবর নিয়ে জানলেন, কাছেই বোষ্টন শহরে কম খরচে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। তিনি তখনই ট্রেনে করে বোষ্টন শহরে রওনা হলেন।

স্বামীজীর পোষাকে আকৃষ্ট হয়ে একজন শিক্ষিকা অভিজাত বৃদ্ধা এগিয়ে এলেন স্বামীজীর সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য। এই বৃদ্ধা ছিলেন আমেরিকার একজন বিখ্যাত লেখিকা স্যানবর্ণ।

কিছুক্ষণ আলাপেব পরই স্বামীজীব সমস্যাব কথা জেনে খুব বিচলিত হলেন। তিনি স্বামীজীকে নিজেব বাডীতে আশ্রয দিলেন এবং শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ করে বাডীতে হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে আলোচনার ব্যবস্থা করলেন। বিভিন্ন পত্রিকায় স্বামীজীব মতামত খুবই গুরুত্ব দিযে প্রকাশ করা হল। স্বামীজীর বক্তব্য এবং যুক্তি সবাইকে মুগ্ধ করল।

পত্রিকায স্বামীজীব অদ্ভুত সব বক্তব্যেব খবব পড়ে অধ্যাপক রাইট একদিন স্যানবর্ণ এব বাড়ীতে হাজিব হলেন। স্বামীজীব সঙ্গে আলোচনায় মুগ্ধ হলেন। স্বামীজী কোন আমন্ত্রণ পত্র ছাডাই এত দুব দেশে ধর্মসভায় যোগদানেব জন্য এসেছেন শুনে আরো অবাক হলেন। বিশ্বধর্মসভায সম্মানিত প্রতিনিধি হিসেবে যাতে যোগ দিতে পারেন অধ্যাপক বাইট সে ব্যবস্থা করলেন এবং শিকাগো যাবাব ট্রেনের টিকেটও কবে দিলেন।

শিকাগো স্টেশনে নেমে পকেট হাতিযে দেখেন অধ্যাপক বাইটের দেওয়া চিঠিখানি হারিয়ে গেছে। ঠিকানাও ভুলে গেছেন। পাযে হেঁটে অজানা পথে চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে একটি মাল গাড়ীব বাক্সে বাত কাটালেন।

ভোর বেলায় আবার অজানা ঠিকানার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে এক সময় ক্লান্ত হয়ে একটা বড় বাড়ীর বারান্দায় ঘুমিযে পড়লেন। সেই বাড়ীর এক বয়স্কা মহিলা নতুন ধরনের পোষাক পরা একজন যুবককে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে অবাক হলেন।

তিনি এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি বিশ্বধর্মমহাসভার

প্রতিনিধি? অনাহারে স্বামীজীর কণ্ঠস্বর আচ্ছন্নের মত মনে হল। তিনি নিজের দুরবস্থার কথা ধীরে ধীরে বললেন।

ভদ্র মহিলা স্বামীজীকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে বললেন,--- আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি আপনাকে ধর্ম মহাসভায় নিয়ে যাব। এখন বিশ্রাম করুন।

বিকালে ভদ্র মহিলা স্বামীজীকে নিয়ে ধর্মসভায় উপস্থিত হলেন। কর্তৃপক্ষের সঙ্গেঁ বিস্তারিত আলোচনা করে স্বামীজীকে হিন্দুধর্মের সম্মানিত প্রতিনিধি রূপে গ্রহণ করার ব্যবস্থা করলেন।

১১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ধর্ম মহাসভায় সমবেত দশটি ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দশটি ঘন্টাধ্বনী করে বিশ্ব ধর্ম মহাসভার কাজ শুরু হল। আমন্ত্রিত দশটি ধর্ম হল- ইসলাম- ইহুদি-পারসীক, বৌদ্ধ, কনফুসিয়াস, শিন্টো, হিন্দু এবং তিনটি খৃষ্টান চার্চ।

বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতা

১৮৯৩ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর থেকে ২৭শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১৭ দিন ধরে আমেরিকার শিকাগো শহরে বিশ্বের প্রথম বিশ্বধম মহাসভা অনুষ্ঠিত হয়। ৫০টি জাতির প্রতিনিধি এই ধর্ম মহাসভায় সমবেত হয়েছিল।

বিশ্ব ধর্ম মহাসভার মূল আলোচ্য বিষয় ছিল ১০টি প্রধান বিষয়গুলো ছিল-

১. পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্মের ঐতিহাসিক ভূমিকা।

২. বিভিন্ন ধর্মের মূল সত্যগুলো আলোচনা করা।

৩. প্রত্যেক ধর্মের যে সত্যগুলো মূল বৈশিষ্ট্য হিসাবে দাবী করে তার ব্যাখ্যা করা।

৪. বিভিন্ন ধর্ম কিভাবে পরস্পরকে প্রভাবিত করতে পারে তা আলোচনা করা।

৫. সামাজিক সমস্যাগুলো দূর করার ক্ষেত্রে ধর্মের ভূমিকা।

৬. বিশ্ববাসীর স্থায়ী শান্তি কামনায় ধর্মের ভূমিকা ।

৭. বিভিন্ন দেশের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বোধের বন্ধনে ধর্মের ভূমিকা ।

৮. বিভিন্ন জাতির মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় ধর্মের ভূমিকা। ইত্যাদি

উদ্যোক্তাদের একটা গোপন উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধর্ম রূপে খৃষ্টান ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ সেই উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন। এই ধর্মমহাসভায় যোগ দিয়েছিলেন আমেরিকার বিশিষ্ট সাত হাজার বুদ্ধিজীবী।

প্রথম দিনের প্রথম অধিবেশনে স্বামীজীকে শ্রোতাদের সামনে পরিচয় করিয়ে দেবার পর তিনি সংক্ষিপ্ত ভাষণ শুরু করলেন এভাবে, — সিস্টার্স এন্ড

ব্রাদার্স অব আমেরিকা — মুহূর্তের মধ্যে করতালিতে বিশাল হল ঘরটি মুখরিত হল। আর কোন বক্তা আমেরিকাবাসীকে এরূপ সন্মান জানিয়ে বক্তৃতা শুরু করেন নি। অনেকই লিখিত ভাষণ পাঠ করেছেন । কিন্তু স্বামীজীর কোন পূর্বপ্রস্তুতি ছিলনা। - ছিল গভীর আত্মবিশ্বাস এবং সবধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা বোধ। কণ্ঠে ছিল মধুর স্বর , ভাষায় ছিল আন্তরিক আবেগ। করতালির শব্দ থেমে যাবার পর স্বামীজী বলেন, আপনারা আমাদের প্রতি যে উষ্ণ ও আন্তরিক সম্বর্ধনা জানিয়েছেন, তার উত্তর দিতে এক অনির্বচনীয় আনন্দে আমার হৃদয় ভরে যাচ্ছে। বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন সন্ন্যাসী সমাজের নামে আমি অপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি, ধন্যবাদ জানাচ্ছি সকল ধর্মের জননীর নামে এবং সকল শ্রেণীর ও সম্প্রদায়ের লক্ষ লক্ষ হিন্দু জনগণের নামে।

আবার হাততালিতে ফেটে পড়ল সমস্ত হলটি। স্বামীজী আবার বললেন, যে ধর্ম বিশ্বকে সহিষ্ণুতা ও সর্ব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার আদর্শ শিখিয়েছে, আমি সেই ধর্মের লোক বলে গর্বিত। আমরা শুধু সর্বজনীন সহিষ্ণুতায় বিশ্বাস করিনা, আমরা সকল ধর্মকে সত্য বলে গ্রহণ করি।

যে জাতি বিশ্বের সমস্ত জাতি এবং ধর্মের নির্বাসিত ও আশ্রয় প্রার্থী মানুষদের আশ্রয় দান করেছে, আমি সেই জাতির মানুষ বলে গর্বিত।

এভাবে ভারতের ঐতিহাসিক ভূমিকা তুলে ধরে সমবেত বুদ্ধিজীবীদের পূর্ব ধারণা ভেঙ্গে দেন স্বামীজী। এতকাল ধরে ইউরোপ ও আমেরিকার অধিবাসীরা শুনেছে, ভারত হল একটা বর্বর সভ্যতার দেশ। অসংখ্য কুসংস্কার এবং ধর্মান্ধতায় জীর্ণ হিন্দু ধর্মের মানুষেরা প্রায় পশুর জীবন যাপন করে।

দ্বিতীয় অধিবেশনে স্বামীজী কুয়োর ব্যাঙ এর গল্পটি বলে সব ধর্মের মানুষের মধ্যেই যে সংকীর্ণতা রয়েছে তার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন।

স্বামীজী বলেন, আমি একজন হিন্দু। আমি আমার ছোট্ট কূয়োর মধ্যে বসে আছি এবং ভাবছি এই ছোট্ট কূয়োটাই হচ্ছে সমগ্র জগৎ। মুসলমান ধর্মাবলম্বী বসে আছেন তাঁর কূয়োর মধ্যে এবং ভাবছেন, সেটাই সমগ্র জগৎ । খৃষ্টধর্মাবলম্বী বসে আছেন তার ছোট কূয়োর মধ্যে এবং ভাবছেন সমগ্র জগৎ হচ্ছে তার কূয়ো। আপনারা আমেরিকাবাসীরা আমাদের এই ক্ষুদ্র জগতের বাধা ভেঙ্গে

ফেলার জন্য যে মহান প্রচেষ্টা করে চলেছেন, তার জন্য আমাকে আপনাদের ধন্যবাদ দিতেই হবে।

১৯শে সেপ্টেম্বর অধিবেশনে স্বামীজী মূল বক্তব্য পাঠ করেন। বেদ - বেদান্ত-পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারত ও গীতা শত শত বছর ধরে, হিন্দু সমাজকে যে শিক্ষা দিয়েছে তার তাৎপর্য ব্যখ্যা করেন এই অধিবেশনে।

তিনি বলেন, হিন্দুরা বেদ থেকে ধর্ম লাভ করেছে। কিন্তু বেদ দ্বারা কোন একটি গ্রন্থ বোঝায় না। হিন্দু ঋষিরা বিভিন্ন সময়ে সাধনার দ্বারা যে সব আধ্যাত্মিক অনুশাসনগুলো আবিষ্কার করেছেন তাঁদের সঞ্চিত জ্ঞানের ভান্ডারই হল বেদ। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কারের আগেও যেমন মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অস্তিত্ব ছিল, ঠিক তেমনি অধ্যাত্মিক জগৎ নিযন্ত্রণকারী শক্তিও ঋষিদের দ্বারা আবিষ্কারের আগেও বর্তমান ছিল। সেজন্যই বলা হয়েছে বেদ অর্থাৎ জ্ঞান আদি অন্তহীন।

মহাজাগতিক শক্তি পরিবর্তনশীল হলেও মোট শক্তির পরিমান একই থাকে। আধুনিক বিজ্ঞান এই সত্য আবিষ্কার করেছে। হিন্দু ঋষিরা তিন হাজার বছর আগেই এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন। নানা বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপণ কবেন যিনি, তিনিই ঈশ্বর।

হিন্দুরা আত্মায় বিশ্বাস করে। আত্মা মানুষের দেহে বাস করে। মানুষের দেহের মৃত্যু হয় কিন্তু আত্মার মৃত্যু হয় না। দেহ থেকে দেহান্তরে স্থানান্তরিত হয় আত্মা। এই বিশ্বাসের সঙ্গে শক্তি বিজ্ঞানের কোন পার্থক্য নেই।

বৈদিক ঋষিরা মানুষকে বলেছেন- অমৃতের সন্তান। এর চেয়ে মহৎ আদর্শ কি হতে পারে? তাঁরা বলেছেন, হে অমৃতের উত্তরাধিকারী ভাইসব, হে বীর সিংহেরা, জাগ্রত হও, তোমরা অমর আত্মা, তোমরা চিরন্তন।

বেদে ঈশ্বরের কল্পনা করা হয়েছে সর্ব্যব্যাপী, পবিত্র, নিরাকার এক সর্বশক্তিমান, সর্ব করুণাময়রূপে। বিশুদ্ধ হৃদয়ের অধিকারী ধর্মপ্রাণ পবিত্র মানুষেরাই শুধু ঈশ্বরের দেখা পান। এ বিষয়ে সমস্ত হিন্দুরা একমত। ভারতের সকল সম্প্রদায়ের এটা হল সধারণ ধর্ম। হিন্দুধর্ম পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিটি মানুষকে পূর্ণ মনুষ্যত্বের পথে এগিয়ে দেয়া, দেবত্ব লাভে সাহায্য করা।

হিন্দুদের মূর্তিপূজা সম্পর্কে স্বামীজী বলেন, হিন্দুরা উপাসনার

. সময় একটি প্রতীক ব্যবহার করে। একটি মূর্তি সামনে রেখে দেবভাব উপলব্ধির চেষ্টা করা, প্রার্থনা করা মোটেই পাপ কার্য নয়। সাধনার উচ্চতম স্তরে যখন মন ও হৃদয় পবিত্র হয় তখন ঈশ্বর উপলব্ধি ঘটে, মূর্তির প্রয়োজন হয় না।

ক্যাথলিকদের গীর্জায় অনেক মূর্তি থাকে। প্রোটেস্টান্টদের প্রার্থনার সময়ও মূর্তির কল্পনা জাগে। হে আমার ভাইগণ, শ্বাস প্রশ্বাস ছাড়া যেমন আমরা বাঁচতে পারি না। তেমনি মনের মধ্যে একটা কল্পনা ছাড়া আমরা চিন্তা করতে পারি না।

প্রত্যেক ধর্ম পার্থিব মানুষের চেতনা থেকে ঈশ্বরের বিকাশ ঘটায় এবং সেই একই ঈশ্বর সব মানুষেরই প্রেরণা দাতা। তাহলে আমাদের মধ্যে কেন এই পরস্পর বিরোধীতা?

বৌদ্ধরা জৈনদের মত ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে না। মানুষের মধ্যে থেকে ঈশ্বরের বিকাশ ঘটানোই তাদের মূল উদ্দেশ্য।

হিন্দুরা তাদের দার্শনিক পরিকল্পনা হয়তো সম্পূর্ণ রূপায়তি করতে পারে নি। যদি কোন সার্বজনীন ধর্ম কোথাও সৃষ্টি হয়ে থাকে, তবে সে ধর্ম কোন স্থান বা কালের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে থাকবে না।

হয়তো একাজ আমেরিকাবাসীর জন্যই নির্ধারিত হয়েছিল। আজ আমেরিকা বিশ্ববাসীর কাছে ঘোষণা করুক যে, প্র্যত্যেক ধর্মের মধ্যে একই ঈশ্বর বিরাজ করছেন।

২০ শে সেপ্টেম্বর ধর্ম মহাসভার দশম অধিবেশনে স্বামীজী খৃীষ্টানদের সমালোচনা করে - বলেন, আপনারা খৃীষ্টানরা পৌওলিকদের আত্মার ত্রাণেব জন্য ধর্ম প্রচারক পাঠাতে এত আগ্রহী , অথচ, আপনারা কেন তাদের দেহগুলোকে অনাহারের হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করেন না?

ভারতে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময় হাজার হাজার মানুষ অনাহারে মারা যায়, কিন্তু আপনারা খৃষ্টানরা কিছুই করেননি।

ভারতে অনেক গীর্জা আপনারা নির্মাণ করেছেন। কিন্তু প্রাচ্যের যে অভাব খুবই তীব্র তা ধর্ম নয়, তাদের অভাব হচ্ছে রুটির। অনাহারক্লিষ্ট মানুষকে ধর্মদান করা হচ্ছে তাদের আত্মাকে অপমান করা।

২২শে সেপ্টেম্বর - ভারতে ধর্ম সমূহ সম্পর্কে ভাষণ দেন।

২৬শে সেপ্টেম্বরের অধিবেশনে স্বামীজী বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে বলেন,— ভারতে হিন্দুধর্মের পূর্ণতার জন্যই বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটেছিল। হিন্দুরা বুদ্ধের মানব কল্যাণকর নীতি ও নির্দেশ গুলো মেনে নিয়েছে। হিন্দুধর্মের যুক্তিসঙ্গত উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে।

একই ভাবে ইহুদীধর্মের পূর্ণতার জন্যই যীশুর আবির্ভাব ঘটেছিল। কিন্তু ইহুদীরা যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করেছে।

হিন্দুরা বিশ্বাস করে পৃথিবীতে যতদিন মৃত্যুভয় থাকবে ততদিন ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসও অক্ষুন্ন থাকবে। ধর্ম হল একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে সমাজে বিরাট পরিবর্তন ঘটেছিল।

২৭শে সেপ্টেম্বর সমাপ্তি অধিবেশনে স্বামীজী বলেন,— যেসব মহান আত্মাব উদার স্বপ্নে এমন একটি আশ্চর্য সম্মেলন সফল হল, তাদের সকলকেই আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি । সম্মেলনে যারা শ্রুতিকটু ধ্বনি দিয়েছেন তাদেরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যদি কেউ আশা করেন একটি ধর্মেব বিজয় এবং অন্যসব ধর্মেব ধ্বংসের ধারা পৃথিবীতে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে, তবে তারা হতাশ হবেন।

কোন খৃষ্টানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হতে হবেনা। কোন হিন্দু বা বৌদ্ধকেও খৃষ্টান হতে হবেনা। প্রত্যেক ধর্ম থেকে সারবস্তু গ্রহণ করে নিজ ধর্মের উৎকর্ষ সাধন করতে হবে।

এই ধর্ম মহাসভা জগতের সামনে প্রমাণ ক'রছে যে পবিত্রতা, শুদ্ধতা এ এবং দানশীলতা কোন একটি ধর্মের একচেটিয়া স।রবস্তু নয়। প্রত্যেক ধর্মেরই উন্নত আদর্শ রয়েছে।

একমাত্র তখনই দুঃখের অবসান হবে, যখন আমি সুখের সঙ্গে একাত্ম হব। একমাত্র তখনই সকল ভ্রান্তি দূর হবে যখন আমি জ্ঞানের সঙ্গে একাত্ম হব। এটাই হল প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত।

কুসংস্কার মানুষের বড় শত্রু, কিন্তু ধর্মগত গোঁড়ামী আরো খারাপ। মানুষকে দেবত্বের উপলব্ধি করে দেবতা হয়ে উঠতে হবে।

বৈচিত্রের মধ্যে একতা হচ্ছে প্রকৃতির পরিকল্পনা। হিন্দুরা তা জানতে পেরেছে। প্রত্যেক ধর্মই পার্থিব মানুষের চৈতন্য থেকে ঈশ্বরের বিকাশ ঘটায় এবং সেই একই ঈশ্বর তাদের প্রেরনা দাতা। তাহলে কেন এত পরস্পর বিরোধিতা? প্রতিটি ধর্মের পতাকার উপরে লেখা থাকবে- সংগ্রাম নয় সহায়তা, ধ্বংস নয় সম্মেল, ঝগড়া বিবাদ নয় সমন্বয় ও শান্তি। প্রতিটি ধর্মকে অন্যান্য সব ধর্ম থেকে সারবস্তু গ্রহন করে নিজের বৃদ্ধির স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী অন্যান্য সব ধর্ম থেকে সারবস্তু গ্রহন করে নিজস্ব স্বাভাবিক নিয়ম্ম অনুযায়ী অন্যান্য সব ধর্ম থেকে সারবস্তু গ্রহগন করে নিজস্ব বৃদ্ধির স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী বেড়ে বেড়ে খেতে উঠতে হবে।

ভগিনী নিবেদিতা

বিশ্ব বিজয়ী বিবেকানন্দ

শিকাগো ধর্মমহাসভার প্রথম অধিবেশনের, প্রথম সম্বোধনী ভাষণেই স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ব প্রতিনিধিদের মনজয় করেছিলেন। তারপর থেকে প্রতিদিন আমেরিকার প্রধান প্রধান পত্রিকায় স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে নানা ধরণের মূল্যায়ন প্রকাশ পেতে থাকে । তার ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপের সর্বত্র এবং ভারতসহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে।

আমেরিকায় যাত্রা করার সময় স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন ভারত বিজয়ী, শিকাগো শহবেব ধর্ম সভায় প্রথম ভাষণেই তিনি হলেন বিশ্ব বিজয়ী।

বিশ্ব ধর্মমহাসভার সম্মেলন শেয হবার পর আমেরিকার সর্বত্র স্বামী বিবেকানন্দের বক্তব্য শোনার আকাংক্ষা ব্যাপকভাবে প্রকাশ পেল এবং চারিদিক থেকে আমন্ত্রণ আসতে লাগল।

শিকাগো ধর্ম মহাসভার কর্মসূচী জানা না থাকায় স্বামীজী দেড় মাস আগেই শিকাগো শহরে পৌঁছেছিলেন। ১৮৯৩ সালেব ৩১শে মে বোম্বাই থেকে বিদেশ যাত্রা করেন। সমুদ্র পথে বিভিন্ন দেশে সাময়িক অবস্থান করে করে ৩০ শে জুলাই শিকাগো শহরে উপস্থিত হন। এখানে এসে জানতে পারেন যে, বিশ্ব ধর্ম মহাসভা অনুষ্ঠিত হবে ১১ই সেপ্টেম্বর থেকে।

প্রায় দেড় মাস কোথায় থাকবেন, কেমন করে খরচ চালাবেন, কেমন করে প্রতিনিধি হবার অনুমতি সংগ্রহ করবেন এসব চিন্তায় স্বামীজী কিছুটা হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু দেখা গেল আশ্রয়, খাদ্য, পবিচিতিপত্র,অনুমতি পত্র সবই সময় মত ব্যবস্থা হয়ে গেল।

সমুদ্র পথে আসার সময় স্বামীজী জাপানে ওসাকা, কিয়োটো, টোকিও ভ্রমণ করেন, কলম্বো, সিঙ্গাপুর, হংকং শহরগুলোও ঘুরে ঘুরে দেখার সুযোগ

পেয়েছিলেন। বৌদ্ধ মন্দিরগুলো পরিদর্শন করে মুগ্ধ হলেন। শিকাগো শহরে পৌঁছে জটিল পরিস্থিতির মধ্যে পড়েন। কিন্তু বোষ্টন শহরে যাবার পথে ট্রেনে জনপ্রিয় লেখিকা স্যানবর্ণের সঙ্গে আকস্মিক পরিচয়, ক্রমে ঘনিষ্টতায় পরিণত হয়। তিনি স্যানবর্নের বাড়ীতে শুধু আশ্রয়ই পান নি, শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া এবং ভারতীয় ধর্ম-দর্শন ও ইতিহাস নিয়ে আলোচনার সুযোগও লাভ করেন।

ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে আলোচনা শোনে স্থানীয় চার্চের পাদ্রীরাও মুগ্ধ হন। চার্চে বেশ কয়েকটি আলোচনা সভারও আয়াজন করা হয়। সমস্ত পত্র পত্রিকায় এসব খবর প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের নামটি যেমন চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। ঠিক তেমনিভাবেই স্বামীজীর মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও হতাশাও দ্রুত দূর হয়ে গেল। মনে মনে অনুভব করলেন গভীর আত্মবিশ্বাস।

বিভিন্ন মহল থেকে নানা বিষয়ে আলোচনার দাবী আসতে থাকে। ২২শে আগষ্ট মহিলাদের সামনে বক্তৃতা দিলেন ভারতের রীতিনীতি ও জীবন যাত্রা প্রণালী সম্পর্কে। ২৮শে আগষ্ট একটি ক্লাবের অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিলেন- হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু প্রথা- সম্পর্কে । ২৯শে আগষ্ট উত্তস উদ্যানে বালক-বালকিাদেব জীবন যাত্রা- খেলাধূলা এবং শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে। ৩রা সেপ্টেম্বর ইস্ট চার্চের অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিলেন-ভারতের ধর্ম এবং দরিদ্র ভারতবাসী সম্পর্কে। ৫ই সেপ্টেম্বর সোস্যাল সায়েন্স এসোসিয়েশনে বক্তৃতা দিলেন- ভারতে মুসলিম শাসন সম্পর্কে।

৮ই সেপ্টেম্বর বোস্টন ত্যাগ করে শিকাগো শহরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান। ৯ই সেপ্টেম্বর মালগাড়ীর বাক্সে রাত্রিযাপন করেন। ১০ই সেপ্টেম্বর জর্জ হেলের গৃহে আশ্রয় লাভ করেন। শ্রীমতি হেলের চেষ্টায় বিশ্বধর্মমহাসভায় যাবতীয় ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

ধর্ম মহা সভার সমাপ্তি ঘোষণার পরই স্বামীজীর সঙ্গে বিভিন্ন সংস্থা মিলিত হয়ে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে থাকে।

৩০শে সেপ্টেম্বর স্বামীজী তিনটি জায়গায় তিনটি বিষয়ে বক্তৃতা দেন। প্রথমটি হল হিন্দুদের পরমতে শ্রদ্ধা বিষয়ে। তারপর অদ্বৈতবাদ, পুনর্জন্মবাদ,

ভারতের রীতিনীতি, বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। শ্রোতাদের কাছে সব কথাই ছিল নতুন। তাই আকর্ষণও ছিল খুব বেশী। প্রতিটি সভায় প্রচুর লোকের সমাবেশ ঘটতো। চমৎকার ইংরেজীতে মধুর কণ্ঠে আবেগ জড়িত ভাবে প্রতিটি বক্তৃতা আরো বেশী আকর্ষনীয় হয়ে উঠতো।

নবেম্বর মাসে প্রায় দুই সপ্তাহ হেল পরিবারে বিশ্রাম করে স্বামীজী শিকাগো শহর ত্যাগ করেন। এর পর স্লেটন লাইসিয়োম লেকচার ব্যুরোর সঙ্গেঁ চুক্তিবদ্ধ হয়ে তাদের প্রোগ্রাম মতে বিভিন্ন শহরে শত শত বক্তৃতা দিয়ে স্বামীজী সারা আমেরিকায় প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেন।

বক্তৃতার বিষয় বস্তুগুলো, ছিল বিচিত্র ধরনের। হিন্দুধর্ম, ভারতের ধর্ম সমূহ, ভারতের রীতিনীতি, পুনর্জন্ম, মানুষের ভাগ্য, তুলনামূলক ঈশ্বর তত্ত্ব, মানুষের দেবত্ব, ঈশ্বর প্রেম, প্রাচীন হিন্দু দার্শনিকদের শিক্ষা, ভারতের খ্রীষ্টীয় মিশন, বৌদ্ধধর্ম, ধর্মসমন্বয়, ভারতীয় নারী, ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিদিন বক্তৃতা দিয়ে অসংখ্য শোতৃ মন্ডলীকে মুগ্ধ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

ধর্ম সম্পর্কিত বক্তৃতা গুলো বেশীরভাগ অনুষ্ঠিত হতো বিভিন্ন চার্চে। কোন কোন জায়গায় খ্রীষ্টান মিশনারীরা স্বামীজীর তীব্র সমালোচনাও করেছে। কঠোর ভাষায় আক্রমণও করেছে।

কিন্তু স্বামীজীর পক্ষে ছিল বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত আমেরিকাবাসীর সমর্থণ। বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি স্বামীজীর অনুরাগী হয়ে শিষ্যত্ব ও গ্রহণ করেন। বিভিন্ন জায়গায় ছাত্র-ছাত্রীরা বেদান্ত ক্লাসেরও আয়োজন করেছিল। স্বামীজী প্রতিদিন সাত আট ঘন্টা ক্লাস নিয়েছেন।

লাইসিয়াম থিয়েটারে প্রগতিশীল ধর্ম বিষয়ে এক আকর্ষনীয় বক্তৃতা দেন। পিপলস্ চার্চের অনুরোধে- সর্ব ধর্মের সাধারণ উৎস এবং আর্যজাতি বিষয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা দেন।

এভাবে দুই বছরের বেশীকাল আমেরিকায় ব্যাপকভাবে প্রচার ও বক্তৃতা দিয়ে ১৮৯৫ সালের ১৭ই অক্টোবর স্বামীজী ইউরোপ যাত্রা করেন।

প্রথমেই ফ্রান্সের প্যারিস শহরে বিভিন্ন সংগঠনের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে স্বামীজী বক্তব্য রাখতে থাকেন। এখানকার আলোচ্য বিষয় ছিল- প্রেম সম্পর্কে

প্রাচ্য মতবাদ, ভারতীয় দর্শন ও পাশ্চাত্য সমাজ, বেদান্ত নীতিবাদের ভিত্তি, বিশ্বধর্মের আদর্শ, সৃষ্টি রহস্য, বিশ্বের দরবারে ভারতের বর্ণীতউপনিষদ ইত্যাদি।

এছাড়াও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে জ্ঞান যোগ, কর্মযোগ, ভক্তি যোগ, রাজযোগ ইত্যাদি বিষয়ে ক্লাস নিতে হয়েছে।

প্যারিস থেকে লন্ডনে এসে আবার ঠাসা প্রোগ্রামে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে হয়েছে স্বামীজীকে। এখানে বক্তৃতার বিষয় ছিল- ধর্মের প্রয়োজনীয়তা, প্রকৃত ও আপাত মানুষ, উপলব্ধি, ত্যাগ, সভ্যতায় বেদান্তের কার্যকারিতা, ইত্যাদি।

লন্ডনের এক চার্চে দুদিন স্বামীজীর বক্তৃতা শোনার পর মিস মার্গারেট নোবেল নামে এক উচ্চ শিক্ষিতা পাদ্রীকন্যা স্বামীজীর আদর্শের প্রতি অনুরক্ত হয়ে শিষ্যত্ব গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি ভারতীয় নারীদের সেবায় জীবন উৎসর্গ করার সংকল্প গ্রহণ করেন। স্বামীজী ভারতের সমাজ ধর্ম-পরিবেশ সম্পর্কে বার বার বোঝাবার পরও মার্গারট নোবেল নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। স্বামীজী শেষ পর্যন্ত তাঁকে শিষ্যত্ব প্রদান করেন। ভারতের কল্যাণে নিবেদিত প্রাণ বলে তাঁর নতুন নাম দেন ভগিনী নিবেদিতা। ভারতে আসার পর আনষ্ঠানিকভাবে মঠ মন্দিরে ব্রহ্মচর্য দীক্ষা দিয়েছিলেন।

১৮৯৬ সালের ১৬ই ডিসেম্বর লন্ডন ত্যাগ করে কয়েকদিন ইতালীতে অবস্থান করেন। সেখান থেকে ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে ভারতের উদ্দেশ্যে কলম্বোর পথে যাত্রা শুরু করেন।

১৮৯৭ সালের ১৫ই জানুয়ারী কলম্বোতে পৌঁছে বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেন। ১৬ই জানুয়ারী প্রাচ্য ভূমিতে প্রথম বক্তৃতা করেন। বিষয় ছিল- পবিত্র ভূমি ভারত। এখানে বিভিন মঠ মন্দির পরিদর্শন করে ১৯শে জানুয়ারী অনুরাধাপুর হয়ে জাফনায় এসে হিন্দু মহাবিদ্যালয়ে বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেন। সন্ধ্যায় বিশাল মশাল শোভাযাত্রা হয়। এখান থেকে চলে আসেন রামেশ্বরমে।

রামেশ্বরমে মন্দির দর্শন করে ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে মাদুরাই কলেজে বিপুল সংবর্ধনায় যোগ দেন। এখান থেকে ত্রিচিন পল্লী হয়ে মাদ্রাজে উপস্থিত হন। ভিক্টোরিয়া হলে বিপুল সংবর্ধনা লাভ করেন। এখানে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে- ভারতের ঋষি, বিবেকানন্দ ভারতের ভবিষ্যৎ বিষয়ে কয়েকটি বক্তৃতা

দেন। মাদ্রাজ থেকে জাহাজে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হন। ১৯ শে ফেব্রুয়ারী বজবজ থেকে স্পেশাল ট্রেনে শিয়ালদহ স্টেশনে বিশাল জনতার সমাবেশে ঐতিহাসিক সংবর্ধনা লাভ করেন।

১৮৮৭ সালে কলকাতার নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বর থেকে ভারত পরিক্রমা শুরু করেন- গেরুয়া বসন পরে বিবিদিষানন্দ নাম নিয়ে। ১৮৯৩ সালে ভারত পরিক্রমা শেষ করে ভারত বিজয়ী বিবিদিষানন্দ বিদেশ যাত্রা করেন স্বামী বিবেকানন্দ নাম নিয়ে।

১৮৯৭ সালে স্বামী বিবেকানন্দ কলকাতায় ফিরে আসেন বিশ্ব বিজয়ী বিবেকানন্দ হয়ে। কলকাতাবাসীর উদ্দেশ্যে আন্তরিক আবেগ পূর্ণ বক্তৃতায় দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেন নবভারত গড়ার সংকল্প ঘোষণায়। এবং যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করেন স্বদেশবাসীর জন্য ত্যাগ ও সেবার ব্রত গ্রহণ করে ভারতকে বিশ্বসভায় স্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করার ব্রত গ্রহণ করতে।

বিবেকানন্দের আহ্বানে সারা দিয়ে জেগে উঠেছে সমগ্র ভারত। শুরু হয়েছে নতুন ভারতবর্ষ গড়ে তোলার কর্ম যজ্ঞ।

নবজাগরণের প্রবল ঢেউ পরিনতরূপ নিয়েছে স্বদেশী আন্দোলনে। আবার স্বদেশী আন্দোলন থেকেই জন্ম নিয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রাম।

বিবেকানন্দের বাণী যেমন স্বাধীনতা সংগ্রামের মন্ত্র ও প্রেণারুপে কাজ করেছে। তেমনিভাবে ভবিষ্যত্বের সুনাগরিক গড়ে তোলার কাজেও সমান শক্তি ও শিক্ষার উপকরণ রূপে চারিত্র গঠনের উৎস হয়ে উঠেছে।

বিবেকানন্দের স্বপ্নের ভারত গড়ে তুলতে হলে তাঁর পরিকল্পিত চরিত্রবান নাগরিক ও সৃষ্টি করতে হবে। সেই লক্ষ্য পূরনের জন্য আরেকটা জাগরনের ঢেউ সৃষ্টি করতে হয়তো আবির্ভূত হবেন অন্য কেউ।

বিবেকানন্দের ধর্মচিন্তা

স্বামী বিবেকানন্দ পূর্ববর্তী সব ধর্ম প্রচারকদের তুলনায় সম্পূর্ণ আলাদা প্রকৃতির ছিলেন। -সন্ন্যাসী হিসেবেও তিনি ছিলেন পৃথক চরিত্রের ।

ভারতে সন্ন্যাসীরা সংসার ত্যাগ করেন, ইহলোকের দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে পরলোকে ঈশ্বর প্রপ্তির আশায়।

শ্রী রামকৃষ্ণ দেব প্রথম জীবনে এজন্যই সন্ন্যাস জীবনকে স্বার্থপরতা বলে গণ্য করতেন। সার্বিক সাধক জীবনেও তিনি কখনো গেরুয়া বসন পরিধান করেন নি।

তবুও সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে শুধুমাত্র অসহায়, আর্ত মানুষের সেবা কার্যের জন্য একদল সর্বত্যাগী যুবকর্মীর প্রয়োজনীয়তা রামকৃষ্ণদেব অনুভব করেছিলেন।সেজন্যই জীবনের শেষ পর্বে নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে একদল নবীন সন্ন্যাসী তিনি সৃষ্টি করেছিলেন। তাদের জীবনের মূল লক্ষ্য স্থির করে দিয়েছিলেন, - মানুষের সেবা করা এবং মানুষকে দেবত্ব অর্জনে সাহায্য করা।

এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশণ গঠন করেছিলেন। এই সংগঠনকে স্থায়ী রূপ দেবার জন্য দেশে বিদেশে বহু মঠ স্থাপন করেছেন।

স্বামীজীর ধর্মচিন্তা বেদ-বেদান্ত-গীতা, রামায়ণ ও মহাভারতকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। কিন্তু বিচার বিশ্লেষণে পার্থক্য আছে। নতুনত্ব আছে।

ভারতে শংকরাচার্য বেদান্তের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন,-ব্রহ্মসত্য,- জগৎমিথ্যা। এখানে প্রশ্ন উঠেছে জগৎ যদি মায়া বা মিথ্যা হয় তাহলে, ধর্ম কিভাবে মানব কল্যাণের কাজ করবে?

স্বামী বিবেকানন্দ জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় ঘটিয়ে মানব সমাজের উন্নতি

ঘটাবার লক্ষ্যে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন। অবশ্য শ্রী রামকৃষ্ণই এই পথের সূচনা করেছেন। তিনিই প্রথম উপদেশ দিয়েছেন,— অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেধে যা ইচ্ছা তাই কর। অর্থাৎ কর্ম করে যাও। কর্মের মধ্যেই লুকিয়ে আছে উন্নতির উপায় এবং ঈশ্বরত্ব লাভের রাজপথ।

বিবেকানন্দ বলেছেন,- তোমার এক আত্মা, আমার আরেক আত্মা, এই ধারণা ঠিক নয়। জগতের সব আত্মাই এক এবং অভিন্ন। বেদান্তে এক ব্রহ্মকেই আত্মা বলা হয়। কাজেই আত্মা সর্বব্যাপী। আত্মার বিনাশ হয় না। দেহের বিনাশ হয়।

তিন হাজার বছর আগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,— যা কিছু দেখতে পাচ্ছ আমাতে বিলীন হয়। শান্তি, সত্য ও ধর্ম রক্ষার জন্য যুদ্ধের কথাও শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন। অর্জুনকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করাব জন্য বিশ্বরূপ দেখিয়েছেন। বিশ্বের যাবতীয় সৃষ্টির মূলে যেমন ঈশ্বর, তেমনি সৃষ্টির সব কিছুই ঈশ্বরের মধ্যেই মিলিত হয়।

এভাবে আত্মা চক্রকে দেখলে ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে একটা সমন্বয়ের সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সঙ্গেও বিরোধ মিটে যায়। অর্থাৎ শক্তির ধ্বংস নেই, রূপান্তর আছে এই সূত্রের সঙ্গে মিলে যায়।

বিবেকানন্দ বেদান্তের মধ্যে ব্রহ্ম ও জগতের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। তিনি বলেছেন,- ইহকাল মায়া নয়, ইহকালেরও প্রয়োজন আছে। আবার পরকালের ও প্রয়োজন আছে।

এভাবে বেদান্তের নতুন ব্যাখ্যা দেবার ফলে পুরোহিত তন্ত্রের অদৃষ্টবাদ বাতিল হয়ে যায়।

স্বামীজী বলেন,- পুরোহিত তন্ত্র বলছে, ইহলোকে দুঃখ দুর্দশা ভোগ করার কারণ হল, পূর্ব জন্মের কর্মফল। এ জীবনে ধর্মীয় নির্দেশ মেনে কর্মের মাধ্যমে পুণ্য সঞ্চয় করলে পরলোকে স্বর্গ সুখ ভোগ করা যাবে।

যদি পূর্বজন্মের কর্মফলে সমাজের অধিকাংশ মানুষ নিদারুন দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে বাধ্য হয় তবে সুশৃঙ্খল কর্মের মাধ্যমে ইহলোকের চরম উন্নতি লাভ করা সম্ভব। বিবেকানন্দ পরলোককে অগ্রাহ্য না করেই নতুন সমাধানের পথ দেখালেন।

স্বামীজী সারা ভারত ভ্রমণ করে অসংখ্য মানুষকে পশুর মত জীবন যাপন করতে দেখেছেন। তাই ক্ষোভে দুঃখে বলেছেন,— যে ঈশ্বর পৃথিবীতে লক্ষ্য লক্ষ মানুষের দুঃখ দূর করতে পারেননা। সেই ঈশ্বর স্বর্গলোকে সব মানুষের জন্য সুখের ব্যবস্থা করবেন তা আমি বিশ্বাস করিনা।

যুবকদের ডাক দিয়ে বলেছেন,— হে বীর যুবকেরা, তোমরা কি অনুভব করনা যে, তোমাদের লক্ষ লক্ষ ভাই শত শত বছর ধরে পশুর জীবণ যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে? তোমাদের দেব-দেবতাদের আগামী পঞ্চাশ বছরের জন্য ঘুম পাড়িয়ে রাখো। তোমাদের সামনে উপস্থিত লক্ষ লক্ষ জীবন্ত দেবতাদের সেবা করে তাদের মধ্যে আত্মশক্তি জাগিয়ে দাও। আত্মা যদি একবার জেগে উঠে তাহলে বাকি সব আত্মাই করবে। আত্মশক্তির অভাবই আমাদের সব সমস্যার মূল কারণ।

স্বামীজী আত্মা বলতে বোঝাতে চেয়েছেন সর্বোচ্চজ্ঞান। সেই জ্ঞানই ঈশ্বর। ধর্ম হল সেই জ্ঞান অর্জনের পদ্ধতি। শত শত বছরের অভিজ্ঞতা থেকেই জ্ঞানের উৎপত্তি। জ্ঞানই সৃষ্টি করে কর্মের শক্তি, কর্মের মাধ্যমেই আসে ভক্তি। জ্ঞান হল অনন্ত, অসীম।

জ্ঞান-কর্ম ও ভক্তি জীবনে পূর্ণতা আনে। পূর্ণ মানুষই হল ঈশ্বর। মানুষের মধ্যে অবস্থিত দেবত্বের বিকাশ সাধনই ধর্মের কাজ। ধর্মপ্রাণ মানুষই ইহলোকে সুখী হয়, হিংসা- বিদ্বেষ থেকে মুক্ত হয়। ইহলোকে শান্তির জন্যই পরলোকের চিন্তার প্রয়োজন হয়।

এভাবে ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দ আধুনিক যুগের যুক্তিবাদী মানুষের বহু জটিল প্রশ্নের সমাধান করেছেন। সফলও হয়েছিলেন।

এক সময় বৌদ্ধধর্ম ভারতের প্রধান ধর্ম হয়ে উঠেছিল। অহিংসার মন্ত্রে ভারত বিশ্বজয় করেছিল। সম্রাট অশোক হয়েছিলেন - ধর্মাশোক।

কিন্তু আত্মার সঠিক ব্যাখ্যা না থাকায় বৌদ্ধধর্ম বেশীদিন টিকে থাকতে পারলনা। বিদেশী আক্রমনে বিধ্বস্ত ভারতবাসী আবার হিন্দুধর্মে আশ্রয় খুঁজে নিল। কিন্তু হিন্দুধর্ম হল আরো কঠোর, আরো বিকৃত।

শঙ্করাচার্য জগৎকে মায়া বলে ব্যাখ্যা করে ইহলোকে অগ্রগতি স্তব্ধ করে দিলেন। তাঁর গভীর তত্ত্বজ্ঞান সঠিক ভাবে উপলব্ধি করা গেলনা। মায়াবাদই প্রাধান্য পেল। শঙ্করাচার্য শেষ সিদ্ধান্তে জীবকে ব্রহ্মরূপে দেখিয়েছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরবাদীরা তা মানতে পারেননি।

মধ্যযুগে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করার ফলে হিন্দু সমাজে সৃষ্টি হয়েছিল চরম বিশৃঙ্খলা। চৈতন্য দেবের প্রেমধর্ম সামাজিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছিল।

আধুনিক যুগের সূত্রপাতে খ্রীষ্টান ধর্মের প্রভাবে শিক্ষিত মানুষের মধ্যে ধর্মান্তরের প্রবল আকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়েছিল। এবার শিক্ষিত সমাজে দেখা দিল বিশৃঙ্খলা এবং খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহনের প্রবণতা।

এই সময় সামাজিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনলেন শ্রী রামকৃষ্ণ ও শ্রী স্বামী বিবেকানন্দ।

শঙ্করাচার্য জোর দিয়েছিলেন জ্ঞানের উপর চৈতন্যদেব জোর দিয়েছিলেন প্রেম ও ভক্তির উপর, শ্রী রামকৃষ্ণ ও শ্রী বিবেকানন্দ জোর দিয়েছিলেন কর্মের উপর।

স্বামীজী বললেন,— জগতে যে সকল কর্ম আমরা দেখে থাকি, মানব সমাজের সকল গতিবিধি, আমাদের চারধাবে যেসব কর্ম করা হচ্ছে — তা সবই চিন্তার বহিঃপ্রকাশ, ইচ্ছার অভিব্যক্তি। এই ইচ্ছা সৃষ্টি হয় চরিত্রের দ্বারা এবং এই চরিত্র গঠিত হয় কর্মের দ্বারা। যে সব শক্তির সঙ্গে মানুষকে বোঝাপড়া করতে হয় তার জীবনে, চরিত্রের উপর কর্মের প্রভাব তার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী।

হিন্দুদের প্রধান ধর্মশাস্ত্র হল বেদ।কিন্তু বেদ বলতে কোন একটি গ্রন্থকে বোঝায় না। কয়েক শত বছর ধরে অনেক মুনি ঋষি গভীর চিন্তাভাবনা এবং ধ্যানের মাধ্যমে সৃষ্টি তত্ত্বের যে সব রহস্য আবিষ্কার করেছেন তারই সঞ্চিত ভান্ডার হল বেদ।

বেদ শব্দটির অর্থ হল জ্ঞান। এই জ্ঞান ভান্ডার যারা সৃষ্টি করেছিলেন তাদের দৃষ্টিতে মানুষ ছিল অমৃতের সন্তান।

তখন ভারতবর্ষ বলে কোন দেশ ছিলনা এবং হিন্দু বলে কোন ধর্ম ছিলনা। বিশ্ব ব্রাহ্মান্ড এবং মানব সমাজের সৃষ্টি রহস্য আবিষ্কারই ছিল সেকালের ঋষিদের ধ্যানের মূল বিষয়বস্তু।

কাজেই বেদের জ্ঞান ভান্ডার পৃথিবীর সব মানুষেরই সম্পদ। বিবেকানন্দ এই নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন বিশ্ববাসীর সামনে।

প্রাচীনকাল থেকেই বেদের নানা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও ভাষ্য রচনা করেছেন বহু প্রতিভাশালী পন্ডিত। উপনিষদগুলিও রচিত হয়েছে বেদের মূলতত্ত্বের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে। কাজেই উপনিষদগুলিও বেদের অন্তর্গত বলে গণ্য হয়।

বেদের পরিনত ভাষ্যগুলিকেই বলা হয় বেদান্ত। বেদের মূল তত্ত্ব ব্রহ্ম ও জগৎ অর্থাৎ স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে সম্পর্ক কি এই বিষয়ে তিনহাজার বছর ধরে নানা বিতর্ক চলছে। অসংখ্য মীমাংসা গ্রন্থও রচিত হযেছে। কিন্তু এই বিতর্কের এখনো শেষ হয়নি।

দ্বৈতবাদীরা বলেন, ব্রহ্ম ও জগৎ আলাদা, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। এই মায়াময় জগৎ থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হল ঈশ্বর সাধনা। ত্যাগ এবং বৈরাগ্যই হল একমাত্র ধর্ম।

অদ্বৈতবাদীরা বলেন, ব্রহ্ম ও জগৎ এক এবং অভিন্ন। সবসৃষ্টিতেই মূলতঃ স্রষ্টারই ভিন্ন ভিন্ন রূপ। জীবের মধ্যে ঈশ্বর আত্মারূপে অবস্থান করেন। এই আত্মাকে উপলব্ধি করার সাধনাই হল ধর্ম। আত্মাকে যারা উপলব্ধি করেন তারাই দেবত্ব লাভ করেন। তাদের মধ্যে হিংসা-ক্ষোভ থাকেনা। তাঁদের হৃদয় ভরে উঠে প্রেম-ভালবাসা-ভক্তি ও সেবার মাধুর্যে। এই পর্যায়ে উন্নীত হলে জাতিভেদ, বর্ণভেদ, ভাষাভেদ, ধর্মভেদ কিছুই থাকেনা। এরা হয়ে উঠেন মানবধর্মের প্রতীক।

আরেক দলের বিতর্ক হল --- আত্মা এক না একাধিক। এ বিষয়ে শ্রী রামকৃষ্ণের সোজা উত্তর হল- আমি আর তুমিতে কোন পার্থক্য নেই। আমিও যা তুমিও তাই।

শ্রী রামকৃষ্ণের এই সূত্র ধরে বিবেকানন্দ আমি ও তুমির সমন্বয় সাধন করলেন। এ বিষয়ে গীতা হল নির্ভরযোগ্য একটি শাস্ত্রীয় গ্রন্থ। শ্রী কৃষ্ণের মধ্যে বিশ্বদর্শণ করে অর্জুন সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেলেন।

এই তত্ত্বের মাধ্যমে বিবেকানন্দ ভারতীয় ধর্ম চিন্তায় সামাজিক সাম্যের আদর্শ খুঁজে পেলেন। স্রষ্টা এবং সৃষ্টি যেখানে এক, সেখানে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ থাকতে পারেনা। দরিদ্র মানুষের মধ্যেও ঈশ্বর আছেন, অন্ধ, খঞ্জ, অস্পৃশ্য মানুষের মধ্যেও ঈশ্বর আছেন। কাউকে ঘৃণা করা বা হিংসা করা ঈশ্বরকেই ঘৃণা করা ও হিংসা করা।

ঈশ্বর এক এবং ধর্ম পৃথক। পৃথিবীর বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন ধর্মীয় রীতিনীতি প্রচলিত হয়েছে। কিন্তু ঈশ্বরের উপাসনার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য একই আছে। এই বিশ্বজনীন ধারনা পৃথিবীতে সর্বপ্রথম ভারতীয় ঋষিদের চিন্তায় এসেছিল।

পৃথিবীর সবদেশের সব মানুষের মধ্যে একই ঈশ্বরের আত্মা রয়েছে। বেদান্ত শাস্ত্রের এই শিক্ষা গ্রহণ করলে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর হয়ে যাবে। পৃথিবীর যেকোন মানুষকে ঘৃণা করার অর্থ হবে ঈশ্বরকে ঘৃণা করা এবং যে কোন মানুষকে ভালবাসার অর্থ হবে ঈশ্বরকে ভালবাসা, যে কোন আর্ত, অসহায় মানুষকে সেবা করাই হবে ঈশ্বরের সেবা করা।

বিবেকানন্দের এই বিশ্বাস এবং ধর্মচিন্তা আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষকেও উদার হৃদয়ের অধিকারী করে তুলছে। সকলের সামনে স্থাপন করেছে মানব ধর্মের নতুন আদর্শ। বিবেকানন্দেব পরে এই আদর্শকেই উর্ধে তুলে ধরেছেন - বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ।

বিবেকানন্দের ধর্মচিন্তা আধুনিক উদার মানব ধর্মেরই পরিনত রূপ। মানুষকে ভালবাসো, আর্তকে সেবা করা, অসহাযকে সহায্য করা, হিংসা বিদ্বেষ থেকে মুক্ত হওয়া, প্রতিটি মানুষকে ঈশ্বর জ্ঞানে শ্রদ্ধা করা আধুনিক মানব ধর্মের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট।

বিবেকানন্দের সমাজচিন্তা

স্বামী বিবেকানন্দ নিজেই বলেছেন,- তিনি একজন সমাজতন্ত্রী। তবে মার্কসবাদী সমাজতন্ত্রের সঙ্গে স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য আছে।

কার্লমার্কস শ্রেণী সংগ্রামের কথা বলেছেন, বিবেকানন্দ ভারতের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, ভারতেও শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে সামাজিক বিপ্লব ঘটেছে। ব্রাহ্মণ্য শাসনে সাধারণ মানুষ যখন সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিল, এমনকি শিক্ষার অধিকার থেকেও বঞ্চিত করা হয়েছিল, ঠিক তখনই বুদ্ধদেব সমাজ বিপ্লব ঘটয়েছিলেন।

প্রায় এক হাজাব বছর ধবে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে ও শাসনে ভারতেব বিরাট উন্নতি হয়েছিল। কিন্তু দেশময় বৌদ্ধমঠ এবং হাজার হাজার সন্ন্যাসী সৃষ্টি করে সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে দুর্বল করা হযেছিল।

ফলে বিদেশী আক্রমনকাবীরা ভারতের শাসন ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হয়েছিল।

মুসলমান শাসণে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের নিম্ন বর্ণের মানুষেরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সমাজে নতুন শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিল।

ইতিহাসের এই পর্যায়ে ব্রাহ্মণ্য শাসন, ক্ষত্রিয় শাসন, বৌদ্ধ শাসন এবং মুসলিম শাসন ভারতীয় সমাজে নানা বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে।

তারপর ইংরেজ শাসনে সৃষ্টি হল বৈশ্য সমাজের প্রধান্য। বৈশ্যদের সমাজ ও নানা পরিবর্তন নিয়ে আসছে।

কিন্তু হাজার হাজার বছর ধরে শূদ্র শ্রেণী শোষিত এবং অত্যাচারিত হয়েছে। তারা এবার বদলা নেবার জন্য তৈরী হচ্ছে।

ভারতে শূদ্র বিপ্লব সমাজ বিকাশের অনিবার্য পরিনতি। এটা কেউ ঠেকাতে

পারবেনা। শূদ্ররা শূদ্রত্ব নিয়েই শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হবে।

স্বামীজীর এই কথার তাৎপর্য এই যে, শূদ্রদের শোষণ করার ক্ষমতা কোনকালেই ছিল না। তারা শোষক শ্রেণী নয়। তারাই সৃষ্টি করবে শোষণহীন সমাজ। বিবেকানন্দের সময় ভারতবর্ষ ছিল সম্পূর্ণরূপে কৃষি নির্ভর দেশ। কৃষকরা সম্পদ সৃষ্টি করতো অথচ তারাই ছিল সবচেয়ে বেশী দুর্দশাগ্রস্থ।

ইংরেজ শাসনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কৃষকরা জমির মালিকানা হারাল। জমিদার এবং মহাজনের শোষনে কৃষকের জীবন বিপর্যস্ত হল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন চালু হবার পর একশ বছরের মধ্যেই প্রায় দশ কোটি কৃষক জমি হারিয়ে ভিক্ষুকে পরিনত হল।

রামমোহন রায় প্রথম বৃটিশ পার্লামেন্টে ভাবতীয় কৃষকের এই দুর্দশাব চিত্র তুলে ধরে প্রতিকার দাবী করেন।

বিবেকানন্দ সারা ভারত পরিক্রমা করে কৃষকদের অবর্ণনীয় দুর্দশা স্বচক্ষে দেখেছেন। দুঃখে, যন্ত্রনায় সন্ন্যাসীর মনও বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল।

স্বামীজী বিভিন্ন আলোচনায় এবং বক্তব্যে বলেন, কৃষকের হাতে জমির মালিকানা ফিরিয়ে দিতে হবে। প্রাচীন পদ্ধতির পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষের ব্যবস্থা করতে হবে। চাষীর উন্নতি না হলে ভারতের সামগ্রিক উন্নতির কোন সম্ভাবনা নেই।

ঐ সময় ভারতে আধুনিক শ্রমিক শ্রেণীর একেবারে শৈশব অবস্থা ছিল। রেল শিল্প এবং বস্ত্র শিল্পে আধুনিক শ্রমিক শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটেছিল। তাদের চরম দুঃখ, দুর্দশা স্বামীজী ঘুরে ঘুরে প্রত্যক্ষ করেছেন। শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে কথা বলার কেউ ছিল না। কোন সংগঠন তখনো গড়ে উঠেনি।

কৃষকের সমস্যা নিয়ে চিন্তা ভাবনা তখনো একেবারে প্রথমিক পর্যায়ে ছিল। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে খন্ড খন্ড ভাবে কৃষক বিদ্রোহ অনেক হয়েছে। কিন্তু সারা দেশব্যাপী কৃষক বিদ্রোহ ভারতে কখনো ঘটেনি। নেতৃত্ব দেবারও কেউ ছিল না। বিবেকানন্দ ভারত ভ্রমণের পর দেশের চরম দুর্দশার কথা ভেবে একবার রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়ার চিন্তাভাবনা করেছিলেন। কিন্তু ভারতবাসী তখনো স্বাধীনতার মূল্য উপলব্ধি করতে পারে নি। তাই শোষিত, নিরীহ মানুষের

মধ্যে আত্মার জাগরণকে জরুরী কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

নবজাগরণের শেষ মহানায়ক স্বামী বিবেকানন্দ যেভাবে সারা ভারতে মানসিক জাগরণ সৃষ্টি করেছিলেন তা এক অভিনব চিন্তা ও প্রেরণার বিপ্লব ঘটিয়েছিল। শুধু এজন্যই তিনি চিরকাল ভারতবাসীর হৃদয়ে স্মরনীয় হয়ে থাকবেন।

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে মুচি, মেথর ও চামারের ঘরে আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। এজন্য যারা সমালোচনা করেছেন, তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন,- এসব অস্পৃশ্য মানুষেরাই সমাজকে পরিচ্ছন্ন, বিশুদ্ধ ও পবিত্র করে রাখছে। মেথররা যদি একদিন ধর্মঘট করে তবে ভদ্রলোকদের নাভিশ্বাস উঠবে। যদি তিন দিন ধর্মঘট করে, তবে মহামারীতে ভদ্রলোকদের বংশই ধ্বংস হয়ে যাবে।

বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী হয়েছিলেন হিমালয়ের গুহায় সাধনা করে নিজের আত্মার মুক্তির জন্য নয়, বরং চরম ত্যাগের ব্রত গ্রহণ করে মানব সেবায় জীবন উৎসর্গ করার জন্য।

ভারতে প্রতিবছরই কোন না কোন অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। লক্ষ লক্ষ কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষ দুর্ভিক্ষের সময় অনাহারে ও মহামারীতে মারা পড়তো। তাদের সেবার জন্য সরকারী, বেসরকারী কোন সংস্থা ছিল না।

বিবেকানন্দ এই সব আর্ত মানুষের সেবাকেই জীবনের প্রধান ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। দেশের শিক্ষিত সমর্থ যুবকদের এই সেবাব্রত গ্রহনের জন্য আন্তরিকভাবেই অণুপ্রানিত করেছেন। এসব কাজের মাধ্যমে ভারতবাসীর প্রানে জাগিয়ে দিয়েছেন স্বদেশপ্রেম, মানবপ্রেম এবং স্বাধীনতাবোধ।

ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলোতে দেশের মোট জন সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ মানুষ বাস করতো। তাই স্বামীজী দেশীয় রাজাদের অতিথ্য গ্রহণ করে প্রজাদের কল্যাণ মূলক কাজে উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। এর ফলে বহু দেশীয় রাজা প্রজাকল্যাণ মূলক কাজের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। অনেকে স্বামীজীর শিষ্যাত্ব গ্রহণ করেছেন।

স্বামীজী জানতেন রাজারা প্রজাকল্যাণে খুব বেশী আগ্রহী হবে না। তবু

নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল, এই নীতি অনুসরণ করেছিলেন। কারণ দেশীয় রাজ্যে প্রজাদের অবস্থা ছিল খুবই করুণ। তাদের মধ্যে ঐক্য ছিল না, অধিকার বোধ ছিল না। তাই যতটা সম্ভব শিক্ষার বিস্তার ঘটানোই ছিল স্বামীজীর মূল লক্ষ্য।

ভারতীয় নারীর প্রতি স্বামীজী গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। প্রাচীন সমাজে নারী যথেষ্ট মর্যাদা লাভ করেছিল। কিন্তু পুরোহিততন্ত্র নারীর অধিকার এবং মর্যাদা কেড়ে নিয়েছিল।

ভাবতে পতিব্রতা নারীরা অন্ধ ধর্মবিশ্বাসে স্বেচ্ছায় স্বামীর চিতায় জীবন দিয়েছে। কিন্তু লক্ষ লক্ষ নারীকে জোর করে স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মারা হয়েছে। অথচ ইতিহাসে কোথাও নারী বিদ্রোহের কোন ঘটনার উল্লেখ নাই।

স্বামীজী এসব নিয়ে গভীরভাবে ভেবেছেন। তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, ধর্মর প্রতি গভীব বিশ্বাস নাবীকে অসাধাবণ সহিষ্ণুতা দিয়েছে। অন্যদিকে শিক্ষার অভাবে প্রতিবাদের ভাষা ফুটেনি। বিশেষত চরিত্রের দিক দিয়েও নারী দুর্বল এবং কোমল।

স্বামীজী নাবী শিক্ষার বিস্তারের জন্য নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। নারী ও পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার কথাও বলেছেন।

নাবী ও পুরুষেব মধ্যে একই আত্মা বর্তমান। তাই নারী ও পুরুষের মধ্যে ভেদাভেদ ধর্ম বিরুদ্ধ কাজ বলে তিনি প্রচ র করেছেন।

স্বামীজীর মতে ভারতীয় নারীর মূল গৌরব হল মাতৃত্ব এবং লজ্জাবোধ। পাশ্চাত্যে নারী লজ্জা বিসর্জন দিয়েছে, মাতৃত্বের প্রতি ও অবহেলা করছে। ভারতে নারীকে আত্ম চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে। কিন্তু প্রাচ্যের নারী আদর্শ অক্ষুন্ন রেখে পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিজ্ঞানের শিক্ষায় সমৃদ্ধ করে তোলাই হবে মূল লক্ষ্য।

বিবেকানন্দ বলেছেন, মানুষের মুক্তির জন্য সব রকম বন্ধন ঘোচাতে হবে। ধর্ম চর্চায়, পরিবার জীবনে, রাষ্ট্রব্যবস্থায় এবং সমাজ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। জীবনের প্রকৃত সত্য প্রকাশের জন্য আত্ম শক্তি বিকাশের জন্য, সমাজের নব জন্ম প্রয়োজন।

বিবেকানন্দের সমকালে ভারতীয় রাজনীতি ও অর্থনীতিতে জাতীয় নেতৃত্ব

গড়ে উঠেনি। একজন শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক নেতার যে সব গুনাবলী থাকা দরকার বিবেকানন্দের মধ্যে তার সবই ছিল।

ভারতের দরিদ্র ও অবহেলিত মানুষের প্রতি যে আবেগ ও অনুভূতি স্বামীজীর মধ্যে দেখা দিয়েছিল, তাতে মনে হয় তিনি জীবিত থাকলে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নিরপেক্ষ থাকতে পারতেন না। হয়তো তাঁর নেতৃত্বে ভারতের যুব সম্প্রদায় দরিদ্র ও শোষিত জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করে এক অসাধারণ সমাজ বিপ্লবের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতো।

স্বামীজীর অকাল মৃত্যুর পর অরবিন্দ, দেশবন্ধু ও বং সুভাষচন্দ্র স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই নতুন ভারত গড়ার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

স্বামীজীর স্বদেশ প্রেম এবং জাতীয়তাবাদী ভাবধারা স্বাধীনতা সংগ্রামের অধিকাংশ নেতাকেই প্রভাবিত করেছিল।

স্বামীজীর সমাজ চিন্তার মূল ভিত্তি ছিল মানবিকতা। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় থেকে রবীন্দ্রনাথও স্বামীজীর মানবতাবাদী আদর্শকেই সবক্ষেত্রে উর্ধে তুলে ধরেছেন। সন্ন্যাসী হয়েও স্বামীজীর সমাজ চিন্তা দরিদ্রনারায়ণকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। প্রতিটি মানুষের কল্যাণই সমাজ কল্যাণের মূল লক্ষ্য রূপে বিবেচিত হয়েছে। স্বামীজীর সমাজতন্ত্র ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ভিত্তি করেই পরিকল্পিত হয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের সমাজ ও সভ্যতার সমন্বয় চেয়েছেন। মানুষের পক্ষে কল্যান কর যে কোন চিন্তা ভাবনা ও রীতি নীতি যে কোন চিন্তা ভাবনা ও রীতি নীতি যে কোন দেশেই হোক না কেন তা গ্রহন করা উচিত বলে পরামর্শ দিয়েছেনহগ যে কোন সমাজ থেকেই শিক্ষা নেবার প্রয়োজন আছে। যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি। এই নীতিকে স্বামী বিবেকানন্দ খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন।

বিবেকানন্দের শিক্ষা ভাবনা

বিবেকানন্দের শিক্ষাভাবনায় ধর্মও শিক্ষা একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত। তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষের মধ্যে দেবত্বকে বিকশিত করাই হল ধর্মের মূল লক্ষ্য। ঠিক তেমনি শিক্ষারও মূল লক্ষ্য হল মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটানো। মানুষের মনুষ্যত্বই হল দেবত্ব।

মানুষের মধ্যে সুপ্ত ইচ্ছাশক্তিকে জাগিয়ে দেওয়া এবং সমাজ কল্যাণের লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রিত করার পদ্ধতিকেই বলা হয শিক্ষা।

শিক্ষাব দ্বারা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েরই উন্নতি হয়। স্বামীজী বলেছেন, যে বিদ্যার উন্মেষে ইতর জনসাধারণকে জীবন সংগ্রামে সমর্থ করতে পারা যায় না, যাতে মানুষের চরিত্র বল, পরার্থপরতা, সিংহ সাহসিকতা এনে দেয় না, সে কি আবার শিক্ষা?

স্বামীজীর মতে ভারতের অধ:পতনের মূল কারণ হল, মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে শিক্ষা ও বিদ্যাবুদ্ধির চর্চা সীমাবদ্ধ হয়ে যাওয়া। তাই মুক্তির একমাত্র উপায় হল- জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে শিক্ষা ও বিদ্যাচর্চার প্রসার ঘটানো।

আমাদের প্রধান প্রয়োজন হল চরিত্র গঠন এবং বিভিন্নভাব ও ভাবনার মধ্যে সমন্বয় সাধন। দেহ, মন এবং আত্মার পূর্ণাঙ্গ বিকাশই হবে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য। ভারতে অসংখ্য নিরন্ন মানুষের জন্য অন্নের সংস্থান করা এবং মুর্খ ভারতবাসীকে মানুষের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করাও আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হতে হবে।

বিবেকানন্দের শিক্ষা ভারনায় আরেকটি মৌলিক দিক হল, তিনি বিশ্বাস করতেন, বেদান্তের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষের অন্তরে জ্ঞান সুপ্ত অবস্থায় থাকে। তাকে জাগ্রত করাই হল শিক্ষার প্রধান কাজ। তিনি মনে করতেন, কেউ কাউকে কিছু শিক্ষা দিতে পারে না, বিবেক বুদ্ধিকে জাগ্রত করতে পারে। অর্থাৎ

শিক্ষা হল একটি মানসিক জাগরণ।

বিবেকানন্দ উপলব্ধি করেছিলেন যে, জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে উপেক্ষা করে কোন শিক্ষানীতি ও পদ্ধতি গড়ে উঠতে পারে না। যাদের জন্য শিক্ষা তাদের পক্ষে গ্রহনযোগ্য হতে হবে শিক্ষার পদ্ধতি ও বিষয়বস্তু।

তিনি আরো বিশ্বাস করতেন, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর ঘনিষ্ট সম্পর্ক না থাকলে চরিত্র গঠনের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় গুণাবলীর বিকাশ ঘটে না। প্রাচীন ভারতে আশ্রম স্কুল ছিল শিক্ষার শ্রেষ্ঠ আদর্শ। তিনি আরো মনে করতেন, ধর্মীয় শিক্ষার ফলে শিক্ষার্থীর মধ্যে ত্যাগ ও সেবার প্রেরণা জাগ্রত হয় এবং হৃদয় ভয় শূন্য হয়।

বর্তমান ভারতে প্রচ্যের দর্শন এবং পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও অর্থনীতির সমন্বয় সাধন করে শিক্ষার প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। এই আদর্শ রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র এবং বিবেকানন্দ প্রচার করে গেছেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথও এই আদর্শ প্রচার করেছেন।

স্বামীজী বলেছেন, আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় বিজ্ঞানকে ধর্মেরও উর্ধে স্থান দিতে হবে। কারণ উদর পূর্তি হলেই ধর্ম চিন্তা কার্যকর হবে। তিনি ইউরোপে বিভিন্ন বক্তৃতায় মিশনারীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, ক্ষুধার্ত মানুষকে ধর্ম দান করা অপমান করার সমান। লক্ষ লক্ষ নিরন্ন মানুষকে ধর্মান্তর কারার চেয়ে অন্নের সংস্থান করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়াই বরং ধার্মিক মানুষের কাজ।

প্রাচীন ভারতে শিক্ষার্থীকে ব্রহ্মচর্যের শিক্ষা দেওয়া হত। তার অর্থ হল সব বিষয়ে সংযম, পবিত্রতা এবং চিন্তায়, কথায় ও কাজে সমন্বয় সাধনের অভ্যেস গড়ে তোলা। স্বামীজীর মতে ব্রহ্মচর্য শিক্ষা সর্ব যুগেই প্রযোজ্য। এর ফলে নৈতিক বলিষ্ঠতা সৃষ্টি হয় এবং এর অভাবে মানবিক মূল্য বোধ নষ্ট হয়।

শিক্ষার বিষয়বস্তু হিসেবে - ধর্ম, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল দর্শন ও প্রযুক্তি বিদ্যার উপর জোর দিয়েছেন স্বামীজী। ভারতকে আত্মনির্ভরশীল করতে হলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার দ্রুত বিস্তার ঘটাবার পরামর্শ তিনি দিয়েছেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার সার্থক চর্চার জন্য স্বামীজী ইংরেজী শিক্ষার উপর জোর দিয়েছেন।

বিবেকানন্দ বাল্যকাল থেকেই ইংরেজী মাধ্যমে পড়াশোনা করেছেন। ইতিহাস ও দর্শনশাস্ত্র গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন। পিতা বিশ্বনাথ দত্তের ইচ্ছা ছিল 'আদরের ছেলেকে একজন সেরা ব্যারিষ্টার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবেন। তাই নরেন্দ্রনাথকে 'ল' কলেজে ভর্তি করে দেন এবং একজন বড় ব্যারিষ্টার বন্ধুর অধীনে এটর্নীর কাজে নিযুক্ত করেন। 'ল' ফ্যাইনাল পরীক্ষার অল্প কিছুদিন আগেই হঠাৎ পিতা বিশ্বনাথ দত্ত মারা যান। কিছুকাল পর আবার যখন ফাইনাল পরীক্ষার জন্য তৈরী হলেন তখনই শ্রী রামকৃষ্ণ দেহত্যাগ করেন। গুরুর শেষ উপদেশ ও ইচ্ছা পূরণের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে নরেন্দ্রনাথ হলেন বিবেকানন্দ।

দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, ভারত পরিক্রমার মাধ্যমে প্রকৃত ভারতবাসীর সঙ্গে ঘনিষ্ট পরিচয় এবং বিদেশ ভ্রমনের মাধ্যমে ইউরোপ ও আমেরিকার আধুনিক শিক্ষা ও সমাজের সঙ্গে পরিচয়, বিবেকানন্দকে সেকালে ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ হিসেবেই চিহ্নিত করেছিল।

স্বামীজীর বাণী শিক্ষিত সমাজকে আলোড়িত করেছিল। স্বামীজীর শিক্ষা পরিকল্পনায় হাজার হাজার শিক্ষিত যুবক যোগ দিয়েছিল।

ভারতের সাধারণ মানুষ এতই গরীব যে ৬/৭ বছরের একটি শিশুকে বিদ্যালয়ে পাঠানোর চেয়ে মাঠের কোন কাজে লাগানো লাভজনক মনে করে।

এরূপ অবস্থায় স্বামীজীর শিক্ষা পরিকল্পনা কার্যকর করা সম্ভব কিনা এ বিষয়ে প্রশ্ন উঠেছে। স্বাধীনতার পরে ৫৮ বছর অতিক্রান্ত হবার পরও দরিদ্র পরিবারের সব শিশুদের শিক্ষার অঙ্গনে টেনে আনা যাচ্ছে না।

এই সমস্যার কথা স্বামীজীরও জানা ছিল। তাই তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন,- পর্বত যদি তোমার কাছে না আসে তবে তুমি পর্বতে যাও। দরিদ্রের ঘরে অথবা কৃষকের মাঠে গিয়ে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কথা বল। দেখা যাবে বার বার শুনতে শুনতেই শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বেড়ে যাবে। একবার জেগে উঠলে আর ভয় নেই।

আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের মূল লক্ষ্য ছিল, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যায় সুশিক্ষিত একদল শিক্ষক গোষ্ঠী গড়ে তোলা, যাতে পরবর্তী কালে একটা

শিক্ষা পরিকাঠামো গড়ে উঠতে পারে।

শূদ্র বিপ্লবদের পরে শিক্ষার প্রসার ঘটলেও শিক্ষার মান নিম্নগামী হবে, স্বামীজী এরূপ আশংকা প্রকাশ করেছিলেন।

জনশিক্ষা সবদেশেই একটা দীর্ঘস্থায়ী পদ্ধতি। জনগণের মানসিক প্রস্তুতি, আর্থিক উন্নতি এবং উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে উঠতে দীর্ঘ সময় কেটে যায়।

স্বামীজীর বিশ্বাস ছিল জনশিক্ষার আন্দোলন একবার শুরু করলেই তা আপন গতিতে অগ্রসর হবে। কিন্তু ভারতে জনসমাজে এরূপ আশা সঠিক বলে প্রমানিত হয়নি।

এদেশের ইতিহাস আলোচনা করলেই দেখা যায়, একেক যুগে একটা ভাবের আবেগ সৃষ্টি হয়, প্রচন্ড জোয়ারও আসে। কিন্তু তার গতি ক্রমশ শিথিল হয়ে পড়ে।

বিবেকানন্দ আমেরিকায় ও ইউরোপে শত শত বক্তৃতা দিয়েছেন। সবই ইংরেজী ভাষায়। বাংলা ভাষায় গ্রন্থ বা প্রবন্ধ রচনার সময় তিনি পাননি। অকাল মৃত্যু না হলে তিনি বাঙ্গালী সমাজকে অতি মূল্যবাণ সাহিত্য ভান্ডার দিয়ে যেতে পারতেন।

বাংলা গদ্য সম্পর্কে আলোচনায় তিনি মাতৃভাষার প্রতি গভীর মমতা বোধের পরিচয় দিয়েছেন। বাংলা গদ্য রচনার ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব সংস্কৃত শব্দ বাদ দেবার পক্ষপাতি ছিলেন স্বামীজী।

ইতিহাসের শিক্ষা থেকে তিনি দেখিয়েছেন যে, প্রাচীন ভারতে সর্বত্র যখন সংস্কৃত ভাষা ছিল পন্ডিতদের ভাষা, তখনই বুদ্ধদেব প্রাকৃত জনের ভাষাকে করেছিলেন উপদেশের ভাষা। নতুন ভাষার নাম দিয়েছিলেন পালি ভাষা। ফলে সাধারণ মানুষ বুদ্ধদেবের বাণী ও উপদেশ খুব সহজেই বোঝতে পারতো।

ভাষা যত সহজ হয় ততই ভাল। ভাষাকে দুর্বোধ্য করে তোলার একমাত্র লক্ষ্য ছিল মুষ্টিমেয় পন্ডিতদের মধ্যে জ্ঞানের ভান্ডার সীমাবদ্ধ করে রাখা।

কলকাতা তখন ভারতের রাজধানী ছিল। যারা কলকাতায় আসতো তারাই কলকাতার ভাষা অনায়াসে আয়ও করতে পারতো। তাই স্বামীজী কলকাতার ভাষাকেই বাংলা সাহিত্যের ভাষা করার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন। গ্রাম্য ভাষাকে

সাহিত্যে গুরুত্ব দেবার বিরোধী ছিলেন তিনি।

শিক্ষা ভাবনায় এবং সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ অতি উদার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গী সমস্ত বাঙালী জাতিকেই বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। আসল কথা হল মানুষ গড়া এবং গণজাগরণ সৃষ্টি করা। বিবেকানন্দের বাণী চিরকাল মানুষকে মানুষ হয়ে উঠার শিক্ষা দেবে।

বিবেকানন্দ শিক্ষা মানুষের নবমূল্যায়নের শিক্ষা। এই শিক্ষা সমাজে সাম্যবাদী চিন্তার সূত্রপাত ঘটিয়েছে। মানুষের মধ্যে যে বাহ্যিক পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে তা শি৭ার দ্বারা সহজেই দূর করা যায়। বুদ্ধি এবং কর্মশক্তি সব মানুষের মধ্যেই রয়েছে। শিক্ষার দ্বারা তা বিকশিত করা যায়।

শিক্ষার মূল লক্ষ্য হবে চরিত্র গঠন এবং মনুষ্যত্ব অর্জন। দেশের কল্যানের জন্য প্রয়োজন বীর্যবান, তেজস্বী, বিশ্বাসী, চরিত্রবান এবং দায়িত্ব জ্ঞান সম্পন্ন যুবশক্তি। শিক্ষার দ্বারাই তা সম্ভব।

শিক্ষাই মুছে দেবে জাতিভেদের কলংক, জাগিয়ে দেবে সামাজিক অন্যায় ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার শক্তি। সৃষ্টি করবে আত্ম বিশ্বাস এবং আত্ম মর্যাদা বোধ।

ভারত প্রেমিক বিবেকানন্দ

ভারতবর্ষ ও বিবেকানন্দকে আলাদা করা যায় না। ভারতবর্ষ ছিল বিবেকানন্দের ধ্যান-জ্ঞান ও প্রাণের কেন্দ্রবিন্দু। ভারতের অতীত গৌরবকে বিশ্বের সামনে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল বিবেকানন্দের স্বপ্ন।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে শিকাগো শহরে বিশ্বধর্মমহাসভায় ভারতের অতীত গৌরব ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার গৌরব অর্জন করার পরই বিশ্ববাসী এবং ভাবতবাসী বিবেকানন্দের বিশাল প্রতিভার সঙ্গে পরিচিত হয়েছে।

এরপর বিবেকানন্দ বেঁচেছিলেন মাত্র ৯ বছর। তার মধ্যে দুইবার বিদেশ ভ্রমণে চারবছর এবং ভারতে কর্মযজ্ঞে মাত্র পাঁচবছর সময় তিনি পেয়েছিলেন।

এই পাঁচ বছর সময়ের মধ্যেই নবভারত গড়ার ভিত্তি তিনি স্থাপন করেছিলেন। স্বামীজীর প্রতিটি বাণী শিক্ষিত যুবকদের মনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল।

স্বামীজীর লক্ষ্য ছিল ভারতের স্বাধীনতা। একথা বুঝতে শিক্ষিত যুবকদের কষ্ট হয়নি। স্বাধীনতা ছাড়া দরিদ্র জনগণের মুক্তির কোন উপায়ে নেই একথা স্বামীজী গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। বিভিন্ন লেখায় ও বক্তৃতায় এই উপলব্ধি নানাভাবে প্রকাশ করেছেন।

কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা লাভের পথ কি হবে এ বিষয়ে উপদেশ দেওয়া বা ভাবনা চিন্তা করার সময় তিনি পান নি।

স্বামীজীর অকাল মৃত্যুর পরে স্বামীজীর বাণী ও আদর্শকে রূপায়িত করার জন্য একদল যুবক সশস্ত্র বিপ্লবের পথকে বেছে নিয়েছিল। আরেক দল যুবক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথকেই বেছে নিয়েছিল।

১৯০২ সালে স্বামীজী দেহত্যাগ করেন। এ বছরই সশস্ত্র বিপ্লবী দল গঠিত

হয়। শ্রীঅরবিন্দ এবং নিবেদিতা ছিলেন এই বিপ্লবী দলের সদস্য। বিবেকানন্দ ছাত্র জীবনে বিপ্লবী আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু ভারতের সমাজ ও জনগণের চেতনার স্তর বিশ্লেষণ করে গণজাগরণকেই অগ্রাধিকার দেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতে ধর্মকে বাদ দিয়ে কোন রকম পরিবর্তন আনা অসম্ভব ছিল। রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ পর্যন্ত একশ বছরের নবজাগরনের আন্দোলনে মুসলিম সমাজে কোন রকম আলোড়ন দেখা দেয় নি। ধর্মান্তরিত দেশীয় খৃষ্টান সমাজেও ভারতীযত্ব বোধ দেখা যায় নি। শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ বিকশিত হওয়ায় তা অনেকটা হিন্দু ভাবাপন্ন হয়েছিল।

কিন্তু বিবেকানন্দ অহিন্দুদের বাদ দিয়ে জাতীয়তা গঠন করতে চান নি। তিনি বলেছেন, - আমরা মানব সমাজকে এমন এক স্তরে নিয়ে যেতে চাই, যেখানে বেদ নাই, কোরান নাই, বাইবেল্ল নাই। মানুষকে এই শিক্ষা দিতে হবে যে, ধর্ম সমূহ হল একই ধর্মের বিভিন্ন প্রকাশ, যা থেকে প্রত্যেকে নিজ নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী ধর্মাচরণ করতে পারে। স্বামীজীর এই দৃষ্টিভঙ্গী একটি সুস্থ ও উদার ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের নিদর্শন।

স্বামীজী ছিলেন সেকালের শ্রেষ্ঠ ভারত প্রেমিক, তাঁর অন্তরে কোন দ্বিধা বা ছলনা ছিল না। তিনি যুবকদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, হে বীর সাহস অবলম্বন কর,'তুমি ভারতবাসী, এজন্য গর্ব অনুভব কর, দৃপ্ত কণ্ঠে বলো, আমি ভারতবাসী, প্রত্যেক ভারতবাসী আমার ভাই। বলো ভাই ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।

বিবেকানন্দ সমগ্র ভারত ভ্রমন করে উপলব্ধি করেছিলেন যে, জনসেবার মাধ্যমে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত ভারতবাসী ঐক্য বদ্ধ হতে পারে। ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার। রাষ্ট্র গঠনে ধর্মের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না, রাষ্ট্রও ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করতে পারে না। ধর্ম মানুষের মধ্যে নীতিবোধ গড়ে তোলে, চরিত্র গঠন করে। তাই বিশুদ্ধ ধর্ম চর্চার স্বাধীনতা সব সমাজেই প্রয়োজন। বিশুদ্ধ ধর্মচর্চার অভাবে হিন্দু সমাজ অর্ধমৃত এবং নিক্রিয় হয়ে পড়েছিল। তাই হিন্দুদের মধ্যে নবজাগরণের আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল।

ভারতীয় সংস্কৃতির মূল ভিত্তি হল ত্যাগ এবং সোবর আদর্শ। ধর্মচর্চা,

সমাজ সংস্কার, শিক্ষা বিস্তার ইত্যাদি সর্ব ক্ষেত্রেই ভারতে ত্যাগ ও সেবার আদর্শ শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করেছে। রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রেও এই আদর্শ সমান গুরুত্বপূর্ণ। এজন্যই স্বামীজী শূদ্র বিপ্লবের সম্ভাবনাকে আহ্বান জানিয়েছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ সব রকম জাতিভেদের বিরুদ্ধে ছিলেন, সেটা গুণগতই হোক বা জন্মগতই হোক। তিনি বিশ্বাস করতেন, ভারতের অধঃপতনের অন্যতম প্রধান কারণ হল জাতিভেদ প্রথা। এই প্রথার কারনেই ভারতে সর্ব প্রকার কায়িক পরিশ্রমকে নিম্ন বর্ণের কাজ বলে গণ্য করা হয়েছে।

স্বামীজী লক্ষ্য করছেন যে, ভারতে উচ্চ বর্ণের লোকেরা সব রকম পরিবর্তনের বিরোধী। তাই তিনি মধ্যবিত্ত শ্রেনীর শিক্ষিত যুবকদের উপর নব ভারত গড়ার দায়িত্বভার তুলে দিতে চেয়েছিলনে। তিনি যুবকদের উদ্দেশ্যে বলেছেন,—

"তোমরা আমার কাজের সহায় হও। গ্রাম থেকে গ্রামে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত গিয়ে ব্রাহ্মণ থেকে চন্ডাল পর্যন্ত সকলের নিকট নির্ভয়তার বারতা প্রচার কর। তাদের প্রত্যেককে বল যে, অনন্তশক্তি তাদের মধ্যে আছে, তারা অমৃতের সন্তান। এই প্রকারে তাদের মধ্যে বজ্রশক্তি জাগাও, তাদের জীবন সংগ্রামের উপযুক্ত করে তোল এবং তারপর তার মুক্তির কথা বল।"

স্বামীজী স্বাধীনতা সম্পর্কেও স্পষ্ট কথা বলেছেন— "স্বাধীনতা ব্যাতীত কোন উন্নতি, বৃদ্ধি, বিকাশ ও সম্প্রসারণ হয় না। স্বাধীনতাই উন্নতির প্রথম ও প্রধান প্রয়োজনীয় শর্ত। মানুষের যেমন চিন্তা করবাব ও বলবার স্বাধীনতা থাকবে, তেমনি খাদ্য, পোষাক এবং বিবাহাদি অন্যান্য বিষয়েও তার স্বাধীনতা থাকা চাই।"

তিনি আরো বলেছেন— "ধনীদের উপর কোন আশা রেখোনা, তারা জীবন্ত অপেক্ষা অধিকতর মৃত। তোমরা যারা-নম্র, ভদ্র, স্থির বুদ্ধি, হীন , পতিত ও অনুন্নত এবং বিশ্বস্ত তারাই একমাত্র ভরসাস্থল।"

ইউরোপে ভারতবর্ষ সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে গিয়ে স্বামীজী এক সময় বলেন যে, ভারতবর্ষ আমার প্রাণ জুড়ে রয়েছে। পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাগুলো একে

একে হারিয়ে গেছে। কিন্তু ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতা আজো ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলছে। পৃথিবীর কত জাতির কত ভাব, কত রীতিনীতি ভারতবর্ষ আত্মস্থ করে নিয়েছে। বিভিন্ন মতের ও ভাবের সমন্বয়ের আদর্শ হল ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ সম্পর্কে যখন কিছু বলতে শুরু করি, তখন কোথায় শেষ করতে হবে তা ভেবে স্থির করতে পারি না।

ইউরোপের গণতন্ত্র সম্পর্কে বলতে গিয়ে স্বামীজী বলেন, পশ্চিমের পার্লামেন্ট, সিনেট, ভোট, ব্যালট ও মেজরিটির রাজনীতি দেখলুম, কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক শক্তিমান পুরুষ তাদের ইচ্ছে মত সমাজকে পরিচালনা করছে আর জনসাধারণ ভেড়ার দলের মত তাদের অনুসরণ করছে মাত্র। রাজনীতির নামে চোরের দল দেশের লোকের রক্ত চুষে খাচ্ছে।

জাতীয়তা বোধের লক্ষ্য হল দেশের সার্বিক জাগরণ। বিবেকানন্দ ঘোষণা করেছিলেন,-- **আমি সেই ভারতবর্ষকেই আবার দেখিতে চাই, যে ভারতবর্ষ প্রাচীন যুগের যা কিছু শ্রেষ্ঠভাব, তাহার সহিত বর্তনাম যুগের শ্রেষ্ঠ ভাবগুলি স্বাভাবিক মিলন ঘটাইয়াছে।**

ভারতের এক চরম অন্ধকার দিনে নির্মম দারিদ্র্য,অজ্ঞতা, দুর্নীতি, স্বার্থ পরতা, নৈতিক অধ:পতন এবং রাজনৈতিক অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে ভারতে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদী সভ্যতার প্রভাবে মৃতপ্রায় কুসংস্কারাচ্ছন্ন মধ্য যুগীয় ভারতীয় সমাজ চিন্তায় সৃষ্টি হল এক নতুন আলোড়ন। সমাজ, সাহিত্য, ধর্ম অর্থনীতি, রাজনৈতিক চেতনায় এক নবযুগের সত্রপাত হল ভারতবর্ষে।

এই নবজাগরণের প্রথম সূত্রপাত ঘটালেন রামমোহন রায়। একশ বছর ধরে নানা বাধা ও সংঘাত অতিক্রম করে এই নবজাগরণের ধারা পরিনতি লাভ করেছিল বিবেকানন্দের মধ্যে। তিনিই ছিলেন শতাব্দীব্যাপী নব জাগরণের শেষ প্রতিনিধি। ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে বিবেকানন্দ ছাত্র জীবনেই জাতীয়তাবাদী স্বদেশ প্রেমিক হয়ে উঠেছিলেন। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ভারতের জাতীয়তাবাদী আদর্শকে যুগের উপযোগী ধারায় প্রবাহিত করতে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

দেশের আর কোন নেতাই এত অল্প সময়ের মধ্যে সারা দেশের যুব সমাজকে এতটা উদ্দীপিত করতে পারেন নি। পরবর্তী সময়ে সুভাষ চন্দ্র এই ধারাকে বহন করে নিয়েই সমগ্র জাতিকে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন।

বিবেকানন্দের বাণী শুধু স্বাধীনতা সংগ্রামের মন্ত্রই নয়। এই বানী নতুন ভারত এবং নতুন মানুষ গড়ারও মন্ত্র। এজন্যই স্বামীজীর বহু বাণী চিরকালের সম্পদ হয়ে উঠেছে। যেমন—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর;
জীবে প্রেম করে যেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

এই বাণী ভারতের ধর্ম চিন্তাকে সম্পূর্ণরূপে যুগের উপযোগী করে তুলেছে। ধর্মান্ধতার বেড়াজাল ছিন্ন করে দিয়েছে।

সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ভারতবাসীকে ডাক দিয়ে বললেন,--- "আগামী ৫০ বছর আমাদের গরীয়সী ভারতমাতা আমাদের আরাধ্য দেবতা হউন। অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন। তোমার স্বজাতি দেবতারাই এখন জাগ্রত দেবতা।"

আশ্চর্যের ব্যাপার হল, স্বামীজীর এই বাণী প্রচারের ৫০ বছরের মধ্যেই ভারত স্বাধীনতা লাভ করল। অবশ্য স্বামীজীর স্বপ্ন ছিল অখন্ড ভারত। স্বাধীনতা এল ভারতকে বিভক্ত করে। স্বামীজী বা নেতাজী জীবিত থাকলে এই সময় ভারতবর্ষে একটা বিদ্রোহ দেখা দিত। কারণ তাঁরা বিভক্ত ভারতকে মেনে নিতে পারতেন না।

ভারতে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যে মানসিক উদ্দীপনা ও জাতীয় চেতনা বিকাশের প্রয়োজন সেই কঠিন কাজটাই করে ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাই তিনি চিরকালই শ্রেষ্ঠ ভারত প্রেমিক রূপে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকবেন।

ভগিনী নিবেদিতা ও বিবেকানন্দ

লন্ডনের এক চার্চে পর পর তিন দিন স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা শুনে মিস মার্গারেটা নোবেল নামে এক বিদূষী শিক্ষিকা ভারতীয় দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হন। স্বামীজীর সঙ্গে মিলিত হয়ে নানা প্রসঙ্গে আলোচনাব পব ভারতবাসীর সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

ভাবতের আদর্শ-ত্যাগ এবং সেবা। তার সঙ্গে স্বামীজী যুক্ত করেছেন, সেবাব লক্ষ্য হচ্ছে মানুষেব মধ্যে দেবত্বকে জাগ্রত করা। এই মহান ব্রত গ্রহণ করে মিস মার্গারেটা এলিজাবেথ নোবেল স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মানুষের সেবায় নিবেদিত প্রাণ বলে স্বামীজী নতুন নাম দেন ভগিনী নিবেদিতা।

নিবেদিতা ভারতীয় ধর্ম, দর্শন ও সমাজ সম্পর্কে গভীর অধ্যয়ন করে স্বামীজীর সঙ্গে ভাবতে এবং ইউরোপে ভ্রমণ করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞান ও বিচার বুদ্ধির সমন্বয় সাধনে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন,— "নিবেদিতা তাঁর প্রতিটি কার্য, জীবনের প্রত্যেক আবেগের অন্তবর্তী করে নিয়েছিলেন, ভারতের আশা ও আদর্শকে। মনে হতো যেন প্রাচীন কালের কোন ঋষির আত্মা এর দেহে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেছে, যার ফলে পাশ্চাত্য জীবনী শক্তিতে বলীয়ান হয়ে ইনি পুরাতন ভালবাসার চেনা জায়গাটিতে ফিরে এসে এখানকার জনগণের সেবা করতে পারেন।"

বিবেকানন্দের কাছে কেউ বিদেশী বা বিজাতি বলে গণ্য নয়। তিনি ছিলেন মানবতা ও সত্যের পুজারী। পৃথিবীর সব মানুষের সব ধর্মের, সব সভ্যতার অতীত ও বর্তমানের মিলনের সেতু স্বামীজীর এই আদর্শ।

ভারতে নারী শিক্ষার দায়িত্ব নিতে স্বামীজী নিবেদিতাকে আহ্বান

জানিয়েছিলেন। স্বামীজীর জীবনকালেই নিবেদিতা এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ভারতে শিক্ষার রূপ কেমন হওয়া উচিত এ বিষয়ে অতি মূল্যবান অবদান রেখেছেন ভগিনী নিবেদিতা।

স্বামীজীর অকাল মৃত্যুর পর ভারতীয় জনজাগরণের প্রয়োজন অনুযায়ী নিবেদিতা বিভিন্ন কাজে জড়িয়ে পরেন। অসংখ্য সভায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে হয়েছে ভগিনী নিবেদিতাকে। অসংখ্য প্রবন্ধ লিখে জনগণকে বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন ও সতর্ক করতে হয়েছে। এসব লেখা পড়লেই বোঝা যায় ভগিনী নিবেদিতা মনে প্রাণে একজন ভারতীয় হয়ে উঠেছিলেন। ভারতের উন্নতিই হয়ে উঠেছিল তাঁর ধ্যান জ্ঞান ও অন্তরের প্রেরণা। নিবেদিতা হয়ে উঠেছিলেন নেতাদের নেতা।

অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক লিখেছেন, ভারত সম্পর্কে তিনি একাধিক বই লিখেছেন, যেগুলো উচ্চ আদর্শ ও চিন্তার রত্নমাণিক্যে পূর্ণ। সেগুলি তাঁকে অমর করে রাখবে।

নিবেদিতা ভারতীয় তরুণদের দর্শনচর্চা অপেক্ষা বিজ্ঞানচর্চায় বেশী মনোযোগী হতে পরামর্শ দিতেন। তিনি বলতেন — আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং ঐতিহাসিক গবেষণায় মন প্রাণ অর্পণ করে অগ্রসর হও। স্বামীজীও বলতেন আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে বেদান্তের কোন বিরোধ নেই। যুগপোযোগী শিক্ষা না হলে উন্নতি সম্ভব নয়।

ভারতীয় নারীর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে নিবেদিতার একটি প্রবন্ধ সেকালে ভারতে ও বিদেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল এই প্রবন্ধে।

ভগিনী নিবেদিতা ভারতে যেমন বিভিন্ন বিষয়ে প্রেরণার উৎসস্থল হয়ে উঠেছিলেন, তেমনি বিদেশেও তিনি ভারত বিষয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যাদাতা বলে গণ্য হয়ে হয়েছিলেন। নিবেদিতার -'ওয়েব অফ ইন্ডিয়ান লাইফ- গ্রন্থখানি ভারত সম্পর্কে পাশ্চাত্য পন্ডিতদের ধারণা একেবারে বদলে দিয়েছিল।

কলকাতার বাগবাজারে একটি বাড়ীতে নিবেদিতা থাকতেন। সমাজের নানা স্তরের লোকের ভীড় জমে থাকতো এই বাড়ীতে। ছাত্র-যুবক, সাংবাদিক

,বুদ্ধিজীবী, জননেতা-ধর্মনেতা, সন্ন্যাসী- পরিব্রাজক সকলের সঙ্গেই নানা বিষয়ে আলোচনা ও মতামত বিনিময় করে তিনি ব্যস্ততার মধ্যেই সময় কাটাতে ভালবাসতেন। দর্শন, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজনীতি সব বিষয়েই গভীর জ্ঞান ছিল ভগিনী নিবেদিতার।

নিবেদিতা লেখক ও গবেষকদের বিশেষ ভাবে সাহায্য করতেন। নতুন লেখকদের অনুপ্রাণিত করতেন।

শ্রী রামকৃষ্ণের মতই ভগিনী নিবেদিতা বলতেন,— প্রতিটি সত্যকে যাচাই করবে, প্রতিটি ভাবকে পরীক্ষা করে নেবে। তাঁর উপদেশ ছিল, ব্যক্তিগত, সমাজগত বা মতবাদগত বিতর্কে জড়িয়ে পড়লে সত্য সন্ধান বাধা প্রাপ্ত হবে।

বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুর সঙ্গে বিবেকানন্দের খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। বিভিন্ন বিষয়ে দুজনের মধ্যে আলোচনা ও মত বিনিময় হতো। স্বামীজী একদিন শুনলেন যে, জগদীশ চন্দ্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছেন। স্বামীজী নিজে গিয়ে জগদীশ চন্দ্রকে পরামর্শ দিলেন, তিনি যেন শুধু বিজ্ঞান নিয়েই গবেষণা করেন। রাজনীতি করার জন্য অনেকেই আছে কিন্তু সারা বিশ্বে গ্রহণযোগ্য বিজ্ঞানী হবার মত প্রতিভা বেশী নেই।

ভগিনী নিবেদিতা স্বামীজীর এই দৃষ্টি ভঙ্গীর দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিঁনি বলতেন, ভবিষ্যতকে জয় করা আমাদের লক্ষ্য। অতীতের পুর্বপুরুষরা সবজান্তাছিলেন এমন ধারণা ভুল। সত্য সবদেশেই সমান। সত্যকে আবিষ্কার করাই আমাদের মূল সাধনা। যার যার শক্তি অনুযায়ী এই সাধনা চালিয়ে যেতে হবে।

সমাজ বিজ্ঞানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ইতিহাস ও অর্থনীতি। দেশের প্রকৃত ইতিহাস আবিষ্কার করতে হলে সমাজ বিজ্ঞানের চর্চা করতে হবে। ইউরোপের বিশেষজ্ঞের লেখাকে অভ্রান্ত বলে মেনে নেওয়া ঠিক হবেনা। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

নিবেদিতা বলেছেন,— কেউ রাজনীতিতে বিশেষজ্ঞ হতে চাইলে তাকে অবশ্যই ইতিহাস পড়তে হবে। ভারতবর্ষ নতুনযুগে প্রবেশ করছে। এই সময় প্রয়োজন পারস্পরিক সাহায্য, সহযোগিতা এবং প্রয়োজনীয় সংগঠন। শুধু

ভারতের ইতিহাস পড়লেই চলবেনা। জানতে হবে সব মানুষের, সব সভ্য জাতির ইতিহাস।

নিবেদিতা ভারত ভ্রমনের সময় লক্ষ্য করেছিলেন, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষত দক্ষিণ ভারতের বহু গ্রামে ও শহরে বিবেকানন্দ সোসাইটি গড়ে উঠেছে, প্রধানতঃ ছাত্রদের উদ্যোগে। তিনি তাদেরকে পরামর্শ দেন, সোসাইটি স্থাপন করে শুধু বই পড়লে চলবেনা, কাজ করতে হবে। স্বামীজী কর্মের পথে ঝাপিয়ে পড়তে তরুন দলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন।

স্বামীজীর অকাল মৃত্যুর পর নিবেদিতা বেঁচেছিলেন মাত্র দশ বছর। এই সময়ের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে ছাত্র সমাজের মানসিকতায়, চরিত্রে ও আচরণে বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন।

বিদেশী বিশেষজ্ঞদের লেখা থেকে জানা যায় ভগিনী নিবেদিতা প্রকাশ্যে রাজনীতি না করলেও সেকালের রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল এবং নেতাদের উপর প্রচন্ড প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ১৯০৫ থেকে ১৯১০ সালের স্বদেশী আন্দোলনে নিবেদিতার ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ছোটবড় প্রতিটি ঘটনায় তিনি যুক্ত ছিলেন এবং উদ্দীপনা ও উৎসাহ যুগিয়েছিলেন।

কংগ্রেস নেতা গোপাল কৃষ্ণ গোখলে বলেছেন,- "পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ যারা, ভগিনী নিবেদিতা তাদেরই একজন। কংগ্রেস সভাপতি রাসবিহারী ঘোষ বলেছেন,- নিবেদিতার কুহকময় ব্যক্তিত্ব আমাদের সহস্র সহস্র তরুনকে তাঁর দিকে আকৃষ্ট করেছিল। যদি আমাদের তরুনেরা নতুনতর, উচ্চতর, মহত্তর জীবনের জন্য অগ্নিময় বাসনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকে, তার মূলে এই নারীর কৃতিত্ব কম নয়।"

ভারতের নবজাগরণে ভগিনী নিবেদিতা স্থপতির ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ১৯০২ সালে ২৪শে মার্চ বিপ্লবী অনুশীলন সমিতির পাঁচজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্যের মধ্যে ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন একজন। আইরিশ বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে নিবেদিতার ঘনিষ্ঠতা ছিল। বিপ্লবী সাহিত্য সংগ্রহ করা এবং বিপ্লবী কাজে উদ্দীপনা সৃষ্টির কাজে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

কিন্তু অস্ত্র সংগ্রহের জন্য ডাকাতি করার পরিকল্পনা তিনি সমর্থন করতে পারেননি।

১৯০৫ সালে বেনারসে কংগ্রেসের অধিবেশনে ভগিনী নিবেদিতা যে বক্তব্য রাখেন, তা কংগ্রেস নেতাদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে।

রামকৃষ্ণ মিশন রাজনৈতিক চর্চা নিষিদ্ধ করায় ভগিনী নিবেদিতা মিশন থেকে সরে আসেন। কারণ স্বামীজীর আদর্শকে কার্যে রূপ দেবার জন্য রাজনীতি জরুরী হয়ে পড়েছিল। বিবেকানন্দের ঘনিষ্ঠরা বিশ্বাস করতেন, স্বামীজী জীবিত থাকলে তিনিও একজন জাতীয় নেতারূপে এই সময় রাজনীতিতে আর্বিভূত হতেন।

উনবিংশ শতাব্দীর নব জাগরণের ফলস্বরূপ স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল। শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে আত্মশক্তি জেগে উঠেছিল, জাতীয় মর্যাদাবোধ এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বিকশিত হয়েছিল। প্রচন্ড গণআন্দোলনের চাপে বঙ্গভঙ্গ আইন বাতিল হয়েছিল। কিন্তু চতুর ইংরেজ শাসকরা ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে সরিয়ে নেবার ফলে ভারতবাসীর দৃষ্টি কলকাতার পরিবর্তে দিল্লির দিকে ঘুরে গেল।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের শেষ ফল নিবেদিতা দেখে যেতে পারেননি। ১৯১১সালের ১৩ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ আইন রদঘোষণার অল্পদিন আগে মাত্র ৪৪বছর বয়সে ভারত প্রেমিক মহীয়সী নারী ভগিনী নিবেদিতা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বিবেকানন্দের আদর্শে নিবোদিত প্রাণ বিবেক ভুমিতে অমর হয়ে রইল।

ভগিনী নিবেদিতা ভারতবাসীর সর্বাঙ্গীন কল্যানে নিজেকে নি:শেষি দান করে নিবেদিতা নামটিকে সার্থক করে তুলেছিলেন। ভারতে নারী শিক্ষা বিস্তারে, সাহিত্যে, সংস্কৃতি ও দর্শন চিন্তার উন্নয়নে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী শিক্ষার প্রসারে, সর্বোপরি পরাধীনতা বন্ধন থেকে ভারতবাসীর মুক্তির জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। নতুন পথের দিশারী হিসেবে তিনি ভারতবাসীর হৃদয়ে চিরস্থায়ী আসন লাভ করেছেন।

বিবেকানন্দের বাণী

বিবেকানন্দের যে সব বাণী ভারতের জাতীয় জীবনে চিরস্থায়ী সম্পদ হয়ে উঠেছে, তা প্রতিটি মানুষকে চিরকাল উদার মানবিকতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করবে। নতুন প্রজন্মের তরুণ তরুণীদের প্রত্যেকেই যাতে এসব বাণীর সঙ্গে পরিচিত হতে পারে তার ব্যবস্থা করা আমাদের শিক্ষানীতির অপরিহার্য অঙ্গরূপে স্বীকৃত হয়েছে।

প্রধান প্রধান বাণীগুলি হল ঃ-

(১)

বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুজিছ ঈশ্বর,
জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।

এই দুটি লাইন ভারতে ধর্মীয় চিন্তায় বিপ্লব সৃষ্টি করেছে। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এটি একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। সব ধর্মের মানুষের কাছেই এই বাণীর মূল্য অপরিসীম।

(২)

অন্যায় করোনা, অত্যাচার করোনা, যথাসাধ্য পরোপকার কর। কিন্তু অন্যায় সহ্য করা মহাপাপ, তৎক্ষনাৎ প্রতিবিধান করতে চেষ্টা করতে হবে।

(৩)

অন্যান্য জাতের কাছে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। যে মানুষটা বলে আমার কিছু শেখার নেই, সে মরতে বসেছে। যে জাতটা বলে আমরা সবজান্তা, সে জাতের অবনতির দিন অতিনিকট। যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি। তবে দেখ জিনিষটা আমাদের ঢঙে ফেলে নিতে হবে এইমাত্র।

(৪)

মানুষের মধ্যে আছে আমাদের মতে, তিনটি জিনিষ শরীর, মন, আত্মা। শরীরে শরীরে কত ভেদ, কিন্তু মন এবং আত্মা একই প্রকৃতির।

(৫)

পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া আমরা কখনোই নিজেদের শক্তিশালী করতে পারবনা।

(৬)

আমরা যা চাই তা এই, কারও জন্য বিশেষ সুবিধা নয়। সকলের জন্য সমান সুবিধা।

(৭)

হে বাঙলার তরুণেরা, ধনী ও বিত্তশালীদের উপর নির্ভর করোনা। গরীবরাই জগতের সব বড় কাজ করেছে। দৃঢ় হও, সর্বোপরি পবিত্র ও খাঁটি হও।

(৮)

অজ্ঞানতার এক দুর্ভেদ্য ঘন মেঘ এমনিভাবে আমাদের সকলকে ঢেকে ফেলেছে যে, আর চেনা অসাধ্য। আজ অভিষ্ট সাধনে চিত্তের দৃঢ়তা নেই, দুঃসাহসিক কর্ম সাধনে তৎপরতা, উদ্যম এবং সাহসও নেই। অপরের দ্বারা নিপীড়িত হলে ঘৃণাও নেই, গোলামীর উপর বিতৃষ্ণাও নেই; হৃদয়ে ভালবাসা নেই, আশা বা মনুষ্যত্ব নেই। ভারতে যা আছে তা পরস্পরের প্রতি হিংসা এবং বিদ্বেষ; কেবল গরীবকে যেকোন প্রকারে ধ্বংস করার ইচ্ছা। এমন দেশের শূদ্র শ্রেণীর বিষয়ে কি বলা যায়, যেখানে সকল লোকই শূদ্রের পর্যায়ে নেমে এসেছে?

(৯)

এমন দিন আসবে শূদ্র শ্রেণীর শূদ্রত্ব নিয়েই উত্থান হবে। প্রত্যেক দেশের শূদ্রগণ শূদ্রগত স্বাভাবিক প্রকৃতি ও আচার নিয়েই প্রত্যেক দেশে পূর্ণ প্রভুত্ব গ্রহণ করবে।

(১০)

স্বামীজী দেশের উচ্চ বর্ণের লোকদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, —" তোমরা কি ইহা বুঝিতে পারনা যে ভারতের এই গণশ্রেণীকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করার ফলেই তোমরা বিগত সহস্র বছর ধরে গোলাম জীবণ যাপণ করছ? এজন্যই তোমরা বিদেশীদের কাছে ঘৃণার পাত্র হয়েছে আর নিজের দেশের লোকেরাও

তোমাদের প্রতি উদাসীন।

(১১)

স্বাধীনতাই উন্নতির প্রথম, প্রধান ও প্রয়োজনীয় শর্ত। মানুষের যেমন চিন্তা করার এবং কথা বলার স্বাধীনতা থাকবে, তেমনি খাদ্য, পোশাক, শিক্ষা, বিবাহাদি অন্যান্য বিষয়েও তার স্বাধীনতা থাকা চাই, যতক্ষণ পর্যন্ত তা অন্যের প্রতি অন্যায় বা অপরের অধিকার ও স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না করে।

(১২)

আমি এমন ভগবানে বিশ্বাস করিনা যিনি আমায় ইহ জগতে রুটির ব্যবস্থা করে দিতে পারেননা, অথচ স্বর্গে তিনি আমায় নিত্য মঙ্গল ও চিরন্তন স্বর্গসুখ প্রদান করবেন।

(১৩)

যতদিন লক্ষ কোটি মানুষ ক্ষুধার্ত ও অজ্ঞতায় বাস করবে ততদিন আমি প্রতিটি লোককে, যে তাদেরই অর্থে শিক্ষিত হয়ে তাদের গ্রাহ্য করেনা, তাকে স্বদেশদ্রোহী বলে অভিহিত করব।

(১৪)

এটা নিশ্চিত জানবে যে কোন কিছুরই উন্নতি সম্ভব নয়, যদি প্রথমেই নারীজাতি ও গণসমূহের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার না হয়।

(১৫)

সমস্ত দেশটা নীচতা, অজ্ঞতা, ভীরুতা ও শিক্ষাহীনতায় সর্বশেষ পর্যায়ে নিমজ্জিত হয়ে আছে। এসব লোকদের জাগাতে হবে, আত্মবিশ্বাস, আশা ও আশ্বাসবাণী শোনাতে হবে তাদের। আর বলতে হবে,- তোমরা আমাদেরই মত মানুষ, আমাদেরই মত সকল অধিকার আছে তোমাদেরও।

(১৬)

ছুঁৎ মার্গের সহিত আমাদের কিছুমাত্র সংশ্রব নাই। উহা হিন্দুধর্ম নহে, উহা আমাদের কোন শাস্ত্রে নেই। উহা প্রাচীন আচারের অনুমোদিত একটি কুসংস্কার।

(১৭)

মানুষের জন্ম প্রকৃতিকে জয় করিবার জন্যই, অনুসরণ করিবার জন্য নয়।

(১৮)

ধর্ম এমন একটি ভাব, যাহা পশুকে মানুষে এবং মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করে।

(১৯)

যে মানুষটা বলে, আমার শেখবার নেই, সে মরতে বসেছে, যে জাতটা বলে আমি সব জান্তা, সে জাতের অবনতির দিন অতি নিকট। যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি।

(২০)

মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণত্বের প্রকাশ সাধনকে বলে শিক্ষা।

(২১)

মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশ সাধনকে বলে ধর্ম।

(২২)

সত্যকে হাজার রকম বাক্যে প্রকাশ করা চলে, এর প্রতিটি বাক্য সত্য।

(২৩)

সত্যের জন্য সব কিছুকেই ত্যাগ করা চলে কিন্তু কোন কিছুর জন্যই সত্যকে বর্জন করা চলে না।

(২৪)

সত্যের অনুসন্ধান মানে শক্তির প্রকাশ ওটা দুর্বল বা অন্ধের মত হাতড়ানো নয়।

(২৫)

পাপ বা পুণ্যের কোন অস্তিত্ব নেই। আসলে আছে অজ্ঞান।

(২৬)

প্রত্যেকের মধ্যেই ঈশ্বর আছেন। অন্য সব কিছুই স্বপ্ন, শুধু মায়া।

(২৭)

পরোপকারই ধর্ম, পর পীড়নই পাপ। শক্তি এবং সাহসিকতাই ধর্ম, দুর্বলতা

এবং কাপুরুষতাই পাপ। স্বাধীনতাই ধর্ম, পরাধীনতাই পাপ। অপরকে ভালবাসাই ধর্ম, অপরকে ঘৃণা করাই পাপ।

(২৮)

আমি এত তপস্যা করে এই সার বুঝেছি যে জীবে জীবে তিনি অধিষ্ঠান হয়ে আছেন,তাছাড়া ঈশ্বর ফিশ্বর কিছুই আর নেই। জীবে প্রেম করে যেই জন সেজন সেবিছে ঈশ্বর।

(২৯)

সমাজে সাম্য আনিবার একমাত্র উপায়, উচ্চ বর্ণের শক্তির কারণ স্বরূপ শিক্ষা ও সংস্কৃতি আয়ত্ত করা। তাহা যদি করিতে পার তবে তোমরা যাহা চাহিতেছ তাহা পাইবে।

সমাজে জাতিভেদ দূর কবাব জন্য এটাই শ্রেষ্ঠ উপায় বলে স্বামীজী মনে কবতেন। দেশের যুব সমাজকে ত্যাগ ও সেবাব ব্রতে অনুপ্রাণিত কবাব জন্য স্বামীজীর বাণী ছিল তুলনাহীন। যুবকদেব উদ্দেশ্যে স্বামীজী যে ভাষায ও যে আবেগে কথা বলেছেন তা পববর্তীকালে একমাত্র নেতাজীব মুখেই শোনা গিয়েছিল।

বর্তমান ভারত গ্রন্থেব স্বদেশ মন্ত্র অধ্যাযে যুবকদেব উদ্দেশ্যে স্বামীজী বলেন,—

হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাস সুলভ দুর্বলতা,এই ঘৃণিত, জঘণ্য নিষ্ঠুরতা এইমাত্র সম্বল করে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করবে?

হে ভারত তুমি ভূলিওনা তোমার নারী জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী। ভুলিওনা-তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয় সুখের, তোমার ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে।

ভুলিওনা তুমি জন্ম থেকেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত। ভুলিওনা নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।

হে বীর সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল,- আমি ভারতবাসী, দবিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চন্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।

সদর্পে ডাকিয়া বল, ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের মাটি আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।

এই অখন্ড ভারত চিন্তা স্বামী বিবেকানন্দের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। এই চিন্তা নবজাগরণেরই পরিনত রূপ, যার সূত্রপাত হয়েছিল শতাব্দীর প্রথমপর্বে রামমোহন রায়ের মাধ্যমে।

স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় নবজাগরণের মহানায়কেরা উপেক্ষিত ছিলেন। স্বাধীনতার পর তাঁদের কার্যাবলীর মূল্যায়ন শুরু হয়েছে। তাঁরা যে সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন তা এখনো পূরণ হয়নি। ভারতে দরিদ্র নারায়ণের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। ভারতে শিক্ষা সংস্কৃতির বিকাশের ক্ষেত্রেও প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের মিলন ঘটেনি। ভারতীয় ঐতিহ্য যেন ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে।

শ্রী রামকৃষ্ণের বাণী

(১)

উপদেষ্টা অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু উপদেশ মত কার্য করে এরূপ লোক অতি অল্প মেলে।

(২)

বিবেক বৈরাগ্যের সহিত বই না পড়লে পুস্তক পাঠে দাম্ভিকতা, অহংকার বেড়ে যায়

(৩)

ঝড় উঠলে অশ্বত্থ গাছ বটগাছ চেনা যায় না। তেমনি জ্ঞান সূর্য উদিত হলে জাতিভেদ থাকে না।

(৪)

ভক্তের জাতি নাই। ভক্তি থাকলেই দেহ, মন আত্মা শুদ্ধ হয়। ভক্তি না থাকলে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নয়, ভক্তি থাকলে চন্ডাল চন্ডাল নয়।

(৫)

মানুষ দেখতে কেউ সুন্দর, কেউ কালো, কেউ সাধু, কেউ অসাধু। কিন্তু সকলের ভিতর সেই এক ঈশ্বরই বিরাজ করেন।

এই লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১। **বিংশ শতাব্দীর ত্রিপুরা -১ম খন্ড - রাজন্য যুগ।**
এতে আছে রাজন্য যুগের তথ্য সমৃদ্ধ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

২। **বিংশ শতাব্দীর ত্রিপুরা - ২য় খন্ড - প্রজাতান্ত্রিক যুগ।**
এতে আছে প্রজাতান্ত্রিক ত্রিপুরার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

৩। **ত্রিপুরায় গণ অন্দোলনের বিচিত্র ধারা ।**
এতে আছে ত্রিপুরায় রাজন্যযুগের শেষ লগ্নে শুরু হয়ে বর্তমান কাল পর্যন্ত বিভিন্ন ধারার গণ অন্দোলনের তথ্য সমৃদ্ধ ইতিহাস।

৪। **কিশোর গল্প গুচ্ছ।**
(ছোটদের জন্য শিক্ষামূলক গল্প)

৫। **নব জাগরণের অগ্রদূত** -- রাজা রামমোহন রায়
(এতে আছে মধযুগের অন্ধকার থেকে আলোর পথে যাত্রার কাহিনী।

৬। **নব যুগের সমাজ বিপ্লবী ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর**
(শিক্ষা সংস্কার ও সমাজ সংস্কারের মহানায়ক বিদ্যাসাগরের সংগ্রামী জীবনের পরিচয়।)

৭। **নবজাগরণের কবি ও কথা শিল্পী** -- মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র
(এতে আছে নব যুগের কবিতা, নাটক, উপন্যাস, ও প্রবন্ধ সাহিত্যের আবির্ভাব লগ্নের পরিচয়।)

৮। **নবযুগের দুই সাধক শ্রী রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ**
(এতে আছে ভারতীয় ধর্ম চিন্তায় মানবধর্মের নতুন ধারা)

৯। ***নবজাগরণের ছয় মহানায়ক***
(এতে আছে উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের প্রেক্ষাপট ও ছয় মহানায়কের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।)